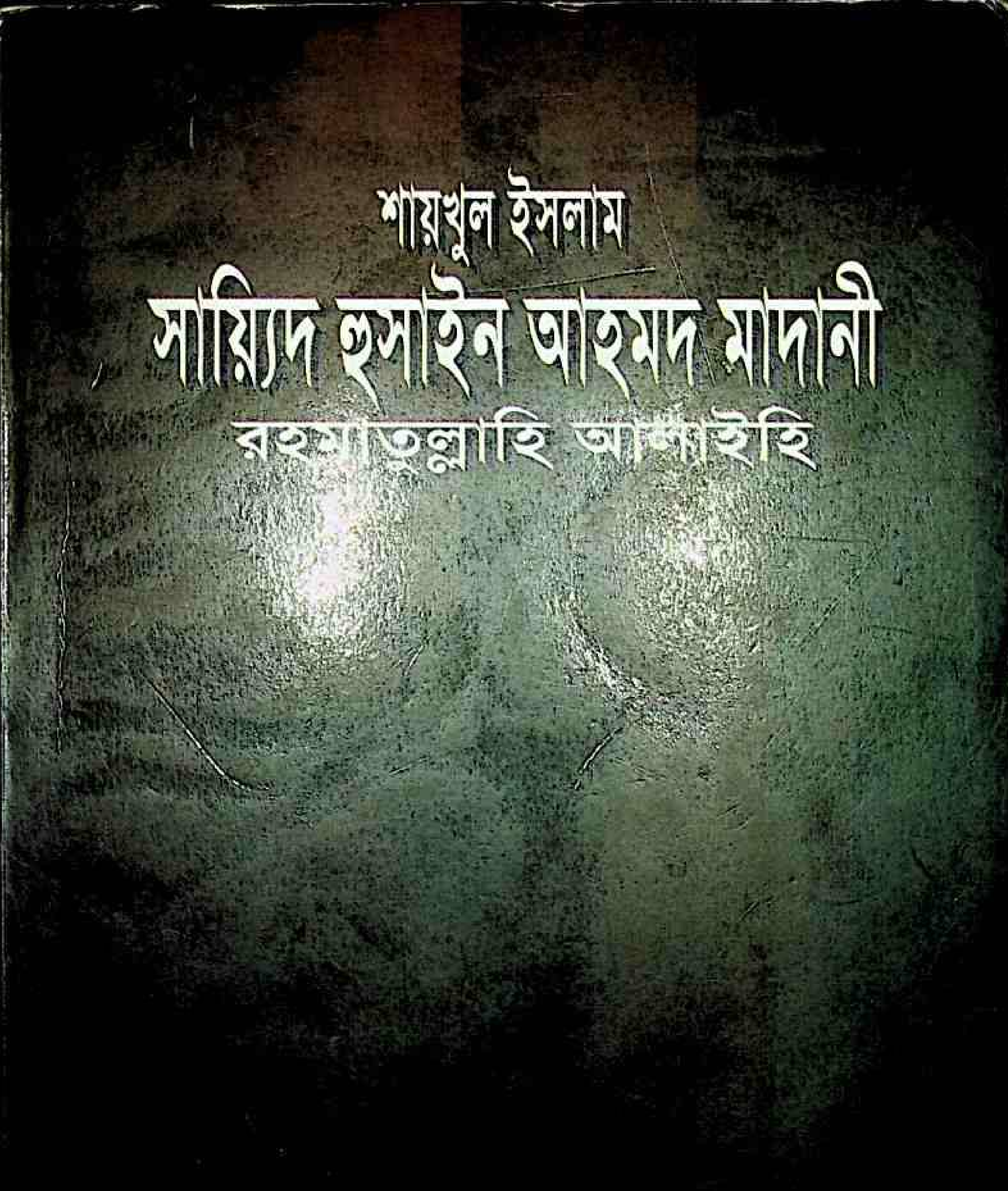


শায়খুল ইসলাম

সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী

রহমাতুল্লাহি আলাইহি

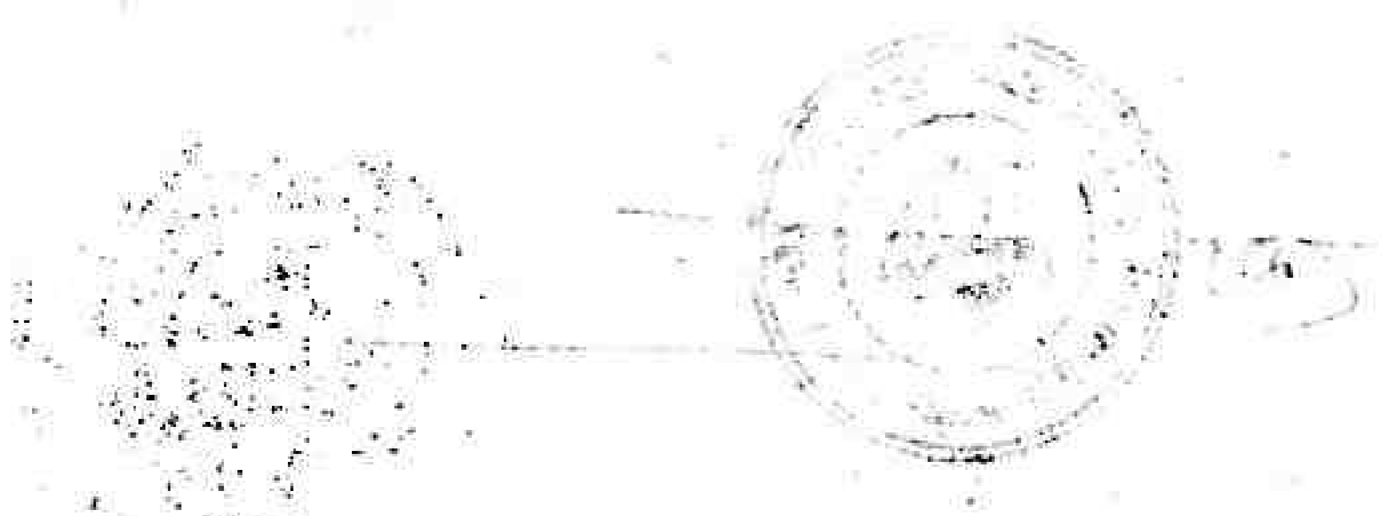
ড. মুশতাক আহমদ

শায়খুল ইসলাম
সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী
রহমাতুল্লাহি আলাইহি
(১৮৭৯-১৯৫৭)

ড. মুশতাক আহমদ

পারিবারিক গ্রন্থাগার

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)

ড. মুশতাক আহমদ

ইফাবা গবেষণা : ৪৬
ইফাবা প্রকাশনা : ২০১৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0608-5

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০১/ বৈশাখ ১৪০৮/ সফর ১৪২২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক
মুহাম্মদ নূরুল আমিন
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রন ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

মূল্য : ১১০.০০ (এক শত দশ) টাকা মাত্র

SHIKHUL ISLAM SAIYED HUSAIN AHMAD MADANI (R.) Written by Dr.Mushtaqe Ahmad, Published by Research Department, **Islamic Foundation Bangladesh.** Agargaon, Shere banglanagar,Dhaka-1207,Bangladesh. May 2001. Price TK 110.00 only : US. $ 4.00.

প্রকাশকের কথা

শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম মুজাহিদ আলিম, মুহাদ্দিস, রাজনীতিক, ায়খে তরীকত ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ রেন। ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি অধ্যয়ন শেষ করে দীর্ঘ আঠার র মদীনা শরীফের পবিত্র মসজিদে নববীতে, তারপর তিন বছর বাংলাদেশের লেটে এবং তারপর বত্রিশ বছর যাবৎ দারুল উলূম দেওবন্দে কৃতিত্বের সাথে ীসের অধ্যাপনা করেন। উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা ন্দোলনে তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান অসামান্য। এ আন্দোলনের কারনে ক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। বহু তন নিপীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়। বহুবার জেলে যেতে হয়। তিনি মাল্টায় বছর, করাচীতে দুই বছর এবং এলাহাবাদে দুই বছর কারাবরণ করেন। া একজন উচচমানের শায়খে তরীকত এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম।

তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রামী ও রাজনীতিক। কোন নিষ্ঠাবান তিবিদ যখন জনসাধারনের কল্যাণে নিজকে উৎসর্গ করেন তখন তিনি আর ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি পরিণত হন অনবদ্য বিশাল ন। তখন তাঁর অবদান ও সমূদয় কর্মকাণ্ড হয়ে যায় জণসাধারনের সম্পত্তি; ক মূল্যবান তত্ত্ব আহরণ সম্ভব। এই কারণেই সফল রাজনীতিবিদের ক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ থাকে এবং তা নিয়ে বিচার গবেষণা ও পর্যালোচনার অবকাশ থাকে বরং প্রয়োজন হয়।

হযরত শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে ইতোপূর্বে লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু াঙ্গ গবেষণা বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট গবেষক

আলিম ড.মুশতাক আহমদ পূর্ণাঙ্গ গবেষণার জন্য উদ্যোগী হন। তিনি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য "শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী ঃ জীবন ও কর্ম" শিরোনামে গবেষণা করে জাতিকে আলোচ্য অভিসন্দর্ভ উপহার দেন। অভিসন্দর্ভের ভিত্তিতে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অভিসন্দর্ভখানা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও মানসমৃদ্ধ বিধায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ এটি 'শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি' শিরোনামে প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছে। পাঠকবৃন্দ বইটি দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হলেও আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বইখানা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকে আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা দান করেছেন। আমরা তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের শ্রম কবূল করুন।

মুহাম্মদ নুরুল আমিন
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

পারিবারিক গ্রন্থাগার
মেরুল বাড্ডা ঢাকা-১২১২

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। মহান আল্লাহর নির্দেশিত মানবতাবাদী জীবনাদর্শ। মানবতার সামগ্রীক কল্যাণের জন্যই ঘটেছে এর আবির্ভাব। ইসলাম চায় মহান আল্লাহর প্রতি বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুষম ও স্বাভাবিক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে। নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দের ভিত্তিতে সমাজে এমন এক বিধান প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে শোষণ নেই, অত্যাচার নেই, নিপীড়ন নেই, সর্বোপরি নেই দুর্বল মানুষকে দলিত করার হীনপ্রবণতা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এবং সত্যপন্থি সংগ্রামী আলিমগণ যুগে যুগে এই চেতনার আলোকেই ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার করে গেছেন। তাই সমাজে যখনই কোন ধরনের শোষণ, জুলুম, অপব্যাখ্যা ও বাড়াবাড়ি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তখনই সংগ্রামী আলিমগণ প্রতিবাদ করেন, প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং লড়াই করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিমগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আলিমগণ ছিলেন স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের মহান ধারক ও বাহক। ভারতীয় উপমহাদেশ বিদেশী ইংরেজ বেনিয়াদের কবলে চলে গেলে এই আলিমগণই স্বাধীনতার দাবীতে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী কর্তৃক ১৮০৩ সালে ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁদের মহান মুক্তিসংগ্রাম। তারপর ১৮৩১ সালের বালাকোট যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, শামেলীর যুদ্ধ, ১৮৬৬ সালের দেওবন্দ আন্দোলন প্রভৃতি সেই ধারারই এক একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায়।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ১৮৫৭ সালের গণঅভ্যুত্থানকে নির্মমভাবে দমনের পর রাজনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করে। ইংরেজরা নিজেদের উপনিবেশবাদী শোষণকে রক্ষা করার তাগিদে এদেশে 'Divide and rule ' তথা ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম দেয়। তারা সুকৌশলে একদিকে যেমন হিন্দুদের মধ্যে একদল খোশামুদে শ্রেণীর সৃষ্টি করে --সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে হিন্দু সমাজের জন্য কল্যাণকর বলে প্রচারণা চালায়, তেমনি অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে অপর একদল লোক তৈরি করে--যারা মুসলিম সমাজে হিন্দু আতংক ছড়িয়ে দিতে এবং ইংরেজকে নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বিশ্বাস করানোর

কাজে সচেষ্ট হয়। উল্লেখ্য এ পথ ধরেই উপমহাদেশে জন্ম নেয় হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, দ্বিজাতিতত্ত্ব ও জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার মত বিভিন্ন সংগঠন ও চিন্তাধারা।

তবে ভারতীয় সংগ্রামী আলিমগণ ইংরেজদের উপরোক্ত চক্রান্ত আঁচ করেন সূচনা থেকেই। তাই কোন চক্রান্তই তাঁদেরকে মুক্তি সংগ্রামের মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি। ১৮৫৭ সালে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর নেতৃত্বে 'শামেলীর যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ছিলেন সিপাহসালার ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী ছিলেন কাযিউল কুযাত। তাঁদের পরে হযরত শায়খুল হিন্দ 'ঐতিহাসিক রেশমী রুমাল আন্দোলন' গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনেরই এক পর্যায়ে ১৯১৪ সালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর উদ্যোগে কাবুলে প্রথম 'স্বাধীন ভারত প্রবাসী সরকার' গঠিত হয়েছিল। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন ঐ সরকারের প্রধানমন্ত্রী।

হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী ছিলেন সংগ্রামী আলিমগণের ঐ ধারারই সর্বশেষ কীর্তিমান মহান ব্যক্তিত্ব। আযাদী সংগ্রামের প্রায় চূড়ান্ত পর্বে ইংরেজ প্ররোচনায় প্রতারণাবাদী দ্বিজাতিতত্ত্ব যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে শায়খুল ইসলাম তখন এর প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ান। মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আযাদসহ এ মহান মনীষী বহু নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করেও জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তির সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখেন। সংগ্রামী এ আলিমগণ বরাবরই ছিলেন উদার, মানবতাবাদী ও পরমতসহিষ্ণু। আমরা মনে করি, তাঁদের এই উদার নীতিই উপমহাদেশে মুসলিম রাজনীতির সর্বাপেক্ষা সুন্দর আদর্শ।

বিশিষ্ট গবেষক আলিম ড.মুশতাক আহমদ 'শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী : জীবন ও কর্ম' শিরোনামে তথ্য ও তত্ত্ববহুল অভিসন্দর্ভ প্রনয়ন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই অভিসন্দর্ভ উপলক্ষ্যে তাঁকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অভিসন্দর্ভখানায় শুধু শায়খুল ইসলামের জীবনীই নয়; বরং ভারতীয় সংগ্রামী আলিমগণের জিহাদী চিন্তা-চেতনা, জীবন-দর্শন, স্বদেশ-প্রেম, সমাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের নীতিমালা প্রভৃতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিজ্ঞ গবেষককে এ দুরূহ কর্মটি সম্পাদনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটি উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজে, বিশেষতঃ সম্মানিত উলামায়ে কেরামের চিন্তার জগতে নতুন জগরণ সৃষ্টি করবে প্রত্যাশায় এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আল্লাহ জাল্লাশানুহু আমাদের শ্রম কবূল করুন।

মওলানা আবদুল আউয়াল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

উৎসর্গ

আমার শ্বশুড় ও শাশুড়ী
আলহাজ্জ হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ও
বেগম মরযিয়্যা ইসলামের দস্ত মুবারকে
যাঁদের অপরিসীম সোহাগ ও স্নেহ-মমতার কাছে
আমি ঋণি।

সূচিপত্র

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ

ভূমিকা

এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য হল হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি(১৮৭৯-১৯৫৭)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং তাঁর চিন্তাধারা ও অবদানের সার্বিক মূল্যায়ন করা। এ কারণে অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে "শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহ্মদ মাদানী ঃ জীবন ও কর্ম"।

তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিপ্লবী সে সব আলিমের অন্যতম যারা খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইল্‌মী, আমলী, আখলাকী, জিহাদী ও রাজনৈতিক প্রতিভার দ্বারা জাতির অসামান্য উপকার সাধন করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটে। ভারতবর্ষে এই শাসন-শোষণের অবসান ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবী আলিমগণের প্রয়াস শুরু হয় অনেক আগে থেকে। মুসলিম ভারতের রাজধানী দিল্লী ইংরেজের করতলে চলে যাওয়ার পূর্বেই ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২) বিপ্লবী দর্শনের প্রচার করেন। ১৮০৩ সালে ঐ দর্শনের আলোকে সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (১৭৪৬-১৮২৩) ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেন। তারপর আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সায়্যিদ আহ্মদ শহীদ বেরেলবী (১৭৮৬-১৮৩১), হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (১৭৮৭-১৮৩১), হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী (মৃ ১২৬৯/১৮৫২), হযরত মাওলানা ইনায়েত আলী (মৃ ১২৭৪/১৮৫৮), হযরত মাওলানা ফয্‌লে হক খায়রাবাদী (মৃ ১২৭৪/১৮৫৭), সায়্যিদুত্ তায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মক্কী (১৮১৭-১৮৯৯), হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (১৮৩২-১৮৮০), ফকীহুন নাফ্‌স কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গূহী (১৮২৯-১৯০৮), উস্তাযুল কুল হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (১৮৫১-১৯২০), ইমামে ইনকিলাব হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (১৮৭২-

১৮৪৪) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ এ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহ্মদ মাদানী মাদানী সেই ধারার সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত জটিল মুহূর্তে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে দীর্ঘকালের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

তিনি ছিলেন ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি 'পবিত্র জিহাদ' জ্ঞান করেন। স্বাধীনতার আন্দোলন বানচালের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ ভারতবর্ষে 'Divide and Rule' নীতি প্রয়োগ করলে তিনি তা প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। ইংরেজদের ঐ নীতির অনিবার্য পরিণামে সৃষ্ট 'খণ্ডিত জাতীয়তা ও দ্বিজাতিতত্ত্ব' তিনি মেনে নেননি। ফলে অনেক মুসলমান তাঁর প্রতি বিরক্ত হলেও তিনি ভারতবাসীর ঐক্য ও অবিভক্তির উপর জোর দিয়ে স্বাধীনতার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অবশেষে ভারতবর্ষ স্বাধীন ও বিভক্ত হয়ে গেলে খণ্ডিত অংশ পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক দর্শনের আলোকে ইতিহাস রচিত হয়। তাতে ইংরেজ উপনিবেশিক শাসনের সমর্থক ও সাহায্যকারী স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), স্যার সায়্যিদ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ নেতাগণ মুসলমানদের ত্রাণকর্তা ও পথিকৃতের স্থান লাভ করলেও হযরত শায়খুল ইসলামসহ বিপ্লবী আলিমগণের দেড় শত বছরের অবদান ইতিহাস গ্রন্থাবলীর মধ্যে যথোচিত স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে বাদ পড়ে যায়। অথচ উপমহাদেশীয় গণমানুষের ভৌগলিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় বিশেষতঃ মুসলিম মিল্লাতের সার্বিক মুক্তি ও উদ্ধারের জন্য তাঁর ও তাঁর পূর্বসূরীগণের অবদান কোন বিচারেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

হ্যরত শায়খুল ইসলাম ছিলেন সমকালের বিশিষ্ট মুজাহিদ, মুহাদ্দিস ও সূফী। তিনি আজীবন ইল্ম ও জিহাদের অঙ্গনে নিয়োজিত থাকেন। জীবন সাধনার বিচারে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক রহ্মাতুল্লাহি আলাইহি (১১৮/৭৩৬-১৮১/৭৯৭)-এর সাথেই তাঁর তুলনা হতে পারে। হাদীস বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা তাঁকে যুগের ইব্ন হাজার আল আসকালানী (৭৭৩/১৩৭২-৮৫২/১৪৪৯)-এর মর্যাদায় উপনীত করেছিল।

কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে মানবতাবাদ, অখণ্ডতা ও অবিভক্ত জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণের দরুন তাঁকে জীবদ্দশায় অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। বিশেষতঃ

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁকে পড়তে হয় মহা সংকটে। হিন্দু-মুসলিম হানাহানি ও খণ্ডিত জাতীয়তা (Tow Nation Theory) সমর্থন না করায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁকে 'হিন্দুদের গোলাম' ও 'কংগ্রেসের দালাল' বলে নাজেহাল করে। পশ্চিম পাঞ্জাব, লাহোর, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে তাঁর গাড়ীতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। তদানীন্তন ঢাকা থেকে তাঁকে 'কাফির' ফত্ওয়া দেওয়া হয়। (যদিও ফত্ওয়ায় স্বাক্ষরকারীরা পরবর্তীকালে ভুল স্বীকার করেছেন এবং নির্বাচনের পর ক্ষমা চেয়ে নিজেদের শুধরে নিয়েছেন) অথচ ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রে তাঁর এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ছিল সেটি প্রমাণিত হতে বেশী সময় লাগেনি। কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তানের জন্ম সে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের ভাষণে কায়িদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা 'আজ থেকে কোন হিন্দু হিন্দু নয় আর কোন মুসলমান মুসলমান নয় বরং সবাই হবে পাকিস্তানী' লীগের বহুল প্রচারিত ঐ দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শনকে অর্থহীনে পরিণত করে দেয়। তারপর পাকিস্তানে কিছুকাল যেতে না যেতেই পাল্টা অসাম্প্রদায়িকতার আলোকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে সেই তত্ত্বের অসারতা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হযরত শায়খুল ইসলাম জীবিত ছিলেন না। কিন্তু ভারতে তখনো তাঁর আদর্শের বহু মুজাহিদ এবং তাঁর প্রিয় সংগঠন জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দ ছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানান। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতে আশ্রয়রত বাংলাদেশী শরণার্থীদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেন। সাংগঠনিকভাবে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকারের জুলুম নির্যাতনের নিন্দা জ্ঞাপন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রেজুলেশন গ্রহণ করেন। তাঁরা রাজধানী দিল্লীতে মিছিল করে গিয়ে হাই কমিশনারের নিকট স্বারক পত্র দেন... (১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ জমইয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ তাহির রচিত 'বাংলাদেশ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' গ্রন্থ দ্র.)। এ সব দিক বিবেচনা করেই আমরা গবেষণা সন্দর্ভের জন্য উপরোক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছি।

হযরত শায়খুল ইসলামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে উর্দু ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর জীবন কালে সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ 'হায়াতে শায়খুল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ লেখকের রচিত 'উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহিদানা কারনামে' দ্বিতীয় খণ্ড ও 'আসীরানে মাল্টা' গ্রন্থেও তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া আবদুর রশীদ আরশাদ রচিত 'বীস বড়ে মুসলমান', আসীর আদরবী রচিত 'মাআছিরে শায়খুল ইসলাম', দৈনিক আল জমইয়তের বিশেষ সংখ্যা 'শায়খুল ইসলাম নম্বর'-এ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত লিখেছেন মাওলানা ফরীদুল ওয়াহীদী। তাঁর গ্রন্থকে

শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ের তথ্যকোষ বলা চলে। গবেষণাকর্মে আমরা উপরোক্ত গ্রন্থগুলো থেকে উপকৃত হয়েছি। তবে এসবে তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারা বিশ্লেষনের চেয়ে চরিত-ইতিহাসের গদবাঁধা আলোচনা প্রাধান্য পেয়ে গিয়েছে। তাই আমাদেরকে হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রচিত 'মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ' স্বয়ং শায়খুল ইসলামের রচিত An Open Letter to Moslem League, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত India Wins Freedom এবং অধ্যাপক যিয়াউল হাসান ফারূকী রচিত Deabond School and the Demand for Pakistan সহ সমকালীন জীবনীকার, সমালোচক ও রাজনীতিকদের অন্যান্য লেখা থেকে তথ্যগত সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। মাওলানা সায়্যিদ ফরীদুল ওয়াহীদীর গ্রন্থে তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাস স্পষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মেধা, মননশীলতা, শিক্ষাদান ও তাসাওউফ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। উপরোক্ত বিষয়গুলোকে আমরা পাকিস্তানের কাযী যাহিদ হুসাইন রচিত 'চেরাগ মুহাম্মদ', মাওলানা নাজ্‌মুদ্দীন ইসলাহী রচিত 'মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম' ও অন্যান্য লেখকের রচনাবলীর সাহায্য নিয়ে তৈরী করেছি। তিনি কর্মজীবনের দীর্ঘ একত্রিশ বছর ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দের সদ্‌র মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস পদে অবস্থান করে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করলেও সায়্যিদ মাহবূব রেযবী রচিত 'তারীখে দারুল উলূম' গ্রন্থে তাঁর কার্যাবলী যথোচিত ব্যক্ত হয়নি। 'নক্‌শে হায়াত' শিরোনামে শায়খুল ইসলাম নিজে ৭০৩ পৃষ্ঠায় আত্মচরিত রচনা করেন। তাতে মাত্র ১৫২ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিজের জন্ম, বংশ, পরিবার-পরিজন, শৈশব, কৈশোর, শিক্ষা, মদীনা শরীফ থেকে হযরত শায়খুল হিন্দের সাথে মাল্টা গমন ও ভারত প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কর্মজীবন আলোচনা করেন। অবশিষ্ট ৫৫১ পৃষ্ঠা তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দের জীবন ও রাজনীতির আলোচনায় ব্যয় করেন। আমাদের কাছে তাঁর জীবনী সম্পর্কীয় মৌলিক তথ্যাবলীর জন্য এ গ্রন্থই বুনিয়াদ হিসেবে গৃহীত হয়। তা ছাড়া তাঁর জীবন সংগ্রামের যোগসূত্র এবং সমকালীন অবস্থা নিরূপনে আমরা এ গ্রন্থ থেকে বিশেষ উপকৃত হই।

১৯৮৮ সালে দিল্লীতে হযরত শায়খুল ইসলামের চিন্তাধারা ও অবদান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশ থেকে অনেক অধ্যাপক, আলিম, শিক্ষাবিদ ও গবেষক তাতে যোগদান করেন। সেমিনারের নির্বাচিত নিবন্ধমালা দিল্লী জামিয়া মিল্লিয়ার অধ্যাপক ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে পাকিস্তানের ড.আবূ সালমান শাহ্‌জাহানপুরী, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড.ওয়াকার আহমদ রেযবী, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শামস তিবরীয খান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানবীর আহমদ উলবী, মাসিক দারুল উলূমের সম্পাদক মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসিমী, উড়িষ্যার গভর্ণর বিশ্বম্বর নাথ পাণ্ডে, শিবলী একাডেমীর যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, পাঞ্জাবের বিশ্বনাথ তাউস, প্রখ্যাত গবেষক মরহুম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদ্‌ভী, অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী, ড. সায়্যিদ আবদুল বারী রচিত নিবন্ধমালা বিশেষভাবে স্থান লাভ করে। শায়খুল ইসলামের জীবন দর্শন, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নে এসব নিবন্ধের ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে সিলেটে এবং আসামে তাঁর বহু শাগিরদ, মুরীদ ও ভক্ত আছেন। অথচ বাংলা ভাষায় তাঁর সম্পর্কে মৌলিক কোন গবেষণা হয়নি। তাঁর ওফাতের পরবর্তী বছর মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 'হায়াতে হযরত মদনী' নামে এবং আরো পরে কলিকাতা আলীয়া মদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাহের 'মদনী চরিত' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থদ্বয়ে শায়খুল ইসলামের প্রতি লেখকদ্বয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিপুল বহিঃপ্রকাশ রয়েছে; কিন্তু ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মরহুম আবদুল মান্নান খান পি-এইচ. ডি. গবেষণার জন্য 'শায়খুল ইসলামের জীবন ও কর্ম' শিরোনাম গ্রহণপূর্বক কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু থিসিসের কোন কাজ করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড.এ.বি.এম.হাবিবুর রহমান চৌধুরী আমাকে ডেকে বললেন, শায়খুল ইসলাম মাদানী ছিলেন অন্যতম উচ্চমানের আলিম ও বুযর্গ ব্যক্তিত্ব। উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজে তাঁর বিভিন্ন দিকের অবদান অপরিসীম। কিন্তু এই শিরোনামে কোথাও কোন বস্তুনিষ্ঠ কাজ হয়নি। অথচ তাঁর জীবন ও কর্ম শিরোনামে গবেষণা করা হলে যেমন ডিগ্রী পাওয়া যাবে তেমনি রূহানী দুআ লাভের সুযোগও পাওয়া যাবে। তখন আমি এ শিরোনামে গবেষণার জন্য অগ্রসর হই।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'সমকালীন পরিস্থিতি ও সংগ্রাম-সূত্র'। এতে ইংরেজ পূর্বকালীন ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বর্ণনা, ইংরেজ আমলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীর উপর নিপীড়ন, মুসলমানদের উপর বিশেষভাবে নিপীড়ন, বিশ্ব মুসলিমের উপর নিপীড়ন এবং নিপীড়িত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লবী আলিমগণের যুগ যুগ থেকে পরিচালিত প্রচেষ্টা তথা মুজাহিদ আন্দোলন, ওয়াহাবী আন্দোলন, সাতান্নর মহাবিদ্রোহ ও দেওবন্দ আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে হযরত শায়খুল ইসলামের

জীবন-সংগ্রামের যোগসূত্র বিধৃত করেছি। এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয় 'ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন'-এর বর্ণনা থেকে আর শেষ হয় শায়খুল ইসলামের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক ও রাজনীতির পথনির্দেশক হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসানের 'রেশমী রুমাল আন্দোলন'-এর বর্ণনায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান লাভ করে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত। এ অধ্যায়ে তাঁর জন্ম, বংশ পরিচয়, শিক্ষা গ্রহণ, মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা, তরীকতের দীক্ষা লাভ, রেশমী রুমাল আন্দোলনে যোগদান, মাল্টায় নির্বাসন, ভারতে প্রত্যাবর্তন, খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ, করাচীর কারাবরণ, সিলেটে দীনী তালীম, দেওবন্দের সদ্‌র মুদার্‌রিস পদে যোগদান, স্বাধীনতার জিহাদে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান, এলাহাবাদে কারাজীবন যাপন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের সঠিক মূল্যায়নের সুবিধার্থে তৎকালীন অন্যান্য রাজনীতিকের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনার জন্যও কিছু জায়গা ছাড় দিতে হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সামগ্রীক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। এ অধ্যায়ে রাজনীতিতে তাঁর দর্শন, কংগ্রেস সমর্থনের কারণ, বিদেশী পণ্য বর্জনের নীতি, দেশপ্রেম, অবিভক্ত জাতীয়তার সমর্থন ও পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করার কারণ, স্বাধীনতার পর ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সম্মানজনক আসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান। এখানে তাঁর শিক্ষাদর্শন, হাদীস ও উলূমে ইসলামিয়্যার শিক্ষকতায় পারদর্শিতা ও বৈশিষ্ট্যাবলী, শিক্ষার সংস্কার ও সম্প্রসারণ, শিশু শিক্ষা ও আধুনিক স্কুল শিক্ষা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নানূতবী শিক্ষাদর্শন, দারুল উলূম দেওবন্দের উসূলে হাশতেগানা (অষ্ট মূলনীতি) এবং ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে দেওবন্দ ও আলীগড়ের চিন্তাধারা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আছে তাঁর আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা। এ অধ্যায়ে তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, আখলাক, ইবাদত ইত্তিবায়ে সুন্নত ও তাক্‌ওয়ার বৈশিষ্ট্য, তাসাওউফ ও সূফীবাদ সম্পর্কীয় দৃষ্টিকোণ, বায়আত ও ইরাদত, ইসলাহ্ ও তরবিয়্যত নীতি, ইজাযত ও খেলাফত দান, কাশ্‌ফ, কারামত, শিক্ষণীয় বিভিন্ন ঘটনা ও মানবিক গুণাবলীর সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করা হয়েছে। শায়খুল ইসলাম সংস্কারবাদী সূফী ছিলেন বিধায় তাঁর নীতিমালা ও বে-শরা পীর ফকীরদের নীতির

পার্থক্য করে দেখানো হয়েছে। তাসাওউফে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে তাঁর নীতির সামঞ্জস্যশীলতাও এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

উপসংহার শিরোনামে রয়েছে হযরত শায়খুল ইসলামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার পর এই গবেষকের অনুভূতি বর্ণনা। এখানে আমরা আমাদের প্রাপ্ত ও আবিষ্কৃত তথ্যাবলীর আলোকে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে অভিসন্দর্ভের ইতি টেনেছি।

অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে অনেক গুণী জন প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্যাবলী সরবরাহ করে কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত শায়খুল ইসলামের সাহেবযাদা আমার পীর ও শায়খ ফিদাউল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন কুত্‌বে দাওরান হযরতুল আল্লামা সায়্যিদ আসআদ আল মাদানী দামাত বারাকাতুহুম, আমার উস্তায হযরতুল আল্লামা সায়্যিদ আরশাদ আল মাদানী, দারুল উলূম দেওবন্দের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফ্‌তী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ জামেয়া মালিবাগের সুযোগ্য মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, আমার বিশিষ্ট শিক্ষক-যাঁর স্নেহঋন কোন কালেই শেষ হয়নি, হবেও না--হযরতুল উস্তায মাওলানা নূর হোসাইন কাসিমী, হযরত মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারূক, হযরত মাওলানা গোলাম মুস্তফা, ইসলামিয়া মদ্রাসার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী চাটগামী, হযরত মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, হযরত মাওলানা আশরাফুদ্দীন কুমিল্লায়ী, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক, ওয়ালিদ মুহ্‌তারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মূছা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক ড.এ.বি.এম.হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ড.আবদুস সাত্তার, ড.আ.ন.ম.রঈস উদ্দীন, ড.আ.হ.ম. মুজতবা হোছাইন, ড.আবদুল বাকী, ড.আলী হায়দার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. আমীনুল হক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আমি তাঁদের সবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার বিশিষ্ট বন্ধু চৌধুরীপাড়া মদ্রাসার বর্তমান মুহতামিম প্রখ্যাত আলিম মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, মালিবাগ জামেয়ার সুযোগ্য মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ মায়মুন, সিলেট কুদরতুল্লাহ মার্কেটের মাওলানা মাসউদুল হক, পি-এইচ.ডি.গবেষক সুহৃদ আবদুল মুনয়িম খান নোমান, এম.ফিল.গবেষক শুভাকাঙ্ক্ষী কাজী হারূনুর রশীদ এবং সর্বোপরি আমার জীবন সঙ্গিনী নাজমুন নাহার নাজু আমার প্রতি যে সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করেছেন তা তাবৎ কাল স্মরণযোগ্য। তাঁদের সকলের নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে গন্তব্যে পৌছতে সহযোগিতা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ মুহূর্তে আমার অন্যান্য বন্ধু বিশেষ

করে মাওলানা আসআদ হুসাইনী, মাওলানা আবুল ফাতাহ ইয়াহয়া, মাওলানা আবদুল মতীন, মাওলানা আবদুর রাযযাক, মাওলানা রুহুল আমীন সিরাজী, স্নেহাস্পদ মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ, মুফতী মোহাম্মদ উল্লাহ ও হাফিয মাহমূদ হাসানকে আমি স্মরণ করছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকলকে যথাযোগ্য জাযা ও পুরস্কার দিয়ে ধন্য করুন ।

এছাড়া বহু প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা আমি পেয়েছি: এসবের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, দারুল উলূম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী (ভারত), কলিকাতা মদনী নগর লাইব্রেরী (ভারত), থানাবন খানকায়ে ইমদাদিয়া লাইব্রেরী (ভারত), চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, মালিবাগ মাদ্রাসা, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা, বড়কাটরা মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, মদনীনগর মাদ্রাসা, কাকরাইল মারকায মাদ্রাসা, হাটহাজারী মাদ্রাসা, পটিয়া মাদ্রাসা ও মারকাযু দাওয়াতিল ইসলামিয়্যা-এর কুতুবখানা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। অনেক দুষ্প্রাপ্য দলীল ও গ্রন্থ, দুর্লভ কিতাব, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য আহরণে উদারভাবে সুযোগ দানের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার ঋণ অকপটে স্বীকার করছি।

গবেষণাকর্মে আমার নির্দেশক ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সিনিয়র অধ্যাপক, উস্তাযুল আসাতিযা, ডক্টর এ.বি.এম.হাবিবুর রহমান চৌধুরী। আমার প্রতি অসামান্য মমতা নিয়ে তিনি যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়ে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছতে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে অভিসন্দর্ভের আদ্যোপান্ত খুঁটে খুঁটে দেখে দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ আমাকে চিরদিন ঋণি করে রাখবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ অভিসন্দর্ভটি প্রকাশ করে আমাকে সবিশেষ কৃতার্থ করেছে। আমি গবেষণা বিভাগের সম্মানিত প্রাক্তন পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, বর্তমান পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, উপ পরিচালক মাওলানা এ.এম.এম.সিরাজুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা আবদুল মুকীত চৌধুরী, গবেষণা সহকারী সাইফুল ইসলাম খানসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের শ্রম কবূল করুন। আমীন।

বিনীত

ড.মুশতাক আহমদ

পারিবারিক গ্রন্থাগার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَأَزْوَاجِهٖ وَأَحِبَّاءِ أَوْلَادِهٖ وَعُلَمَاءِ
أُمَّتِهٖ وَأَتْبَاعِهٖ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

১ম অধ্যায়

সমকালীন পরিস্থিতি ও সংগ্রাম-সূত্র

ইংরেজ শাসনপূর্ব ভারতবর্ষ

এক

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জাহানের জন্য রহমতরূপে প্রেরিত।[1] বিশ্বের সর্বত্র সত্যের আহবান পৌঁছানো তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। কুরাইশ ও আরব গোত্রগুলির উৎপাতের দরুন তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর পূর্বে আরবের বাইরের দিকে মনোনিবেশের সুযোগ পাননি। হুদাইবিয়্যার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.)-এর পর অনেকটা স্বস্তি লাভ করেন এবং বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন। তিনি নিজের চিঠিসহ দূত প্রেরণ করে বাইযানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius), পারস্য সম্রাট খস্রু পারভেজ (Chosroes 11), মিসরের শাসনকর্তা আযীয মিস্র, হাবশার রাজা নাজাশী (Negus), ইয়ামামার সর্দারবৃন্দ ও গাস্সানী শাসক হারিস প্রমুখের নিকট ইসলাম কবূলের আহবান জানান।[2] তখন দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত 'হিন্দ' তথা ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কেও তাঁর দরবারে আলোচনা হয়। তিনি নিজ সাহাবীগণকে ভারতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, আমার উম্মতের দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ

---

১. মহান আল্লাহর বাণী:
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ﴾
আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। আল কুরআন ২১ : ১০৭।

২. মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোছাইন ও ড.এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ ৬৮১।

তাআলা জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। তন্মধ্যে একটি হল 'হিন্দ' অভিযানকারী সেনাদল আর অপরটি হল মার্‌য়াম তনয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সহযোগী সেনাদল।[৩]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত বক্তব্য সাহাবীগণের মনে গভীর রেখাপাত করে। হযরত আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু (মৃ. ৫৭/৫৮/৫৯ হি) নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দ বিজয়ের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। তাই সেই সময়ে যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে অবশ্যই আমার ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। ঐ যুদ্ধে আমি নিহত হলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাব আর মঙ্গল মত ফিরে এলে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব।[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় 'সরবতক' নামক ভারতীয় জনৈক রাজাকে ইসলামের দাওয়াত জানালে তিনি কবূল করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য ভারত থেকে যানজাবীল বা আদ্রক উপঢৌকন পাঠান। শায়খ যায়নুদ্দীন 'তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী বাযি আহওয়ালিল বুর্‌তুকালীন' গ্রন্থে বলেন, মালাবার (কেরালা)-এর জনৈক রাজা 'চেরুমল পারুমল' তাওহীদ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরব গমন করেন এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা

---

২. মূল হাদীস;

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِيْ حَرَّرَهُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُوْنُ مَعَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ – عَلَيْهِمَا السَّلَامُ –))

(আস সুনান লিল ইমাম আন্ নাসায়ী, দেওবন্দ, দারুল কিতাব, হি. ১৩৫০, ২য় খণ্ড, গায্ওয়াতুল হিন্দ, পৃ ৫২)

৩. মূল হাদীস:

((وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيْهَا نَفْسِيْ وَمَالِيْ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ)) .

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫] এভাবে নবীজীর জীবন কালেই ইসলামের আহবান ভারতবর্ষে এসে পৌছে।

আরব্য বণিকরা অতীত কাল থেকেই ভারত উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে যাতায়াত করত। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে এই বণিকগণ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলীয় বন্দরসমূহে এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় ইসলামী ভাবধারার আগমন ও প্রসার ঘটে।[৬] এই সময় ভারত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এমনকি দক্ষিণ চীনসাগর পাড়ি দিয়ে ইসলামের আহ্বান চীনে গিয়ে পৌছে।[৭] চীনের ক্যান্টনে দু'জন মহান সাহাবীর কবরের অস্তিত্ব এ সব তথ্যের প্রমাণ বহন করে।[৮]

---

৫. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, **বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ ১৭৬; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, **বাংলা ও বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা** (ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ফাল্গুন ১৩৯৭), পৃ ১০৪।

৬. ড.তারা চাঁদ, **ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ ২৭; The coin of Khalifa Harun-ur-Rashid, dated 172 H/788 A.D. found at Paharpur in the Rajshahi district, and the coin of one of his successors discovered at Mainamati in the Comilla district show that the Arab Muslim used to come Bengal either as traders or preachers from the eighth century. (Dr.M. A. Rahim 'The Advent of Islam in Bangladesh', **Islam in Bangladesh Through Ages**, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, ১৯৯৫, পৃ ১৫)

৭. প্রচলিত প্রবাদ « اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّيْنِ » জ্ঞান অর্জন কর চীন দেশে গিয়ে হলেও। এ প্রবাদটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের আগে থেকেই আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এটি হাদীস বলে অনেকের ধারণা রয়েছে। বস্তুত এটি হাদীস নয়, পূর্ব থেকে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্যের কোন প্রতিবাদ করেছেন বলে জানা যায়নি। তাই অনেকে এটিকে হাদীস মনে করেছেন। প্রবাদটির মাধ্যমে জানা যায় যে, ইসলামের বহু আগে থেকেই চীনদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ ছিল। চীনদেশের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল আর ঐ বাণিজ্য উপলক্ষে বঙ্গদেশসহ উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আরবদের বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত ছিল।

৮. হযরত আবূ ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে ৩ জন বিশিষ্ট সাহাবী ও কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলমানের একটি প্রচারক দল চীনে গমন করেন। দলনেতা হযরত আবূ ওয়াক্কাস

জলপথের ন্যায় স্থলপথেও ভারত উপমহাদেশে মুসলিম প্রচারকগণের আগমন ঘটেছিল। স্থলপথে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গিরিপথ দিয়ে মুসলমানগণ প্রবেশ করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারূক রাযিআল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে (খৃ.৬৩৩-৬৪৩) সিন্ধুর সাথে আরবদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।[৯] তখন যে কয়েকজন সম্মানিত সাহাবী উপমহাদেশে পদার্পণ করেন তাঁদের নাম হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইত্‌বান,[১০] হযরত আসিম ইব্‌ন আম্‌র আত্‌ তামীমী[১১], হযরত সুহার ইবনুল আদাবী[১২], হযরত সুহায়ল ইব্‌ন আদী[১৩] এবং হযরত হাকাম ইব্‌ন আবুল আস আস্‌

ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটাং মসজিদটি এখনো সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয় যিয়ারত্‌গাহ্‌ রূপে পরিচিত। অন্য দু'জন সাহাবী উপকূলীয় ফু-কীন প্রদেশের চুয়াংচু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের উপর সমাহিত রয়েছেন। চতুর্থ জন দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে গিয়েছিলেন। (মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলাম ঃ কয়েকটি সূত্র" **ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা**, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ ২০)

৯. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইত্‌বান রাযিআল্লাহু আনহু মদীনার আনসারদের একটি গোত্র 'বনুল হুবলা'-এর সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী এবং আনসারগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ২১ হি./৬৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হযরত সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাসের স্থলে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং সেই বছরের শেষ দিকে একই পদে বসরায় বদলী হন। এরপর তিনি পূর্ব ইরান ও উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন। তাঁর ইন্তিকালের তারিখ জানা যায়নি। (ইব্‌ন হাজার আল আস্‌কালানী, **আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস্‌** সাহাবা, মিস্‌র, মাতবাউস সাআদাহ, হি. ১৩২৮, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৭)

১১. হযরত আসিম ইব্‌ন আম্‌র আত্‌ তামীমী রাযিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিশিষ্ট সাহাবী ও প্রাথমিক যুগের একজন খ্যাতিমান সৈনিক। ইরাক বিজয়ে তিনি বিশ্ববিশ্রুত জেনারেল হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ রাযিআল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট সহযোগী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন এবং সিন্ধু উপত্যকা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। (ইব্‌ন হাজার আল আস্‌কালানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭; ইব্‌ন আবদিল বার, **আল ইস্তিআব ফী-মারিফাতিল** আস্‌হাব, মিসর, মাকতাবাহ নাহ্‌দাহ, তা. বি., ২য় খণ্ড, পৃ ৭৮৪)

১২. হযরত সুহার ইবনুল আদাবী রাযিআল্লাহু আনহু ছিলেন আবদুল কায়্যস গোত্রের লোক। ৮/৬৩১ সালে একটি প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি হুজ্‌র থেকে মদীনা শরীফ আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমরের খেলাফত কালে তিনি বসরা গমন করে সেখানেই

সাকাফী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম।[১৪] খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর আমলে (৬৪৪-৬৫৬ খৃ.) আগমনকারী আরো দু'জন সাহাবী ছিলেন হযরত উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মা'মার আত্‌ তামীমী[১৫] ও হযরত আবদুর

বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। সিন্ধুনদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, এখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন। (ইব্‌ন হাজার আল আস্‌কালানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮; ইব্‌ন সাদ, আত্‌ তাবাকাত, রাগিব রহমানী অনূদিত, করাচী, নফীস একাডেমী, ১৯৭২, ৭ম-৮ম খণ্ড, পৃ ১০২)

১৩. হযরত সুহায়ল ইব্‌ন আদী রাযিআল্লাহু আনহু ছিলেন আযদ গোত্রের শাখা বনুল আশহালের লোক। তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৭/৬৩৭ সালে তিনি আল জাযীরার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীগণের তালিকাভুক্ত হওয়ার মত বয়স হযরত সুহায়লের ছিল। তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাদের সকলে সাহাবী ছিলেন এবং তাঁরা ওহুদ যুদ্ধে শরীক হন। তাঁদের নাম হযরত হারিস ইব্‌ন আদী, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আদী ও হযরত সাবিত ইব্‌ন আদী রাযিআল্লাহু আনহুম। (ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩)

১৪. হযরত হাকাম ইব্‌ন আবুল আস আস্‌ সাকাফী রাযিআল্লাহু আনহু ছিলেন বসরায় হিজরতকারীগণের অন্যতম। তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা আল মুযানী (মৃ. ১১৩) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সাকীফ গোত্রের সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোক ১১ হিজরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। সে মতে হযরত হাকাম যে সাহাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ যে মারফূ-এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী তাঁর সাহাবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। (ইব্‌ন আবদিল বার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৫৮)

১৫. হযরত উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মা'মার আত্‌ তামীমী রাযিআল্লাহু আনহু ছিলেন মদীনা শরীফের বাসিন্দা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারীও ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু তাঁকে মাকরান ও সিন্ধু এলাকার বিদ্রোহী উপজাতিদের দমনের জন্য পাঠান। তবে তাঁর এই নিয়োগের সঠিক সন তারিখ অজ্ঞাত। আল্লামা তাবারীর বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু ২৩ হিজরীতে খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরই তাঁকে মাকরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। মাকরানে পৌঁছে তিনি বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের করতলগত করে নেন। (ইব্‌ন হাজার আল আস্‌কালানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪০)

রহমান ইব্‌ন সামুরা আল বস্‌রী রাযিআল্লাহু আনহুমা ।[১৬] এভাবে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলেও বহু সূফী-সাধক, আলিম ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আরব থেকে সুদূর ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন।

দুই

আধুনিক ইসলামী গবেষকদের মতে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর অধঃস্তন বংশধর। পবিত্র কুরআনসহ সকল আসমানী গ্রন্থে সায়্যিদুনা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে মানবকুলের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] তিনি ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী।[১৮] ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতার মতে হযরত

---

১৬. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা রাযিআল্লাহু আনহু কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান। ইতোপূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্‌দ কিলাল অথবা আবদুল কাবা। ৯/৬৩০ সালে তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে তাবূক যুদ্ধে শরীক হন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন আল মুসায়্যিব, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা এবং হাসান আল বস্‌রীর উস্তাদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ৩১/৬৫০ সালে তিনি 'সীস্তানের' গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ জেনারেল ছিলেন। কার্যভার গ্রহণের পরই বরঞ্জ থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা অধিকার করেন। তিনি হেলমন্দ নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'রূদবার' পর্যন্ত জয় করেন। এ স্থানটি বর্তমানে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। ৫০/৬৭০ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। (ইব্‌ন সাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৮; ইব্‌ন আবদিল বার, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৩৫; ইব্‌ন হাজর আল আস্‌কালানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০১)

১৭. আল কুরআন ২ : ৩০-৩১। (See Targum of Jerusalem to Gen. Tal. Sanhedrin, P. 38a; Pirke R. Eliezer, ch.i xi)

১৮. সাদুদ্দীন তাফ্‌তাযানী, **শারহুল আকায়িদ আন্ নাসাফিয়্যা** (চট্টগ্রাম : কুতুবখানা যমীরিয়্যা, তা. বি.), পৃ১২৫; **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ ১৫।

আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে অবতরণ করেন। এখান থেকে পরে আরব উপদ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।[১৯]

হযরত আদমের পর বহু কাল পর্যন্ত মানুষের মধ্যে খাঁটি তাওহীদবাদ অব্যাহত ছিল। তারপর মানুষ ক্রমে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আসেন। তিনি ৯৫০ বছর তাওহীদবাদের প্রচার করেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউ মুসলমান হয়নি।[২০] ফলে পৃথিবীতে প্রথম আসমানী গযব 'মহাপ্লাবন' সংঘটিত হয়।[২১] তাতে বিশ্বাসীগণ ছাড়া সকলে সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।[২২] মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁর বংশধরকে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেন।[২৩] তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ায় বসবাসের ফলে বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। নূহ-এর বংশধরের নাম অনুসারে বিভিন্ন এলাকার নাম হয়ে যায়। হযরত নূহের তিন পুত্র ছিল। হাম, সাম ও ইয়াফিস।[২৪] আবার হামের ছয় পুত্র। হিন্দ, সিন্দ, হাবাস, জানাস, বার্বার ও নিউবাহ। তন্মধ্যে হিন্দের মাধ্যমে ভারতবর্ষ আবাদ হয়েছিল বলে এ ভূখণ্ড 'হিন্দ' বা হিন্দুস্তান নামে পরিচিত।[২৫]

হযরত নূহের পুত্র ও পৌত্রগণের সকলে ছিলেন তাওহীদে বিশ্বাসী ধর্মপ্রচারক। হিন্দের চার পুত্র। পূরব,বঙ,দাকন ও নাহরাওয়াল। জ্যেষ্ঠপুত্র পূরবের

---

১৯. মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশ্তা, তারীখে ফেরেশতা, আবদুল হাই অনূদিত (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে মিল্লাত, ১৯৮৩), পৃ ৫৯।

২০. হাফিয ইব্‌ন কাসীর আদ্ দামেশকী, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বায়রূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ১৪১৩/১৯৯৩), ১ম খণ্ড ,পৃ ১১৩।

২১. মহাপ্লাবন কোন সালে ঘটেছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০, কেউ বলেন আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। আবার কারো মতে খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এ প্লাবন ঘটেছিল। তবে এতটুকু সত্য যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ কিংবা খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দে পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। (এম.আই.চৌধুরী প্রণীত প্রবন্ধ, মনসূর মূসা সম্পাদিত, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ ৪৬)

২২. আল কুরআন ৭ : ৬৪; ১০ : ৭৩; ১১ : ৪৩; ২১ : ৭৭; ২৫ : ৩৭।

২৩. আল কুরআন ৩৭ : ৭৭; (Goldziher, **Adhandlungen zur arabischen Philologie**, ii, Leyden 1899.)

২৪. হাফিয ইব্‌ন কাসীর আদ্ দামেশকী, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩০-১৩১।

২৫. মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

মোট ৪২ পুত্র। অল্পকালের মধ্যে তাদের আরো বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং তাঁরা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয় পুত্র বঙ উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই বঙ বংশধরের আবাসস্থলই বঙ বা 'বাংলা' নামে পরিচিত হয়।[২৬] দাকানের তিন পুত্র। সারহাট, কানাড় ও তালাঙ্গ। তন্মধ্যে সারহাটের নামে সুরাট, কানাড়ের নামে কানাড়ী ও তালাঙ্গের নামে তেলেঙ্গূ বা তেলেগু নাম হয়।[২৭] নূহের সন্তান-সন্ততি ভারত ভূখণ্ডে কতকাল বসবাস করেন তা সঠিক জানা যায়নি। তবে প্রাচীনকালে নানা পরিবর্তনের ফলে এই জনগোষ্ঠির পর অন্যান্য দিক থেকে ক্রমে নেগ্রিটো (Negrito), অষ্টলয়েড বা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, মঙ্গোলয়েড বা ভোট চীনীয় (Mongoloid/Bhooto-Chinese) ও দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে। তাদের অনেক পরে আগমন ঘটে আর্য সম্প্রদায়ের।[২৮] এভাবে অতি প্রাচীন

---

২৬. ড.এম.এ.আজিজ ও ড. আহমদ আনিসুর রহমান রচিত প্রবন্ধ, **বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ**, প্রাগুক্ত,পৃ ২-৩।

২৭. ড.কাজী দীন মুহম্মদ রচিত প্রবন্ধ, **বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ**, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯; আবদুল মান্নান তালিব, **বাংলাদেশে ইসলাম** (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ ১৯।

২৮. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ ঃ কিছু ভাবনা" **মাসিক অগ্রপথিক** (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২ ফেব্রু, ১৯৮৯), পৃ ৩৮; বিজ্ঞানীরা মানব বংশধারা ও জাতি বিভক্তিকে প্রধানতঃ ৩টি ধারায় বিভক্ত করেন। ককেশিয়ান, মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড। ককেশিয়ানদের গায়ের রং সাদা ও চুল ঢেউ খেলানো। তাদের উদাহরণ হিসেবে ইউরোপিয়ানদের কথা বলা যায়। মঙ্গোলয়েডদের গায়ের রং হলদে এবং চুল সোজা। তারা অনেকটা বর্তমান চীন ও জাপানীদের ন্যায়। নিগ্রোয়েডদের গায়ের রং কালো এবং চুল পশমের মত কোকড়ানো। আফ্রিকার নিগ্রোদেরকে তাদের উদাহরণ বলা যেতে পারে। তবে এ জাত বিভক্তি ১০০% সঠিক নয়। ককেশিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন শাখা আছে। তম্মধ্যে নরডিক্স, ইস্ট বাল্টিক্স, আলপিন্স এবং মেডিটারিয়ান্স অন্যতম। নরডিক্সরা দীর্ঘদেহী, মাথার খুলি লম্বাটে এবং চোখের মনি নীল। বালটিক্সরা বেঁটে দেহ, চওড়া মস্তক ও গোলাকার মুখমণ্ডল। আলপিন্সরা বেঁটে এবং মাথার খুলি গোল। মেডিটারিয়ানদের মাথা লম্বা, চামড়ার রং গাঢ় বর্ণ, চোখের মনি কালো এবং চুল ঢেউ খেলানো। এই তিন ধরণের ককেশিয়ান ইউরোপে বাস করে। আরবরা মেডিটারিয়ান। তাদের গায়ের রং হালকা বাদামী, চুল কালো, খুলি লম্বাটে এবং নাক খাড়া। ভারতেও মেডিটারিয়ানদের দেখা যায়। উত্তর আফ্রিকার হেমিট্স জাতিরা মেডিটারিয়ান। তবে তাদের মধ্যে নিগ্রোয়েডদের প্রভাব বেশী। মিসর, ইথিওপিয়া ও সাহারাবাসীদেরকে তাদের দৃষ্টান্ত বলা যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাপানের আইনু জাতি ও ভারতের আর্যদেরকে মিশ্র ককেশিয়ান বলা যায়। মঙ্গোলয়েডদের বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের চুল পাতলা ও অনেকটা সোজা সোজা। তাদের গায়ে

ভারতীয়দের সাথে নতুন আগমনকারীদের বহু গোত্র ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতে প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর কাছে আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন।[২৯]এ সূত্র মতে ভারত উপমহাদেশে বসবাসকারী প্রাচীন জাতিসমূহের কাছেও যে তাওহীদের প্রচারক বহু পয়গাম্বর পাঠানো হয়েছিল তা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। তবে যেহেতু তাঁদের নাম ও ধর্মপ্রচারের ইতিহাস পবিত্র কুরআন কিংবা মহানবীর হাদীসে উল্লেখিত নেই, সেহেতু কাউকে চিহ্নিত করে 'নবী' আখ্যায়িত করা যায় না।[৩০]

লোম খুব কম হয়। নাক খ্যাদা, ঠোঁট মোটা, চোখ ছোট ছোট এবং বোজা বোজা। প্রধানতঃ চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়নমার ও তিব্বতে তাদের বসবাস বেশী। আসামের অনেকের মধ্যে মঙ্গোলয়েডদের প্রভাব দেখা যায়। এস্কিমোরা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। নিগ্রোয়েডদের গায়ের রং কালো, নাক থ্যাবড়া। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বাস করে। তাছাড়া আন্দামান, মালয়েশিয়া, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপে তারা ছড়িয়ে আছে। আরো কিছু যাদেরকে উপরোক্ত তিনটির কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না যেমন পিগমী, বুশম্যান, হটেনটট ও অস্টোলয়েড। পিগমীরা আকারে ভীষণ ছোট, তাদের উচচতা বড় জোর সাড়ে ৪ ফুট। মধ্য এশিয়ার জঙ্গলে তারা থাকে। বুশম্যান ও হটেনটটদের আদি বাস আফ্রিকায়। তারা পিগমীদের মত বেটে নয় তবে রং নিগ্রোদের চেয়ে হালকা এবং একটু হলদে। চুল পশমের মত কোকড়ানো। অস্টলয়েডদের চুল ঢেউ খেলানো, গায়ের রং কালো, নাক চওড়া, কপাল চওড়া হয়ে সামান্য ঢালু। দ্র.জ্ঞান বিশ্বকোষ, পৃ ৭০ ।

২৯. মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক। ১৩ : ৭ ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। ৩৫ : ২৪; (Horovitz. Koranische, Berlin Leipzing, p 44.)

৩০. আল্লামা শিবলী নুমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, সীরাতুন্নবী (করাচী : দারুল ইশাআত, ১৯৮৫) , ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩১১; পবিত্র কুরআনের আয়াত :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾

আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ কওে ছিলাম, তাদেও কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি আর কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি, (৪০ : ৭৮) এ তথ্যকে সমর্থন করে।

আর্যদের পৌত্তলিকতা, জাতবিভক্তি ও ধর্মীয় কঠোর অনুশাসন প্রাচীন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনে দুঃখ ও নৈরাশ্য বাড়িয়ে তুললে নির্বাণ ও মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসেন 'গৌতম বুদ্ধ' ও 'মহাবীর'সহ বহু ধর্মপ্রচারক। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম তাঁদের দ্বারা প্রচারিত হয়।[৩১] কিন্তু কালের নির্মম আবর্তে তাঁদের সকলেরই প্রচারিত ধর্ম নানাভাবে বিকৃতির শিকার হয়। এটা শুধু প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগুলোর ব্যাপারেই নয়; প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শেষনবী পর্যন্ত যত ধর্মপ্রচারক পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কারো ধর্মই সুরক্ষিত থাকেনি। বরং কালক্রমে বিকৃত হয়ে পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে হযরত আদম (Adam) আলাইহিস সালাম- যেই ধর্ম ও জীবন বিধান নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন সেটি বিভিন্ন সময়ে বিকৃতির কবলে পতিত হলেও সেটিকে পরবর্তী সময়ে মার্জিত ও সুপরিচ্ছন্নরূপে যুগোপযোগী ধর্ম হিসেবে পুনরায় পেশ করার লক্ষ্যে প্রেরিত হন হযরত নূহ (Noah), হযরত ইদ্রীস (Enoch), হযরত ইব্রাহীম (Abraham), হযরত মূসা (Moses), হযরত দাঊদ (David) ও হযরত ঈসা (Jeses) আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামসহ পৃথিবীর সকল পয়গাম্বর ও ধর্মপ্রচারক।[৩২]

তাঁদের সকলে ছিলেন একই ধারাবাহিকতা ও একই আদর্শের বিভিন্ন কড়ি। এই ধারারই সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , যিনি পূর্ববর্তী সকল ধর্মপ্রচারকের রেখে যাওয়া আমানতকে সুপরিচ্ছন্ন অবয়বে বিশ্বমানবতার সামনে পেশ করেছেন। কাজেই ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তথা নাম অজ্ঞাত পয়গাম্বরগণের উম্মতের মাঝে শেষ পয়গাম্বরের পেশকৃত ধর্মের যেই প্রচার ও প্রসার ঘটেছে সেটিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যায় না।

---

৩১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, **বাঙ্গালার ইতিহাস**, ১ম খণ্ড, পৃ ২৭-২৮; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত,পৃ ৩৬।

৩২. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী, **আল বালাগুল মুবীন** (ঢাকা : শিরীন পাবলিকেশন্স, বাংলা ১৩৮৩), পৃ ৭-১০।

তিন

ভারতীয় জনগোষ্ঠী ইসলামে দীক্ষিত হলে ক্রমে মুসলিম শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ধর্মপ্রচারকগণের ক্রমাগত প্রচারাভিযান সেই ক্ষেত্রকে আরো উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় করে তোলে। ফলে শতাব্দীকালের মধ্যেই (৭১২ খ্রি.) উপমহাদেশের পশ্চিম-উত্তর সীমানায় উড্ডীন হয় মুসলিম শাসনের বিজয় পতাকা।[৩৩] এ ব্যাপারে মুসলিম রাজন্যবর্গের চেয়ে ইসলাম প্রচারকগণের অবদান বেশী ছিল। বস্তুত রাজন্যবর্গ ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছিলেন ধর্ম প্রচারকগণ রাজন্যবর্গ দ্বারা ততটুকু উপকৃত হননি। ইউরোপে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা কোথাও তরবারীর জোরে হয়ে থাকলেও ভারতের অবস্থা ছিল ভিন্ন। এখানে তরবারীর চেয়ে ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষের নিখুঁত আকর্ষণবোধই বেশী কাজ করে।[৩৪] অনুরূপে শ্রেণীবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি কারণে অতিষ্ঠ শূদ্র ও নীচকূলজাতের লোকেরা প্রধানতঃ ইসলাম কবূল করেছিল-এ কথাও যথার্থ নয়। ভারতীয়দের সত্যানুরাগ তাদেরকে ইসলামের দিকে ধাবিত করে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের চরিত্রে আদিকাল থেকে ধার্মিকতা, মানবতাবোধ ও সরলতার যেই বৈশিষ্ট্য ছিল, ইসলাম গ্রহণে সেই বৈশিষ্ট্য তাদের সাহায্য করে। কালিকটের রাজা জামেরীনের ইসলাম গ্রহণপূর্বক নিজে দাওয়াতের কাজে অংশ গ্রহণ করা,[৩৫] আরাকানের রাজা বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত বাণিজ্যতরীর মুসলিম বণিকদের ধর্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হওয়া এবং তাদেরকে নিজ দেশে স্থায়ীভাবে বসতির ব্যবস্থা করে দেওয়া[৩৬] এরই ইঙ্গিত বহন করে। নতুবা অবস্থাপন্ন ও সবল লোকদের তুলনায় দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের কাছে যে কোন ধর্মের দাওয়াত অধিকতর সমাদৃত হওয়া শুধু ভারত উপমহাদেশের বেলায় নয়, বিশ্বের সর্বত্রই এমনটি ঘটেছে।

মুসলিম প্রচারকবৃন্দ ভারতে প্রবেশ করে ভারতীয়দের সাথে একান্তভাবে মিশে যান। তাঁরা ভারতবাসীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার মাধ্যমে ইসলামের অমিয় বাণী, আখ্‌লাক ও দৈনন্দিন জীবন বিধানের দাওয়াত ও শিক্ষা দেন। তাঁরা সাধারণতঃ কোন গ্রাম কিংবা নগরকে নিজেদের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়ে সেখানে

---

৩৩. ড.তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১-৪২।

৩৪. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারীখী জায়িযা (লক্ষ্ণৌ : মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশ্‌রিয়্যাতে ইসলাম, ১৯৯২), পৃ ৩২-৩৪।

৩৫. ড.তারা চাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৩৬. ড.কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২।

খানকা ও প্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলতেন। ভারতের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশকে তাঁরা এত বেশী আপন করে নিয়েছিলেন যে, অনেকে নিজ জন্মভূমিতে আর ফিরে যাননি বরং এখানেই সমাধিস্থ হন।[৩৭] দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জ (২৩ জানু ৬৩২ খ্রি.)এর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে প্রায় সোয়া লক্ষ[৩৮] সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ইসলামের মহান আহ্বান নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ[৩৯] পেয়ে সকলে এমনভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন যে, ঐ সোয়া লক্ষ সাহাবীর এক-দশমাংশের সমাধিও আরব ভূখণ্ডে পাওয়া যায় না। এই প্রচারকগণই দেশে দেশে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেন এবং সর্বত্র ইসলামী শাসনের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করে দেন। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন উমাইয়া সেনাপতি মহাবীর মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম (৯৩/৭১২-৯৬/৭১৫)। তারপর যথাক্রমে সুলতান মাহ্মূদ গযনবী আল ফাতিহ (৯৯৭-১০৩৩ খ্রি.), সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৩-১২০৬ খ্রি.)ও সুলতান কুতবুদ্দীন আয়বেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন। অবশেষে সুলতান আলাউদ্দীন শাহ্ খালজী (১২৯৬-১৩১৬)-এর সময়ে সমগ্র ভারত উপমহাদেশ মুসলিম

---

৩৭. সাধারণতঃ বলা হয় যে, এক হাতে কুরআন আর অপর হাতে তরবারি নিয়ে পৃথিবীতে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়েছে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয়। তবে মুসলিমগণের দেশবিজয়ের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মেরও প্রসার ঘটেছে। উল্লেখ করা যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবনকালে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের যে সব ধর্মযুদ্ধ হয় তার প্রায় সবগুলোই ছিল আত্মরক্ষামূলক। এমনকি যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও শত্রুপক্ষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবনকালে এবং তাঁর ওফাতের পরেও ইসলামের এ মূল শিক্ষা অব্যাহত থাকে। যুগে যুগে এরই অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সাম্যের আদর্শের প্রতি সকলকে আহবান করা হয়েছে। এ উদার মনোভাবের কারণেই ইসলাম সহজে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছিল। ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এখানে কোথাও জবরদস্তি করা হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। মুখ্যত সূফী-দরবেশ ও উলামায়ে কিরামই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরাই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২।

৩৮. বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ সম্পাদনকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার, মতান্তরে ১ লক্ষ ১৪ হাজার কিংবা আরো বেশী। (ইদ্‌রীস কান্ধলবী, **সীরাতুল মুস্তফা**, দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, তা.বি, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪৯)

৩৯. শাহ্ মুহম্মদ ইউসুফ কান্ধলবী, **হায়াতুস সাহাবা**, (নয়াদিল্লী : ইদারায়ে ইশাআতে দীনিয়াত, তা. বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ ২৪২-২৪৩।

শাসনের আওতাভুক্ত হয়। মুসলিম শাসনের এই ধারা মোঘলদের পতন (১৮৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

চার

ভারতীয় মুসলিম শাসকদের ইতিহাস সম্পর্কে স্যার হেনরী এলিট ও মি. কিমসন যেই চিত্র তুলে ধরেছেন, সেটি ইতোপূর্বে রচিত ভারতীয় হিন্দু কিংবা মুসলিম লেখকদের পেশকৃত চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ভারতীয়দের রচিত ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের দেশপ্রেম, প্রজাপালন, সাম্য ও সুশাসনের মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় এবং শাসকবর্গের প্রতি পাঠকের ইতিবাচক ধারণার উদ্রেক হয়। অথচ হেনরী এলিট কিংবা কিমসনের রচনায় ঐ শাসকবর্গের ভোগ-বিলাসিতা, পারিবারিক কলহ ও কোন্দল, সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা ও অর্থ অপচয়ের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে যা পাঠক মনে বিরক্তি ছাড়া কিছুই উদ্রেক করে না। উপরিউক্ত লেখকদ্বয় ভারতে ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। ভারতে ইংরেজ পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্য বই হিসেবে তাঁরা ইতিহাসের ঐ গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।[৪০]

মুসলিম শাসকদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় হয়ত কোন দুর্বল দিক ছিল। সাধারণ মানুষ হিসেবে ভুল ত্রুটির উর্ধে কেউ নয়। তবে সামগ্রিকভাবে তাঁরা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী ছিলেন। তাই হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে সকলেই তাঁদেরকে নিজেদের অভিভাবক মনে করত। মুসলিম শাসকদের আচরণ সম্পর্কে ভারতীয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক ড.তারা চাঁদ লিখেছেন, মুসলিম বিজয়ীরা বিজিতদের সাথে সঙ্গত আচরণ করেন এবং জনগণের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে তাঁরা ভারতীয়দের পূর্বরীতি চালু রাখেন। হিন্দু পূজারী, যোগী, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদেরকে মন্দিরের পূজা অর্চনা করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের উপর অতি অল্প পরিমাণের একটি 'কর' (জিযিয়া) ধার্য করা হয়। তাও আদায়কারীদের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ধার্য করা হয়। যেন তাদের পক্ষে আদায় করা সহজে সম্ভব হতে পারে। ভূমি মালিকদেরকে ব্রাহ্মণ ও মন্দিরসমূহের জন্য পূর্ববর্তী রীতি অনুযায়ী দেয় কর যথারীতি প্রদানের অনুমতিও

৪০. সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, নক্শে হায়াত (করাচী : দারুল ইশাআত, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ ২৯৯ ও ৩১০।

দেওয়া হয়।[৪১] মুসলিম বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী অত্যন্ত উদার ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর ভারতীয় অভিযানগুলো ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরপেক্ষ চরিত্রের। ধর্মান্ধতা তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি।

ঐতিহাসিক হাসান আল নিযামী বলেন, সুলতান কত্‌বুদ্দীন আইবেকের রাজত্বকালে রাজ্যে সার্বিক শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছিল। তাঁর শাসনকালে কোথাও কোন ধনাগারের জন্য কোন প্রহরী নিযুক্ত করা কিংবা কোন মেষপালের জন্য কোন রাখাল নিযুক্তির প্রয়োজন হত না। প্রজাদের মধ্যে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা উদারভাবে দান করতেন বলে তিনি লোকমুখে 'লাখ বখ্‌শ' নামে পরিচিত ছিলেন। পরমত সহিষ্ণুতা তাঁর জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক। হিন্দু প্রজাদের জন্য তাঁর বিশেষ উদারতা ছিল। পণ্ডিৎ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) বিচার কার্যে কখনো হিন্দু মুসলিম কিংবা আপন পর নিয়ে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় দেননি। অন্যায় কাজের কারণে নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয়কেও বিধিমত শাস্তি দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হত না। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, আমি দেখতে চাই সাম্য ও সুবিচার; আইনের দৃষ্টিতে আত্মীয় অনাত্মীয় হিন্দু মুসলিম সকলেই সমান।

মেজর বসু লিখেছেন, প্রজাদের ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও আর্থিক সচ্ছলতার দিক থেকে বিচার করা হলে মুসলিম শাসনামল (৯৬২-১৮৫৮) স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। রাজ্যের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির যে চিত্র সম্রাট শাহ্‌জাহানের (১৬২৭-১৬৫৮) শাসনামলে বিদ্যমান ছিল, নিঃসন্দেহে বিশ্ব ইতিহাসে তার কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৪২]

স্যার উইলিয়াম ব্যান্টিংক বলেন, বহু দিক থেকে মুসলমানদের রাজত্ব আমাদের রাজত্ব থেকে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানগণ যে সব অঞ্চল জয় করেছিলেন, সেখানে নিজেদের বসতি স্থাপন করে নিজেদেরকে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন ও বাসিন্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন। ফলে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে কোন

---

৪১. নাজির আহমদ, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ ৪০; সেখ আজিবুল হক, আওরঙ্গজেব ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ইসলাম, (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩), পৃ ১৪৭-১৪৮।

৪২. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ মোঙ্গলরী, মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাকবিল (লাহোর : হাম্মাদ আল কুতুবী, তা. বি.), পৃ ৪৪-৪৫।

বৈরিতার উদ্রেক ঘটতে পারেনি বরং একই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে পারস্পরিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে আমাদের কর্মপদ্ধতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের শাসন পদ্ধতির মধ্যে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে বৈরিতা, কঠোরতা, স্বার্থপরতা ও দরদহীনতা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।[৪৩]

ঐতিহাসিক কীনি বলেন, শাসন কার্যে সম্রাট শেরশাহ্ (১৫৪০-১৫৪৫) সুতীক্ষ্ণ মেধার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণতা ও প্রশাসনিক পারদর্শিতা প্রদর্শনে ভারতবর্ষের কোন সম্রাটকে তাঁর সমকক্ষ বলা যায় না। আকবরের উদারনীতি হিন্দুদের সন্তুষ্ট করলেও মুসলমানরা পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়নি, এভাবে আলমগীরের উদারতা মুসলমানদের সন্তুষ্ট করলেও হিন্দুরা পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়নি। অথচ সম্রাট শেরশাহের উদারতা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়।

পণ্ডিৎ সুন্দর লাল বলেন, আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) শাহ্জাহান এবং তাঁদেও পরে আওরঙ্গযেব (১৬৫৮-১৭০৭) ও তাঁর উত্তরাধিকারীবৃন্দের শাসনামলে হিন্দু মুসলিম সকলে সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে। তখন উভয় ধর্মকে সমানভাবে সম্মান করা হত। ধর্মের কারণে কারো সাথে কোন প্রকার বৈষম্য কিংবা পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি। সম্রাটদের পক্ষ থেকে বহু মন্দিরের জন্য জায়গীর ও লা-খেরাজ সম্পত্তি প্রদান করা হয়। ভারতবর্ষে এমন বহু মন্দির এখনো আছে, যার পূজারীদের কাছে আওরঙ্গযেবের স্বাক্ষরিত আদেশনামার কপি বিদ্যমান, যেখানে মন্দিরের জন্য সরকারী অনুদান কিংবা জায়গীর প্রদানের কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে।[৪৪]

স্যার পি.সি.রায় বলেন, মুসলিম শাসনামলে প্রশাসনের পদ বণ্টনে ধর্ম কিংবা গোত্রের ব্যবধান ছিল না। হিন্দু রাজার দরবারে মুসলিম উজীর, মুসলিম

---

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

৪৪. বাবু সুন্দর লাল এলাহাবাদী "ভারত মেঁ আঙ্গরেজী রাজ" আল ইস্তিকলাল পত্রিকা, দেওবন্দ, ৪ মার্চ, ১৯৩৬; ভারতের প্রাচীনতম মন্দির 'নাগেশ্বর' মন্দিরেও মুসলমান বাদশাহ্গণ যে জমি, স্বর্ণ ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন সাম্প্রতিক গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়। গবেষক শের সিং 'Muslim Ruler's Donation to Temple. Nageswarnath Ayodhya' শীর্ষক যে পাণ্ডুলিপি পাটনার "খোদাবক্স লাইব্রেরী"তে দান করেছেন, তাতে ২৩ টি Royal Orders রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অর্ডার আওরঙ্গযেবেরও আছে। (সেখ আজিবুল হক, আওরঙ্গজেব ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ইসলাম, ১৯৯৩, পৃ ৮৩)

রাজার দরবারে হিন্দু উজীর সর্বত্র দেখা যেত।[৪৫] রাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে সম্রাট আওরঙ্গযেব সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে,জনৈক অভিযোগকারী কর্মচারী তাঁকে বলেছিল, বেতন বণ্টনকারী আপনার ২ কর্মকর্তা অগ্নিপূজক। তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। তিনি উত্তর করলেন, প্রশাসনের কাজ কারবারে ধর্মের অহেতুক হস্তক্ষেপ উচিত নয়। আমি যদি অভিযোগকারীদের অভিযোগ গ্রহণ করি, তাহলে আমার বহু অমুসলিম রাজা ও প্রজাকে আমি রাজ্যের কোথায় থাকতে দিব? প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্ব লোকজনকে তাদের নিজস্ব বিশ্বস্থতা, যোগ্যতা ও দক্ষতার নিরিখেই প্রদান করা হয়।[৪৬]

মুসলিম শাসকদের বিচার ব্যবস্থা (কাযাউস সুলতান) সম্পর্কে মাওলানা মোঙ্গলরী বলেন, বিচারালয়গুলোর নাম যদিও ছিল 'সম্রাটের বিচারালয়' কিন্তু তাতে সম্রাটের নিজস্ব কোন ক্ষমতা কিংবা কর্তৃত্ব ছিল না। সেখানে মুসলমানদের বিষয়গুলোকে তাদের পবিত্র কুরআনের আলোকে আর হিন্দুদের বিষয়গুলোকে তাদের ধর্মশাস্ত্রের আলোকে সমাধান করা হত। বিচারে ধর্মীয় বিধানের আধিপত্য এতখানি স্বীকৃত ছিল যে, ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোতে সম্রাট নিজেও মুফ্তী ও আলিমদের ফত্ওয়া ও ধর্মীয় সিদ্ধান্তের অনুগত বলে বিবেচিত হতেন।[৪৭]

লন্ডনের বিশিষ্ট বক্তা এ্যাডমন্ড বার্ক বৃটিশ পার্লামেন্টের এক বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এশিয়ার বিগত সরকারগুলো সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সেগুলোর কোনটিরই কাছে যদৃচ্ছা আইন রচনার সুযোগ ছিল না। আর কারো থাকলেও সেটি অন্যের উপর প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল না। আমি আরো দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, প্রাচ্যদেশীয় ঐ সরকারগুলো স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বৈরতান্ত্রিকতার নামও জানে না। এশিয়ার বিশাল অংশ মুসলিম শাসকদের দখলভূক্ত। ইসলামী শাসনের অর্থই হল আইনের শাসন। খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলমানদের আইনে ভিত্তিগত দৃঢ়তা অনেক বেশী। তাদের নিজেদের আইন সম্পর্কে বিশ্বাস যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত আইন। আর এ কারণে সাধারণ প্রজা থেকে সম্রাট পর্যন্ত সকলে সমানভাবে আইন ও ধর্ম উভয়ের অনুগত। যদি কেউ পবিত্র কুরআন থেকে এ মর্মে একটি আয়াতও বের করে দিতে পারে যার নিরিখে কাউকে যথেচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে আমি মেনে নিতে প্রস্তুত

৪৫. মাদানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১৫৬।
৪৬. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩; সেখ আজিবুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫।
৪৭. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

যে, আমি এশিয়া ও এশিয়ার জনগোষ্ঠি সম্পর্কে নিরর্থক অধ্যয়ন করেছি। কুরআনে একটি শব্দও স্বৈরতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকন্তু কুরআন বর্ণিত আইনের এক একটি শব্দ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সদা গর্জনকারী। এ আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য রয়েছেন সম্মানিত কাযী ও উলামা। তাঁদেরকে মনে করা হয় আইনের সংরক্ষণকারী। রায় প্রদানে তাঁরা সম্রাটদের অসন্তুষ্টি থেকে এতটা নিরাপদ যে, সম্রাটের তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ নেই। বস্তুত তাদের সম্রাটদের জন্যও প্রকৃত অর্থে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিকানা নেই। বরং সেই সরকারগুলোকে এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক সরকার বলা যেতে পারে।[৪৮]

সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন

এক

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতবর্ষে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আগমন করেনি কিংবা কোন আদর্শের পয়গাম নিয়েও আসেনি। তারা এসেছে নিছক বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। তারপর ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কুট-কৌশলে উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতারও মালিক হয়ে যায়।[৪৯] দীর্ঘ একশ নব্বই (১৭৫৭-১৯৪৭) বছর তারা দেশের একটি অংশবিশেষ থেকে শুরু করে গোটা ভূখণ্ড শাসন করে। তন্মধ্যে একশ' (১৭৫৭-১৮৫৭) বছর ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর[৫০] শাসন আর নব্বই (১৮৫৭-১৯৪৭) বছর ছিল সরাসরি

---

৪৮. প্রাগুক্ত।

৪৯. এম.এ.রহিম, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস**, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ ১২-১৩।

৫০. খ্রিস্টীয় ১৬০০ সালে ২১৮ জন ইংরেজ বণিক 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বাণিজ্য সংঘ গঠন করে। তারা রাণী এলিজাবেথ থেকে ১৫ বছরের জন্য উপমহাদেশে সরাসরি বাণিজ্যের অনুমতি নেয়। তারপর ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ১ম জেমসের মাধ্যমে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত প্রেরণ করে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইতোপূর্বে বাজার দখলকারী পুর্তগীজ বণিকদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইংরেজরা ব্যর্থ হয়। ১৬১২ সালে ক্যাপ্টেন বেস্ট এক পুর্তগীজ নৌবহরকে পরাজিত করে সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে বিনীত আবেদনের ভিত্তিতে ভারতের সুরাটে কুটি স্থাপনের অধিকার লাভ করে। ১৬১৫ সালে রাজা জেমসের দূত স্যার টমাস রো পুনরায় ভারতে আসেন এবং কোম্পানীর পক্ষে কতগুলো সুবিধা অনুমোদন করিয়ে নেন। ফলে সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, মুম্বাই, মসলিপট্টম প্রভৃতি স্থানে তাদের

বৃটিশ সরকারের শাসন। মোটামুটি বলতে গেলে এই একশ' নব্বই বছরের ইতিহাস ছিল উপমহাদেশের ধনরত্ন ইউরোপে পাচার করা, হিন্দু-মুসলি নির্বিশেষে ভারতবাসীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক সাম্প্রদায়িকভাবে পর্যদুস্ত করা এবং ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, উৎপাদন কৃষি, কারিগরি, শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করে এ দেশে অজ্ঞতা, অদক্ষতা, খাদ্যাভাব দারিদ্র, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ইতিহাস।[৫১]

প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট শাহ্জাহানের আমলে তারা বঙ্গদে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য মসলিপট্টম থেকে বালেশ্বর এসে কুটি স্থাপন করে। প্রথম দিকে বালেশ্বর থেকে স্থলপথে বঙ্গদেশের সাথে তাদের বাণিজ্য চলত। তারপর ১৬৫০ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজ বাণিজ্য জাহাজ হুগলী বন্দরে প্রবেশ করে। সেখানে তাদের কুটি স্থাপি হয়। অতঃপর উপমহাদেশীয় বাসিন্দাদের দানশীলতা,ভদ্রতা ও সহানুভতিশীলতার সুযোগে তারা পাটনা ও কাসিম বাজারেও অনুরূপ কুটি স্থাপন করে নেয়। এভাবে তাদের শক্তি সাহস বৃদ্ধি পায়। তারা উপমহাদেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে সুযোগ বুঝে হস্তক্ষেপে চেষ্টা করে। ফলে সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাট আলমগীর তাদেরকে একাধিক বার শায়েস্তা করেন এবং সতর্ক করে দেন। তারা ক্ষমা ভিক্ষা করে বাণিজ্যের অনুমতি বহাল রাখে ১৬৫১ সালে বাংলার সুবাদার শাহ শুজা থেকে তারা মাত্র ৩,০০০ টাকা বার্ষিক খাজনা বিনিময়ে বঙ্গদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। ১৬৭২ সালে সুবাদার শায়েস্তা খা এক আবেদনের ভিত্তিতে তাদেরকে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি দেন। ১৬৮০ সালে সম্রাট আলমগীর সকল পণ্যদ্রব্যের উপর শতকরা ২ টাকা কর এবং দেড় টাকা জিজি আদায়ের শর্তে তাদেরকে সমগ্র ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি দেন। ইংরেজরা বি অনুমতিতে হুগলীতে এক দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সুবাদার শায়েস্তা খানের সাথে তাদে সংঘর্ষ বাধে। তারা বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়। পরে চার্নক নামক জনৈ ইংরেজ সম্রাট আলমগীরের মন জয় করে সুতানুটিতে তাদের বসতি স্থাপনের অনুমা পুনরায় লাভ করে। ১৬৯১ সালে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অনুমতিও ফিরে পায়। তারপ ক্রমে ১৬৯৮ সালে ভাগিরথী নদীর তীরে কলিকাতা সুতানটি ও গোবিন্দপুর- এ তিন গ্রামের জমিদারী লাভ করে। ১৭০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি নির্মাণ করা হয়। ১৭৫ সালে পলাশীর যুদ্ধে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বঙ্গদেশে তাদের কার্যত শাস প্রতিষ্ঠা করে । তারপর ক্রমে গোটা ভারত তাদের করতলগত হয়ে যায়। ড. মাহমুদ হাসান, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, পৃ ২২৮ ।

৫১. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ ১৩; পণ্ডিত জওহরলাল ইংরেজ রাজত্ব লুণ্ঠনের সাথে তুলনা করেছেন। (Jawharlal Nehru, **The Discovery of Indi** Calcutta, The Signet Press, 1949. p 349.)

উর্দু কবি মুসহাফী (১৭৫০-১৮২৪) তাই দুঃখ করে বলেন,[৫২]

هندوستاں کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی
کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی •

ভারতের সম্পদ ও গৌরব বলতে যা কিছু ছিল,
কাফির ফিরিঙ্গীরা সুকৌশলে সব কেড়ে নিল।

বস্তুত ইংরেজপূর্ব কালে ভারতবর্ষ আপন সমাজ, সভ্যতা ও সম্পদের দ্বারা পৃথিবীতে যে অপরিসীম আত্মমর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেটি তৎকালীন ইউরোপকেও ঈর্ষান্বিত করে তোলে। বৃটিশ পর্যটক র‍্যামসে মূর এ কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতে আসেন। তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন; ভারতীয়দের চাষাবাদ পদ্ধতি, কারিগরি ও হস্তশিল্পের অতুলনীয় দক্ষতা, পড়া লেখা ও অংক শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালার ব্যবস্থা, আতিথেয়তা ও দানশীলতার সুন্দর মন-মানসিকতা, বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি পূর্ণ আস্থার সাথে সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার বিশেষ মনোযোগ প্রভৃতি এমন গুণাবলী, যেগুলোর কারণে আমরা এই জাতিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি-বিবর্জিত বলতে পারি না। এ গুণাবলীর কারণে ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের চেয়ে কোন অংশে নিম্নমানের নয়। যদি ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনিময় করা হয় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষ থেকে সভ্যতার যে সম্পদ ইংল্যান্ডে আমদানী হবে তাতে ইংরেজদের অনেক উপকার সাধিত হবে।[৫৩]

কিন্তু ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর ঐ সমাজ ও সভ্যতার ভিত সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। ভারতবাসী ক্রমে দরিদ্র ও হীনবল হয়ে পড়ে। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা যদিও প্রশাসনের প্রচলিত রীতিনীতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন না করার শর্তে দেওয়ানী লাভ করেছিল পরবর্তী সময়ে সেই শর্ত আদৌ রক্ষা করেনি। দিল্লী কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে প্রশাসন পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ সকল পদ থেকে ধীরে ধীরে দেশী পুরাতন লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের ফিরিঙ্গী লোকজন নিযুক্ত করে। স্যার জন শোর (১৭৯৩-৯৮)-এর মতে তখন নিম্ন থেকে নিম্নতর কোন এমন পদ যেটি গ্রহণের জন্য কোন ইংরেজকে পাওয়া গিয়েছে সেটিও ভারতীয়দের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কর্নওয়ালিস

---

৫২. খালীক আহমদ নিযামী, আটঠারা সও সাত্তাওয়ান কা তারীখী রোযনামচাহ, দিল্লী, পৃ২১।

৫৩. মাদানী, নকশে হায়াত, ১ম খণ্ড, পৃ ১৫৭।

(১৭৯৮-১৮০৫) ভূমি বন্দোবস্তের নতুন নিয়ম চালু করলে ইতোপূর্বের মুসলিম ভূমি মালিক ও অভিজাত শ্রেণী কপর্দকহীনে পরিণত হয়। নতুন নিয়মে ভূমি রাজস্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তাতে কৃষক শ্রেণীর ব্যাপক ভরাডুবি ঘটে। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরেও আরোপিত হয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত টেক্সের বোঝা।[৫৪] এ সকল রদবদলের ফলে সমাজের গোটা কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। লোকজনের উপর দারিদ্র্য আপতিত হয়। তখন উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলে পেটের দায়ে পূর্বপুরুষের জমাজমি বিক্রয় করে দেয়, এমনকি বিগত কালের সঞ্চিত সকল ধনদৌলত, সোনা-গয়না ও অলংকারাদি বিক্রয় করে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। আর অন্য দিকে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী ঐ সকল ধনসম্পদ স্তূপ করে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে।[৫৫]

ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিপন্ন করার পাশাপাশি ইংরেজরা তাদের প্রাপ্য ন্যূনতম নাগরিক অধিকার এবং তাদের আত্মসম্মানও ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছিল। সাধারণ কাজকর্ম থেকে বিচার বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র ফিরিঙ্গী ও ভারতীয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান করা হয়।[৫৬] ইংরেজ ভারতবাসীকে নিজেদের যদৃচ্ছা ব্যবহারের উপযুক্ত গোলামে পরিণত করে এবং চরম অপমানিতের জীবন যাপনে বাধ্য করে। ঐ অপমানের কথা উল্লেখ কওে স্বয়ং স্যার সায়্যিদ আহমদ বলেন, আত্মসম্মানের আঘাত একটি অতি অপ্রিয় বস্তু। তাতে হৃদয় ভেঙ্গে যায় এবং তার পরিণাম খুবই কটু। সরকার ভারতীয়দেরকে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীনে পরিণত করে দিয়েছে। ইংরেজ সাহেবের পেশকার (পি.এ.) চাকুরী করতে গিয়ে সাহেবের রুক্ষতা, কদর্য আচরণ ও গালিগালাজ কানে শুনে আর মনে মনে ক্রন্দন করে বলে, এই চাকুরী করা থেকে বনে গিয়ে ঘাস কাটা উত্তম। ইংরেজ ও ভারতবাসীর বর্তমান সম্পর্ক হল জলন্ত আগুন আর শুকনা ঘাসের সম্পর্ক কিংবা এমন দুই পাথরের সম্পর্ক যেগুলোর একটি সাদা আর অপরটি কাল। যেগুলোর মধ্যে

---

৫৪. মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ ১৬-১৭।

৫৫. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯।

৫৬. কোম্পানীর আমলে একজন ভারতীয়ের তুলনায় একজন ইংরেজ কর্মচারীকে বেতন দেয়া হয় ২০ গুণ বেশী। (সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬)

সমন্বয়ের সুযোগ নেই বরং দূরত্ব দিনে দিনে শুধু বেড়েই চলছে। ইংরেজদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে কোন ভদ্র লোকের বসবাস নেই।[৫৭]

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম মাদানী আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন। তিনি বলেন, ইংরেজ শাসন পদ্ধতিতে রেলগাড়ীর কম্পার্টম্যান্টের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও হিন্দুস্তানীর মধ্যে ব্যবধান করা হচ্ছে। রাজপথে ও সকাল বিকাল পায়চারী করার জায়গায় এমনকি সভা সমিতির বৈঠকে আসন বন্টনেও ঐ পার্থক্য বিদ্যমান। এহেন অপমান সহ্য করতে না পেরে স্যার সায়্যিদ আগ্রার এক সরকারী বৈঠক থেকে ফিরে চলে গিয়েছিলেন। চাকুরীর পদমর্যাদা ও বেতনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে ভয়ানক পার্থক্য করা হয়েছিল সেটি ইংরেজ শাসনের শেষ অবধি অব্যাহত ছিল। ১৮৫৭ সালে নিরীহ ভারতীয়দের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়, সেটি কোন জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে করা হলেও কোন মানুষ সহ্য করবে না। ভারতীয়দেরকে অপমান ও অপদস্থ করা, খুন ও লুণ্ঠন করা এবং সার্বিকভাবে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করার কোন সুযোগ ইংরেজরা হাতছাড়া করেনি। বহির্বিশ্বে তাদেরকে বর্বর, অশিক্ষিত, অসভ্য, কুলি বলে অপপ্রচার করে। তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অযোগ্য, নির্বোধ, স্বাধীনতা দানের অনুপযুক্ত আখ্যা দেয়। তাদেরকে ধর্মান্ধ, কাঙ্গাল ও যুদ্ধবাজ বলে প্রচার করে। দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, মার্সিস, নিউজিল্যান্ডসহ ইউরোপ ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশে ভারতীয়দেরকে ন্যায্য নাগরিক অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত কওে রেখেছে। এ ভাবে অপমান ও অপদস্থের আরো বহু প্রক্রিয়া ভারতীয়দের উপর আরোপ করে আছে যা দেখে ভদ্র ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না।[৫৮]

ভারতীয়দের নৈতিক গুণাবলী কেমন ছিল তার অনুমান পর্যটক র‍্যামসে মূরের পূর্ববর্তী রিপোর্ট থেকে অনুমান করা গিয়েছে। ইংরেজ শাসনের ফলে তাদের ঐ চারিত্রিক মান ক্ষুন্ন হয়। কারণ ভারতকে শাসন ও শোষণের জন্য ইংরেজ কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এমন লোকদের মনোনীত করে পাঠান, যারা পূর্ব থেকেই ছিল ধূর্ত ও চরিত্রহীন কিংবা অন্তত ভারতে পদার্পণের পর হীনচরিত্র অবলম্বনকারী। এর অনিবার্য পরিণতি দাঁড়িয়েছে যে, গোটা ভারতবর্ষের সরল জনসাধারণের জীবনেও দুর্নীতি ছড়িয়ে গিয়েছে। ইংরেজ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও

---

৫৭. স্যার সৈয়দ আহমদ খান, ভারতে বিদ্রোহের কারণ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ ৪৪-৪৫।

৫৮. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

চরিত্রহীনতার সত্যতা ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫) নিজেও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ইংরেজরা ভারতে পদার্পণ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়ে যায়। যে সকল অপরাধ তারা নিজ দেশে থাকা অবস্থায় চিন্তা করতেও সাহস পায় না, ভারতে পৌঁছার পর সেগুলি করার জন্য তাদের ইংরেজ নামটুকুই বৈধতার সনদ দিতে যথেষ্ট। এখানে অপরাধের কারণে তাদের মনে শাস্তির কল্পনাও আসে না।[৫৯]

তাছাড়া আইনী ও বেআইনী বিভিন্ন উপায়ে সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ার পরিণামে কোটি কোটি মানুষ যখন কাঙ্গাল ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত,[৬০] তখন প্রাণে বাঁচার দায়ে ভারতীয়রা বহু অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হয়। স্যার জন সোলেমন লিখেছেন, দেশের দায়িত্বপূর্ণ সকল সরকারী পদ থেকে ভারতীয়দের উচ্ছেদের ফলে তাদের স্বভাবজাত প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও যতটুকু যোগ্যতা অবশিষ্ট ছিল ক্রমে তাও বিলীন হওয়ার উপক্রম। আর্থিক অনটন তাদের নৈতিক চরিত্র এতখানি অবনত করে দিয়েছে, যেখানে কোন নিষ্পেষিত গোলাম জাতিই পৌঁছে থাকে। কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে লিখিত এক সুপারিশমালায় ১৮১১ সালে লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৮১৩) নিজে স্বীকার করে বলেন, জ্ঞানচর্চা দিনে দিনে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা না থাকায় তাদের মধ্যে মিথ্যা কসম করা, জালিয়াতি করা ইত্যাকর দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশে কয়েকটি কলেজ স্থাপন করা জরুরী। তাই শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে সুপারিশ করা যাচ্ছে।[৬১]

ভারতের পুরাতন শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রতি সরকারের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঐ মনোযোগের কারণে ভারতীয় পণ্ডিতগণ অংক, দর্শন, জ্যোর্তিবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে তদানিন্তন বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টোল, চতুষ্পাটি, মকতব, মদ্রাসা ও পাঠশালার ব্যবস্থা ছিল।[৬২] প্রাথমিক শিক্ষা থেকে

---

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫।

৬০. মেসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৩।

৬১. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭।

৬২. ড.অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস (কলিকাতা ঃ মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৮১), ২য় খণ্ড, পৃ ১২০; ১৯০৪ সনে সরকারিভাবে প্রকাশিত **Indian Education Policy** নামক গ্রন্থের বর্ণনা: Schools were attached to Mosque & Shrines and supported by state grants in cash or land or by private liberality. The course of study in a Mohammadan place of learning included grammar, rhetoric,

উচ্চতর শিক্ষার সকল ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক। মুসলিম শাসকমণ্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[৬৩] পণ্ডিত লালা লাজপৎ রায়ের মতে তৎকালে ভারতবর্ষে শিক্ষিতের হার ছিল ৫১%, যা ইংরেজ শাসনামলে অবনত হয়ে ২%-এ নেমে আসে।[৬৪] এ প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ লিখেছেন, ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশেই ৮০ হাজার মাদ্রাসা ছিল। এর অর্থ হল যে, তখন প্রতি ৪ শত মানুষের জনপদে ১টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনো ভারতের ঐ সকল স্থান, যেখানে পুরাতন নিয়মের শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে, সেখানকার শিশুদের প্রায় সকলেই লিখতে ও পড়তে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশসহ যে সকল স্থানে আমরা পুরাতন শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত করে দিয়েছি, সেখানকার গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।[৬৫]

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পর্কে ইংরেজরা কি ধরনের মানসিকতা পোষণ করেছিল স্যার উইলিয়াম ডিগবীর মন্তব্য থেকে তার অনুমান মেলে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন, আমার ধারণায় ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণে স্বাধীনতার এই যুগে ৬ কোটি মানুষের ভূখণ্ডে হাতে গোনা কয়েকজন বিদেশীর রাজ্য শাসন করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। কাজেই যখনই শাসিত লোকজন শিক্ষার আলো লাভ করবে তখন তাদের মধ্যকার সেই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা, যেই কৌশলের উপর নির্ভর করে আমরা আজো টিকে

---

logic, literature, jurisprudence and science. Both systems, the Mohammadan no less than the Hindu, assigned a disproportionate importance to the training of memory and sought to develop the critical faculties of the mind, mainly by exercising their pupils in metaphysical refinements and in fine spun commentaries on the meaning of the text which they had learnt by heart. (দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ পৃ ১৮১)

৬৩. সায়্যিদ আলতাফ আলী, হায়াতে হাফিয রহমত খান, (বাদায়ুন : নেযামী প্রেস, তা. বি.), পৃ ২৭৪।

৬৪. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩।

৬৫. আবদুর রহমান, তাহরীকে রেশমী রুমাল (লাহোর : ক্লাসিক, উর্দু প্রেস, ১৯৬০), পৃ ৭৭।

আছি, সেটি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাদের মননশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা নিজেদের অন্তর্নিহিত মহাসম্ভাবনার অনুধাবন করে ফেলবে।[৬৬]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা এবং জ্ঞানচর্চার পথ রুদ্ধ করে রাখা ছিল ইংরেজদের সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী কাজ। খোদ বৃটেন থেকেও এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। এরই প্রেক্ষিতে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার দীর্ঘ ৭৭ বছর পর ১৮৩৪ সালে শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মনোনীত হন লর্ড ম্যাকলে। তিনি নৈতিকতার দাবী ও কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অসম্মতি-এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক ক্লীব ধরনের একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করনে।[৬৭] ঐ শিক্ষা কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ম্যাকলে নিজে বলেছেন, আমাদেরকে এমন একটি দল গড়ে তুলতে হবে যারা বস্তুত আমাদের ও আমাদের কোটি কোটি প্রজার মধ্যে অনুবাদকের ভূমিকা পালন করবে। এ দলটি এমন হতে হবে যেন তারা রক্ত ও বর্ণের দিক থেকে থাকবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, কথাবার্তা, চালচলন ও অনুভূতির দিক থেকে হবে ইংরেজ।[৬৮]

এ শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্ট ফলাফল সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার[৬৯] বলেন, আমাদের এ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুলগুলো থেকে অধ্যয়নোত্তীর্ণ কোন তরুণ, হিন্দু হোক

---

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮; ভারতের শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে বিশিষ্ট বৃটিশ ঐতিহাসিক এ. হাওয়েল এর মন্তব্য "Education in India under the British Government was first ignored. Then violently and subsequently successfully opposed, then conducted on a system now University admitted to be erroneous and finally placed on its present footing" মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, **যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ** (ঢাকা ঃ জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯) পৃ ১০।

৬৭. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮।

৬৮. মেজর বসু, **তারীখুত তালীম**, পৃ ১০৫; ম্যাকলের ভাষায়, "A class of person Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect." মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭।

৬৯. স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার ছিলেন ইংরেজদের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কর্মচারী ও একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৬২ সালে বঙ্গদেশে আসেন এবং ১৮৬৮ সালে 'অ্যানাল্‌স অব দি রুর‍্যাল বেঙ্গল' বই লেখেন। ১৮৭১ সালে স্ট্যাটিসটিক বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। 'ব্রিফ হিসটোরী অব দি ইন্ডিয়ান পিপলস' ও 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাছাড়া টাইমস পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেলের পক্ষ থেকে মনোনীত আইন সভার অতিরিক্ত সদস্য,

কিংবা মুসলিম, এমন কেউ নেই যে নিজের পূর্বপুরুষের ধর্মকে অস্বীকার করতে শিখেনি। এশিয়ার বহুল সমাদৃত ও ব্যাপক বিস্তৃত ধর্মগুলোকে যখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান মিশ্রিত শিক্ষার মোকাবেলায় দাঁড় করানো হল, তখন সেগুলো শুকিয়ে কাষ্ঠে পরিণত হয়ে গেল।[৭০]

১৮৭১ সালে ভারতে আদমশুমারী হয়। তাতে শিক্ষিতের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল মাত্র শতকরা ২ থেকে ৩ জন। ৫০ বছর পর ১৯২১ সালে পুনরায় আদমশুমারী হয়। তখন এই হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা মাত্র ৪ জনে উন্নীত হয়। অথচ প্রতিবেশী দেশ সোভিয়েত রাশিয়া যেখানে ৫০ বছরের একই সময়ে শিক্ষিতের হার ৮% থেকে ৮০% পর্যন্ত উন্নীত করে, জাপান এক শতাব্দী থেকে কম সময়ের মধ্যে ৯৫% পর্যন্ত পৌছায় সেখানে ইংরেজ সরকার ভারতে শিক্ষিতের হার মাত্র ২% বৃদ্ধি করা শিক্ষার প্রতি তাদের চরম অবহেলার একটি বড় দলীল।[৭১]

শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে লিখিত তাঁর বইয়ে ১৮শ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ, জাতীয় চেতনা ও ওয়াহাবী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং উত্থান-পতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। স্যার সায়্যিদ 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস'-এর সমালোচনা করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ড. সাদিক হুসাইন 'হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান' শিরোনামে উইলিয়াম হান্টার রচিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন। ঢাকার বাংলা একাডেমী বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। (বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ৭৬৩)

৭০. উইলিয়াম হান্টার, ড. সাদিক হুসাইন অনূদিত, হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান (লাহোর : ইকবাল একাডেমী, ১৯৪৪), পৃ ২০২: পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে ম্যাকলে লিখেছেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্টধর্ম ভাবাপন্ন হয়ে ওঠবে, তাদের মধ্যে পৃথকভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের আবশ্যকতা থাকবে না। পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকবে না"- It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respected classes in Bengal thirty years since. And this will be effected without any efforts to proselytes. (মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০)

৭১. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮: প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেও পরবর্তীতে এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকই সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে। উইলিয়াম এ্যাডাম, মনরো, টমাস ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে "শিক্ষা ডিসপ্যাচ" ও ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মূল্যবান সুপারিশসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শনের ফলে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। যদিও দেশীয় ব্যবস্থার কিছু

ইংরেজ আমলের সবচেয়ে লজ্জাকর অধ্যায় ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থ ও জাতীয় সম্পদের নির্মম লুণ্ঠন। ভারতবর্ষ পূর্বকাল থেকে ছিল একটি পূর্ণ মাত্রার স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। এ দেশকে নিজের চলার জন্য একটি পয়সাও বিদেশে চালান করতে হত না। অধিকন্তু নিজের উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রতি বছর কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা আয় করত। দেশের অর্থ যেন বাইরে চলে যেতে না পারে সে দিকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। সম্রাট মুহাম্মদ ইব্‌ন তুঘলকের আমল (১৩২৫-১৩৫১) থেকে ভারতীয় অর্থ বিদেশে চালান করা আইনগতভাবে বন্ধ করে রাখা হয়। ফলে ভারতবর্ষ জাতীয় সম্পদের দিক থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধনভাণ্ডারে পরিণত হয়।[৭২] ব্যাংক ব্যবস্থা তখনো উদ্ভাবিত হয়নি বিধায় ঐ সব ধনদৌলত কাঁচা টাকায় সম্রাট, রাজা ও প্রজাদের হাতে হাতে রক্ষিত ছিল। ভারতীয় ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য ১ম আলেকজান্ডার, কলম্বাস, ভাস্কোদাগামা (১৪৯৪), জার সম্রাট পীটারকে প্রলুব্ধ করে। এটিই পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদলকে ভারতীয়দের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৭৩]

ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থ কি পরিমাণ ছিল সম্রাট আওরঙ্গযেবের একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর দিল্লী ও আগ্রায় অবস্থিত রাজকোষের ধনদৌলত পরিমাপের নির্দেশ দেন। তখন কয়েক হাজার শ্রমিক কেবল রৌপ্য মুদ্রা পরিমাপের কাজে দীর্ঘ ৬ মাস সময় অতিবাহিত করলে দেখা গেল, রাজকোষের একটি কোণও শেষ করা সম্ভব হয়নি। স্বর্ণমুদ্রা, হীরা, জাওহার ইত্যাদি অবশিষ্ট রয়েই গিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি অবশিষ্ট পরিমাপের কাজ স্থগিত রেখে দক্ষিণ ভারতের অভিযানে (১৬৮৫ খ্রি.) নেমে পড়েন।[৭৪] সম্রাট আকবরের পূর্ব থেকে নিয়ম চলে আসছিল যে, সম্রাট প্রতি বছর নিজেকে ২ বার পাল্লায় তুলে মাপতেন। তাতে যতটুকু ওযন হত সেই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে সাদ্‌কা করে দিতেন। তাছাড়া সম্রাট প্রত্যহ বিকালে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে বেড়াতে বের হতেন। তাঁর দু'পাশে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি দু'টি

কিছু ত্রুটি রয়েছে। তবুও এর জীবনীশক্তি ও জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যাবে না। They have survived competition and they have proved that they possess both vitality and popularity. দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারের এ ঔদাসীন্য দেশের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। (মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬)

৭২. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

৭৩. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬।

৭৪. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

থলি রাখা থাকত। এ থলি থেকে তিনি পথিমধ্যে গরীব দুঃখীদের জন্য অকাতরে বিলি করতেন। প্রত্যহ রাতে ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রার এক হাজারটি থলি সাজিয়ে সম্রাটের বালিশের পাশে রেখে দেওয়া হত। সকালে নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের পরই তিনি এগুলো গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতেন।[৭৫] সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌ন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) থেকে মোঘলদের শেষ পর্যন্ত এ নিয়ম অব্যাহত ছিল।

সম্রাটের ন্যায় প্রজাদের হাতেও ছিল পর্যাপ্ত ধন সম্পদ। মেজর বসু লিখেছেন, বঙ্গদেশের জগৎ শেঠদের বাণিজ্যিক কারবার ইংল্যান্ডের সর্ববৃহৎ ব্যাংক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড'-এর মত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের মতে, আবদুল গফুর নামক সুরাটের জনৈক ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত মূলধন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সম্মিলিত মূলধনের সমপরিমাণ ছিল।[৭৬]

ড.অতুল চন্দ্র রায় আরো বিশ্লেষণ করে বলেন, আফগান ও মোঘল সম্রাটদের আমলে সেনাবাহিনী, রাজপ্রাসাদ, সৌধ ও ব্যয়বহুল জাঁকজমক প্রভৃতির ব্যাপারে যে বিশাল ব্যয় হত, তা স্বদেশেই থেকে যেত এবং এটি প্রকারান্তরে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর প্রস্তুতকারী, শিল্পী ও কারিগরদের জীবন নির্বাহে সাহায্য ও উৎসাহিত করত। দিল্লী রাজ দরবারের অনুসরণে সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্যান্য বিত্তশালীরাও নিজ নিজ ব্যয়ে সুরম্য অট্টালিকা, মসজিদ, মাযার, মন্দির, রাস্তাঘাট, সরাইখানা নির্মাণ করতেন। জনহিতকর এ সব কাজে নিযুক্তির দ্বারা সাধারণ বহু লোকের জীবিকা নির্বাহ হত। এ সকল কাজের জন্য শাসকরা জনগণের উপর যে কর ধার্য করতেন, তা পরোক্ষভাবে জনগণের নিকটই ফিরে গিয়ে সেই অর্থ স্বদেশেই থেকে যেত। কিন্তু ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং ভারতীয়দের অর্থ-সম্পদ স্রোতের ন্যায় চলে যায় দেশের বাইরে। এ্যাডমন্ড বার্ক এটিকে ভারত থেকে 'অবিরাম অর্থ সম্পদের নির্গমণ' বলে অভিহিত করেন। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক এটিকে 'ভারত লুণ্ঠন' বলেও অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন খাতে ভারতীয় অর্থসম্পদের এই নির্গমণ ঘটে।[৭৭]

১৭৫৫ পর্যন্ত উপমহাদেশে ইংরেজরা ছিল সামান্য বণিক মাত্র। ১৭৫৭ সালে তারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিপত্তির ভিত্তি রচনা করে এবং নানা ধরনের কপটতা, মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে মস্‌নদ বিক্রির অভিনব

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।

৭৬. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।

৭৭. ড. অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৬।

ব্যবসা শুরু করে। কর্ণাটকে মুহাম্মদ আলীকে এবং বাংলায় মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানোর মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করে যে, মসনদের রদবদল করানোর দ্বারা এ দেশের জাতীয় অর্থ সহজেই লুণ্ঠন করা সম্ভব।[৭৮] ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত মাত্র ৮ বছরে শুধু বাংলার মস্‌নদ বিক্রি থেকে যে পরিমাণ অর্থ লুট করে নিয়েছিল তার হিসাব তৎকালীন টাকায় ছিল নিম্নরূপঃ[৭৯]

১৭৫৭ সালে মীর জাফরকে মসনদ প্রদানের বিনিময়ে গ্রহণ করে ---- ৩,০৬,১০,৭৫০/-টাকা । ১৭৬০ সালে মীর কাসিমকে মসনদ প্রদানের বিনিময়ে গ্রহণ করে ---- ২৬,২৭,৬৯০/-টাকা। ১৭৬৩ সালে পুনরায় মীর জাফরকে মসনদ প্রদানের বিনিময়ে গ্রহণ করে ---- ১৪,১৮,৪৯০/-টাকা। ১৭৬৫ সালে নাজমুদ্দৌলাকে মসনদ প্রদানের বিনিময়ে গ্রহণ করে --- ১৯,৭৬,৯০০/-টাকা সর্বমোট = ৩,৬৬,৩৩,৮৩০/-টাকা।

তাছাড়া ইংরেজ কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবেও অনেক পুরস্কার গ্রহণ করেন। ঐ সময় ক্লাইভ (১৭৬৫-৬৭) ২৭ লক্ষ টাকা এবং ভান্সিস্টার্ট ২৮ হাজার পাউন্ড ব্যক্তিগত পুরস্কার গ্রহণ করেন। ক্লাইভ যখন ভারতে আসেন তখন ছিলেন নিতান্তই বিত্তহীন। কিন্তু ২ বছরে (১৭৬৫-৬৭) তিনি ১ লক্ষ পাউন্ড ব্যক্তিগত অর্থ সংগ্রহ করে স্বানন্দে স্বদেশে ফিরে যান। হেস্টিংসের মামলা চলাকালে এ্যাডমন্ড বার্ক ভারত থেকে ইংল্যান্ডে তার পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা বলে বর্ণনা করেছেন।[৮০]

ভারতবর্ষ থেকে অর্থ সম্পদ নির্গমণের অপর পন্থা ছিল বাণিজ্য। ইংরেজরা এদেশে বিনা পুঁজিতে ব্যবসা করে গিয়েছে। এ ব্যবসায় তাদের পকেটের কোন অর্থ খরচ করতে হয়নি। যেমন ভূমি রাজস্ব হিসেবে ভারতীয়দের থেকে যে টাকা আদায় করত সেই টাকা দিয়েই ভারতীয় পণ্য কিনে বিলাতে রপ্তানী করত এবং নিজেরা লভ্যাংশ হাতিয়ে নিত। ফলে উপমহাদেশের রাজস্ব ও সম্পদ কোন বিনিময় ব্যতিরেকে চলে যেত ইউরোপে। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মোটা অংকের বেতন, বেসরকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ, কোম্পানীর লোকদের ব্যক্তিগত বৈধ ও অবৈধ বিভিন্ন ব্যবসার লভ্যাংশের মাধ্যমেও প্রচুর অর্থ

---

৭৮. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৩।

৭৯. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।

ইউরোপে চলে যায়। এ ভাবে ১৭৬৬ থেকে ১৭৬৮ পর্যন্ত মাত্র ২ বছরে শুধু বাংলা থেকে ৬ কোটি ৩ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের অর্থসম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়েছিল।[৮১]

রাজস্ব বন্দোবস্তের পরিবর্তিত নিয়ম চালুর দ্বারাও সম্পদ লুণ্ঠনের নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হয়। রাজস্বের পরিমাণ ৯০ শতাংশের বেশী বৃদ্ধি করায় কৃষকদের ভরাডুবি ঘটে। ভারতীয়দের অনেকের জমিদারী নিলাম হয়। অপর দিকে কোম্পানীর গৃহে স্বর্ণের স্রোত বইতে থাকে। তাছাড়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব থেকে কোম্পানীর অংশীদারবৃন্দকে তাদের লগ্নীকৃত মূলধনের উপর ১২½ শতাংশ লভ্যাংশ পরিশোধ করতে হত। অপর দিকে বৃটিশ সরকারকে পরিশোধ করতে হত বাৎসরিক ৪০ লক্ষ পাউন্ড। ভারতকে লুণ্ঠন করেই এ বিপুল অর্থ প্রতি বছর ইংল্যান্ডে পাঠানো হত।[৮২]

১৮৩৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য 'সনদ আইন' রচনা করে দিলে কোম্পানী যদিও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল তবুও ভারতীয় জাতীয় সম্পদ লুটে নেওয়ার যেই ধারা পূর্ব থেকে চলে আসছে সেই ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং আরো বৃদ্ধি পায়। সনদ আইনের দ্বারা ইংরেজদেরকে দস্যুবৃত্তির পর্যায় থেকে সরিয়ে ভদ্রজনোচিতের পর্যায়ে আনা হয় মাত্র। কোম্পানীর লোকেরা তখন রাজনৈতিক বিভিন্ন পথে সম্পদ লুণ্ঠন করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ডালহৌসীর 'স্বত্ব বিলোপ' নীতির কথা বলা যায়। এ নীতি অনুসারে তিনি দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার বাতিল করে ভারতের প্রায় ১৫টি স্বাধীন রাজ্য জবরদখল করে নেন। সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী (১৮৪৯-৫৬) এমন কিছু নিয়ম চালু করেন, যা আপাত নজরে ছিল কল্যাণকর। কিন্তু গভীর রহস্যের দিক থেকে ছিল সম্পদ গ্রাস করারই বিভিন্ন বিকল্প।[৮৩] ঐ অবস্থা বর্ণনা করে উইলিয়াম ডিগবী বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষকে পূর্বের তুলনায় আরো ন্যক্কারজনকভাবে লুট করা হচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক রাজত্বকালের কঠিন চাবুক বর্তমানে আইনের লৌহ শিকলে পরিণত হয়েছে। এই শিকলের সামনে ক্লাইভ ও হেস্টিংসের লুণ্ঠন অতি তুচ্ছ। এই শিকলের কঠোরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একটি দেশ অপর একটি দেশের রক্ত নির্মমভাবে চুষে নিচ্ছে।[৮৪]

---

৮১. ড. অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭।

৮৩. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।

৮৪. প্রাগুক্ত।

উইলিয়াম ডিগবী ১৯০০ সাল পর্যন্ত আইন সিদ্ধ পথে ভারতের সম্পদ বাইরে চলে যাওয়ার পরিমাণ অনুমান করেছেন ৬ হাজার ৮০ মিলিয়ন পাউন্ড, তৎকালীন ভারতীয় টাকার অংকে যার পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা। মি.হ্যাভম্যান ১৯০১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ইংরেজদের গ্রাসকৃত টাকার পরিমাণ বলেছেন ২ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ কেবল আইনসিদ্ধ পথে ইংরেজ ১৮৩৩ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে যা লুটে নিয়েছিল তার মোট পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার কোটি টাকা।[৮৫]

ভারতীয় অর্থ শোষণের অপর পন্থা ছিল ভারত সরকারের উপর 'বৈদেশিক ঋণের বোঝা আরোপ' ও 'হোম চার্জের' অর্পণ। লালা লাজপৎ রায় বলেন, প্রাথমিক কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজের ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইংল্যান্ড থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণের অর্থ দ্বারাই কোম্পানী ভারতের শাসনদণ্ড অধিকার করে এবং ঐ ঋণ সুদআসলে পরিশোধের দায়িত্ব ভারত সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডারের উপর অর্পণ করে। ফল দাঁড়াল এ রকম যে, ইংরেজরা ভারতের কর্তৃত্ব দখল করে কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দেশের জন্য নিজেদের পকেট থেকে একটি পয়সাও ব্যয় করেনি। অধিকন্তু কোম্পানী নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার ও ব্যবসা বিস্তারের কাজে যে অর্থ ব্যয় করে, এমনকি গোটা এশিয়ার ভিতর কোম্পানী যে কাজই করে সেটির ব্যয় পরিশোধের দায়িত্ব থাকে ভারতীয় রাজস্ব ভাণ্ডারের। এভাবে দিনে দিনে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ সুদ আসলে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'আনহ্যাপী ইন্ডিয়া' গ্রন্থের হিসাব মোতাবেক ১৭৯২ সালে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ পাউন্ড। এটি ১৯১৩ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ডে পরিণত হয়। এ ঋণের ভিত্তিতে ভারতের অর্থবিভাগ প্রতি বছর সুদ দিতে হত ৮০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ৪০ কোটি টাকা ভারত সচিবের মাধ্যমে ইংল্যান্ড সরকারকে প্রদান করা হত। আর অবশিষ্ট টাকা পূর্ববর্তী ঋণের সাথে যুক্ত হয়ে যেত।[৮৬]

আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে, ইংরেজরা এশিয়ায় কিংবা আফ্রিকার কোথাও কোন যুদ্ধে লিপ্ত হলে সেখানকার জন্য সৈন্য, রসদ ইত্যাকার কোন কিছুই ইংল্যান্ড থেকে নেওয়া হত না বরং নেওনা হত ভারত থেকে। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে,

---

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২২০-২২১।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২২২।

যুদ্ধে গনীমতের মালিক হত ইংরেজ আর যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় শোধের দায়িত্ব আরোপিত থাকত ভারতীয় রাজকোষের উপর।[৮৭]

১৮৫৭ সালে বৃটিশ সরকার কোম্পানী থেকে ভারতের শাসনাধিকার ৪ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়। ঐ টাকা শোধ করার দায়িত্বও অর্পিত হয় ভারতীয় রাজকোষের উপর। এ সকল বৈদেশিক ঋণের উপর সুদের হার ইংল্যান্ডে প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে অনেক বেশী অর্থাৎ শতকরা ১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তাতেও শর্ত আরোপিত থাকে যে, ৪০ বছর পর্যন্ত ভারত শুধু সুদ আদায় করে যাবে। মূলধন হ্রাস করার অনুমতি নেই। ইংরেজ আমলে দেশের অভ্যন্তরে রেল লাইন ও রাস্তাঘাটসহ উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। এ সব উন্নয়ন বস্তুত ইংরেজদেরই বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার স্বার্থে করা হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এগুলোর ব্যয় 'হোম চার্জ' শিরোনামে ভারতের কোষাগার থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়। এ ভাবে আরো বহু পদ্ধতিতে ইংরেজরা ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠন করে।[৮৮]

শাসকের আসনে বসে ভারতবাসীর সম্পদ স্রোতের ন্যায় বছরের পর বছর এভাবে পাচার করার অনিবার্য পরিণতিতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয়দের জীবনযাত্রা ভয়াণকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ভারতীয়দের উপর অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী কঠিনভাবে জেঁকে বসে। ফলে এক কালে যে জাতির জীবনে অভাবের চিন্তাও করা যেত না সেই জাতি রীতিমত কাঙ্গালে পরিণত হয়।[৮৯] আসামের চীফ কমিশনার স্যার চার্লস ১৮৮৮ সালের এক সরকারী রিপোর্টে বলেন, আমি নির্দ্ধিধায় বলতে পারি যে, এখানকার কৃষকদের ৫০%-এর আর্থিক অবস্থার এত অবনতি ঘটেছে যে, তারা গোটা বছরেও পেট ভরে এক বেলা আহার করা কাকে বলে তা জানে না। জনৈক আমেরিকান মিশনারীর বক্তব্য লালা লাজপৎ রায় উদ্ধৃত করে বলেন, উত্তর ভারতের লোকেরা জীবন যাপন করে না বরং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কোনক্রমে পূরণ করে যাচ্ছে মাত্র। আমি এমন বহু পরিবারকে দেখতে পেয়েছি, যারা মৃত লাশের গোশ্‌ত খেয়ে জীবন যাপন করছে। অথচ সেই সময় কোন দুর্ভিক্ষ ছিল না।[৯০]

---

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৩।

৮৮. ড. অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৫।

৮৯. মেসবাহুল হক, আবদুল গফুর সম্পাদিত, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ ৭৩।

৯০. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।

স্যার উইলিয়াম ডিগবীর মতে খ্রিস্টীয় একাদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইংল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ হয় ১০০টি। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল মাত্র ১৭টি। অষ্টাদশ শতক থেকে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতে চলে যায়। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে হয় ৭টি আর ভারতে হয় ১১টি। উনবিংশ শতকে ইংল্যান্ডে হয় ১টি আর ভারতে হয় ৩১টি।[৯১] এ সকল দুর্ভিক্ষে নিহতদের সংখ্যাও ছিল অকল্পনীয়। ১৮০০ থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত মোট ৫টি দুর্ভিক্ষে মারা যায় ৫০ লক্ষ মানুষ। ১৮২৬-৫০ সালের মধ্যে মোট ২টি দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে ১০ লক্ষ মানুষ। ১৮৫১-৭৫ পর্যন্ত মোট ৬টি দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছে ৫০ লক্ষ (মতান্তরে ১ কোটি) মানুষ। ১৮৭৬-১৯০০ পর্যন্ত মোট ১৮ টি দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ। ডিগবী আরো স্পষ্ট করে বলেন, ১৭৯৩ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ৫০টি যুদ্ধ হয়। এ সকল যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ লক্ষ। অথচ ঐ একই সময়ে ভারতবর্ষে শুধু দুর্ভিক্ষের কারণে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল (তার চেয়ে ৭ গুণ) ৩ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশী।[৯২]

অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি ইংরেজরা ভারতবাসীর ব্যবসা, বাণিজ্য, মসলিন, সিল্ক ও সুতি বস্ত্র শিল্প, নৌ শিল্প ইত্যাদি ধ্বংস করে। ভারতীয় শিল্পের স্বার্থ বিরোধী মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সাম্রাজ্যবাদী শিল্পনীতি গ্রহণ করে শিল্প জগতে ভারতীয়দের সর্বনাশ ঘটায়। ফলে এক কালের অতি সমৃদ্ধ ভারতীয় শিল্প নগরীগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।[৯৩] তাছাড়া রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করা, প্রজাদের মধ্যে পারস্পারিক কলহ ও বিচ্ছেদ ঘটানো, কপট আচরণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ইংরেজদের জঘন্যতম কুশাসন।[৯৪] আর এ সকল কারণেই খ্রিস্টীয় ১৮০৩ সালে সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন।

---

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫-১৩৬।

৯২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪০-২৪২।

৯৩. ড.অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭; আবদুল করিম, ঢাকাই মসলিন (ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০), পৃ ৯৭-১০০।

৯৪. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২১।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন কায়েমের দরুন বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ দেশের মুসলমান। ইংরেজদের কুশাসন ও মুসলমানদের প্রতি তাদের চরম বৈরী আচরণ মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ণ বিপন্ন করে দেয়। ফলে যে মুসলমানগণ বিগত শত শত বছর ধরে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ভারতবর্ষ শাসন করে আসছিল, তাঁরা মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অধঃপতনের চরম সীমানায় পৌঁছে যায়।[৯৫]

ভারতের পুরাতন শাসন ব্যবস্থা ও ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পুরাতন ব্যবস্থাপনায় সরকার ও প্রশাসন ছিল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইংরেজ আমলে এটি শোষণ ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিম বিজয়ীরা ভারত জয়ের পর এখানকার প্রচলিত প্রাচীন রাজস্ব নীতির কোন পরিবর্তন করেননি। তাঁরা সেনাপতিদের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারী বন্টন করে দিয়ে সর্বত্র রাজস্ব ও প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সামাজিক সুবিচার ও সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। মুসলিম বিজয়ীদের প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দুরা। রাজ্য জয়ের পর মুসলমানরা হিন্দু প্রজাদের হৃদয় জয়ের প্রতি মনোনিবেশ

---

৯৫. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ একটি মূলনীতি নির্দেশ করে বলেছেন,

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

রাজা বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তা বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করে এরাও এরূপই করবে (২৭ : ৩৪)।

W. W. Hunter obsered in about 1870: 'A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born Mussalman in Bengal to become poor, at present it is almost impossible for him to continue rich' The truth of this statement will be evident from the account of the conditions of the Muslims under the British rule. (Dr. K. M. Mohsin, 'Bangladesh Under British Rule', **Islam In Bangladesh Through Ages,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩); এম.এ.রহিম, **বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস** (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪), পৃ ৫৩।

করেন। তাঁরা হিন্দু প্রজাদের পূর্ববর্তী অবস্থান অপরিবর্তিত রাখেন। এমনকি তাদেরকে মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে প্রশাসনের উচ্চ পদেও সংযুক্ত করে নেন।[৯৬]

বিজিতদের মন জয় করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব কায়েমের উদ্যোগ মোঘল আমলে ইসলামের দেয়া সীমারেখাও অতিক্রম করে গিয়েছিল। সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষে একাধিক মোঘল সম্রাট হিন্দুদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন (যদিও ইসলামী শরীঅতে এটি আদৌ অনুমোদিত নয়)। সম্রাট আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের আপন মাতা ছিলেন মুসলমান আর অপর মাতা ছিলেন হিন্দু। স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক স্ত্রী ছিলেন মুসলমান আর অপর স্ত্রী ছিলেন হিন্দু। প্রশাসনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরমত সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের এই রূপরেখা আঞ্চলিক সুবাদার, নওয়াব ও জমিদারদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে গোটা ভারতবর্ষের প্রশাসন একটি অন্তরঙ্গ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[৯৭] কিন্তু ইংরেজ আমলে এটি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয় বলে স্বৈরাচার, শোষণ ও জুলমের দিকটি প্রাধান্য পেয়ে যায়। ইংরেজরা নিজেদের প্রতিপক্ষের মন জয় করার প্রতি কোনই ভ্রুক্ষেপ করেনি। অধিকন্তু প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল বরং নির্মূল করার চেষ্টায় প্রাণপণ লিপ্ত থাকে।

ইংরেজ পূর্বকালে ৫টি ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপক অংশীদারিত্ব ছিল। দেওয়ানী ও রাজস্ব, আইন ও বিচার, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও শিক্ষা। এ ক্ষেত্রগুলো বলতে গেলে মুসলমানদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা দিল্লী দরবার থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর মুসলমানদেরকে ঐ সকল ক্ষেত্র থেকে অপসারণ শুরু করে। আর তদস্থলে নিজেদের ফিরিঙ্গী লোকজন অথবা মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুদেরকে নিয়োগ করে। ফলে মুসলমানরা সামাজিকভাবে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ে।[৯৮] উইলিয়াম হান্টার বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, এ ভূখণ্ড যখন আমাদের অধিকারে আসে তখন মুসলমানরাই সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গণ্য ছিল। তারা মনের দৃঢ়তা ও শারীরিক শক্তির দিক থেকেই নয়; মেধা, রাজনীতি ও কর্মকৌশলের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। এতদসত্ত্বেও তাদের জন্য সরকারী কোন চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ ছিল না। জীবিকা

---

৯৬. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।

৯৭. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২।

৯৮. এম.এ.রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪; Dr.K.M.Mohsin. Bangladesh Under British Rule. **Islam in Bangladesh Through Ages,** প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪।

নির্বাহের বেসরকারী ক্ষেত্রগুলোতেও তাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকার সুযোগ রাখা হয়নি।[৯৯]

উইলিয়াম হান্টারের মতে মুসলিমদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয় আইন ও বিচার বিভাগ থেকে।[১০০] পূর্বকালে আইন রচনা, ব্যাখ্যা দান, প্রয়োগ ও বিচারের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত। ইংরেজ শাসন শুরু হলে আইন রচনা থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। এটি তাদের অযোগ্যতার কারণে ছিল না বরং রাজনৈতিক কারণে এবং সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয়। স্যার আর্সকিন বলেন, ভারতীয় ঐ সকল মুসলিম বিচারকের বিচার প্রতিভা কোম্পানীর সে সব জজ থেকেও উত্তম ছিল, যারা আপীলের শুনানী গ্রহণ করতেন।[১০১] বিচার বিভাগ থেকে ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস করার কারণে ঐ বিভাগে ১৮৬৯ সালে মুসলমানদের অবস্থান দাঁড়িয়েছিল নিম্নরূপঃ

সরকারী আইন বিষয়ক কর্মকর্তা ঃ ইংরেজ ৪ জন, হিন্দু ২ জন, মুসলিম শূন্য।
হাইকোর্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঃ ইংরেজ ১৪ জন , হিন্দু ৭ জন, মুসলিম শূন্য।
ব্যারিস্টার ঃ ইংরেজ অসংখ্য, হিন্দু ৩ জন, মুসলিম শূন্য।

১৮৫৩ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্য থেকে ২৪০ জন উকীল নিয়োগ করা হয়। তন্মধ্যে ২৩৯ জন নেওয়া হয় হিন্দুদের থেকে, আর মাত্র ১ জন নেওয়া হয় মুসলমানদের থেকে। এ ভাবে যেই আইন বিভাগের সর্বত্র ছিলেন মুসলমানরা, সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব ক্রমে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেওয়া হয়।[১০২]

মুসলমানদের সর্বাধিক অংশীদারিত্ব ছিল সামরিক বিভাগে। তাঁরা এ বিভাগে পূর্বকাল থেকেই দক্ষতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে আসেন। ইংরেজ আমলে নিরাপত্তার অজুহাতে এ বিভাগে তাঁদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর কাউকে সুযোগ দেওয়া হলেও এমন নিম্নপদে স্থান দেওয়া হয়, যেখানে চাকুরী করে পেট চালানোই কঠিন। উইলিয়াম হান্টার বলেন, তখন কোন ভারতীয়কে সিপাহী থেকে উপরের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কর্নেল রুটবীর সুপারিশক্রমে

৯৯. উইলিয়াম হান্টার, হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৭।
১০০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৫।
১০১. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬১-৩৬২।
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮১।

কেবল 'হায়াত আলী' নামক এক ব্যক্তিকে অনারারী ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হয়েছিল।[১০৩]

দেওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগে প্রধানত মুসলমানরাই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাঁদের অনেকে পারিবারিকভাবে এবং বংশানুক্রমিক জমিদারীর মালিক ছিলেন। হেস্টিংসের আমলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় নানা রকমের পদ্ধতিগত রদবদল চলে। ১ বছর, ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানের নীতি চালু হয়। কোম্পানীর পক্ষ থেকে খাজনা আইনও ক্রমে কঠোর করা হয়। ১৭৭২ থেকে চালু হয় ৫ বছরের জমি নিলাম করার নীতি। হেস্টিংস কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস বলেন, এই রদবদলে প্রাচীন জমিদার (মুসলিম)দের অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁদের জায়গায় খাজনা আদায়ের জন্য সরকার নিম্নশ্রেণীর হিংস্র মানুষদের নিয়োগ করেন। অবশেষে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী জমি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়।[১০৪]

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকার মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতকেও ক্রমে দুর্বল করে দেয়। অধিকন্তু বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা ও ইউরোপীয় স্বার্থ উপযোগী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। নতুন এ শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলিম আদর্শের অনুকূলে ছিল না বিধায় মুসলমানদের পক্ষে এটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই ভারতবর্ষে শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকেও মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে।[১০৫] মুসলিম সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিসেবে ইতোপূর্বে বিদ্যোৎসাহী আমীর উমারা ও নওয়াবগণ বহু সম্পত্তি লা-খেরাজ দিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৩৮ সালে ইংরেজরা ঐ সকল সম্পত্তি ক্রোক করে নিলে শিক্ষা ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮০৬ সালে হাজী মুহাম্মদ মুহ্সিন মুসলিম শিক্ষার জন্য যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যান, ইংরেজ সরকার সেটি থেকেও মুসলমানদের বঞ্চিত করে। হুগলীর ইসলামী কলেজকে ইংরেজী কলেজে পরিণত করা হয়।[১০৬] উইলিয়াম হান্টারের মতে তখন ঐ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০০। তাদের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিল মুসলমান।[১০৭]

---

১০৩. উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩।

১০৪. ড.অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২১০, ২১৮।

১০৫. মেসবাহুল হক, আবদুল গফুর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

১০৬. এম.এ.রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯-১১০; Abdul Karim, **Muhammadan Education in Bengal** (Calcutta: Metealfe Press, 1900), P. 13-14.

১০৭. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯১।

শিক্ষার পর সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির কোন সুযোগ না থাকার বিষয়টিও মুসলমানদেরকে শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। কোন কোন স্থানে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও চাকুরী শুধু হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। এ মর্মে উইলিয়াম হান্টার বলেন, মুসলমানরা বর্তমানে এতটুকু অধঃপতিত যে, সরকারী চাকুরীর উপযুক্ততা অর্জনের পরেও বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন রকমের শর্ত দ্বারা তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। তাদের অসহায়ত্বের প্রতি কারো সুদৃষ্টি হচ্ছে না। উর্ধ্বতন মহল মুসলমানদের অস্তিত্ব মেনে নিতেও যেন নারাজ।[১০৮]

১৮৭৩ সালে মাদ্রাজ সরকার নিজেও স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষাদানে তাদের গৃহীত পদ্ধতি হিন্দুদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের নিরিখে তৈরীকৃত। এ ব্যবস্থাপনায় মুসলমানকে এতটা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে যে, স্কুলগুলোতে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, আশ্চর্যের ব্যাপার হল এহেন পরিস্থিতিতে তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকা।[১০৯]

ইংরেজপূর্বকালে প্রশাসনের সকল পদে প্রধানত ছিলেন মুসলমানরাই। ইংরেজ আমলে সেটির আমূল পরিবর্তন ঘটে। সরকারী পদ থেকে তাদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস করা হয়। ১৮৭১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তখন সরকারী পদের সংখ্যা ছিল ২১১১ টি। তন্মধ্যে ইংরেজদের দখলে ছিল ১৩৩৮টি পদ, হিন্দুদের ছিল ৬৮১টি আর মুসলমানদের ছিল মাত্র ৯২ টি।[১১০] এর অর্থ হল যে, এক শতাব্দী পূর্বে যারা প্রশাসনের সর্বত্র বিরাজিত ছিল, ইংরেজ আমলে তাঁদেরকে মোট চাকুরীজীবীদের ২০ ভাগের এক ভাগও প্রদান করা হয়নি।

অফিস ও আদালতের প্রচলিত ভাষা পরিবর্তনের কারণেও মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্বে অফিস আদালতের ভাষা ছিল ফার্সী। উপমহাদেশের হিন্দুরাও এ ভাষায় শিক্ষা লাভ করত। কলিকাতার মুন্সী নবকৃষ্ণ (যিনি পরবর্তী কালে মহারাজ নবকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন) ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ফার্সী ভাষার গৃহশিক্ষক ছিলেন। কবি মাইকেল মধুসূদনের পিতা মুন্সী রাজ নারায়ণ ফার্সী পণ্ডিত ছিলেন। বাংলার প্রতিটি মসজিদে ও মক্তবে ফার্সী শিক্ষা দেওয়া হত। গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সেকান্দরনামা ইত্যাদি ছিল পাঠ্য পুস্তক।[১১১] ১৮০৬ সালে দিল্লী সম্রাটের সাথে ইংরেজদের কৃত চুক্তিতে অফিস আদালতের প্রচলিত ফার্সী ভাষা

---

১০৮. উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮।

১০৯. সায়্যিদ মাহমূদ, তারীখুত্ তালীম, বাদায়ুন, পৃ ১৫০।

১১০. মেসবাহুল হক, আবদুল গফুর সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

১১১. ড.অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫।

অপরিবর্তিত রাখার অঙ্গীকার ছিল। ইংরেজ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ১৮৩৭ সালে ফার্সী ভাষা তুলে দেয় এবং সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী চালু করে। মি. মিয়ো বলেন, এ পরিবর্তন সাধন আপাতদৃষ্টিতে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও তার পরিণতি ছিল সুগভীর। পরিবর্তনের কারণে মুসলমান সমাজ ভয়াণকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১১২]

মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বৈরিতা ও বিদ্বেষের উলঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময়ে। মহাবিদ্রোহের জন্য ইংরেজ সরকার মুসলমানদের দায়ী করে। বিশেষত তাদের উলামা ও ধার্মিকদেরকে। তাই আলিম ও ধার্মিক লোকদের উপরই প্রতিশোধ ও দলনমূলক নির্যাতন চালানো হয়। আলিমগণকে বাড়ী থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়।[১১৩] তাঁদের জমাজমি, সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে অসংখ্য আলিমকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। তাঁদেরকে ফাঁসি দিয়ে হাটে বাজারে ঝুলিয়ে রেখে ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়।[১১৪] সম্রাট শেরশাহ নির্মিত সুদীর্ঘ ট্রাংক রোডের দু'পাশে অবস্থিত বৃক্ষরাজির বহু স্থানে মাসের পর মাস ঝুলে ছিল বহু আলিমের মৃতদেহ।[১১৫] মাওলানা আহ্‌মদ উল্লাহদেহলবী, মাওলানা ফয্‌লে হক খায়রাবাদী, মাওলানা ফয়েয আহমদ বাদায়ূনী, মৌলভী আবদুল কাদির দেহলবী, মুফ্‌তী ইনায়েত আহমদ কাকূরী (ইলমুস-সিগাহ গ্রন্থের মুসান্নিফ), মৌলভী ওয়াযীর খান

---

১১২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯২।

১১৩. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে প্রায় ২০ লক্ষ মুসলমান অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে দুই লক্ষ শহীদ হয়। ইংরেজ দিল্লীর ক্ষমতা পুনর্দখলের পর ২ সপ্তাহের ভিতরে ৫০ হাজার আলিমকে হত্যা করে। (মুহাম্মদ ইদরীস হুশিয়ারপুরী, খুত্‌বাতে মাদানী, দেওবন্দ, যমযম বুক ডিপো, ১৯৯৭, পৃ ৪২০)

১১৪. বাহাদুর শাহ্ পার্ক নামে পরিচিত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একযোগে ৬০ জন মুসলমানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁদের লাশগুলো মাসের পর মাস বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত ছিল। হলফেজ লিখেছেন, কোর্ট মার্শালে যে সকল ইংরেজ অফিসার বিচারক নিযুক্ত হতেন, তাদের এ মর্মে শপথ করতে হত যে, দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে সকল বন্দীদের তারা ফাঁসির রায় দেবেন। (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আবদুল গফুর সম্পাদিত, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮)

১১৫. আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 'উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের অবদান" ইনকিলাব স্মারক সংখ্যা (ঢাকা ঃ লাজনাতুত তালাবা বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ ১৭-১৮; সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারীখী জায়িযা, (লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৯৯২), পৃ ১৬৩।

আক্‌বরাবাদী, কাযী ফয়েয উল্লাহ দেহলবী, সায়্যিদ মুবারক শাহ্ রামপুরীসহ বহু আলিমকে ইংরেজরা মহাবিদ্রোহের জন্য দায়ী করে।[১১৬]

প্রতিশোধের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষত আলিমগণের নির্মূল করার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। দাঁড়ি টুপি বিশিষ্ট কোন লোক দেখা মাত্রই মৌলভী মনে করে গুলি করে উড়িয়ে দেওয়া হয়। মৌলভী বেষ-ভূষায় পাওয়াই বিদ্রোহী বিবেচিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানেই মনে করা হত বিদ্রোহের আখড়া। দিল্লীর ঐতিহাসিক রহীমিয়্যা মদ্রাসা, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ, সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয ও হযরত শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদী মুহাদ্দিস দেহ্‌লবীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; যেখান থেকে হযরত নানূতবী, হযরত গাঙ্গূহী ও মাওলানা ফয্‌লে হক খায়রাবাদীর মত মহান বিপ্লবীরা গড়ে উঠেন, ইংরেজরা সেই মদ্রাসা কামানের নির্মম আঘাতে উড়িয়ে দেয়। মদ্রাসার জায়গাটি লালা রাম কৃষ্ণ দাস নামক জনৈক হিন্দুর কাছে বিক্রয় করে দেয়। আকবরী মসজিদ, যেখানে হযরত শাহ্ আবদুল কাদির একটানা ৪০ বছর পবিত্র কুরআনের দরস দেন, সেই মসজিদকে এই অপরাধে গুড়িয়ে দেয়া হয় যে, এখান থেকে স্বাধীনতা প্রেমিক আলিম তৈরী হয়। প্রতিশোধের নেশা গুড়িয়ে দিয়েই শেষ হয়নি। জায়গাটি মদ্যপানের একটি ক্লাবে পরিণত করে।[১১৭] সমগ্র দেশে গোয়েন্দা জাল এমনভাবে বিছিয়ে দেয় যে, মুখে স্বাধীনতা কিংবা আযাদীর নাম উচ্চারণ করা তো নয়ই, জালিমের বিরুদ্ধে ও মজ্‌লূমের পক্ষে আল্লাহর কাছে দুআ করতেও মানুষ ভয় পেত। দেওবন্দের জনৈক বুযর্গের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর তিনি মজ্‌লূম মানবতার জন্য দুআ করার আগে গৃহের ছাদে উঠে দেখে নিতেন কোথাও কোন গোয়েন্দা লুকিয়ে বসে পাহারা দিচ্ছে কিনা।[১১৮]

এ্যাডওয়ার্ড টামসন মুসলমানের প্রতি ইংরেজ নিপীড়নের হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরে যে গ্রন্থ রচনা করেন, হোসামুদ্দীন বি এ সেটি 'তাসবীর কা দোসরা রোখ' শিরোনামে অনূদিত করেন। ঐ গ্রন্থের কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক মি. লীন লিখেছেন, জীবন্ত মুসলমানকে নাপাক শূকরের চামড়ার ভিতর ঢুকিয়ে সেলাই করে দেওয়া, ফাঁসিতে

---

১১৬. মাদানী, নক্‌শে হায়াত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৬০।

১১৭. আবদুর রহমান, তাহরীকে রেশমী রুমাল, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

ঝুলানোর পূর্বে তাঁদের শরীরে শূকরের চর্বি মাখিয়ে দেওয়া, তাঁদেরকে জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা কিংবা ভারতীয়দেরকে একে অন্যের সঙ্গে গর্হিত কুকর্ম করতে বাধ্য করা ইত্যাদি প্রতিশোধ গ্রহণের এমন নিন্দিত ব্যবস্থা, যেগুলোকে পৃথিবীর কোন সভ্যতা অনুমোদন করেনি। এসব কারণে আমাদের চেহারা লজ্জায় অবনত হয়ে যাচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে এটি এমন কর্ম যা আমাদের খ্রিস্ট ধর্মমতকেও প্রকারান্তরে কলুষিত করেছে। এ কর্মের অনিবার্য পরিণতি অবশ্যই আমাদের ভোগতে হবে।[১১৯]

শেখপুরা, গাওজরনাওয়ালা ও মন্টোগোমারী জেলা থেকে বহু মুসলিম কয়েদীকে গ্রেফতার করে লাহোর শাহী মসজিদে আনা হয়। মসজিদের ভিতরই তাঁদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। বিদ্রোহী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি আহত করণার্থে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।[১২০]

জনৈক ইংরেজ লিখেছেন, ভারতীয়দের যে বিপুল সংখ্যক লোককে ফাঁসি দেওয়া হয় তা বর্ণনাতীত। এলাহাবাদ থেকে কানপুর পৌছার পথে ৪২ জন মুসলমানকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ১২ জনকে এ অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল যে, ইংরেজ বাহিনী যখন সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তারা ঘৃণায় নিজেদের চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। তাছাড়া ঐ বাহিনী পথিমধ্যে যেখানে অবস্থান করে সেখানই আতংক সৃষ্টির জন্য আশেপাশে অবস্থিত সকল জনপদ পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।[১২১]

দিল্লীতে রক্তপিপাসু ইংরেজ সৈনিকরা প্রতিশোধ প্রবণতায় উন্মাদ হয়ে ফাঁসি দানকারী জল্লাদদের ঘুষ দিয়ে বলেছিল আসামীদেরকে যেন ফাঁসির দড়িতে দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখে। কারণ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আসামীদের ধরপড় (তাদের ভাষায় নৃত্য) দেখে তাদের মানসিক তৃপ্তি অনুভূত হত।[১২২]

এ্যাডওয়ার্ড টামসন আরো বলেন, দিল্লীতে মুসলমানদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ আমাদের জানামতে সেখানে এমন বহু মুসলমানও ছিলেন যারা বিদ্রোহের সময় আন্তরিকভাবে আমাদের পক্ষ সমর্থন

---

১১৯. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী (দিল্লী : কিতাবিস্তান এম ব্রাদার্স, ১৯৮৫), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪৮৯।

১২০. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

১২২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৫।

করেছেন। আমাদের অনেক যুবক অফিসার খুনের ইচ্ছা পূণার্থে নিজেদের বিশ্বস্থ ভারতীয় পিয়ন ও আর্দালীদেরকেও হত্যার উলঙ্গ নির্দেশ দিয়েছিল।[১২৩]

নাদির শাহ্ দিল্লীতে সেই লুণ্ঠন (১৭৩৯) চালাতে সক্ষম হয়নি, যেটি চালিয়ে ছিল ইংরেজ সৈনিকেরা। রাজপথে অস্থায়ী ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করা হয়। প্রত্যহ ৫/৬ জন করে মুসলিম বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক দানপুল বলেন, দিল্লীতে ৩ হাজার লোককে একত্রে ফাঁসি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ২৯ জন ছিল মোঘল রাজ পরিবারের সদস্য।[১২৪]

সফর মাসের ১/২ তারিখে সম্রাটের সম্বন্ধী ইলাহী বখ্শের গোপন সংবাদে সেনাপতি মি.হাডসন সম্রাট হুমায়ূনের সমাধিতে আত্মগোপনকারী ৩ শাহ্জাদা- মির্জা মোঘল, মির্জা হযরত সুলতান ও মির্জা আবূ বকরকে গ্রেপ্তার করে। ইংরেজরা শাহযাদাত্রয়ের কর্তিত মস্তক একটি তশ্তরীর মধ্যে সাজিয়ে নাশ্তার সময়ে বন্দী সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যফর (১৮৩৭-৫৭) এর সামনে পেশ করলে তিনি অতি দুঃখের হাসি হেসে বললেন, তৈমুর বংশের বীর সন্তানেরা শেষ পর্যন্ত এভাবে কর্তিত মস্তক হয়ে পিতার সম্মুখে হাজির হতে হল?[১২৫]

বস্তুত ইংরেজরা ভারতীয় মুসলিম বিপ্লবীগণকে ফাঁসি দেওয়া, তাঁদের মৃতদেহ বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখা, জ্বলন্ত লৌহ শলাকার দ্বারা ছেকা দিয়ে হত্যা করা, শূকরের চামড়ায় আবৃত করে হত্যা করা, গলা টিপে হত্যা করা, ব্যাপক গণহত্যা চালানো ইত্যাদির কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি।[১২৬] ঐ সময় মোঘল শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যফর ধৃত হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। অনেক কাকুতি করেও নিজ কবরের জন্য সামান্য জায়গার অনুমতি না পেয়ে সমগ্র উপমহাদেশের অধিপতি মোঘল শেষ সম্রাট বিদায় কালে বলেছিলেন,

---

১২৩. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

১২৪. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৫।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৬।

১২৬. সিলেট জেলায় এখনও প্রবাদ আছে যে, বড়লেখা থানার লাতু নামক স্থানে ইংরেজ ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদেরকে লাতু থেকে সিলেটে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান হাসান মার্কেটে (পূর্বের গোবিন্দচরণ পার্কে) অবস্থিত বটগাছের এক-একটা ডালে এক-একজন সিপাহীকে প্রকাশ্য দিবালোকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের লাশ কোন আত্মীয়স্বজনকে দাফন করতে দেওয়া হয়নি। এই গলিত শবগুলো নরমাংসাশী শকুনদের আহার্যে পরিণত হয়েছিল। (দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮)

کتنی بدنصیب ہے ظفر دو گز زمیں
نہ مسلی دفن کیلئے ہندوستاں میں

(দিল্লী সম্রাট যফরের কত দুর্ভাগ্য যে, ভারত উপমহাদেশের সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে মৃত্যুর সময় কবরের জন্য সামান্য দুই গজ জমি পর্যন্ত কপালে জোটেনি।)

তিন

ভারতবর্ষের ভাগ্য বিপর্যয় অন্যান্য মুসলিম দেশের জন্যও ভাগ্যের নির্মম পরিহাস টেনে আনে। কারণ ইংরেজরা ধনরত্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার ভারতবর্ষ দখলের পর এখানকার আধিপত্য অটুট রাখা এবং ইংল্যান্ডের সাথে যোগযোগের পথ নিষ্কণ্টক করার স্বার্থে পথিমধ্যে অবস্থিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানও করায়ত্তের প্রয়োজন বোধ করে।[১২৭] দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে অবস্থিত দেশগুলোর অধিকাংশ ছিল মুসলিম দেশ। ফলে এক ভারতের উপর রাজত্ব টেকানোর লক্ষ্যে বহু মুসলিম দেশ ইংরেজদের উৎপীড়ন ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। আরো বিস্ময়ের বিষয় ছিল এই যে, গুরুত্বপূর্ণ ঐ সকল স্থান ও দেশ হস্তগত করতে বৃটিশ সরকারকে বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। যুদ্ধগুলোতে ভারত থেকে শুধু সৈনিক ও রসদের ব্যবস্থাই নয়, যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ভারতের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই চালানো হয়।[১২৮]

সুয়েজ প্রণালী তৈরী হওয়ার পূর্বে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসার জন্য উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ব্যতিরেকে অন্য কোন পথ ছিল না। এ পথে ইউরোপ থেকে ভারতে পৌছতে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করে পৌছতে হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা এ পথেই ভারতে এসেছিল। ইংরেজদের জন্য এ পথ ব্যয়বহুল ও কষ্টকর হয়ে থাকলেও ভারতের ধনৈশ্বর্যের নেশা তাদের সব কষ্ট সহজ করে দেয়। ভারতে ঔপনিবেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর যাতায়াতের পথ কণ্টকমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রথমেই তারা দক্ষিণ ইয়ামেনের 'এডেন' সমুদ্র বন্দর করায়ত্তের প্রয়োজন বোধ করে। ১৮৩৯ সালে তুরস্কের সুলতান আবদুল মজীদ খানের বিরুদ্ধে মিসরের গভর্নর মুহাম্মদ আলী পাশা বিদ্রোহ করলে উভয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধে। ইংরেজরা তুরস্কের সুলতানকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেছিল বলে

১২৭. মাদানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৮৮-৪৮৯।
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯১।

পুরস্কার হিসেবে সুলতান থেকে এডেন বন্দর লাভ করে।[১২৯] এডেনের দলীলে বৃটিশকে সামুদ্রিক জাহাজের জন্য শুধু 'জ্বালানি কয়লা সংরক্ষণাগার' স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ ক্রমে এডেনকে নিজেদের শক্তিশালী সামরিক ঘাটিতে পরিণত করে এবং দক্ষিণ ইয়ামেনের বিশাল ভূখণ্ড দখলপূর্বক 'বাবেল মান্দেব' প্রণালীর উপরেও আধিপত্য কায়েম করে। তাছাড়া এই সুবাদে এডেন উপসাগরের অপর তীরে অবস্থিত সোমালিয়া, সুদান ও মিসরের উপর হস্তক্ষেপ চালায়।[১৩০] ইংরেজদের আগ্রাসী পদক্ষেপে এতদঞ্চলের মুসলমানগণ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তুরস্কের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার কারণে এ ক্ষতিগ্রস্ততার কোন প্রতিকার সম্ভব হয়নি। ইংল্যান্ড ও ভারতের নৌ-যোগাযোগ নিরাপদ করার স্বার্থে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল বলে অজুহাত দেখিয়ে এর যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকারের উপর বর্তানো হয়।

১৮৬৯ সালে সুয়েজ প্রণালী তৈরী হলে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর দিয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নতুন পথ চালু হয় এবং পুরাতন পথের দূরত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। মিসরের গভর্ণর ইসমাঈল পাশা সুয়েজ খনন করেন।[১৩১] ঔপনিবেশিক রাজত্ব সংরক্ষণের স্বার্থে বৃটিশ নতুন এ জলপথ দখলেও সচেষ্ট হয়।

বিশ্ব নৌ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুয়েজ প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ প্রথম দিকে তাতে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। ইসমাঈল পাশা কয়েকটি ফরাসী কোম্পানীর দ্বারা সুয়েজ খননের কাজ সম্পন্ন করেন। খননের কাজ সমাপ্তির পর এই বৃটিশই ইসমাঈল পাশার সাথে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তি অনুসারে সুয়েজের সমস্ত এলাকা ৩৯,৭৬,৫৮২ পাউন্ডে খরিদ করে নেয়।[১৩২] লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে 'বাবেল মান্দেব' প্রণালী ইতোপূর্বেই তাদের দখলে ছিল। অতঃপর উত্তর প্রান্তে সুয়েজ প্রণালী খরিদের দরুন সমস্ত লোহিত সাগর ইংরেজদের অধিকারে চলে যায়।

---

১২৯. কে আলী, মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস (ঢাকা ঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯), পৃ ১৫৯।

১৩০. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯।

১৩১. ১৮৫৯ সালের এপ্রিলে খাল খননের কাজ শুরু হয় এবং ১৮৬৯ সালে খনন শেষ হয়। খাল খননের সময় মিসরীদের বহু জীবন নষ্ট হয়েছিল। খনন কার্যে মোট ৪৭৩০ লক্ষ ফরাসী মুদ্রা ব্যয় হয়। ১৮৬৯ সালে ইসমাঈল পাশার আমলে মহাসমারোহে সুয়েজ খালের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। দ্বার উদ্ঘাটন করেন সম্রাজ্ঞী ইউজেনী। সুয়েজ খালের দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল, প্রস্থ ১০০ গজ এবং গভীরতা ২৫-৩৫ ফুট। (কে আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৪)

১৩২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯।

নতুনভাবে সূচিত নৌপথের মধ্যে লোহিত সাগরের সমস্ত অংশ নিরাপদ করার পর বৃটিশ সরকার ভূমধ্যসাগরের দিকে মনোযোগ দেয়। ১৮৭৮ সালে সাইপ্রাস দ্বীপ তুরস্কের হাত থেকে ইংরেজদের দখলে আসে। ইংরেজ ঐ বছরই যুদ্ধের মাধ্যমে মাল্টা ও জিব্রাল্টার দখল করে নেয়। মাল্টা ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর সাইপ্রাস পূর্ব প্রান্তে ও জিব্রাল্টার পশ্চিম প্রান্তে। এ তিনটি দ্বীপে সামরিক ঘাটি তৈরী করে বৃটিশ ভূমধ্যসাগরের অবশিষ্ট পথও নিজেদের জন্য নিরাপদ করে নেয়।[১৩৩] এই সাগরের উপকূলস্থ আলজেরিয়াকে ফ্রান্স ১৮৩০ সালে তুরস্কের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঔপনিবেশিক রাজ্যে পরিণত করেছিল। ১৮৮১ সালে পার্শ্বস্থ তিউনিসিয়াকেও ফ্রান্স জবর দখল করে। উপকূল এলাকায় ফ্রান্সের ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি বৃটিশের শিরোপীড়ার কারণ হয়। ফলে বৃটিশ ১৮৮৩ সালে মিসর ও সুদান দখলের চেষ্টায় মেতে উঠে। দীর্ঘ ২ বছর ভূমধ্যসাগর থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর বোমা হামলা চালানো হয়। অবশেষে তুরস্ক সুলতানের মাধ্যমে গভর্ণর ইসমাঈল পাশাকে পদচ্যুত করে তার জায়গায় পুত্র তৌফিক পাশাকে নিযুক্ত করে। ঐ সময়ে লর্ড ক্রেমারের প্রত্যক্ষ আগ্রাসনের মাধ্যমে ইংরেজ সমগ্র মিসর ও সুদানের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।[১৩৪] মিসর দখলে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হয়। এটি শোধ করার দায়িত্ব অর্পিত হয় ভারতের উপর। ইংরেজ ১৯০০ সালে আফ্রিকার আরো কয়েকটি দেশে অভিযান চালায়। ঐ সকল যুদ্ধেও ভারত থেকে সৈন্য ও রসদ সরবরাহ ছাড়াও যুদ্ধের ব্যয় বাবদ ২ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ড পরিশোধের দায়ভার ভারত সরকারের উপর চাপানো হয়।[১৩৫] এভাবে ভারতীয় জনশক্তি ও ভারতীয় অর্থের দ্বারা বৃটিশ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সমুদ্র পথ নিজ অধিকারে নেয় এবং উপকূলে অবস্থিত মুসলিম দেশগুলোকে সর্বশান্ত করে দেয়।

ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের পথ নিরাপদ করার পর বৃটিশ ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরকেও নিজেদের জন্য নিরাপদ করতে সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দিন থেকে ইরানে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বৃটিশের সাথে রাশিয়ার গোলযোগ চলে। অবশেষে ১৮০৭ সালে এক সন্ধির মাধ্যমে ইরানের উত্তরভাগ রাশিয়ার হাতে এবং দক্ষিণ ভাগ বৃটিশের হাতে ন্যস্ত হলে উপসাগরীয় অঞ্চলও ইংরেজদের জন্য নিরাপদ হয়ে যায়।[১৩৬] তারপর ১ম মহাযুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালের

---

১৩৩. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।
১৩৪. কে আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২।
১৩৫. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৯।
১৩৬. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।

ভার্সাই ও সেভার্সের চুক্তি অনুসারে আরব জগতের যে অংশটুকু অবশিষ্ট ছিল তন্মধ্যে বৃটিশ দখল করে নেয় ইরাক, প্যালেস্টাইন, ট্রান্স জর্ডান ও সৌদি আরব।[১৩৭] তাই দেখা যায় একটি ভূখণ্ড ভারতবর্ষের আধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে বৃটিশ ইংল্যান্ড থেকে ভারতে পৌছার সমুদ্র পথে অবস্থিত বহু মুসলিম দেশ এক এক করে দখল করে নেয় এবং নিজেদের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন করার অজুহাতে সে সব দেশীয় নিরীহ মুসলমানদের উপর শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালায়।

মুক্তি প্রচেষ্টা

এক

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে ভারতকে কংগ্রেসই স্বাধীন করেছে। এ ধারণা সর্বাংশে সঠিক নয়। কংগ্রেস গঠিত হওয়ার দীর্ঘ ৮২ বছর পূর্ব থেকেই ভারতে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২)-এর[১৩৮] বিপ্লবী চিন্তাচেতনায় অনুপ্রাণিত আলিমগণের

---

১৩৭. কে আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫ ; আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪।

১৩৮. হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস, দার্শনিক, মুজ্তাহিদ, রাজনীতিক, গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক। উপমহাদেশে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হযরত শাহ্ আবদুর রহীম। ১৫ বছর বয়সে তিনি পিতার নিকট কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৭ বছর বয়সে তরীকত শিক্ষা দানে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার মৃত্যুর (১৭৯১ খ্রি.) পর রহীমিয়া মাদ্রাসায় ১২ বছর অধ্যাপনা করেন। ১৭৩০ সালে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারায় গমণ করে তথাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৩২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় রহীমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। আমৃত্যু শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থেকে ১৭৬২ সালে ইন্তিকাল করেন এবং দিল্লীতে সমাহিত হন। তাঁর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তাধারা মুসলিম জাহানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলমানরা শরীঅত ও তরীকতের পাশাপাশি জগত ও জীবন তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে যুগোপযোগী গবেষণা ও চিন্তাভাবনার চেতনা লাভ করেন। শরীঅতের যাবতীয় বিধানের অন্তর্নিহিত দর্শন সম্বলিত তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। এ গ্রন্থে মানবতার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করা হয়েছে। 'ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা' গ্রন্থে তিনি খিলাফতে রাশিদাকে ইসলামের মূলনীতির উৎস বলে বর্ণনা করেন এবং ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে

নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ চলে আসে। তাঁদের ঐ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পর্বে (অর্থাৎ ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সালে) রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেস যে ভূমিকা রাখে সেটি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। উর্দু প্রবাদে আছে;

پیٹ آخری لقمہ سے نہیں بھرتے

পেট শুধু শেষ লোকমা দ্বারা ভরে না। তাতে পূর্ববর্তী লোকমাগুলোর অংশীদারিত্ব অনস্বীকার্য।

এ দিকের বিচারে ভারত স্বাধীন করার সকল কৃতিত্ব একমাত্র কংগ্রেসের এমনটি দাবী করা যায় না।[১৩৯] ১৮০৩ সালে লর্ড লেক মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লীর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে এক আদেশ জারী করে। ইংরেজদের ঐ আদেশটি ছিল;

خلقت خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا

সৃষ্টি আল্লাহর, সাম্রাজ্য সম্রাটের আর কর্তৃত্ব হবে ইংরেজ কোম্পানীর।

তখন দিল্লী থেকে তৎকালীন বিপ্লবী আলিমগণের অবিসংবাদিত নেতা সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয[১৪০](১৭৪৬-১৮২৩) ভারতবর্ষকে 'দারুল

ধরেন। (অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, **মওজে কাওসার**, লাহোর, ফীরোয এন্ড সন্স, ১৯৫৮, পৃ ৩৪৫-৩৪৬)

১৩৯. যিয়াউর রহমান ফারুকী, **স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামায়ে দেওবন্দ** (ঢাকা : আল হাসান সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ ১৩।

১৪০. হযরত শাহ্ আবদুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ, হাদীসবিদ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি দিল্লীর রহীমিয়া মাদ্রাসায় ৬০ বছর শিক্ষকতা করেন। মাদ্রাসাটি ছিল তাঁর পিতামহ হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর ন্যায় তিনিও কুরআনী নীতির আলোকে যথার্থ ইসলামী জীবন পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর (আংশিক) ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। 'বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন' ও 'তুহফায়ে ইস্না আশারিয়্যা' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শিক্ষকতা, ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সে যুগের ইসলামী চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি অনেক যোগ্য শাগিরদ তৈরী করেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর মতে, হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর শাগরিদদের দ্বারা যেখানে উপকৃত হয়েছে ১০ জন লোক সেখানে হযরত শাহ আবদুল আযীযের শাগরিদদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে ১০ হাজার লোক। (**শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ কী সিয়াসী তাহরীক**, পৃ ৬৪) হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ইসলাম বিরোধী

হর্‌ব' (শত্রুকবলিত দেশ) ফত্‌ওয়া দেন এবং মুসলমানদের জন্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ করা ফরয ঘোষণা করেন।[১৪১] বস্তুত তখন থেকে শুরু হয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্‌লবীর ঐতিহাসিক এই ফত্‌ওয়া 'ফাতাওয়া আযীযিয়্যা' গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।[১৪২] আলিমগণের নেতৃত্বে এ আন্দোলন যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে শায়খুল ইসলাম মাদানীর সময়ে এর পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি ঘটলে বিশ্ব মানচিত্রে ভারত ও পাকিস্তান নামে ২টি স্বাধীন ভূখণ্ডের অভ্যুদয় ঘটে।

বিপ্লবী আলিমগণের বিগত ১৪৪ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে ৪টি পর্বে বিভক্ত করা যায়। তন্মধ্যে ১ম পর্বে আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের 'মুজাহিদ আন্দোলন' (১২০৩-১৮৩১), ২য় পর্বে ক. সাদিকপুরী আলিমদের 'ওয়াহাবী আন্দোলন' (১৮৩১-১৯১৯) খ. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, গ. হযরত নানূতবী ও হযরত গাঙ্গূহীর 'দেওবন্দ আন্দোলন' (১৮৫৭-১৯০৮), ৩য় পর্বে হযরত শায়খুল হিন্দের 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' (১৯০৮-১৯২০) ও চূড়ান্ত পর্বে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর 'স্বাধীনতা আন্দোলন' (১৯২০-১৯৪৭)। উল্লেখ্য, উপরোক্ত নামগুলো ইংরেজ লেখকদের দেওয়া নাম। আলিমগণ শুধু 'স্বাধীনতা জিহাদ'-এর একই শিরোনামে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করেন। বিপ্লবীরা এই দীর্ঘ সময়ে সীমান্ত, থানাবন, লক্ষ্ণৌ ও ইয়াগিস্তানে মোট ৪ বার মহান মুক্তিযুদ্ধ করেন। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ[১৪৩]

শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা ও দর্শন পেশ করলেও তিনি এর সূচনা করে যেতে পারেন নি। এটি বাস্তবায়ন করার ভার পড়ে হযরত শাহ আবদুল আযীযের উপর। তিনি এ উদ্দেশ্য হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সামরিক ট্রেনিং দিয়ে প্রচার কার্যে প্রেরণ করেন এবং নিজে দিল্লীতে জিহাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন। তৎকালে ভারত উপমহাদেশে অবস্থিত হাদীসচর্চার এমন কোন কেন্দ্র ছিল না যেখানে হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের শাগিরদ পাওয়া যেত না। (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৭২, পৃ ১৫৫; সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ইদারায়ে ইহ্‌তিমামে দারুল উলূম, ১৯৯২, ১ম খণ্ড, পৃ ৯৪)

১৪১. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০; উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮।

১৪২. শাহ্ আবদুল আযীয, ফাতাওয়া আযীযিয়্যা (দিল্লী : মাতবায়ে মুজ্‌তবায়ী, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ ১৭।

১৪৩. হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মুসলিম ভারতের সংগ্রামী ধর্মীয় নেতা ও স্বাধীনতা জিহাদের বীর সেনাপতি। তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত রায়

(১৭৮৬-১৮৩১) ইঙ্গমিত্রদের সাথে ১২ টির বেশী যুদ্ধ করেন। তাঁর শাহাদতের পর সাদিকপুরী আলিমগণ ইংরেজ বাহিনীর সাথে সরাসরি যে সকল যুদ্ধ করেছিলেন, উইলিয়াম হান্টারের মতে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সেগুলোর সংখ্যা ছিল

বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাসানী বংশোদ্ভূত সায়্যিদ ছিলেন। পিতার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ ইরফান। বেরেলীতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। বাল্যকাল থেকে সৈনিকসুলভ কুচকাওয়াজ ও ক্রীড়াকলাপের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। লক্ষ্ণৌ থেকে বিদ্যার্জনের জন্য দিল্লী আসেন। সেখানে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র তদানিন্তন শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প কালেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন। শিক্ষা শেষে হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের নির্দেশে তিনি জিহাদের দিকে মনোযোগী হন। ১৮১০ সালে রাজপুতনায় যান এবং নওয়াব আমীর খানের সৈন্য বাহিনীতে ৭ বছর কাজ করেন। তারপর নিজের পীর হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের সাথে সাক্ষাৎ করে পুনরায় জাতির ধর্মীয় শিক্ষক ও সংস্কারকরূপে প্রচারমূলক পর্যটনে বের হন। মুসলমানদের তদানিন্তন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধঃপতনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন। কাজেই তিনি ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে কুসংস্কার বর্জন, চরিত্র সংশোধন, ইত্তিবায়ে শরীঅত ও সুন্নত এবং শুদ্ধ সরল ধর্ম পদ্ধতি গ্রহণের আন্দোলন চালাতে থাকেন। আরব দেশের 'ওয়াহ্হাবী' মতাদর্শের সাথে শির্ক ও বিদআতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের ক্ষেত্রে তাঁর মতাদর্শের অনেকটা মিল থাকলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ওয়াহ্হাবী ছিলেন না। ভারতবর্ষে শীঘ্রই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অগণিত মুসলমান তাঁর অনুসারী হয়। তিনি হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এটিই প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের মধ্যে হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল (শহীদ), হযরত মাওলানা আবদুল হাই ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ উল্লেখযোগ্য। ১৮২১ সালে তিনি কলিকাতা আসেন এবং সেখান থেকে হজ্জে গমন করেন। ১৮২৪ সালে ভারতে ফিরে এসে জিহাদের প্রস্তুতি নেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুরীদদেরকে অস্ত্র চালনার শিক্ষায়ও তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। ইংরেজ শক্তিকে বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। শিখরা ইংরেজদের মিত্র ছিল এবং ইংরেজকে নানাভাবে সহায়তা করত বিধায় তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাব থেকে শিখশক্তির নির্মূল সাধন। কাবুল ও কান্দাহারের শাসকগণ তাঁকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ১৮২৬ সালে তিনি উৎসাহী অনুচরদের বিরাট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পেশাওয়ার প্রবেশ করেন। কিন্তু ইয়ার মুহাম্মদ খান দুররানী ও দুররানীর আরেক ভ্রাতা দল ত্যাগের দরুন 'শায়দোর' যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। ১৮৩০ সালে পেশাওয়ার পুনর্দখলে সমর্থ হন কিন্তু দুররানী ভ্রাতৃদ্বয় ও স্থানীয় খানদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিরুৎসাহিত হয়ে কাশ্মীর গমনে মনস্থ করেন। কাশ্মীরের পথে শিখ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে তিনি ও শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল শাহাদত বরণ করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ ৯৬; বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৫৬-৫৫৭)

২০টির বেশী। ১৮৬০-এর পরেও সীমান্তে মুজাহিদদের যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু সেগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।[১৪৪]

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মানবতাবোধ, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। জিহাদের জন্য হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে তিনি যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন তাঁদের মধ্যেও ঐ মানসিকতার প্রতিফলন ছিল। দারুল হর্‌ব[১৪৫] সংক্রান্ত বিস্তারিত ফত্ওয়ার এক জায়গায় তিনি বলেন, এই শহরে (দিল্লী) ইমামুল মুসলিমীনের আদেশ কার্যকর হচ্ছে না। তদস্থলে ইংরেজ বড় বড় নেতার আদেশ নির্দ্বিধায় কার্যকর হচ্ছে। দেশটি দারুল কুফ্‌রে পরিণত হওয়ার কারণ হল যে, বর্তমানে দেশের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রজাদের লালন পালন, যাকাত, খেরাজ ও টেক্স উসূল করা, কাস্টম ডিউটি গ্রহণ করা, দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করা, মামলা-মোকদ্দমার বিচার ও রায় প্রদান, অপরাধীদের শাস্তি বিধান ইত্যাকার রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদী কর্তৃত্ব ইংরেজদেও হাতে চলে গিয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদিও ইংরেজরা ধর্মীয় কিছু কিছু কাজ যেমন জুমুআ, ঈদ, আযান, গরু জবাহ্ প্রভৃতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না, তাতে কি আছে? এ সব ধর্মীয় কাজের যেটি বুনিয়াদ সেটিই ইংরেজদের হাতে কুক্ষিগত ও নিগৃহীত হয়ে আছে। তারা নির্বিচারে বহু মসজিদ ভেঙ্গে দিচ্ছে। তাদের থেকে নিরাপত্তার পরওয়ানা অর্জন ব্যতিরেকে মুসলিম কিংবা হিন্দু কেউ দিল্লী কিংবা দিল্লীর উপকণ্ঠের কোথাও প্রবেশ করতে পারে না। শুজাউদ্দৌলা ও বেলায়েতী বেগমের ন্যায় দেশের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত খ্রিস্টানদের অনুমতি ছাড়া এখানে প্রবেশের

---

১৪৪. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪১; উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

১৪৫. কতিপয় ইসলামী আইনজ্ঞের মতে পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। দারুল হর্‌ব ও দারুল ইসলাম। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন সেটি দারুল ইসলাম আর যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন নয় সেটি মুসলিমদের দ্বারা বিজিত হওয়া পর্যন্ত দারুল হর্‌ব হিসেবে গণ্য। এ মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম জগতের মধ্যে মূলতঃ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। কোন কোন আইন বিশেষজ্ঞ এ মতের সহিত দ্বিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে শত্রুতামূলক কারণ ছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোভাব পোষণ ইসলাম পরিপন্থী । (আল কুরআন ২ : ১৯০; ২২ : ৩৯-৪০) কোন কোন মাযহাবের আলিমগণ দারুল হর্‌ব ও দারুল ইসলাম ব্যতীত তৃতীয় একটি দার-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেটি হল দারুস সুল্‌হ বা দারুল আহ্‌দ। যে দেশ মুসলিম শাসনাধীন নয় অথচ ইসলামের সাথে সে দেশের করদ সম্পর্ক বিদ্যমান, সে দেশকে দারুস সুল্‌হ বলা হয়। (মুহাম্মদ যফরুদ্দীন, ইসলাম কা নিযামে আমান, আযমগড়, ১৯৬৬; হায়দর যামান সিদ্দীকী, ইসলাম কা নযরিয়্যায়ে জিহাদ, লাহোর, ১৯৪৯, পৃ ১০৫)

সুযোগ নেই। খ্রিস্টানদের কর্তৃত্ব দিল্লী থেকে সুদূর কলিকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে আছে।[১৪৬]

উপরোক্ত উদ্বৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত শাহ্ আবদুল আযীয ইংরেজদের হাতে নিপীড়িত হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের বিষয়টিও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাছাড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারা তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মুক্তি কামনা করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর দৃষ্টিতে কোন ভূখণ্ড 'দারুল ইসলাম' বিবেচিত হওয়ার জন্য শুধু মুসলিম বসতি বিদ্যমান থাকা যথেষ্ট নয়। সেখানে মুসলমানরা সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারা এবং তাদের ধর্মীয় শিআর (প্রতীক)-এর সম্মান বজায় থাকাও জরুরী। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বোঝা যায় যে, যদি কোন ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে থাকে অথচ মুসলমানরাও সেই ক্ষমতার সাথে শরীক থাকেন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতীকের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হয় এমতাবস্থায় ঐ ভূখণ্ড 'দারুল ইসলাম' বলে গণ্য হবে এবং ঐ ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হবে।[১৪৭]

সীমান্ত থেকে গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 'রাজা হিন্দুরাও'কে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ যে চিঠি লিখেছিলেন তার আলোকেও দেখা যায় যে, স্বাধীনতা জিহাদের দ্বারা কোন সাম্প্রদায়িক রাজ্য কায়েম করা আলিমগণের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তিকে উৎখাত করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শৃংখলমুক্ত করা।[১৪৮] চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আপনি অবশ্যই অবগত যে, সাত সমুদ্রের অপর পাড় থেকে ভেসে আসা বেনিয়া দল ভারতে রাজত্বের আসন কেড়ে নিয়েছে। তারা দেশী বড় বড় আমীরদের নেতৃত্ব, প্রতাপশালী শাসকমণ্ডলীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে। দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে এতদিন যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন, তাঁরা ইংরেজদের

---

১৪৬. শাহ্ আবদুল আযীয, ফাতাওয়া আযীযিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭, ১০৫।

১৪৭. মাদানী, নক্শে হায়াত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৭।

১৪৮. এক প্রশ্নের জবাবে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্পষ্ট উত্তর দিয়ে বলেন, আমরা কোন ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আদৌ ইচ্ছুক নই। শিখদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করার কারণ হল যে, তারা আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর উৎপীড়ন করছে, আযানসহ ধর্মীয় বিভিন্ন কাজ পালনে বাধা দিচ্ছে। শিখরা যদি এখন কিংবা আমাদের বিজয়ের পরে উপরোক্ত নিপীড়ন পরিত্যাগ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন থাকবে না (মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী, সাওয়ানিহে আহমদী, পৃ ৭০)

মোকাবেলায় যখন একের পর এক যখন হাত গুটিয়ে নিয়েছেন তখন বাধ্য হয়ে আমরা কিছু দুর্বল ও অস্ত্রহীন লোককে সঙ্গে নিয়ে বুকে সাহস বেঁধে শত্রুর প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হয়েছি। আমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়্যতে বেরিয়ে এসেছি। আল্লাহর এ বান্দাদের উদ্দেশ্য কোন সম্পদ লাভ করা কিংবা রাজত্ব অর্জন করা ইত্যাদির কিছুই নয়। মাতৃভূমি ভারতকে বিদেশী দুশমনদের শৃংখল থেকে মুক্ত করে দেওয়া আমাদের মূলদায়িত্ব। তারপর দেশ পরিচালনার ভার দেশের যোগ্য লোকদের উপরই অর্পিত থাকবে। শাসকদের কাছে আমাদের কেবল এতটুকু দাবী থাকবে যে, তাঁরা যেন ইন্‌সাফের সাথে ইসলাম ও মানবতার কল্যাণ সাধন করেন এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেন।[১৪৯] এ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ নিজের সেনাবাহিনীতে হিন্দুদেরকেও অন্তর্ভুক্ত রাখেন। 'রাজপুত রাজারাম' নামক জনৈক হিন্দু তাঁর তোপখানার প্রধান দায়িত্বশীল ছিলেন।[১৫০]

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ১৮০৮ সালে হযরত শাহ্ আবদুল আযীয থেকে তরীকতের খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে মুজাহিদ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি প্রথমত নিজে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের দিকে মনোযোগ দেন। ১৮১৬ সালে হযরত শাহ্ আবদুল আযীয তাঁকে সিপাহসালার এবং হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ[১৫১] (১৭৭৮-১৮৩১) ও হযরত মাওলানা আবদুল হাই[১৫২] (মৃ.

---

১৪৯. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুসলমানূঁ কে তানায্যুল ছে দুন্য়া কো কিয়া নুক্সান পৌহ্চা, (লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম), পৃ ২৭৪-২৭৬।

১৫০. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২২।

১৫১. হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন ভারতবর্ষের ইসলামী সংস্কার আন্দোলন ও জিহাদের অন্যতম শীর্ষনেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করেন। তিনি হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পৌত্র ও হযরত শাহ আবদুল গনীর পুত্র। ১৭৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বহু মেধাবী ছাত্র অধ্যয়নের জন্য শাহ ওয়ালিউল্লাহর মাদ্রাসায় ভর্তি হত। ইসমাঈল শহীদ ঐ মাদ্রাসায় শৈশব থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর উস্তাদ ও মুর্শিদ ছিলেন তাঁরই পিতৃব্য বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আযীয। এই পিতৃব্যের নির্দেশেই তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদের সাথে মিলে স্বাধীনতার জিহাদে অবতীর্ণ হন। তিনি ইসলাম ধর্মে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ স্বাধীনতার বাণী প্রচারে দিল্লীতে আগমন করলে, তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর উস্তাদ শাগির্দ মিলিতভাবে দেশকে ইংরেজদের কবল থেকে স্বাধীন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। বালাকোটের যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে তাঁর একটি আঙ্গুল গুলিবিদ্ধ হয়। তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে পরদিন অগ্রগামী সৈন্যদের সাথে যোগদান করে প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে

১৮৩১)-কে প্রধান সহযোগী নিযুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দেন।[১৫৩] স্বাধীনতার লক্ষ্যে হযরত শাহ্ সাহেবের পদক্ষেপ ২টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে একটি বিভাগে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদকে প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অন্য বিভাগে তিনি নিজে দিল্লীতে বসে মানুষকে তালীম-তরবিয়্যত প্রদান, মন-মানসিকতার সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ দান ও সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করেন।[১৫৪] দিল্লীতে হযরত শাহ্ সাহেবের সহযোগিতায় ছিলেন হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিস দেহলবী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব, হযরত মাওলানা সদরুদ্দীন, হযরত মাওলানা রশীদুদ্দীন, হযরত মাওলানা ফয্লে হক খায়রাবাদী প্রমুখ। এদিকে সিপাহ্সালার সায়্যিদ আহমদ শহীদ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দ্বীন প্রচার,

---

যান। ঐ সময় তিনি কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদত বরণ করেন (মে.১৮৩১)। মুজাহিদ আন্দোলনে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের পরেই তাঁর স্মৃতি অমর হয়ে আছে। 'তাক্বিয়াতুল ঈমান', 'মানসাবে ইমামত', 'সিরাতুল মুস্তাকীম', 'তানবীরুল আয়নায়ন' তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁর সমাধি বালাকোটে অবস্থিত। (**সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬ ; **বাংলা বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৪)

১৫২. হযরত মাওলানা আবদুল হাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মীরাঠ জেলার বিশিষ্ট সায়্যিদ পরিবারের সদস্য। পিতার নাম হযরত মাওলানা হিবাতুল্লাহ। তাঁর পিতামহ মাওলানা নূরুল্লাহ হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও কর্মী ছিলেন। তিনি আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে একজন বিদগ্ধ আলিম, সুবক্তা ও জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। দিল্লী ও উত্তর ভারতের আমীর উমারার নজরেও তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু হযরত সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের সবকিছু স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে উৎসর্গ করেন। তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের মুরীদ ছিলেন। কিন্তু সত্য ভাষণে এত নির্ভীক ছিলেন যে, পীরকেও ছাড় দিতেন না। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বিবাহ করার পর একদা ফজ্‌র নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণে বিলম্ব হয়ে যায়। তাঁর তাক্‌বীরে উলা ছুটে গিয়েছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তোলেন। পীর নিজেও ছিলেন নিষ্ঠাবান। তাই অবিলম্বে নিজের ত্রুটি স্বীকার পূর্বক আর কখনো এমনটি ঘটবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের অন্যতম উপদেষ্টা। সীমান্ত এলাকায় স্বাধীন সরকার গঠিত হলে তিনি ঐ সরকারের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। বালাকোট যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। (সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী**, দিল্লী : কিতাবিস্তান এম ব্রাদার্স, ১৯৮৫, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭০-১৭৩)

১৫৩. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 'তাহরীকে দেওবন্দ' ২য় সং (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ ৬০।

১৫৪. প্রাগুক্ত।

স্বেচ্ছাসেবক গঠন ও সৈনিক সংগ্রহের কাজে মোট ৩ বার পরিভ্রমণ করেন।[১৫৫] রাজনৈতিক বৃহত্তর স্বার্থে তিনি প্রথম দিকে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শনে বিরত ছিলেন। তখন মুসলমানদের উপর ইংরেজের মিত্র রণজিৎ সিং-এর বিভিন্ন উৎপীড়ন প্রতিরোধ করাই সম্মুখে রাখা হয়েছিল। ফলে ইংরেজ সরকার তাঁর দাওয়াতী অভিযানে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারপর ১৮২৩ সালে তিনি কয়েক হাজার শিষ্যসহ হজ্জ পালন করে ফিরে আসার পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রচারণা আরম্ভ করলে তাদের টনক নড়ে উঠে।[১৫৬]

উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ শহীদের প্রচারাভিযানের প্রতি প্রথম দিকে ইংরেজ প্রশাসকদের কোন মনোযোগ ছিল না। তিনি নিজের শিষ্যদের নিয়ে আমাদের শাসিত বিভিন্ন সুবা সফর করেন। তিনি হাজার হাজার লোককে মুরীদ করেন। মুরীদদের মধ্যে রীতিমত গদি (দায়িত্ব) বণ্টন, ধর্মীয় ট্যাক্স উত্তোলন ও গোপনে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করে নেন। আমাদের ইংরেজ অফিসাররা তখন নিজেদের চারপাশে গড়ে উঠা ঐ ধর্মীয় (স্বাধীনতা) আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে শুধু খাজনা আদায়, কোর্ট প্রতিষ্ঠা ও সৈনিকদের প্যারেড করানোর কাজেই লিপ্ত ছিল। ফলে নিজেদের এহেন উদাসীনতার দরুন ১৮৩১ সালে তাদেরকে ভীষণ লজ্জাজনকভাবে সজাগ হতে হয়।[১৫৭]

হযরত শহীদের পক্ষে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা অসম্ভব ছিল বিধায় তিনি ইংরেজ কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থিত বর্তমান সীমান্ত প্রদেশকে যুদ্ধ পরিচালনার ঘাঁটি হিসেবে নির্বাচন করেন।[১৫৮] অনুকূল ভৌগলিক অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা লাভের দিক থেকে এ স্থানটি তাঁর দৃষ্টিতে অধিকতর উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল। তিনি সিন্ধু, কোয়েটা ও বেলুচের পথে ভারত থেকে স্বেচ্ছাসেবক, সৈন্য ও রসদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

ইয়াগিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে 'কূহেস্তানী' ও 'দুররানী' নামে স্বাধীনচেতা বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। এই মুসলমানগণ স্বভাবগতভাবে ছিলেন সাহসী ও যোদ্ধা। হযরত শহীদ তাদের সর্দারবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানের

---

১৫৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।

১৫৬. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৪।

১৫৭. উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

১৫৮. গোলাম রসূল মেহের, আবদুল জলীল অনূদিত, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১), পৃ ২০৫।

সাথে মিত্রতা স্থাপন করে সামরিক সহযোগিতার চুক্তি করেন।[১৫৯] সেই অনুসারে ১৮২৭ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর মুজাহিদ কাফেলা সীমান্তের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে পৌঁছে এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম 'প্রবাসী বিপ্লবী সরকার' গঠনপূর্বক মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন। তৎকালে পাঞ্জাবের শাসনদণ্ড ছিল উচ্চাভিলাষী ও ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত মিত্র রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯)-এর হাতে। ইংরেজ তাকে ঐ বিপ্লবীদের প্রতিরোধ করার কাজে ব্যবহার করে। রণজিৎ সিং ঈঙ্গমিত্রতা নীতির ভিত্তিতে 'অখিল শিখ রাষ্ট্র' গঠনের প্রয়াস পায়।[১৬০] দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতার সৈনিকদেরকে প্রথমত ইংরেজদের এই মিত্রের সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। আকোড়া, বাযার, হাযারা, হাড্ডু, যীদাহ, ফুলুড়া প্রভৃতি স্থানে শিখ সৈন্যদের সাথে মুজাহিদদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধগুলোতে প্রথম দিকে মুজাহিদদের ব্যাপক বিজয় সাধিত হলেও শেষ দিকে কতিপয় সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁদের পক্ষে শিখ ও ইংরেজের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোট যুদ্ধে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ নিজের বহু সঙ্গীসহ শাহাদত বরণ করেন।[১৬১]

বালাকোট যুদ্ধে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ শাহাদত বরণ করলেও গোটা ভারতে তিনি স্বাধীনতার এক অপ্রতিরোধ্য চেতনা বপন করে যান। তাঁর ব্যাপক প্রচার অভিযানের ফলে শহর-গ্রাম, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত,আলিম ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলে স্বাধীনতা জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন ও দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে উঠে। গ্রামের সাধারণ মহিলারা পর্যন্ত জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যহ গৃহে রান্না করার পূর্বে 'মুট চাউল' জমা রেখে জিহাদের ফান্ডে প্রদানের অভ্যাস করে নেয়। তাঁর সৈনিকদের জীবনধারা ছিল অত্যন্ত পূত ও পবিত্র। তাঁদের জীবনযাত্রায় ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় ঈমান, আমল, ইখ্‌লাস, ধৈর্য, অবিচলতা ও সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা প্রদর্শন ইত্যাদি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। উইলিয়াম হান্টারের মতে স্বাধীনতার জন্য তিনি যে আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেছেন বিগত ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত নেই। এই চেতনাই পরবর্তী ৫০ বছর ভারতে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড জিইয়ে রাখে।[১৬২] বাংলায় হযরত হাজী শরীঅত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ও হযরত

---

১৫৯. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

১৬০. ড.অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১।

১৬১. উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, নূরুদ্দীন আহমদ অনূদিত, **শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯), পৃ ৭৮।

১৬২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৭।

মাওলানা সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)[১৬৩] ছিলেন সেই ধারার মুজাহিদ। বালাকোট যুদ্ধের ঐ বছর (১৮৩১) বাংলায় নারিকেলবাড়িয়ার যুদ্ধে হযরত তিতুমীর শাহাদত বরণ করেন।[১৬৪] আলিমগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বালাকোটের পরেও অব্যাহত ছিল।

১৮৩১ সালের পর শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ২য় পর্ব। এ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল 'ওয়াহাবী আন্দোলন' (১৮৩১-১৯১৯), ১৮৫৭ সালের 'মহাবিদ্রোহ' ও 'দেওবন্দ আন্দোলন' (১৮৫৭-১৯০৮)। এগুলো মূলত মুজাহিদ আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। তাই বালাকোটের যুদ্ধকে প্রকৃত অর্থে ব্যর্থ বলা যায় না।

---

১৬৩. হযরত সায়্যিদ নিসার আলী তিতুমীর শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হাফিয, আলিম, মুজতাহিদ, শহীদ ও স্বকীয় জাতিসত্তা বিনাশ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর জন্ম ১৪ মাঘ, বাংলা ১১৮৮/১৭৮২ ইং, পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে। পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবিদা রোকায়্যা খাতুন। কথিত আছে, শৈশবকালে তিক্ত ঔষধের প্রতি আসক্তি ছিল বলে তাঁকে তিতা মিয়া ডাকা হত। এই তিতা মিয়াই পরবর্তীকালে 'শহীদ তিতুমীর' নামে পরিচিত হন। সায়্যিদ শাহাদত আলী ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট পূর্বপুরুষ। তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব থেকে তৎকালীন-বাংলায় আগমন করেন। তাঁর পুত্র সায়্যিদ আবদুল্লাহ শাহী দরবার কর্তৃক 'মীর ইনসাফ' উপাধিতে ভূষিত হন। তখন থেকে এই বংশ মীর সায়্যিদ হিসেবে পরিচিত। শহীদ তিতুমীর নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হাফিয হন। তারপর মাদ্রাসা শিক্ষার কিতাবাদি অধ্যয়ন শেষ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর প্রভূত দখল ছিল। ১৮২২ সালে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যান। সেখানে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিতুমীর তাঁর মুরীদ হন। কোন কোন লেখকের মতে তিনি ১৮২১/২২-এর দিকে কলিকাতায় হযরত সায়্যিদ আহমদের মুরীদ হন এবং মুরশিদের সাথে হজ্জে গমন করেন। মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যিয়ারতকালে মুর্শিদের খেলাফত প্রাপ্ত হন। একই সাথে সংস্কার অভিযান, উপমহাদেশের আযাদী সংগ্রাম ও জিহাদী প্রেরণাও লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে শিরক ও বিদ্আতের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালান এবং মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেন। (ড. আবদুল গফুর সিদ্দীকী, শহীদ তিতুমীর, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৭৫ বাংলা)

১৬৪. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃ ৮৬-৮৭।

(ক) বালাকোট বিপর্যয়ের ফলে মুজাহিদ বাহিনী আপাতত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। তাঁদের অনেকে সীমান্ত থেকে জন্মভূমি ভারতে ফিরে আসেন। অবশ্য মুজাহিদগণের একটি দল তখনও নিজেদের হিজরত বাতিল না করে নিকটস্থ নান্দিহার ও সিতানা দুর্গে সমবেত হন এবং মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।[১৬৫] প্রত্যাবর্তনকারীরা আন্দোলনকে নতুন চেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।[১৬৬] হযরত শহীদের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সান্নিধ্যের দরুন তাঁদের মনমস্তিষ্ক ছিল জিহাদ ও শাহাদতের আবেগে সদা উদ্বেলিত। সাংগঠনিক শৃংখলার অভাবে তাঁদের অবস্থান যদিও সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত ও পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল তবুও যিনি সেখানে অবস্থান করেছেন, সেখানে বসেই জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জিহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন। তখন শাহাদতপ্রাপ্ত এক সায়্যিদ আহমদ সহস্র সায়্যিদ আহমদে পরিণত হন। উইলিয়াম হান্টার বলেন, এ আন্দোলন তখন কোন নেতার বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং সায়্যিদ আহমদের মৃত্যুকেও তাঁর কর্মীরা আন্দোলন অব্যাহত রাখার একটি শক্ত উপকরণে পরিণত করে।[১৬৭]

---

১৬৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী**, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫: ইসলামের সমরনীতি অনুসারে শত্রুপক্ষের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর পশ্চাদপসরণ কিংবা রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা জায়িয নয়। তবে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করা কিংবা পরিস্থিতি অনুসারে নিজেদের অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়পূর্বক পুনরায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে পশ্চাদপসরণ জায়িয আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর সেটি কতই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (৮ ঃ ১৫-১৬)

১৬৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **তাহরীকে শায়খুল হিন্দ** (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.) পৃ ৫৪।

১৬৭. উইলিয়াম হান্টার, **হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪; Professor Afsaruddin. 'Muslim Society in Bangladesh' **Islam in Bangladesh Through Ages**, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।

হযরত সায়্যিদ আহমদের শাহাদতের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র একটির স্থলে ২টিতে পরিণত হয়। তন্মধ্যে একটি ছিল দিল্লীর রহীমিয়্যা মাদ্রাসায় আর অপরটি পাটনার সাদিকপুরে।[১৬৮] দিল্লী কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্বশীল হযরত শাহ্ আবদুল আযীয ইতোপূর্ব ১৮২৪ সালে ইন্‌তিকাল করলে তদস্থলে হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক[১৬৯] দায়িত্ব (১৮২৪-৪১) গ্রহণ করেন। বালাকোট বিপর্যয়ের পর শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক নিজ জামাতা হযরত মাওলানা সায়্যিদ নাসীরুদ্দীনকে ১৮৩৫ সালে পুনঃ জিহাদের জন্য প্রেরণ করেন। মাওলানা সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন মধ্য ভারতের রিওয়াড়ী, জয়পুর, টুংক, আজমীর ও যোধপুর হয়ে বহু মুজাহিদসহ ১৮৩৯ সালে সিতানা দুর্গে গিয়ে মিলিত হন। তিনি মাত্র ১ বছর মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানের সুযোগ পান। ১৮৪০ সালে সিতানা দুর্গেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।[১৭০]

কেন্দ্রদ্বয়ের মূল লক্ষ্য অভিন্ন হলেও উভয় কেন্দ্রের কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। দিল্লীতে প্রধানত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবোধের প্রচার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সাদিকপুরে হযরত শহীদের প্রবর্তিত মূলনীতি তথা জিহাদ, হিজ্‌রত ও মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটিই কর্মপন্থা হিসেবে বিবেচিত থাকে।[১৭১] এ

১৬৮. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

১৬৯. হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন দিল্লীর অবিসংবাদিত আলিম হযরত শাহ্ আবদুল আযীয-এর দৌহিত্র। তিনি হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের নিকট হাদীস অধ্যয়ন শেষে তাঁরই জীবদ্দশায় ২০ বছর হাদীসের অধ্যাপনা করেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয ইন্‌তিকালের সময় তাঁকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে গেলে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা অব্যাহত রাখেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরই পরিণামে শেষ জীবনে তাঁকে দিল্লী থেকে হিজরত করে মক্কা শরীফ চলে যেতে হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে তাঁর শাগির্‌দবৃন্দের অনেকে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মুফ্‌তী ইনায়েত আহমদ কাকূরী, মাওলানা আবদুল জলীল কুয়েলী, মুফ্‌তী সদ্‌রুদ্দীন আযুরদাহ, শাহ্ আবূ সাঈদ মুজাদ্দিদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তিনি জুন, ১৮৪৬ সালে মক্কা শরীফে ইন্‌তিকাল করেন। (ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ ১৭৩ ; সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫)

১৭০. শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, মওজে কাওসার (দিল্লী ঃ তাজ কোম্পানী, ১৯৯১), পৃ ৪২-৪৫।

১৭১. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

নীতির আলোকে সাদিকপুরী আলিমগণ যে বিশাল গোপন আন্দোলন গড়ে তোলেন ইংরেজ লেখকদের ভাষায় সেটি 'ওয়াহাবী আন্দোলন' [১৭২] নামে অভিহিত হয়।

সাদিকপুরী আলিমগণ লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, ইউপি, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাই-এর সুবিস্তৃত এলাকায় আন্দোলন সম্প্রসারিত ছিল। তাঁরা প্রত্যেক এলাকায় মারকায গঠন ও দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে গ্রামে গ্রামে জিহাদের প্রচারণা চালান। এভাবে স্বেচ্ছাসেবক, মুজাহিদ ও রসদ যোগাড় করে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সিতানা দুর্গে প্রেরণের কাজ করে। মুজাহিদরা মানুষকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত সুন্নত অনুসারে ইসলামের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির কাজে নিজের সবকিছু উৎসর্গিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজেদের সার্বিক নিরাপত্তার সুবিধার্থে তাঁরা নিজস্ব বহু পরিভাষা, সামরিক সংকেত, ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য ও কথাবার্তার সফল প্রচলন করেছিল।[১৭৩] ফলে ইংরেজ গোয়েন্দাদের জন্য মুজাহিদদের গোপন কার্যাবলীর বিবরণ উদ্ঘাটনে অনেক বেগ পেতে হয়।

---

১৭২. ওয়াহাবীদের লড়াই ভারতবর্ষের আদিতম এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইগুলোর অন্যতম। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ওয়াহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কোন ঐতিহাসিক রচনাতেই অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী এ মহান সংগ্রামকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। 'ওয়াহাবী' কথাটি একটি ভুল প্রয়োগ। অনেক মুসলমান (বিদ্আতপন্থীরা) এদের অমুসলমান বলে গণ্য করেন। আসলে ব্রিটিশরা নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদেরকে ওয়াহাবী ও অমুসলমান আখ্যা দিয়েছিল, যেভাবে তারা পরবর্তী কালে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কেও বলেছিল। ভারতীয় ওয়াহাবীদের প্রকৃত নাম ছিল 'তারীকায়ে মুহাম্মদিয়া'। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সায়্যিদ আহমদ বেরেলবী নামক রায় বেরেলীর একজন বিশিষ্ট সূফী। (শান্তিময় রায়, **ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান**, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৪, পৃ ৪-৫)

১৭৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **তাহরীকে শায়খুল হিন্দ**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬-৬০; নিরাপত্তা বা আত্মরক্ষার জন্য জিহাদে সংকেত ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা জায়িয। এটি মিথ্যার পর্যায়ভুক্ত নয়। হিজরতে গমনকালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফর সঙ্গী ছিলেন হযরত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু। একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী হিসেবে লোকেরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে চিনত। তাই পথিমধ্যে তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনার সাথে ইনি কে? আবূ বকর সিদ্দীক সমস্যা এড়ানোর জন্য দ্ব্যর্থবোধক শব্দে জবাব দিয়ে বলেছিলেন ((رجل يهديني السبيل)) অর্থাৎ ইনি আমাকে পথপ্রদর্শন কারী। লোকেরা মনে করল, কথাটির অর্থ মদীনা গমনের

আন্দোলনে সাদিকপুরীদের বিচক্ষণতা স্বীকার করে উইলিয়াম হান্টার বলেন, ষড়যন্ত্র (জিহাদ) কারীদের জন্য সবচেয়ে কষ্টসাধ্য কাজটি ছিল পাটনার প্রধান কেন্দ্র থেকে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সীমান্তের দুর্গে পৌছিয়ে দেওয়ার কাজ। তাদের সংকেতের ভাষায় পাটনার নাম ছিল 'ছোট গুদাম' আর সিতানার নাম ছিল 'বড় গুদাম'। একজন বাঙ্গালী ওয়াহাবী (মুজাহিদ)-এর পক্ষে পথিমধ্যে হাজারো অবাঞ্ছিত প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ছিল একান্ত স্বাভাবিক। কারণ তাদেরকে উত্তর পশ্চিম সুবা বা পাঞ্জাবের বিশাল এলাকা হয়ে প্রায় ২ হাজার মাইলের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হত। তাদের চেহারার বাহ্যতঃ অপরিচিতি প্রতিটি গ্রামে তাদের শারীরিক গঠন,আকৃতি-প্রকৃতি ও মুখের ভাষা ইত্যাদির কারণে ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আন্দোলনকারীরা এ কঠিন সমস্যাটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধান করে নেয়। বাংলা থেকে সিতানা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের সর্বত্র জামাআতখানা (উপকেন্দ্র) স্থাপন করা হয়। এগুলোর ব্যবস্থাপনা সচেতন ও নির্ভরযোগ্য মুরীদদের উপর অর্পিত থাকে। তাঁরা শেরশাহী ট্রাংক রোডের বিভিন্ন অংশের দায়-দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। ফলে সীমান্ত ক্যাম্পে গমনেচ্ছু প্রতিটি বিদ্রোহী মুজাহিদ বিভিন্ন সুবার বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌছে যেত। গমনেচ্ছুদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্যেক মনযিলে সে নিজের এমন কোন সহযোদ্ধা অবশ্যই পেয়ে যাবে যিনি তাকে পথের দিশা দান করবেন। পথিমধ্যে অবস্থিত জামাআতখানাগুলোর দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত থাকত তারা পেশায় বিভিন্ন পেশাজীবী হলেও ইংরেজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব পোষণে সকলেই ছিল অভিন্ন, অনড় ও আপোসহীন। স্থানীয় দায়িত্বশীল নির্বাচনে ওয়াহাবীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তাদের কোন একজন কর্মীকেও এমন পাওয়া যায়নি যাকে গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে

পথ প্রদর্শকারী অথচ তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আখিরাতের পথ প্রদর্শনকারী। ফিক্‌হের পরিভাষায় এটি 'তারীয' ও 'তাওরিয়া' নামে অভিহিত। বিশিষ্ট ফিক্‌হ গবেষক মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বলেন;

اَلتَّعْرِيْضُ فِي الْكَلَامِ مَا يَفْهَمُ بِهِ السَّامِعُ مُرَادَهٗ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيْحٍ وَالتَّوْرِيَةُ هِيَ أَنْ يُّرِيْدَ الْمُتَكَلِّمُ بِكَلَامِهٖ خِلَافَ ظَاهِرِهٖ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ فِي الْحَرْبِ "مَاتَ إِمَامُكُمْ" وَيَنْوِيْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ.

(কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হ, দেওবন্দ, আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১, পৃ ২৩১, ২৪১)

কিংবা ঘুষের টোপ দিয়ে নিজ নেতার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য প্রদানে সম্মত করা সম্ভব হয়েছিল।[১৭৪]

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের বিশিষ্ট শিষ্য ও খলীফা হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী ১৮৩১ থেকে এ আন্দোলন শুরু করেন। পাটনা কেন্দ্রে দীর্ঘকাল কাজ করার পর তিনি নিজে সিতানা গমন করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন।[১৭৫] ঐ দুর্গে হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীনের পর যাঁরা পর পর নেতৃত্ব দেন তাঁদের নাম; হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী (১৮৪০-৫২), হযরত মাওলানা ইনায়েত আলী (১৮৫২-৫৮), হযরত মাওলানা নূরুল্লাহ (১৮৫৮-৬০), হযরত মাওলানা মীর মাকসূদ আলী (১৮৬০-৬২), হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ (১৮৬২-১৯০২) ও হযরত মাওলানা আবদুল করীম (১৯০২-১৯) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এদের সকলে জন্মগতভাবে ছিলেন সাদিকপুরের অধিবাসী। সকলে জিহাদের জন্য সিতানায় হিজরত করেন। তারপর সেখানেই ইন্তিকাল করেন কিংবা শাহাদত বরণ করেন।[১৭৬] এদিকে হযরত মাওলানা বেলায়েত আলীর হিজরতের পর সাদিকপুরে স্থানীয় প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে যারা কাজ করেছেন, তাঁরা ছিলেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ ফরহাত হুসাইন (১৮৫০-৫৮), হযরত মাওলানা ইয়াহ্‌য়া আলী (১৮৫৮-৬৪), হযরত মাওলানা আহ্‌মদ উল্লাহ (১৮৬৪-৬৫), হযরত মাওলানা মুবারক আলী (১৮৬৫-৬৮) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান (১৮৬৮-৭০) রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র সায়্যিদ ফরহাত হুসাইন সাদিকপুরে ইন্তিকাল করেছেন। অবশিষ্ট সকলে পর্যায়ক্রমে আন্দামানে নির্বাসিত

---

১৭৪. উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫-১৩৬।

১৭৫. শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬-৪৭; Dr.Muin-ud-Uddin Ahmad Khan 'Muslim Renaissance in Bangladesh', **Islam in Bangladesh Through Ages,** প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫।

১৭৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬-৫৭; আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদগণের চরিত্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য :

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ শাহাদত বরণ করেছে আর কেউ রয়েছে প্রতিক্ষায়। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩ : ২৩)

হন।[১৭৭] ইংরেজ সরকারের কঠিন নিপীড়নের দরুন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসানের পর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসেবে কাউকে স্বনামে ঘোষণা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সাদিকপুরী আলিমগণের 'আন্ডার গ্রাউন্ড' আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইংরেজ গোয়েন্দা ১৯৫৮ সালে উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়। গাযান খান নামক সীমান্তের জনৈক সর্দার ইংরেজ থেকে ঘুষ গ্রহণে প্রলুব্ধ হয়ে এসব সংবাদ ফাঁস করে দেয়। ফলে ইংরেজ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধরপাকড় করে। তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়। অনেক বিপ্লবীকে ফাঁসি দেয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে কিংবা আন্দামানে নির্বাসন প্রদান করা হয়।[১৭৮] স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার আলিমগণের পবিত্র জিহাদী তৎপরতাকে সন্ত্রাস বলে এবং মুজাহিদগণকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয়। এই হীন লক্ষ্যে একদল নামধারী ভাড়াটে আলিমকে ভাড়া করে এনে সাদিকপুরী মুজাহিদগণকে 'ওয়াহাবী' ও 'কাফির' বলে ফত্ওয়া দেওয়ায় এবং নিজেরাও মুজাহিদগণের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একান্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নাম দিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। বস্তুত মক্কার ওয়াহাবীদের সাথে এ আন্দোলনের কোন সম্পর্কও ছিল না।[১৭৯]

ভারত থেকে হিজরতকারী মুজাহিদগণকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। অবশেষে ইংরেজ সীমান্তের মুজাহিদদের দমনের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। উইলিয়াম হান্টার সেই অভিযান সম্পর্কে বলেন, তাদের (মুজাহিদদের) দমন করার জন্য ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত আমরা পৃথক পৃথক ১৬ টি অভিযান চালাতে বাধ্য হই। এ সকল অভিযানে প্রেরিত আমাদের নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ৩৫- হাজারে গিয়ে পৌঁছে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত অভিযানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ টি আর প্রেরিত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০ হাজার। ১৮৬৩ সালের পরাজয়ের পর আমরা উপলব্ধি করি যে, মুজাহিদ ক্যাম্পের

---

১৭৭. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২-৯৪।
১৭৮. শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫-১৭।
১৭৯. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩১।

বিরুদ্ধে অভিযানের অর্থ হল জগতের ৩৫,০০০ তেজস্বী যোদ্ধার সম্মিলিত শক্তির[১৮০] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের দমনের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে এবং অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হয়রানী করে ও শাস্তি দেয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মামলা ছিল যথা, ষড়যন্ত্র মামলা আম্বালা ১৮৬৪, ষড়যন্ত্র মামলা পাটনা ১৮৬৫, ষড়যন্ত্র মামলা মালদহ্ ১৮৭০, ষড়যন্ত্র মামলা রাজমহল ১৮৭০ ও ষড়যন্ত্র মামলা পাটনা ১৮৭১।[১৮১] উপরোক্ত মামলাগুলোতে জড়িত করে ভারতের অসংখ্য মুজাহিদকে বাড়ী থেকে ধরে আনা হয়, তাঁদের জমাজমি ও বসতবাড়ী ক্রোক করা হয় এবং তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হযরত মাওলানা জাফর থানেশ্বরী নিজের কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, এটি ছিল এমন এক করুণ মুহূর্ত যে, কেউ যদি আমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণ দরদ প্রদর্শন করত কিংবা সামান্য কোন উপকারের চেষ্টা করত তাকেও গ্রেপ্তার করা হত। আমাদের শহরে বহু লোককে শুধু এই অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় যে, তাদের কাছে আমার কোন স্মৃতি কিংবা কোন জিনিস পাওয়া গিয়েছিল কিংবা আমার বাড়ীঘর ও জমাজমি নিলাম হওয়ার পর আমার অসহায় সন্তানদেরকে তারা নিজেদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল। পেশাওয়ার থেকে বাংলার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কোন ধনী বাঙ্গালী মুসলমান আলিম কিংবা নামাযীদের এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না যাকে অন্তত একবার হলেও পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে ইচ্ছামত উৎকোচ আদায় করেনি।[১৮২]

এ সকল নিপীড়নের দ্বারা কতটুকু সুফল পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে স্বয়ং হান্টারের মতামত বিবেচনা করা যায়। তিনি লিখেছেন, দেশীয় গাদ্দারদের (মুজাহিদদের) ষড়যন্ত্র মামলাগুলো অনুরূপ ব্যর্থ হয়েছে, যেভাবে ১৮৬৩ সালে তাদের প্রত্যাবর্তন করানোর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের পারস্পরিক বিবাদের কারণে কয়েক বছরের জন্য সীমান্তের উত্তেজনা ঠাণ্ডা থাকলেও আমাদের অধিকৃত এলাকার ভিতর তাদের প্রচারণা কার্যক্রম পূর্ববৎ অব্যাহত আছে। পূর্ব বাংলার প্রত্যেক জেলায় বিদ্রোহের আগুন দিন দিন বেড়ে চলছে। পাটনা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গঙ্গা নদীর দুই তীরে অবস্থিত মুসলমান কৃষকদের মধ্যে

---

১৮০. উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯, ৪৭।

১৮১. শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭।

১৮২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১-১১২ : দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫।

মুজাহিদ বাহিনীর জন্য সাপ্তাহিক চাঁদা ও সাহায্য প্রেরণ আজো একটি নিয়মিত অভ্যাস হয়ে আছে।[১৮৩]

(খ) ১৮৫৭ সালে ভারতে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সরকারী বিবরণে এটিকে নিছক 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলা হলেও বস্তুত এটি ছিল স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর সম্মিলিত সংগ্রাম। ব্যারাকপুরের সেনানিবাস থেকে বিদ্রোহ সূচিত হয়। তারপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে গোটা ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং আলিম-উলামা, হিন্দু, মুসলিম, রাজন্যবর্গ, জমিদার, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পণ্ডিতদের সকলে বিদ্রোহীদের দলে সমবেত হন। প্রায় এক বছর পর্যন্ত এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ডিজরেলী ভারতীয়দের এ অভ্যুত্থানকে মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। ড. মজুমদার এটিকে বৃটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করেছেন।[১৮৪] উল্লেখ্য, এ বিশাল অভ্যুত্থান কোন প্রকার পূর্ব পরিকল্পনা বা ক্ষেত্র প্রস্তুতি ব্যতিরেকে আপনা থেকেই ঘটে গিয়েছিল, এমন দাবী করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক। তবে প্রশ্ন হল, এই মহাবিপ্লবের সেই ক্ষেত্র কারা প্রস্তুত করেছিলেন, কখন এবং কিভাবে প্রস্তুত করেছিলেন ইতিহাসের এ অংশটি পরিষ্কার করে বলা হয় না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বালাকোট যুদ্ধের পর দিল্লী কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। এ কেন্দ্রের দায়িত্বশীল হযরত শাহ্ ইসহাক দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে আন্দোলন পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। সাদিকপুরীদের মত তাঁর আন্দোলনও ছিল গোপনীয় এবং লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে। পার্থক্য এতটুকু যে, সাদিকপুরীদের কার্যক্রম[১৮৫] দেরীতে হলেও গোয়েন্দারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়

১৮৩. উইলিয়াম হান্টার, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪; মঈনুদ্দীন আহমদ খানের মতে ওয়াহাবী আন্দোলনে বাংলা ও বিহারের মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ প্রভাবশালী ওয়াহাবী ছিলেন বাঙালী। (Muin-Ud-Din Ahmed Khan, **Selections from Bengal Government Records on Wahabi Trials** (1863-1870) Dacca. Asiatic Society of Pakistan. 1961, P. 66.)

১৮৪. ড. অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭০।

১৮৫. সাদিকপুরী জামাআতের কার্যক্রম সম্পর্কে মাওলানা সিন্ধী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাদিকপুরী জামাআতের বেশী ঝোঁক ছিল হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ ও হযরত মাওলানা শাহ্ ইসহাকের প্রতি। তবে দু'টো জামাআতই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এবং পরে শাহ্ আবদুল আযীয ও সায়্যিদ আহমদ শহীদের অনুসরণের ব্যাপারে একমত ছিল। অবশ্য

কিন্তু দিল্লী কেন্দ্রের কার্যক্রম গোয়েন্দাদের পক্ষে শেষ পর্যন্তও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইংরেজ সরকার হযরত শাহ্ ইসহাককে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখেছিল। বিষয়টি তাৎক্ষণিক অনুমান করে তিনি ১৮৪৪ সালে হিজরত করে মক্কা শরীফ চলে যান। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী বলেন, তখন বিভিন্ন দিক চিন্তা করে ৪ সদস্যের একটি বোর্ডের উপর নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। বোর্ডে ছিলেন হযরত মাওলানা মামলূক আলী[১৮৬], হযরত মাওলানা কুত্বুদ্দীন দেহলবী, হযরত মাওলানা মুযাফ্ফর

সাদিকপুরী জামাআত পরে যাহিরিয়্যা, ইয়ামানের যায়দী ও নজ্দের হাম্বলী মতাবলম্বীদের সাথে মেলামেশা করেছিল। ফলে তাঁরা হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং উভয় জামাআতের মতামত ও আদর্শের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। (উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮)।

১৮৬. হযরত মাওলানা মামলূক আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহ্ আবদুল আযীয (১৭৪৬-১৮২৪) এবং মাওলানা রশীদুদ্দীন (মৃ. ১৮৩৩)-এর নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী সরকারি কলেজের আরবী বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কলেজের বিভাগীয় প্রধান-এর দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি আরবী, ফিক্হ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সমকালীন আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা পাঠ্য তালিকাভূক্ত সকল গ্রন্থে তিনি অগাধ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট শাগিরদগণের মধ্যে মওলানা মুহাম্মদ মাযহার নানূতবী (মৃ. ১৮৮৫, অধ্যাপক, আগ্রা কলেজ), মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর নানূতবী (জ. ১৮৩১, অধ্যাপক, বেরেলী কলেজ), মাওলানা মুহাম্মদ আহ্সান নানূতবী (মৃ. ১৮৯৫, অধ্যাপক, বেনারস কলেজ), মাওলানা যুলফিকার আলী (মৃ. ১৯০৪, অধ্যাপক, বেনারস কলেজ ও ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব কলেজস), যিয়াউদ্দীন এল. এল. ডি. (অধ্যাপক, দিল্লী কলেজ), শামসুল উলামা মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ (মৃ. ১৯১০), পীরযাদা মুহাম্মদ হুসাইন (সেসন জজ), খাজা মুহাম্মদ শফী' (জজ), খান বাহাদুর নাসির আলী (মৃ. ১৯৩৩), মৌলবী করীমুদ্দীন পানিপথী (মৃ. ১৮৭৯), মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী (১৮৩২-১৮৮০), মাওলানা রশীদ আহ্মদ গাঙ্গূহী (১৮২৮-১৯০৫), স্যার সায়্যিদ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮), শামসুল উলামা নযীর আহ্মদ (মৃ. ১৯১২), শামসুল উলামা মৌলবী যাকাউল্লাহ (মৃ.-১৯১০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জণ্ডিসরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লীতে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬২)-এর পারিবারিক গোরস্তান 'মাহানদিয়ূন'-এ সমাধিস্থ হন। (এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন, 'উপমহাদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও আল্লামা নানূতবী," ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, একবিংশ সংখ্যা, ফেব্রু ১৯৮৫, পৃ ২৮৯)

হুসাইন কান্ধলবী ও হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদী।[১৮৭] এ আন্দোলনের সার্বিক কাজকর্মে দিল্লী কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা, মাশায়িখ, ছাত্র ও মুরীদদের ছাড়াও বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন মাওলানা আহ্‌মদ উল্লাহ মদ্রাজী, মাওলানা ফয্‌লে হক খায়রাবাদী, মৌলভী ইমাম বখ্‌শ সাহ্‌বায়ী, মুফতী সদ্‌রুদ্দীন, কাযী ফয়েয উল্লাহ দেহ্‌লবী, মাওলানা ফয়েয আহমদ বাদায়ূনী, সায়্যিদ মুবারক শাহ্ রামপুরী, মুফতী ইনায়েত আহ্‌মদ কাকূরী, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মক্কী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গূহী প্রমুখ।[১৮৮]

আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক ছিল যে, গোটা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতা বিমুক্ত ধর্মীয় চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাতে হিন্দুদের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণও যোগ দেয়। আন্দোলনে গোপনে ভারতীয় সিপাহীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া ভারতীয় সকল শ্রেণী ও সকল পেশাজীবীদের সচেতন লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। সমুদয় কার্যক্রমে প্রচণ্ড গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। সকল কাজ সাধারণত সংকেত ও ইঙ্গিতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। মহাবিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দাদের কাছে কিছু কিছু সংকেত (যেমন সিপাহীদের কাছে আলিম-উলামা, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদের অধিক যাতায়াত; স্তূপীকৃত চাপাতি রুটি হাতে হাতে ইউপি থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, দাকন ও বাংলায় পৌছানো; তাজা পদ্ম ফুল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হাতে হাতে পৌছিয়ে দেওয়া ইত্যাদি) ধরা পড়েছিল কিন্তু এ সংকেতগুলোর অর্থ কি, এগুলো কোথা থেকে আসে, কে বা কারা সরবরাহ করে এবং কেন সরবরাহ করে এ সবের কিছুই গোয়েন্দারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া এগুলো কোন মহা পরিকল্পনার প্রাথমিক মহড়া বলেও তারা অনুমান করতে পারেনি।[১৮৯]

বিপ্লবী আলিমগণ গোপনে আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করার পর দেশব্যাপী সকল মহল থেকে একসময়ে ও একযোগে মহাবিদ্রোহ তথা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত স্থির করে তা বাস্তবায়নের তারিখ হিসেবে ১৮৫৭ সালের ৩১মের দিনটি ধার্য করেন এবং সে অনুসারে অবশিষ্ট কাজ চূড়ান্ত করতে

---

১৮৭. মাওলানা মুশতাক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

১৮৮. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬০।

১৮৯. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮-৭৯।

থাকেন।[১৯০] ফলে দেশের সচেতন মহলের সর্বস্তরে বিদ্রোহের ক্ষেত্র ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে থাকে। ইত্যবসরে কলিকাতার ব্যারাকপুরে ২৯ মার্চ মঙ্গল পান্ডে নামক জনৈক সিপাহীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে হঠাৎ জ্বলে উঠে বিদ্রোহের আগুন এবং তা অনুকূল ক্ষেত্র পেয়ে দাবানলের আকারে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভারতে। হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী বলেন, নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২ মাস পূর্বে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডের হাতে এ আগুন জ্বলে উঠে। অথচ অন্যান্য স্থানে তখনো পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির কাজ চূড়ান্ত হয়নি। ফল দাঁড়াল যে, দিল্লীতে যথানিয়মে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বাংলার বিপ্লব প্রায় শেষ হয়ে যায়। তারপর পাঞ্জাবে বিপ্লব এমন সময়ে শুরু হল যখন ইংরেজ সরকার দিল্লী ও কানপুর পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে গিয়েছে। মদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদ তথা দক্ষিণ ভারতে তখন পর্যন্ত অনেক কাজই চূড়ান্ত হয়নি। তাই ঐ সকল সুবায় বিদ্রোহ ঘটে ছিল খুবই সামান্য। ইংরেজ ঐ সুবাগুলো সহজেই পুনরুদ্ধার করে ফেলে এবং সেখানকার সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতের দিকে প্রেরণের সুযোগ পেয়ে যায়। মোটকথা সময়ের পূর্বেই অসাবধানে যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য অপেক্ষা না করার কারণেই এই ব্যর্থতা ঘটে।[১৯১]

১৮৫৭ সালের এই স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপ্লবী আলিমগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মুসলমানরা ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক নিয়েও বিদ্রোহে যোগ দেয়। আমীরদের মধ্যে বেগম হযরত মহল, নওয়াব আযীমুল্লাহ খান, নওয়াব আবদুর রহমান খান, নওয়াব মুযাফ্ফরুদ্দৌলা, নওয়াব আমীর খান, নওয়াব আক্বর খান, নওয়াব আহ্মদ কুলী খান, কানপুরের নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী, জগদীশপুরের তাঁতিয়াতোপী, বিহারের কুন্ওয়ার সিং, রাজা নাহির সিং, রাজা অজিৎ সিং প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন।[১৯২] এ বিপ্লব একমাত্র স্বাধীনতার চেতনা নিয়েই সংঘটিত হয়েছিল। তাতে সাম্প্রদায়িক কোন সংকীর্ণতা ছিল না বলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ দিল্লীর দিকে ছুটে আসে এবং মোঘল শেষ প্রদীপ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ যুফারকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিপ্লব শুরু হয়ে গেলে মুজাহিদদের জন্য সাময়িক জটিলতা সৃষ্টি হলেও শীঘ্রই সকলে নেমে পড়েন মহান মুক্তিযুদ্ধে ।

---

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮।
১৯১. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৯।
১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৪।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মক্কীর[১৯৩] নেতৃত্বে থানাবনে মুজাহিদগণের 'বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার' গঠিত হয়। হযরত হাজী সাহেবকে 'আমীরুল মুমিনীন', হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীকে 'সিপাহসালার' ও হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীকে 'কাযীউল কুযাত' মনোনীত করা হয়। অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের এই বাহিনী থানাবন ও শামেলী প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধগুলোতে হযরত নানূতবী ও হযরত গাঙ্গূহী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং হযরত হাফিয যামিন শহীদ শাহাদত বরণ করেন।[১৯৪] এদিকে লক্ষ্ণৌতে মাওলানা আহমদ উল্লাহর নেতৃত্বে মুজাহিদদের শক্তিশালী ব্যূহ গড়ে উঠে। জেনারেল বখ্‌ত খান ও মৌলভী ফয়েয আহমদসহ বহু সিপাহী দিল্লীতে

---

১৯৩. হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুযাফ্‌ফর নগর জেলার অন্তর্গত থানাবন গ্রামে হি. ১২৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন ফারুকী। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব নানূতবী ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী তাঁর আত্মীয় ছিলেন। শৈশবে তিনি কুরআন মজীদ হিফ্‌য করেন এবং আরবী ও ফার্সী কিতাব মুন্সী আবদুর রায্‌যাক ও মুফ্‌তী ইলাহী বখ্‌শের নিকট অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া হয়নি। তবুও তিনি ছিলেন ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী। হযরত নানূতবী বলেন, হাজী সাহেবকে কেউ তাকওয়ার কারণে, কেউ কারামতের কারণে সম্মান করে। আর আমি তাঁকে সম্মান করি তাঁর 'আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলম'-এর কারণে। হযরত থানবী বলেন, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, হাজী সাহেবের কাছে এমন কি জিনিস আছে যা অন্যদের কাছে নেই। উত্তরে আমি বলি, আমাদের কাছে আছে যাহিরী ইল্‌ম আর হাজী সাহেবের কাছে রয়েছে বাতিনী (যা প্রকৃত) ইল্‌ম। হাজী ইমদাদুল্লাহ অতি শৈশব থেকে ইলমে তাসাওউফের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম তরীকায়ে নক্‌শবন্দীয়ার পীর হযরত শাহ্ নাসীরুদ্দীন দেহলবীর হাতে বায়আত হন। তাঁর ইন্তেকালের পর চিশতিয়্যা তরীকার পীর হযরত মিয়াঁজী নূর মোহাম্মদ ঝানঝানবীর কাছে মুরীদ হন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। কিন্তু ১ম বার হজ্জ করার পর যাবতীয় সম্পদ ছোট ভ্রাতাকে অর্পণ করে দিয়ে একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদতে মশগূল হন। তিনি কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর সফল আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে উপমহাদেশের বড় বড় উলামা তাঁর মুরীদ হতে থাকেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী প্রমুখ তাঁর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। হিজরী ১৩১৫ সালে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল মুআল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। (হাবীবুর রহমান, আমরা যাদের উত্তরসূরী, ঢাকা, আল কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ ৪৩-৪৮; মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২-৭৩)

১৯৪. আবদুর রশীদ আরশাদ, **বীস বড়ে মুসলমান** (লাহোর : মাকতাবায়ে রশীদিয়্যা, তা. বি.), পৃ ৯৪-৯৫।

পরিস্থিতির প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা করেন। নানা সাহেব পেশওয়া, মৌলভী আযীমুল্লাহ, শাহযাদা ফীরোয শাহ্ প্রমুখ মাওলানা আহমদ উল্লাহর সাথে যোগ দিয়ে লক্ষ্ণৌতে বিপ্লবী স্বাধীন সরকারের ঘোষণা দেন এবং প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহ্জাহান পুরের চূড়ান্ত যুদ্ধে এ বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ১৮৫৮ সালের ১৫ জুন জনৈক শিখ রাজার প্রপাগান্ডায় হযরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ শাহাদত বরণ করেন।[১৯৫]

মহাবিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরেজ পক্ষ চরমভাবে পরাজিত ছিল। কিন্তু শেষ দিকে ইউরোপীয় সেনাপতিদের কর্মদক্ষতা, শক্তিশালী সমরাস্ত্র, সরকারের সাথে শিখ ও নেপালী সৈন্যদের সহায়তা এবং দেশী একাধিক রাজন্যবর্গের সহযোগিতার দরুন ক্রমে স্বাধীনতাকামীদের পরাজয় ঘটে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, রোহিলাখন্ড ও মধ্য ভারত ইংরেজের পুনঃ দখলে চলে যায়। ৮ জুলাই পর্যন্ত বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল।

(গ) মহাবিদ্রোহের জের থেকে জন্ম নেয় দেওবন্দ আন্দোলন। কারণ মহাবিদ্রোহের জন্য সরকার প্রধানত মুসলমানদেরকে এবং বিশেষত আলিমগণকে দায়ী করে। তাই আলিমগণকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ফাঁসি দিয়ে হাটে-বাজারে ঝুলিয়ে রাখে। ঐতিহাসিক রহীমিয়্যা মাদ্রাসার ইট পর্যন্ত গুড়িয়ে দেয় এবং জায়গাটি জনৈক হিন্দুকে হস্তান্তর করে। দাড়ি টুপী বিশিষ্ট লোক মাত্রই পাকড়াও করে। আলিমদের পেছনে গোয়েন্দাদের লেলিয়ে দেয় এবং সন্ধানদাতাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করে।[১৯৬] এ পরিস্থিতিতে হযরত শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদী মুহাদ্দিস দেহলবী, হযরত মাওলানা রহমত উল্লাহ কীরানবী, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারূকী পবিত্র মক্কায় হিজরত করেন। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হলে হযরত গাঙ্গূহী কারারুদ্ধ হন। হযরত নানূতবী আত্মগোপন করেন। কিন্তু ৩ দিন পর নিজেই বের হয়ে যান। ইংরেজ বাহিনী অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। হযরত হাজী সাহেবের হিজরতকালে পথিমধ্যে ইংরেজ

---

১৯৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩১।

১৯৬. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৯; দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২০-১২১; সিপাহী বিদ্রোহে যদিও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু সমকালীন ইংরেজরা বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকাই বেশী মনে করেছিল। (Jawaharlal Nehru, **An Autobiography**, London, John the Bodley Head, First Published, 1936, p. 460)

গোয়েন্দা একাধিকবার তাঁর মুখোমুখি হয়। প্রত্যেকবারেই তিনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পান।[১৯৭]

মহাবিদ্রোহে ব্যর্থতার ফলে মুসলমানদের শেষ শক্তিটুকুও বিলীন হয়ে যায়। তখন ভারতবর্ষে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে পড়ে। বিষয়টি হযরত হাজী সাহেবকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তিনি মক্কা শরীফ হিজরত করলেও তাঁর সাথে হযরত নানূতবী[১৯৮] ও হযরত গাঙ্গূহীর

---

১৯৭. মুহাম্মদ আশিক ইলাহী মীরাঠী, তায্‌কিরাতুর রশীদ (সাহারানপুর : মাকতাবায়ে খলীলিয়্যা, ১৯৭৭), ১ম খণ্ড, পৃ ৭৭-৭৮।

১৯৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইউপির অন্তর্গত সাহারানপুর জেলার নানূতা গ্রামে ১২৪৮/১৮৩২ সনের শেষ ভাগে অথবা ১৮৩৩ সনের শুরুর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশপরম্পরা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু-এর সাথে যুক্ত। তাঁর তারীখী নাম খোরশেদ হুসাইন। পিতার নাম শায়খ আসাদ আলী সিদ্দীকী। এ বংশের অনেকেই ছিলেন ধর্ম বিষয়ে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন। তাঁদের মধ্যে তাঁরই পিতৃব্য আল্লামা মামলূক আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অনেক প্রসিদ্ধ আলিমের উস্তাদ। মাওলানা নানূতবী প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর দিল্লী সরকারি কলেজের আরবী বিভাগের অধ্যক্ষ মাওলানা মামলূক আলী (মৃ. ১৮৫১)-এর নিকট আরবী অধ্যয়ন করেন। এক বছর পর মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীও সেখানে উপস্থিত হন। কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়নের পর গাঙ্গূহী ও নানূতবী উভয়ে সহপাঠীরূপে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে উভয়ে মুসলিম বিশ্বের সেরা আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। হযরত নানূতবী সিহাহ্ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন হযরত শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদী মুহাদ্দিস দেহলবী (মৃ. ১৮৭৮) এবং হযরত মাওলানা আহমদ আলী মুহাদ্দিস সাহারানপুরী (মৃ.১৮৭৯)-এর শাগিরদরূপে। তিনি ১২৬৭/১৮৫১ সালে গ্রন্থ সম্পাদনা ও টীকা রচনার কাজে দিল্লীর আহ্‌মদিয়া মুদ্রণালয়ে যোগদান করেন। হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রচিত সহীহ বুখারীর টিকা প্রস্তুতিতে তাঁকে সহযোগিতা করেন এবং নিজে সহীহ বুখারীর শেষ ৫ পারার টিকা রচনা করেন। এ অধ্যায়গুলোর বিভিন্ন স্থানে ইমাম বুখারী হানাফী ফিক্‌হ ও হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমতের সমালোচনা করেন। মাওলানা নানূতবী বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে ইমাম বুখারীর অভিযোগ খণ্ডন করেন। হযরত নানূতবীর তাক্‌ওয়া সম্পর্কে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহজিরে মক্কী বলেন, তাঁর যুহ্দ ও তাক্‌ওয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুলভ হলেও এ যুগে দুর্লভ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে তিনি আলিমদের মুজাহিদ দল থেকে সিপাহসালার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় (৩০মে ১৮৬৬)। তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের মুনাযির। খ্রিস্টান পাদ্রী ও হিন্দু আর্য সমাজীদের সাথে তাঁর একাধিক মুনাযারা হয়। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। হিন্দুদের পক্ষে পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী, মুন্সী আন্দ্রমন এবং খ্রিষ্টানদের পক্ষে নভেলস, ইসকাট ও

যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। পরিস্থিতি অনুসারে বিপ্লবীদের অবশিষ্ট আলিমগণ তখন ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা তথা হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর প্রবর্তিত সংস্কারমূলক চিন্তা-চেতনার ধারাবাহিকতা জীবন্ত রাখা এবং ঐ চিন্তা-চেতনার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধনপূর্বক পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে 'কাওমী মাদ্রাসা' নামে ধর্মীয় শিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি চালু করেন। হযরত নানূতবী এ শিক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ 'ইল্‌হামী শিক্ষা পদ্ধতি' বলে অভিহিত করেছেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৬৬ সালের ৩০মে স্থাপিত হয় ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ। হযরত নানূতবী এ মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর সহযোগিতা করেন কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গূহী।[১৯৯]

ওয়াকরো প্রমুখের সাথে তাঁর মুনাযারা হয়েছিল। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। ১৫ এপ্রিল, ১৮৮০ সালে তাঁর ইন্তিকাল হয়। (সায়্যিদ মানাযির আহসান গীলানী, **সাওয়ানিহে কাসিমী**, দেওবন্দ, হি. ১৩৭৩ ; মুফতী আযীযুর রহমান, **তাযকিরায়ে মাশায়িখে দেওবন্দ**, করাচী, ১৯৬৪, পৃ ১২৭-১৫১ ; **বাংলা বিশ্বকোষ**, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ ৯৯ ; হাকীম আবদুল হাই, **নুযহাতুল খাওয়াতির**, হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মাআরিফ উসমানিয়্যা, ৭ম খণ্ড, পৃ ৩৮৩)

১৯৯. হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৮২৯ সালে সাহারানপুর জেলার গাঙ্গূহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশধারা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী রাযিআল্লাহু আনহু-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা হিদায়াত আহমদ তৎকালের বিশিষ্ট বুযর্গ শায়খ গোলাম আলীর খলীফা ছিলেন। মাওলানা গাঙ্গূহী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৭ বছর বয়সে দিল্লী গমন করেন। সেখানে কাযী আহমদ উল্লাহ পাঞ্জাবীর নিকট কিছুদিন অধ্যয়নের পর হিজরী ১২৬১ সালে হযরত মাওলানা মামলূক আলীর নিকট উপস্থিত হন। এখানে আরবী সাহিত্য, মানতিক ও হিকমতের কিতাব সম্পন্ন করে হাদীস অধ্যয়ন করেন হযরত শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদীর নিকট। এভাবে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি ইলমে যাহিরীর পূর্ণতা অর্জন করেন। অতঃপর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর নিকট মুরীদ হন। মাত্র ৪০ দিন রিয়াযত করেই খেলাফত প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবে 'কাযীউল কুযাতের' দায়িত্ব পালন করেন। বিপ্লবের কারণে তাঁকে ইংরেজদের জেলখানায় ৬ মাস দণ্ড ভোগ করতে হয়। তিনি নিজ গ্রাম গাঙ্গূহে ইল্‌মে হাদীসের দরস দান করেন। তাঁর দরসী তাকরীর সংকলিত করে হযরত মাওলানা ইয়াহ্‌য়া কান্ধলবী আরবীতে সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'লামিউদ্ দারারী' রচনা করেন। মাওলানা গাঙ্গূহী উচ্চমানের ফকীহ ও মুজ্‌তাহিদ ছিলেন। তাঁর রচিত 'ফাতাওয়া রশীদিয়্যা' গ্রন্থকে হানাফী ফিক্‌হের বিশ্বকোষ বলা চলে। মাওলানা নানূতবীর ইন্‌তিকালের পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। তিনি ১২ আগস্ট ১৯০৮ সালে ইন্‌তিকাল করেন। (নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও **ইতিহাস**, চতুর্থ মুদ্রণ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২, পৃ ১৬৯; নূরুর রহমান, **তায্‌কিরাতুল**

এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদেরকে মন-মানসিকতার দিক থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদসহ সর্বপ্রকার বাতিলের বিরুদ্ধে সচেতন করা ও প্রতিকারের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সৈনিক রূপে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।[২০০] এ লক্ষ্যে মাদ্রাসার যাবতীয় কার্যক্রম ইংরেজ সরকারের ন্যূনতম ছোঁয়া বা স্পর্শ থেকেও মুক্ত রাখা হয়। হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান[২০১] ছিলেন সেই

আওলিয়া, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭, পৃ ৩২৪, হাকীম আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ ১৪৯-১৫১)

২০০. ড.বদিউজ্জমান, ইসমাঈল হোসেন শিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ ১৫।

২০১. হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৬৮/১৮৫১ সালে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা যুলফিকার আলী ছিলেন বেরেলীর শিক্ষা বিভাগের সরকারী ডেপুটি ইন্সপেক্টর। তিনি শৈশবে মিয়াঁজী মঙ্গলূরীর নিকট কুরআন মজীদ ও মিয়াঁজী আবদুল লতীফের নিকট ফারসীর প্রাথমিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। তারপর মাধ্যমিক পর্যায়ের কিতাবপত্র অধ্যয়ন করেন তাঁরই পিতৃব্য মাওলানা মাহ্‌তাব আলীর নিকট। এ সময় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে চলে যান। তিনি ছিলেন দারুল উলূমের প্রথম শিক্ষার্থী। আর যিনি তাঁর প্রথম পাঠ প্রদান করেন তিনি ছিলেন মাওলানা মোল্লা মাহমূদ। তিনি ঐ মাদ্রাসার সদ্‌রুল মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানূতবীর নিকটও অধ্যয়ন করেন। ১২৮৬ হি. সালে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর নিকট সিহাহ্-সিত্তাহ ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ১২৮৯ হিজরীতে দারুল উলূমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপর পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি লাভ করে ১৩০৫ হিজরীতে সদ্‌র মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রগামী ছিলেন। ভারত, মক্কা, মদীনা, মাওসিল, বসরা, বলখ, বুখারা, হিরাত, কান্দাহার, কাবুল ও তুরস্ক থেকে আগত বহু শিক্ষার্থী তাঁর নিকট অধ্যয়ন করে। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর অধ্যাপনা করেন। তা ছাড়া মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারাও হাদীসের পাঠ দান করেন। তাঁর শাগিরদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মুফ্‌তী কিফায়েতুল্লাহ দেহলবী, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শায়খুল হিন্দ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ও হযরত গাঙ্গূহী থেকে তরীকতের খেলাফত প্রাপ্ত হন। মাওলানা কাসিম নানূতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর সংস্পর্শ থেকে তিনি যাহিরী ও বাতিনী ইল্‌মের পাশাপাশি জিহাদী প্রেরণাও লাভ করেন। এই প্রেরণাই পরবর্তী জীবনে তাঁকে রেশমী রুমাল আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। হযরত গাঙ্গূহীর ইন্তিকালের পর তাঁর আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের কারণেই তাঁকে মাল্টায় ৩ বছর ২ মাস কারাবরণ

উদ্যোগের সর্বপ্রথম ফসল, যিনি উত্তরকালে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক রেশমী রুমাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কাওমী মাদ্রাসা বিস্তার শীর্ষক নতুন আন্দোলনে হযরত নানূতবী ১৮৮০ সালে ওফাত পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন। তাঁর জীবদ্দশায় দেওবন্দ ছাড়াও আরো কয়েকটি মাদ্রাসা গড়ে উঠে।[২০২] হযরত নানূতবীর ওফাতের পর নেতৃত্ব দেন কুত্বুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গূহী। ১৯০৮ সালে তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ আন্দোলন আরো ব্যাপকভাবে উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে।[২০৩] দারুল উলূম দেওবন্দের উপরোক্ত প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের অবদান সম্পর্কে হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব বলেন, হযরত নানূতবী এ শিক্ষা পদ্ধতির মৌল কাঠামো নির্ধারণ করেছেন এবং আন্দোলনের উসূল ও মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। আর হযরত গাঙ্গূহী ঐ কাঠামোকে সকল দিক থেকে সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন করেছেন। উভয় প্রতিষ্ঠাতার যুগপৎ প্রচেষ্টার ফলে দেওবন্দ আন্দোলন যাহিরী ও বাতিনী উভয় দিকের পরিপূর্ণতা অর্জন করে।[২০৪]

দেওবন্দ আন্দোলনের গুণগত দিক পর্যালোচনা করে হযরত শায়খুল হিন্দ বলেন, তখন দারুল উলূমকে দিনের বেলা দেখা যেত একটি 'মাদ্রাসা' যেখানে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূল ও আকাইদ বিষয়ক ইলমে যাহিরীর শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আর রাতের বেলা মনে হত একটি 'খানকা' যেখানে যিক্র-আযকার, রিয়াযত ও মুজাহাদার মাধ্যমে তাযাকিয়্যায়ে নাফস ও ইলমে বাতিনের প্রশিক্ষণ

করতে হয়। মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে 'শায়খুল হিন্দ' উপাধি দেওয়া হয়। এ উপাধিতে তিনি অদ্যাবধি পরিচিত। তিনি ৩০ নভেম্বর ১৯২০ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। দেওবন্দের মাকবারায়ে কাসিমীতে তাঁর প্রাণপ্রিয় শিক্ষক মাওলানা কাসিম নানূতবীর সমাধির পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। (মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন, হায়াতে শায়খুল হিন্দ, লাহোর, ১৯৭৭, পৃ ১৭-২৫, ৩০-৩৩, ৪০-৮৩, ১৮০-১৯৯; মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, করাচী, ১৯৭২, পৃ ৫৫-৫৬; মাওলানা আবদুল হাই, নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮ম খণ্ড, হায়দ্রাবাদ, ১৯৭০, পৃ ৪৬৫-৪৬৯)

২০২. আসীর আদরবী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী হায়াত আওর কারানামে (দেওবন্দ ঃ শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ ১৫২-১৫৯।

২০৩. ড.নাফীস উদ্দীন সিদ্দীকী, "সারপুরস্ত দারুল উলূম দেওবন্দ" মাসিক আর্ রশীদ (লাহোর ঃ জামিয়া রশীদিয়্যা সাহীওয়াল, ফেব্রু- মার্চ, ১৯৭৬, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা), পৃ ২৭১-২৮০।

২০৪. মাওলানা মুশতাক আহমদ ঃ তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯।

চলছে। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষতম ব্যক্তিত্ব থেকে নিম্নতম পাহারাদার পর্যন্ত সকলেই ছিল অন্যতম অন্তরালোক সম্পন্ন বুযর্গ ব্যক্তিত্ব।[২০৫]

নতুন এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপ্লব ও স্বাধীনতার চেতনা সম্প্রসারিত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল বিধায় এখান থেকে এমন উলামা সৃষ্টি হন যারা পরবর্তীকালে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকা সমুন্নত রাখতে পুনরায় দেশবাসীকে সংগঠিত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক রেশমী রুমাল আন্দোলন, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

তিন

ভারত উপমহাদেশে আলিমগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৩য় পর্বে ছিল ঐতিহাসিক 'রেশমী রুমাল আন্দোলন'। রাওল্যাট কমিটির রিপোর্টে এ আন্দোলনের নেতা ভুলক্রমে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এর নেতা ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (১৮৫১-১৯২০)। ১৯০৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে তিনি এ আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একযোগে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সৃষ্টি ও বহির্দেশীয় আক্রমণের দ্বারা বিপ্লব সম্পাদনের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল থেকে মুক্ত করা। এতদউদ্দেশ্যে তিনি গোপন 'বিপ্লবী দল' গঠন করেন এবং

---

২০৫. একাডেমিক দিক থেকে দারুল উলূমের চিন্তাধারা ও আদর্শের পরিচয় দিয়ে হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব বলেন :

دینًا مسلم ، فرقةً أهل السنة والجماعة ، مذهبًا حنفی ،
مشربًا صوفی ، کلامًا أشعری و ماتریدی ، سلوکًا
چشتی ونقشبندی ، فکرًا ولی اللهی ، أصولًا قاسمی ،
فروعًا رشیدی ، اجتماعیةً محمودی أور نسبةً دیوبندی هے

(উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনী রুখ আওর মাসলকী মিযাজ, দেওবন্দ, মাকতাবায়ে মিল্লাত, পৃ ১৯৩)।

দেশের ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[২০৬]

ইতোপূর্বে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত হওয়ায় ভারতে আইনসম্মত রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হলেও এর গতি ছিল খুবই মন্থর। অথচ পাশাপাশি ঐ সময়ে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শাসন সুদৃঢ় রাখার জন্য ইংরেজরা যে সকল প্রপাগান্ডা চালিয়ে গিয়েছিল সেগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী শক্তিশালী।[২০৭] ১৮৯৯ সালে বড়লাট কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ভারতে পৌছেই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দু-মুসলিমের দ্বন্ধ লাগিয়ে দেয়। ১৯০০ সালে ইউপিতে কৌশলে উর্দু ও নাগরী (হিন্দী) বিরোধের অবতারণা করা হয়। ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' ও 'হিন্দু মহাসভা' নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের জন্ম দেওয়া হয়। তারপর কানপুর মসজিদকে কেন্দ্র করে গোলযোগের সৃষ্টি ও কলিকাতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবমাননাকর কথা তুলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও কলহ বাধিয়ে দিয়ে ইচ্ছামত উসকানো হয়। অনুরূপে মুসলিম খেলাফতের প্রতিনিধিত্বকারী তুরস্কের উপর আরোপিত হয় ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের সম্মিলিত কূটনৈতিক নিপীড়ন। এশিয়ার প্রধান শক্তি তুরস্ককে শতধা বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে একের পর এক চালিয়ে যেতে থাকে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র। নিজ জন্মভূমি ভারতে ও বহির্বিশ্বে এ সব পরিস্থিতি দেখে শায়খুল হিন্দের মন-মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল বলে তিনি উপরোক্ত বিপ্লবী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[২০৮]

---

২০৬. **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭: রাউল্যাট সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, Obeidullah is converted Shikh and had been trained as a Maulvi in the Muslim religious school at Deoband in the Saharanpur District of the United Provinces. There he infected some of the staff and students with his own militant and anti-British ideas. and the principal person whom he influenced was Maulana Mahmud Hassan, who had long been head Maulvi in the school. Obeidullah wished to spread over India a Pan-Islamic and anti British Movement through the agency of Maulvis Trained in the famous Deoband School. (**Rowlatt Sedition Committee Report**, 1918. Chapter XIV, pp. 125.)

২০৭. মাদানী, **নকশে হায়াত**, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫০।

২০৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫১।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি নিজের প্রধান সহযোগী হিসেবে বিশ্বস্ত শাগিরদ হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী[২০৯] (১৮৭২-১৯৪৪) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ ওরফে মনসূর আনসারী[২১০](মৃ. ১৯৪৬)কে মনোনীত

---

২০৯. ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০ মার্চ, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত মিয়াঁওয়ালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাম সিং ও পিতামহের নাম জসপৎ রায়। ৬ বছর বয়সে তিনি উর্দু মডেল স্কুলে লেখা পড়া আরম্ভ করেন। ১২ বছর বয়সে 'তুহফাতুল হিন্দ', 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ও 'আহওয়ালুল আখিরাত' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৫ আগস্ট ১৮৮৭ সালে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি মাওলানা আবদুল কাদির ও মাওলানা খোদা বখ্শের নিকট আরবী প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়ন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮৮৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন। ১৮৮৯ সালে শায়খুল হিন্দের নিকট জামি তিরমিযী অধ্যয়ন করেন এবং পরে হযরত গাঙ্গূহীর নিকট সুনান আবূ দাউদ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা সিন্ধী ছিলেন প্রগতিবাদী শ্রেষ্ঠ আলিম, বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী রাজনৈতিক চিন্তানায়ক, বিশিষ্ট সংগঠক, উৎসর্গিত প্রাণ শিক্ষক, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর রচনাবলীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ও তাঁর চিন্তাধারার একনিষ্ঠ প্রচারক। তিনি ছিলেন ইংরেজ রাজত্বের ঘোর দুশমন এবং শায়খুল হিন্দ গঠিত বিপ্লবীদলের উৎসর্গিত দুঃসাহসী কর্মী। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে তিনি কাবুল গিয়েছিলেন। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি আর দেশে ফিরেননি। ৭ বছর পর কাবুল ত্যাগ করেন। তারপর মস্কোতে ৭ মাস, আংকারায় ৩ বছর ও মক্কা শরীফে ১২ বছর অবস্থানের পর ১৯৩৯ সালে করাচীতে আগমন করেন। সিন্ধী ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র দর্শনের বিশেষজ্ঞ। এ দর্শন চর্চার জন্য তিনি দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়ায় 'বায়তুল হিকমত' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লাহোরে 'সিন্ধ সাগর একাডেমী' এবং সিন্ধুতে 'মুহাম্মদ কাসিম ওয়ালিউল্লাহ থিয়োলজিক্যাল কলেজ' স্থাপন করেন। তাঁর রচিত 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক', 'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকা ফালসাফা' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ। ১৯৪৪ সালের ২১ আগস্ট তিনি ইন্তিকাল করেন। (মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, ঢাকা, চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, ১৯৯২; সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫)

২১০. হযরত মাওলানা মনসূর আনসারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মূল নাম মুহাম্মদ মিয়াঁ আনসারী। তিনি ছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর দৌহিত্র এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রধান মাওলানা আবদুল্লাহ আনসারীর পুত্র। সাহারানপুর জেলার ইটা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তিনি গালাওঠীর মানবাউল উলূম মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর হিজরী ১৩২১ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে কিছুদিন পর্যন্ত আজমীরের দারুল উলূম মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর শায়খুল হিন্দের নিকট এসে তরজমা কুরআনের কাজে সহযোগীর দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়

করেন। তাছাড়া দারুল উলূম থেকে প্রতি বছর যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন শেষ করে বের হত, তিনি তাদের সচেতন ও মেধাবীদেরকে এ কাজের সাথে সংযুক্ত করে নেন।[২১১] তিনি নবীন আলিমদের রীতিমত জিহাদের বায়আত করেন[২১২] এবং ভারত ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা ও অতি সন্তর্পণে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে পরিকল্পিতভাবে প্রেরণ করেন। এ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীতে ডাক্তার মুখ্‌তার আহমদ আনসারী,[২১৩] হাকীম আবদুর রায্‌যাক; সীমান্তে খান আবদুল গাফ্‌ফার খান

তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সাথে যোগ দেন এবং 'জমইয়তুল আনসার'-এর সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। হযরত শায়খুল হিন্দের সাথে তিনিও মক্কা শরীফ গমন করেছিলেন। শায়খুল হিন্দ বন্দী হওয়ার পূর্বেই তিনি 'গালিব নামা' নিয়ে ভারতে চলে আসেন। ইতোপূর্বে রেশমী রুমাল পত্র বৃটিশ সরকারের হস্তগত হলে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তিনি আত্মগোপন করে ইয়াগিস্তানের স্বাধীন এলাকায় চলে যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর কাবুল পৌঁছে 'গালিব নামা' প্রচার করেন। আমীর হাবীবুল্লাহ খানের শাসনামলের শেষ দিকে বৃটিশের নির্দেশে তিনি পুনরায় ইয়াগিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তবে আমীর আমানুল্লাহ খানের আমলে পুনরায় কাবুল আগমন করলে তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার দরুন কাবুল সরকার তাঁকে বিভিন্ন বড় বড় পদে নিয়োগ করেন। রাজনীতি ও ইসলামী প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর রচিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। শেষ বয়সে তিনি আফগানিস্তানের জালালাবাদে বসবাস করেন এবং সেখানেই ১১ জানুয়ারি ১৯৪৬ সালে ইন্তিকাল করেন। (সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৯১)

২১১. ড.এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন "স্বাধীনতা আন্দোলনে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসানের সাংগঠনিক কার্যক্রম", ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী -মার্চ, ১৯৯৯), পৃ ৫-১৫।

২১২. হিজরী ১৩২৬ সালে মাওলানা মুহাম্মদ ইল্‌য়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা) শায়খুল হিন্দের নিকট সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযি অধ্যয়ন করেন। শায়খুল হিন্দ ঐ সময় মাওলানা ইল্‌য়াসকে জিহাদের বায়আত করেন। (বীস বড়ে মুসলমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮০)

২১৩. ডাক্তার মুখ্‌তার আহ্‌মদ আনসারী ভারতের ইউপির অন্তর্গত গাযীপুর জেলার ইউসুফ পুর গ্রামে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বেনারসে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর এলাহাবাদ কলেজে থেকে এফ.এ.পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর হায়দারাবাদের নিযাম কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নম্বরসহ উন্নীত হয়ে লন্ডন মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস.ডিগ্রী লাভ করেন। তথায় তিনি কিছুকাল হাউস সার্জন এবং রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকেন। ১৯১১ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯১২ সালে মেডিক্যাল মিশনসহ তুর্কী গমন করেন। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহন করেন। 'হোম রোল আন্দোলন'-এ এবং রাওল্যাট বিলের এজিটেশনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। ১৯২০ সালে খেলাফত

(সীমান্ত গান্ধী)[২১৪], হাজী তুরঙ্গযুয়ী, মোল্লা সাভাক; রায়পুরে হযরত মাওলানা আবদুর রহীম; আম্বেটায় হযরত মাওলানা খলীল আহমদ[২১৫]; চাকওয়ালে মাওলানা

ডেপুটেশনের প্রধান সম্পাদক হিসেবে ভারতের ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। ১৯২২ সালে 'গয়া'তে অনুষ্ঠিত খেলাফত কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৩ সালে স্বরাজপার্টি এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্টির মধ্যে সমঝোতা করণার্থে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তিনি তার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ সালে ডাক্তার আনসারী মদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে ১৯২৮ সালে 'অল পার্টিজ কনফারেন্স'-এর সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের 'গোল্ডেন জোবিলী'-এর উদ্বোধন করেন। ১৯৩৬ সালে রামপুর থেকে দিল্লীতে আগমনের পথে ট্রেনে হৃদযন্ত্রের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। (মুফ্তী ইন্তিযামুল্লাহ্, **মাশাহীরে জঙ্গে আযাদী**, করাচী, মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি. পৃ ২৮৯-২৯০)

২১৪. খান আবদুল গাফ্ফার খান ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পেশাওয়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ বছর বয়সে শায়খুল হিন্দের নিকট বায়আত হয়ে জিহাদ করার অঙ্গীকার করেন এবং তাঁর বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ নির্বাহ করতেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, হাজী সাহেব তুরঙ্গযুয়ী এবং শায়খুল হিন্দের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করতেন। শায়খুল হিন্দের প্রতি বৃটিশের শ্যেনদৃষ্টির উল্লেখ করে বলেন, শায়খুল হিন্দ পূর্বে বলে দেয়া দেওবন্দের বাইরের সাধারণ স্টেশনে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপ্লবী পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দেশাবলী দিতেন। এ সম্পর্কে সি .আই.ডি কোন হদীসই পেত না। কখনও কখনও তিনি আমাকে তাঁর বাসভবনে গোপনভাবে রেখে দিতেন, বাইরে বের হতে দিতেন না। এভাবে তিনি শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী দলে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যান। তিনি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং নিখিল ভারতের কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতা গান্ধীর পরিচালনায় সকল আন্দোলনে তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন। এজন্য তিনি কারাবরণ করেছিলেন। সীমান্তে তিনি শায়খুল হিন্দের পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনীকে বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত করেন। রাওলাট অ্যাক্ট বিরোধী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এ সময়েই তিনি উপমহাদেশের একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২২ সালে তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড সাজাপ্রাপ্ত হন। তিনি 'খোদায়ী খিদমত্গার' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। তাঁর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রধান কেন্দ্র ছিল পেশোয়ার। তিনি ভারত বিভক্তির চরম বিরোধীতা করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'পাখতুনিস্তান আন্দোলন' আরম্ভ করেন। পাকিস্তানে কিছু সময়কাল কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করেন। চিকিৎসা শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আফগানিস্তানে বসবাস করেন এবং সেখানে থেকে পাখতুনিস্তান আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৭১ সালের পর তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। (**বাংলা বিশ্বকোষ**; ২য় খণ্ড, পৃ ১৪৯; মাওলানা মুহাম্মদ উসমান ফারকলীত; খান আবদুল গাফ্ফার খান', **আল-জমইয়ত, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা**, ১৯৫৮, পৃ ১০৯)।

মুহাম্মদ আহ্‌মদ; করাচীতে মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক; সিন্ধুতে শায়খ আবদুর রহীম[২১৬]; রাম্বীরে মাওলানা মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম[২১৭]; দীনপুরে মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ও আমরুঠে মাওলানা তাজ মাহ্‌মূদ।

---

২১৫. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৬৯/১৮৫২ সালে সাহরানপুরের অন্তর্গত আম্বেটায় জন্ম গ্রহণ করেন। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন পবিত্র মদীনার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী রাযিআল্লাহু আনহু-এর বংশের লোক। তাঁর পিতামহ ছিলেন উস্তাযুল কুল হযরত মাওলানা মামলূক আলী (১৭৮৭-১৮৫১) আর মাতামহ্ ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের ১ম সদর মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানূতবী (হি. ১২৪৯-১৩০২)। তিনি উর্দু-ফারসী ও আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়ীতে সম্পন্ন করেন। অতঃপর তাঁকে সরকারী স্কুলে ভর্তি করানো হয়। স্কুল শিক্ষা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। ঐ সময় দেওবন্দে ধর্মীয় শিক্ষার নতুন কার্যক্রম চালু হলে তিনি দেওবন্দে ভর্তি হন। হিজরী ১২৮৯ সালে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সাহরারানপুরের মোযাহির উলূম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। হিজরী ১২৯৩ সালের কয়েকমাস তিনি ভূপাল সরকারের অধীনে গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৩০৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩১৪ সালে সদর মুদাররিস পদে মোযাহির উলূম মাদ্রাসায় যোগ দেন। ১৩২৫ সালে ঐ মাদ্রাসার 'নাযিম' মনোনীত হন। ১৩৪৪ সালে ভারত থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওওয়ারা চলে যান। হযরত সাহরানপুরী দেওবন্দী নেসাবের সকল ফন শিক্ষা দানে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ হাদীস বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। 'বাযলুল মাজহুদ' শিরোনামে তিনি সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থের বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। হিজরী ১৩৩৫ সালে সাহারানপুর থেকে এ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৩৪৫ পবিত্র মদীনায় রচনা সম্পন্ন করে ঐ বছরই ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর পাশে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি আজীবন শিরক ও বিদ্‌আত প্রতিরোধ প্রচেষ্টা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ করেন। শায়খুল হিন্দ পরিচালিত রেশমী রুমাল আন্দোলনে তাঁর অবদান অসামান্য। তাসাওউফে তিনি হযরত গাঙ্গুহীর (১৮২৯-১৯০৮) মুরীদ ছিলেন এবং হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত হাজী সাহেব (হি. ১২৩১-১৩১৫) থেকে ইজাযত ও খেলাফত প্রাপ্ত হন। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা ছিলেন তাঁর অন্যতম শাগিরদ।

২১৬. শায়খ আবদুর রহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন নওমুসলিম ও মাওলানা সিন্ধীর অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি ভারতীয় বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মাওলানা সিন্ধীকে আফগান সীমান্তে পৌঁছানোর কাজে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। আচার্য কৃপালনী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক অমুসলিম ইসলামে দিক্ষীত হয়। তাঁদের মধ্যে ডাক্তার শামসুদ্দীন উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার শামসুদ্দীন মুসলমান হওয়ার পর শায়খ আবদুর রহীম নিজের মেয়েকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। কাবুল গমনের পর সিন্ধী শায়খ আবদুর রহীমের সাথে পত্রালাপ বজায় রাখেন। রেশমী রুমালপত্র শায়খ আবদুর হক এর নিকট আনার সময় খান বাহাদুর রব্বে নাওয়ায খানের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের হস্তগত হয়।

তাছাড়া ত্যাগী বিপ্লবী নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ[২১৮], মাওলানা যফর আলী খান[২১৯], মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার[২২০], মাওলানা শওকত

এরপর তিনি গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে আত্মগোপন করেন এবং অবশেষে সম্ভবত সরহিন্দে অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাঁর আত্মগোপন করে থাকায় মিশনের শাখা হায়দরাবাদে সিন্ধীর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। (নক্শে হায়াত, ২য় খণ্ড পৃ ১৯৪-১৯৫)।

২১৭. শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মাওলানা সিন্ধীর বন্ধু এবং করাচীর মাওলানা মুহাম্মদ সাদিকের ভাতিজা। তিনি পূণা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ইংরেজীতে বি.এ অনার্স এবং অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী সময় তিনি কাবুলে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি সিন্ধীর পূর্বেই কাবুল গমন করে ১৯১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি হাবীবিয়া কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ছিলেন বৃটিশের চরম বিরোধী এবং একজন মহান বিপ্লবী নেতা। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মুহাম্মদ আলী কাসূরী, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ-এর সাথে মিলিত হয়ে বৃটিশ আধিপত্যের বিরূদ্ধে পরিকল্পনা ও সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেন। কাবুলে বৃটিশ-ভারতের বিবুদ্ধে স্থানীয় সরকারকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা কাসূরীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে মুহাম্মদ আলী কাসূরীসহ শায়খ ইব্রাহীমকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়। ১৯১৬ সালের ১০ জুলাই উপজাতি এলাকা স্বাধীন সীমান্তে তাঁরা পৌঁছে বৃটিশের বিরূদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। **Silken Letter Conspiracy Case and Who's Who**-এর সি.আই.ডি রিপোর্টের দ্বিতীয় প্যারা।

২১৮. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ বছর বয়সে পিতা মুহাম্মদ খায়রুদ্দীনের সাথে কলিকাতায় আগমন করেন। গৃহে অধ্যয়ন করে মাত্র ১৪ বছর বয়সে আরবী, ফারসী, উর্দু, ইসলামী সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। উর্দু দৈনিক 'আল্ হিলাল' (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) - এর সম্পাদনা কালে ভারতের বৃটিশ সরকার কর্তৃক অন্তরিত হন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ ও খিলাফত আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিনবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯২৩, ১৯৩৯, ১৯৪৬)। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৪৭-১৯৫৮)। তাঁর সময়ে পাক-ভারতে তিনি ছিলেন আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম। তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পবিত্র কুরআনের একটি উর্দু অনুবাদ ও ভাষ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৩)

২১৯. মাওলানা যাফর আলী খান (১৮৭৩-১৯৫৬) ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিক। পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার কোটমর্থ নামক স্থানে তার জন্ম। তিনি আলীগড় থেকে বি.এ.ডিগ্রী লাভের পর নওয়াব মুহ্সিনুল মুল্ক্-এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। বোম্বাই থেকে হায়দ্রাবাদ গমন করে অনুবাদকের পদ গ্রহণ করেন। পরে হায়দারাবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র

আলী[২২১], নওয়াব ভিকারুল মুলক[২২২], মাওলানা হাসরত মুহানী প্রমুখ তাঁকে বিশেষ সহযোগিতা করেন।[২২৩]

বিভাগের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন। লাহোর থেকে 'যমীনদার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতিতে অতিবাহিত হয়। তিনি পাঞ্জাব এসেম্বলীর সদস্য ছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সক্রিয়কর্মী ছিলেন। পরে মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের অন্যতম সংসদ সদস্যও ছিলেন। তিনি কবি, প্রবন্ধকার এবং বক্তা হিসেবে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। তার তিনটি কাব্য সংগ্রহ যথা বাহারিস্তান, নিগারিস্তান ও চমনিস্তান নামে প্রকাশিত হয়। 'মারিফাতে মাযহাব ওয়া সায়িন্স' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। (বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৮৫)

২২০. মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। আলীগড়ের ছাত্ররূপে প্রদেশের বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং অক্সফোর্ড থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমে রামপুর রাজ্যের প্রধান শিক্ষা অফিসার ছিলেন। পরে ইস্তফা দিয়ে বরোদা সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষত মুসলমানদেরকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনিই ছিলেন ঐ শতাব্দীর প্রথম দুই যুগের রাজনৈতিক মঞ্চের প্রভাবশালী অধিনায়ক। তিনি ভারতীয় মুসলিম লীগের (১৯০৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে একাধিকবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯২৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু পরে 'নেহরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে কংগ্রেসের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন (১৯২৮)। ১৯৩১ সালে লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাই ছিল আযাদীর জন্য উৎকণ্ঠিত মনোভাবের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ঐ বছরই তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন এবং জেরুজালেমের 'মসজিদুল আক্সা'-এর পাশে সমাহিত হন। তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইংরেজী 'কমরেড' ও দৈনিক উর্দু 'হামর্দদ' পত্রিকায় বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অনলবর্ষী আর্টিক্যাল প্রকাশিত হত। (বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯৬)

২২১. মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৮) ছিলেন উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। রামপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। বেরেলী ও আলীগড়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন (১৮৯৫-৯৬)। তিনি মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বৃটিশের উপেক্ষা, বঙ্গভঙ্গ রদ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, দেশবাসীদের হাতে ক্ষমতা ত্যাগে অস্বীকৃতি এবং বৃটিশের মুসলিম বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির কারণে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে চাকুরীতে ইস্তফা দেন এবং ইউরোপীয় প্রীতি বর্জন করে আযাদী আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এক মুহূর্তের জন্যও স্বদেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করেননি। নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা (লক্ষ্ণৌ অধিবেশন, আগষ্ট ১৯২৮) এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের সংগঠন থেকে শুরু করে ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিটি দাবির প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানান। খেলাফত

১৯১৪ সালের পূর্বেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণের সমর্থন লাভের জন্য আন্দোলনের পক্ষ থেকে মিশন প্রেরণ করা হয়। মাওলানা মকবূলুর রহমান ও শওকত আলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশন চীন ও বার্মা গমন করে। অধ্যাপক বরকত উল্লাহর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি মিশন জাপানে প্রেরিত হয়। চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবী ৩ সদস্য নিয়ে ফ্রান্সে যান। ৬ সদস্যের একটি মিশন হরদয়ালের নেতৃত্বে আমেরিকায় পৌঁছে। এ সব মিশন বিপ্লবের পক্ষে কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২২৪] বহির্দেশীয় আক্রমণের জন্য হযরত শায়খুল হিন্দের দৃষ্টিতে ইয়াগিস্তানের স্বাধীন এলাকাই ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও সাদিকপুরী মুজাহিদগণের মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চল থেকেই পরিচালিত হয়েছিল। তিনি এ এলাকার লোকজনকে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ ও মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে গড়ে তুলতে পুনরায় মনোযোগ দেন। এতদুদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে মাওলানা সায়ফুর রহমান,

---

আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) যোগদান করে রাজরোষে পতিত হন এবং কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ হন। (বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪২৩)

২২২. নওয়াব ভিকারুল মুল্ক (১৮৩৯-১৯১৭) ছিলেন মুসলিম লীগের প্রথম সম্পাদক, বিশিষ্ট সমাজকর্মী; জন্মস্থান সম্ভল (আমরূহা, জিলা মুরাদাবাদ)। প্রথমে শিক্ষক ও পরে ইংরেজ আদালতের সেরেশ্তাদার ছিলেন। স্যার সায়্যিদের অধীনেও কিছুকাল কাজ করেন। তাঁরই সুপারিশে হায়দারাবাদ রাজ্যে আমন্ত্রিত হন। উচ্চ উচ্চ পদে পূর্ণ সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করেন। রাজ্যবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে পেনশন দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। দেশে ফিরে জাতীয় সংস্কার বিশেষত আলীগড় কলেজের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০১ সালের অক্টোবরে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে মুসলমানদের দাবিগুলো সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে এ সকল দাবির পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের জোর সমর্থক ছিলেন। ১৯০৬ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত (বড়লাট সমীপে) মুসলিম ডেপুটেশনে যোগদান করেন। স্যার সায়্যিদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হলেও ভিকারুল মুল্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে ইতস্ত করতেন না। ১৯১১ সালে (১ জুন) এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম কনফারেন্সে তিনি অংশগ্রহণ করেন। (বাংলা বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৩৯)

২২৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮।

২২৪. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৪৬ ; ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী জীবন ও কর্ম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২) পৃ ২৪-২৭; শান্তিময় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮-৮০।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

পেশাওয়ার থেকে মাওলানা ফযলে রাব্বী[২২৫] ও মাওলানা ফযলে মাহমূদকে[২২৬] প্রেরণ করেন। তাঁরা ইয়াগিস্তানের মাওলানা মুহাম্মদ আকবরকে[২২৭] সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন।[২২৮] ইত্যবসরে শুরু হয় ১ম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে ইংরেজ তথা মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে তুরস্ক জড়িয়ে পড়ে। শায়খুল হিন্দ পেশাওয়ারের বিশিষ্ট পীর হযরত হাজী তুরঙ্গযুয়ীকে[২২৯] দ্রুত ইয়াগিস্তান পৌঁছে

---

২২৫. মাওলানা ফযলে রাব্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩২৭ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করে স্বদেশে কুরআন হাদীসের পাঠদানে নিয়োজিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে শায়খুল হিন্দের নির্দেশে তিনি হিজরত করে ইয়াগিস্তানে চলে আসেন। এখানকার অধিবাসীদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। হাজী তুরঙ্গযুয়ী জিহাদের পতাকা উত্তোলন করলে তিনিও তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন ব্যর্থ হলে তিনি আফগানিস্তান চলে যান। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের বড় অফিসার হিসেবে চাকরি লাভ করেন। তিনি জমইয়তে উলামায়ে আফগনিস্তানের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। (ফুয়ূযুর রহমান : মাশহীর উলামায়ে দেওবন্দ, পৃ ৪০০)

২২৬. মাওলানা ফযলে মাহমূদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি পেশাওয়ারের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শায়খুল হিন্দের নির্দেশে ইয়াগিস্তানে আগমন করেন। তিনি এখানকার অধিবাসীদেরকে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং জিহাদে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। বিপ্লব ব্যর্থ হলে তিনি অতি সন্তর্পণে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। তিনি বিপ্লবী মিশনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। (শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, নকশে হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৮-১৯৯)।

২২৭. মাওলানা মুহাম্মদ আকবর রহমাতুল্লাহি আলাইহি সীমান্তের অন্তর্গত ইয়াগিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল হিন্দের নিকট অধ্যায়ন করে (দাওরা হাদীস) চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশীল ও পারদর্শী ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ডিগ্রী লাভ করার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে কুরআন, হাদীস শিক্ষাদান করেন । কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করার পর স্বদেশে ফিরে আসেন। শায়খুল হিন্দ তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণ ও ইয়াগিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ দেন। ইয়াগিস্তানী গোত্রসমূহের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ এবং বংশানুক্রমে শত্রুতা ও লড়াই চলে আসছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় তাদের পরস্পরের পুরাতন মতভেদ ও শত্রুতা লোপ পায় এবং তাদের একতা ও সংহতি সৃষ্টি হয়। এতে ইয়াগিস্তানবাসী জিহাদের উপযোগী হন। (মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, নকশে হায়াত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯৮)

২২৮. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৯-৬৩০।

২২৯. হাজী তুরঙ্গযুয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রকৃত নাম হাজী ফযলে ওয়াহিদ তুরঙ্গযুয়ী। তবে তিনি হাজী সাহেব তুরঙ্গযুয়ী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। জন্ম পেশাওয়ার জেলার চারসিদ্দা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে নির্দেশ দেন। ফলে যুদ্ধ শুরু হয় এবং মুজাহিদ পক্ষের ব্যাপক বিজয় অর্জিত হয়। মুজাহিদরা কয়েক প্লাটুন ইংরেজ সেনা ধ্বংস করে দেন। কিন্তু সমরাস্ত্র ও রসদের অভাবে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।[২৩০]

অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের অভাবজনিত এ সমস্যার নিরসনে শায়খুল হিন্দের বাসভবনে বিপ্লবী দলের মিটিং হয়। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা অর্থাৎ একযোগে আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় আক্রমণ চালানোর বিষয়টি আর বিলম্ব করা উচিত মনে করলেন না। তাঁরা ঐ আক্রমণের জন্য ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখটি নির্ধারণ করে সিদ্ধান্তের একটি কপি শায়খুল হিন্দকে হস্তান্তর করেন এবং ঐ কপিসহ শায়খুল হিন্দ তুরস্ক ও কাবুল সরকারের সাথে মিলিত হয়ে ইতোপূর্বে কৃত সকল দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চূড়ান্ত করিয়ে নেওয়ার রায় দেন। সে মতে হযরত শায়খুল হিন্দ একদিকে মাওলানা সিন্ধীকে কাবুল প্রেরণ করেন, অন্যদিকে নিজে হিজায হয়ে তুরস্ক গমনের সিদ্ধান্ত নেন।[২৩১]

হযরত মাওলানা সিন্ধী কাবুল পৌছার পূর্বেই বিপ্লবী দলের সদস্যগণ, আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে তুরস্ক বাহিনী ভারতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে, এ মর্মে কাবুল সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে ৪টি পথ নির্ধারণ করে নেন। সে অনুসারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মাওলানা মুহাম্মদ সাদিকের নেতৃত্বে কালাত ও মাকরানের গোত্রগুলো করাচী সেক্টরের উপর আক্রমণ চালাবে। অনুরূপে মাওলানা তাজ মাহমূদের নেতৃত্বে গযনী ও কান্দাহারের গোত্রগুলো কোয়েটা সেক্টরের উপর, হাজী তুরঙ্গযুয়ীর নেতৃত্বে মহ্মন্দ ও মাসউদী গোত্রগুলো পেশাওয়ার সেক্টরের উপর এবং মাওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে কুহেস্তানী গোত্রগুলো উগী সেক্টরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবে। উপরোক্ত ৪টি দলের প্রতিটির সার্বিক সহযোগিতায় থাকবে তুরস্কের সশস্ত্র বাহিনী।[২৩২]

থানার অন্তর্গত তুরঙ্গযুয়ী গ্রামে। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ আলিম ও তরীকতের প্রসিদ্ধ শায়খ। মাওলানা শাহ্ নাজমুদ্দীন থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন। পেশাওয়ার ও ইয়াগিস্তানে তাঁর অসংখ্য মুরীদ ছিল। সকলেই তাঁকে বিশিষ্ট বুযর্গ ও ওয়ালী হিসেবে মান্য করত। শায়খুল হিন্দ তাঁর কাছে মাওলানা সিন্ধী ও মাওলানা ওযায়রগুলকে বহু বার পাঠিয়ে নিজ মিশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বানান। শায়খুল হিন্দের পক্ষ থেকে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। (**Silken Letter Conspiracy Case and Who is Who**-এর সিআইডি রিপোর্টের ৯২ নং বর্ণনা)

২৩০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।

২৩১. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩২। আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০।

২৩২. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২-১৮৩।

এদিকে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ করার যে পরিকল্পনা ছিল, সেটি বাস্তবায়নের জন্য ১টি হেড কোয়ার্টার ও ৮টি উপকেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়। হেড কোয়ার্টার ছিল দিল্লীতে। এখানে বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মহাত্মা গান্ধী, ডাক্তার মুখতার আহ্‌মদ আনসারী, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় ও রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর মতে উপকেন্দ্রগুলো ছিল রান্ধের, পানিপথ, লাহোর, দীনপুর, আমরোট, করাচী, আত্মানযুয়ীর এলাকা ও তুরঙ্গযুয়ীর এলাকা। পাকিস্তানের বিশিষ্ট গবেষক ড.মাওলানা আবদুর রহমান বাংলা, আসাম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত আরো ৩টি উপকেন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেছেন।[২৩৩] আন্তর্জাতিক যোগযোগের জন্য ভারতের বাইরে প্রধান কেন্দ্র ছিল কাবুল। ঐ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন প্রথমে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও পরে যুগপতভাবে তিনি ও হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী। তাছাড়া মদীনা মুনাওওয়ারা, ইস্তাম্বূল, কনস্টান্টিনোপল, আংকারা ও বার্লিনেও বিপ্লবী কেন্দ্র ছিল। পবিত্র মদীনা কেন্দ্রে হযরত মাওলানা হাসান আহমদ ও হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।[২৩৪]

মাওলানা সিন্ধী ১৯১৫ সালের ১৫ অক্টোবর কাবুল পৌছেন। ইতোপূর্বে ২ অক্টোবর ভারত-তুর্কী-জার্মান মিশনও কাবুল এসে পৌছে। ২৯ অক্টোবর বিপ্লবীদের অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত হয়। তাতে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ[২৩৫] প্রেসিডেন্ট, অধ্যাপক বরকত উল্লাহ[২৩৬] প্রধানমন্ত্রী ও হযরত মাওলানা সিন্ধী ভারতমন্ত্রী হিসেবে

---

২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯-১৬১; মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৭-৬২৮; সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **আসীরানে মাল্টা**, দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬) পৃ ৩১।

২৩৪. আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭-১৫৮; মাদানী প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮৩।

২৩৫. মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন ভারতের উচ্চ হিন্দু পরিবারের লোক। ১৯১৪ সালের শেষ দিকে তিনি ইটালী, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। তিনি জেনেভায় গমন করে বিপ্লবী ভারতীয় রাজনীতিক হরদয়ালের সাথে পরিচিত হন। হরদয়াল তাঁকে জার্মান কনসালের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে বার্লিনে পৌছেন। মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লাহকে হরদয়াল ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য কাবুল পাঠান এবং নিজে বার্লিন থেকে কাবুলের অস্থায়ী সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব নেন। **(Rowlatt Report, 1918, Chapter XIV. p. 126)**

২৩৬. অধ্যাপক বরকতুল্লাহ ছিলেন ভূপাল স্টেটের অধিবাসী। তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণ করেন। তিনি টোকিওতে হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। The Islamic Fraternity নামক একটি বৃটিশ বিরোধী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন।

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ক্রমে সদস্যসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। মুজাহিদ দলের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত মাওলানা বশীর অস্থায়ী সরকারের অন্তর্ভুক্ত হন। অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে রাশিয়া, ইস্তাম্বুল ও জাপানে মিশন প্রেরিত হয়। এদিকে মাওলানা বশীরের পরামর্শক্রমে মাওলানা সিন্ধী 'জুনূদুল্লাহ' নামে বিপ্লবী কর্মীদের নিয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক 'মুক্তিফৌজ'[২৩৭] গঠন করেন। এতে সামরিক কর্মকর্তাদের স্তর বিন্যাস অনুসারে প্রায় একশত কর্মকর্তার তালিকা পাওয়া যায়।[২৩৮]

পত্রিকাটি জাপান সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাঁকে অধ্যাপনার চাকুরী থেকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত গদর পার্টি (বিদ্রোহী দল)-তে যোগ দেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই উপমহাদেশের বাইরে নানা দেশে ভারতের স্বাধীনতার যে তৎপরতা চলছিল তিনি তাতে ভূমিকা রাখেন। তিনি ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য জার্মান সরকারের সাথে আঁতাত করেন। তারপর হরদয়ালের নির্দেশে কাবুলে এসে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সাথে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনপূর্বক ঐ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। **(Rowlatt Report 1918, Chapter XIV, P. 126)**

২৩৭. মুজাহিদীন দলের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ বশীর রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরামর্শক্রমে মাওলানা সিন্ধী কাবুলে অবস্থান কালে 'জুনূদুল্লাহ্' নামে মুক্তি ফৌজ গঠন করেন। এতে লাহোর থেকে আগত জোয়ানরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এ মুক্তিফৌজের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবীর বিবরণ নিম্নরূপ: ক. পেট্রোন : ১.চীফ জেনারেল খলীফাতুল মুসলিমীন ২.সুলতান আহ্মদ শাহ্ কাচার, ইরান ৩.আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান, কাবুল। খ. ফিল্ড মার্শালঃ ১.আন্ওয়ার পাশা ২.দাওলতে উসমানিয়ার যুবরাজ ৩.দাওলতে উসমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ৪.আব্বাস হিলমী পাশা ৫.শরীফ, মক্কা মুকর্‌রমা ৬. নায়িবুস সালতানাত সরদার নসরুল্লাহ্ খান, কাবুল ৭.মুঈনুস সালতানাত সরদার ইনায়াতুল্লাহ্ খান, কাবুল ৮.নিযাম, হায়দরাবাদ ৯.ওয়ালী, ভূপাল ১০.নবাব, রামপুর ১১.নিযাম, ভাওয়ালপুর ১২. রঈসুল মুজাহিদীন। গ. জেনারেল : ১.সুলতানুল মুআয্যম মাওলানা মাহ্মূদ হাসান মুহাদ্দিস দেওবন্দী ২.কাবুল জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী। ঘ. লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেলঃ ১.মাওলানা মুহ্যুদ্দীন খান ২.মাওলানা আবদুর রহীম ৩.মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ, ভাওয়ালপুর ৪.মাওলানা তাজ মুহাম্মদ সিন্ধী **৫.মওলবী হুসাইন আহ্মদ মাদানী** ৬.মওলবী হামদুল্লাহ হাজী সাহেব, তুরঙ্গযুয়ী ৭.ডাক্তার মুখতার আহ্মদ আনসারী ৮.হাকীম আবদুর রায্যাক ৯. মোল্লা সাহেব, বাব্‌রা ১০.মওলবী কুহিস্তানী ১১.জান সাহেব, বাজুরা ১২.মওলবী ইব্‌রাহীম ১৩. মওলবী মুহাম্মদ মিয়া ১৪.হাজী সাঈদ আহ্মদ ১৫.শায়খ আবদুল আযীয সদেশ ১৬.মওলবী আবদুল করীম রঈসুল মুজাহিদীন ১৭.মওলবী আবদুল আযীয রহীমাবাদী ১৮.মওলবী আবদুর রহীম আযীমাবাদী ১৯.মওলবী আবদুল্লাহ্ গাযীপুরী ২০.নওয়াব যমীরুদ্দীন্ আহমদ ২১.মওলবী আবদুল বারী ২২.আবুল কালাম আযাদ ২৩. মুহাম্মদ আলী জাওহার ২৪.শওকত আলী ২৫.যাফর আলী ২৬.হাসরাত মূহানী ২৭.মওলবী

সিন্ধী কাবুল যাত্রার কিছু দিন পর গোটা ভারতে শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। ইংরেজ সরকার মাওলানা আযাদ ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারসহ বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে। হযরত শায়খুল হিন্দকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি। ততক্ষণে তিনি পৌছে যান হিজাযে। সেখানে মক্কার গভর্ণর গালিব পাশা ও মদীনার গভর্ণর বস্‌রী পাশার সাথে তাঁর বৈঠক হয়।

আবদুল কাদির কাসূরী ২৮.মওলবী বরকুল্লাহ্ ভূপালী ২৯. পীর আসাদুল্লাহ্ শাহ্ সিন্ধী। ঙ. মেজর জেনারেল ঃ ১.মওলবী সায়ফুর রহমান ২.মওলবী মুহাম্মদ হাসান মুরাদাবাদী ৩.মওলবী আবদুল্লাহ্ আনসারী ৪.মীর সিরাজুদ্দীন ভাওয়ালপুরী ৫. পাচা মোল্লা আবদুল খালিক ৬.মওলবী বশীর আহমদ, রঈসুল মুজাহিদীন ৭.শায়খ ইব্‌রাহীম সিন্ধী ৮.মওলবী মুহাম্মদ আলী কাসূরী ৯.সাইয়িদ সুলায়মান নদভী ১০. গোলাম হুসায়ন আযাদ সুবহানী ১১. কাযিম বে ১২. খুশী মুহাম্মদ ১৩.মওলবী আবদুল বারী, অস্থায়ী ভারত সরকারের মুহাজির ওয়াকীল। চ. কর্নেল ঃ ১.শায়খ আবদুল কাদির মুহাজির ২.শুজাউল্লাহ্ মুহাজির, অস্থায়ী ভারত সরকারের নায়িব ওয়াকীল ৩.মওলবী আবদুর আযীয, ইয়াগিস্তানের হিযবুল্লাহ-এর দূতের ওয়াকীল ৪.মওলবী ফযলে রব্বী ৫.মিয়া ফযলুল্লাহ্ ৬.সদরুদ্দীন ৭.মওলবী আবদুল্লাহ্ সিন্ধী ৮.মওলবী আবূ মুহাম্মদ আহ্‌মদ লাহোরী ৯.মওলবী আহ্‌মদ আলী, সহকারী সম্পাদক ,নিযারাতুল মাআরিফ ১০.শায়খ আবদুর রহীম সিন্ধী ১১.মওলবী মুহাম্মদ সাদিক সিন্ধী ১২.মওলবী ওলী মুহাম্মদ ১৩.মওলবী উযায়রগুল ১৪.খাজা আবদুল হাই ১৫.কাযী যিয়াউদ্দীন (এম.এ) ১৬.মওলবী ইব্‌রাহীম শিয়ালকোটী ১৭.আবদুর রশীদ (বি.এ) ১৮.মওলবী যহুর মুহাম্মদ ১৯.মওলবী মুহাম্মদ মুবীন ২০.মওলবী মুহাম্মদ ইউসুফ গাঙ্গূহী ২১.মওলবী রশীদ আহ্‌মদ আনসারী ২২.মওলবী সাইয়িদ আবদুস সালাম ফারুকী ২৩.হাজী আহ্‌মদ জান সাহরানপুরী। ছ. লেফটেন্যান্ট কর্নেল ঃ ১.ফযল মাহ্‌মূদ ২.মুহাম্মদ হাসান (বি.এ) মুহাজির ৩.শায়খ আবদুল্লাহ্ (বি.এ) মুহাজির ৪.যাফর হাসান (বি.এ) মুহাজির ৫.আল্লাহ্-নওয়ায খান (বি.এ) মুহাজির ৬.রহ্‌মত আলী (বি.এ) মুহাজির ৭.আবদুল হামীদ (বি.এ) মুহাজির ৮.হাজী শাহ্ বখ্‌শ সিন্ধী ৯.মওলবী আবদুল কাদির দীনপুরী ১০.মওলবী গোলাম নবী ১১.মুহাম্মদ আলী সিন্ধী ১২.হাবীবুল্লাহ্। জ. মেজর ঃ ১.শাহ্‌নাওয়ায ২.আবদুর রহমান ৩.আবদুল হক। ঝ. ক্যাপ্টেন ঃ ১.মুহাম্মদ সলীম ২.করীম বখ্‌শ্। ঞ. ল্যাফটেনেন্ট ঃ ১.নাদির শাহ্। ড.এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন "স্বাধীনতা আন্দোলনে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসানের সাংগঠনিক কার্যক্রম", **ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা** (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী - মার্চ, ১৯৯৯), পৃ ৫-১৫।

২৩৮. আসীর আদরবী, **হিন্দুস্তান কী জঙ্গে আযাদী মেঁ মুসলমানূঁ কা কিরদার** (দেওবন্দ ঃ মারকাযে দাওয়াতে ইসলাম, ১৯৮১), পৃ ১৪০-১৪১; অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস** (কলিকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, বাংলা ১৩৯৭), পৃ ৭৯।

ভাগ্যক্রমে তখন তুরস্ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী জামাল পাশা ও প্রধান সেনাপতি আন্‌ওয়ার পাশা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা আগমন করলে শায়খুল হিন্দকে আর তুরস্ক যেতে হয়নি। মদীনা থেকেই তিনি তুরস্ক সরকারের সাথে বৈঠকের কাজ সম্পন্ন করে নেন।[২৩৯] এ সকল বৈঠকে তাঁকে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

মক্কা বৈঠকের পর গভর্ণর গালিব পাশা ভারতীয় জনগণকে উদ্দেশ্য করে লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি চিঠি শায়খুল হিন্দকে হস্তান্তর করেন। শায়খুল হিন্দ এটি অবিলম্বে মাওলানা মনসূর আনসারীর মাধ্যমে ভারতে পাঠিয়ে দেন। চিঠি কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর নিকট পৌছানো হয়। এ চিঠি ইয়াগিস্তানে বিলি করার পর অসাবধানে একটি কপি ইংরেজদের হাতেও চলে গিয়েছিল। গভর্ণর গালিব পাশা আফগান সরকারের নামেও একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে তুর্কী ফৌজের গমন সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য ছিল। কিন্তু চিঠিটি যথাসময়ে পৌছানো সম্ভব হয়নি।[২৪০]

জামাল পাশা ও আন্‌ওয়ার পাশার মাধ্যমে তুর্কী সরকারের সাথে শায়খুল হিন্দ ৩টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল বিপ্লবী দলের নেতা হিসেবে শায়খুল হিন্দের নিজের সাথে, একটি ভারতবাসীর সাথে, আর একটি ছিল আফগান সরকারের সাথে।[২৪১] চুক্তিগুলো সম্পাদনের পর থেকেই ইংরেজ গোয়েন্দ তাঁর পেছনে লেগে যায়। তিনি খুব সাবধানতার সাথে চুক্তিগুলোর স্বাক্ষরিত কপি ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। শায়খুল হিন্দ একজন বিজ্ঞ কারিগরের সাহায্যে একটি কাঠের সিন্ধুক তৈরী করান। তৈরীর সময়ে সিন্ধুকের জোড়া ২ কাঠখণ্ডের মাঝখানে চুক্তিপত্রের কপি ২টি এমনভাবে স্থাপন করেন যে, কাঠখণ্ডদ্বয় জোড়া লাগানোর পর এখানে কোন জোড়া আছে বলে অনুমানও করা যায়নি। তারপর ঐ সিন্ধুকে নিজের স্বাভাবিক ব্যবহৃত কিছু কাপড়-চোপড় রেখে দিয়ে সিন্ধুকটি লোক মারফতে মুযাফ্‌ফর নগর জেলার বিপ্লবী নেতা হযরত মাওলানা হাদী হাসানের নিকট পাঠিয়ে দেন।[২৪২]

---

২৩৯. বিলাল আহমদ ইমরান, যার ত্যাগে আমরা স্বাধীন (সিলেট : আল আনসার একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ ১৭-২০।

২৪০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭-২৮।

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭-২৮।

২৪২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, তাহরীকে শায়খুল হিন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮২-৮৪।

সিআইডি পুলিশ অবশ্য পথিমধ্যে কয়েক বার হানা দিয়েছিল। কিন্তু সিন্ধুক আটকাতে পারেনি। এভাবে কপিগুলো ভারত ও কাবুলে পৌঁছে যায়। এই চুক্তির কপি মাওলানা সিন্ধী আফগানের আমীর হাবীবুল্লাহ খানের নিকট পৌছালে তিনি অনুমোদন দেন। সিন্ধী ঐ অনুমোদন পত্রের পূর্ণভাষ্য ও যুদ্ধ আরম্ভের তারিখ একজন দক্ষ কারিগরের মাধ্যমে আরবী ভাষায় একটি রুমালে রেশমী সুতায় বুনিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন এবং এটি একজন বাহকের মাধ্যমে মক্কায় হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ইত্যবসরে রুমালটি বাহক নও মুসলিম আবদুল হকের হাত থেকে বৃটিশ গোয়েন্দার হাতে চলে যায়।[২৪৩] ফলে ইংরেজ সরকার মাওলানা সিন্ধী ও অন্যদের বিরুদ্ধে 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' শীর্ষক ফৌজদারী মামলা দায়ের করে এবং সরকারী কাগজপত্রে গোটা আন্দোলন রেশমী রুমাল আন্দোলন নামে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য, ইংরেজ সরকারের চাপের মুখে কাবুল সরকার মাওলানা সিন্ধীকে ঐ সময় ইংরেজের হাতে হস্তান্তর না করলেও তাকে ১ বছর ৮ মাস গৃহবন্দী করে রাখে।

এদিকে হযরত শায়খুল হিন্দ চুক্তির কপিগুলো ভারতে পাঠানোর পর নিজে হিজায থেকে ইয়াগিস্তান ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময়ে ইংরেজের প্ররোচনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় শরীফ হুসাইন মক্কায় তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে এবং মক্কা, মদীনা, জিদ্দা ও ইয়াম্বু নিজ দখলে নিয়ে যায়। গভর্ণর শরীফের মাধ্যমে ইংরেজ সেনা কর্মকর্তা কর্ণেল ওয়ালসন ও কর্ণেল লরেন্স এ মর্মে একটি ফত্ওয়া তৈরী করায়[২৪৪] যে, তুর্কীরা প্রকৃত মুসলমান নয় এবং তাদেরকে বিশ্ব মুসলিম খেলাফতের জন্য দায়িত্বশীল জ্ঞান করা মুসলমানদের জন্য অবৈধ। ফত্ওয়ায় কতিপয় অখ্যাত লোক স্বাক্ষর করলেও হিজাযের বিশিষ্ট আলিমদের কেউ স্বাক্ষর করেননি। ইংরেজের নির্দেশে শরীফ সেটি শায়খুল হিন্দের নিকট পেশ করলে তিনি স্বাক্ষর করতে অসম্মতি জানান।[২৪৫] ফলে শরীফ শায়খুল হিন্দকে আদেশ অমান্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ইংরেজের হাতে অর্পণ করে দেয়।

---

২৪৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯-৩১।

২৪৪. মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, ৩য় সং (ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃ ৬৫।

২৪৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক আওর উন কে মুজাহিদানা কারনামে (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো,তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৭-১৪৮।

ইংরেজ হযরত শায়খুল হিন্দকে মদীনা শরীফ থেকে প্রথমে জিদ্দায়, তারপরে কায়রোতে অবস্থিত তাদের সামরিক হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ঐ মামলার রায়ে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে মাল্টায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২৪৬]

মাল্টায় শায়খুল হিন্দের সাথে আরো যারা নির্বাসিত হন তাঁরা ছিলেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, হযরত মাওলানা ওয়ায়রগুল[২৪৭], হযরত মাওলানা হাকীম নুস্রত হুসাইন ও হযরত মাওলানা ওয়াহীদ আহ্মদ মাদানী[২৪৮]।

---

২৪৬. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫২-৬৫৪।

২৪৭. হযরত মাওলানা ওয়ায়রগুল রহমাতুল্লাহি আলাইহি পেশাওয়ার জেলার যিয়ারত কাকা সাহেব গ্রামের অধিবাসী। হিজরী ১৩৩১ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদীস পাস করে শায়খুল হিন্দের আযাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। তিনি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দেন। সীমান্ত প্রদেশ ও আযাদ উপজাতি এলাকায় চিঠি পত্রের আদান প্রদানসহ দূত হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেন। আযাদী আন্দোলনের বিপ্লবী কমিটির ট্রেজারার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন কারন। শায়খুল হিন্দের সাথে তিনি মাল্টায় বন্দী হন। মুক্তিফৌজের তালিকায় তাঁর পদবী ছিল কর্ণেল। মাওলানা ওয়ায়রগুল খেলাফত আন্দোলনের সময় খেলাফত কমিটি দেওবন্দ শাখার সভাপতি ছিলেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রূড়কী রাহমানিয়া মাদ্রাসার সদ্‌র মুদাররিস থাকাকালে জনৈকা ইংরেজ মহিলা তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। এ মহিলা ছিল জ্ঞানপিপাসু। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন কালে সে বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন নিয়ে মাওলানার নিকট হাযির হয় এবং সদুত্তর পেয়ে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। ভদ্র মহিলা মুসলমান হওয়ার পর তাসাওউফে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু বিবাহ ব্যতিরেকে এ পথ অতিক্রম করা দুরূহ ছিল বলে মাওলানা ওয়ায়রগুলকেই বিবাহের প্রস্তাব দেন। মাওলানা নওমুসলিম মহিলার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাকে বিয়ে করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভক্তির পর তিনি পেশাওয়ার চলে যান। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। (কারী ফুয়ূযুর রহমান, মাশাহীরে উলামায়ে দেওবন্দ, পৃ ৩৬১; কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, দারুল উলূম দেওবন্দ কী পচাছ মিসালী শখসিয়্যাত, দেওবন্দ, দারুল কিতাব ১৯৯৮, পৃ ৩০৪

২৪৮. হযরত মাওলানা ওয়াহীদ আহ্মদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ হুসায়ন আহমদ মাদানীর ভাতৃপুত্র। অতি শৈশবেই তাঁর পিতা (মাওলানা সিদ্দীক আহমদ) মারা গেলে তিনি নিজ চাচা হযরত মাদানীর নিকট লালিত-পালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সিহাহ সিত্তাহ্ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ ১৩৩৩ হি. সালে মক্কায় গমন করলে তিনি তাঁর সাহচর্যে থাকেন। শায়খুল হিন্দের নামে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হলে তিনি মাওলানা ওয়াহীদ আহ্মদকে সঙ্গে

হযরত শায়খুল হিন্দের গ্রেপ্তারীর[২৪৯] সংবাদ উপমহাদেশে পৌঁছলে জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্যকর অবস্থার উদ্রেক হয়। জনগণ মাল্টায় বন্দীদের মুক্তির

নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। মক্কায় শরীফ হুসায়নের পৈশাচিক নির্দেশে শায়খুল হিন্দ স্বেচ্ছায় বের হয়ে তাদের হাতে গ্রেফতার হন। তাঁর সাথে মাওলানা ওয়াহীদও গ্রেফতার হয়ে জেদ্দায় গমন করেন। মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ মাল্টায় বন্দী থাকা অবস্থায় হযরত মাদানী এবং হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট কুরআন, হাদীস, ফিকহ, তাসাওউফ-এর শিক্ষা লাভ করেন। মাল্টা থেকে মুক্তির পর হেজায গমন না করে হযরত শায়খুল হিন্দের সাথে ভারতে চলে আসেন। ১৩৪৬ হি./ ১৯২৭ সালে মুযাফ্ফর নগর জেলা থেকে তিনি মাসিক 'জামীন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর কিছুকাল তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর বিহারের মদ্রাসা আযীযিয়্যার প্রধান মুদার্‌রিস হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। মাল্টা বন্দীশালায় অবস্থানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সাথে তাঁর সাক্ষাত ও কথোপকথন হয়। এ সময়ে তিনি তাঁর জানা উর্দু ও আরবী ভাষা ছাড়া ফারসী, ইংরেজী, তুর্কী, ফ্রান্স, পশ্‌তু, বাংলা ইত্যাদি ভাষাগুলো অতি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেন। বিহারের আযীযিয়্যা মদ্রাসায় প্রধান মুদার্‌রিস হিসেবে কর্মরত অবস্থায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রী, তিন ছেলে ও দু'মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা ফরীদ আহ্‌মদ হেজাযে অবস্থান করেন। ২য় পুত্র মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ ওয়াহীদী দিল্লীর জামিআ মিল্লিয়ার অধ্যপক। তিনি পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। কনিষ্ঠ পুত্র সাঈদ আহ্‌মদ এম.বি.বি.এস. পাস করে মুযাফ্ফর নগর জেলার সরকারি চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত। তাঁর প্রথমা কন্যা বেগম সফিয়্যার বিয়ে হয় জামিআ মিল্লিয়ার অধ্যাপক যিয়াউল হাসান ফারূকীর সাথে। আর কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে ইনায়াতুল্লাহ্ এম.এ.-এর সাথে হয়। (মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা, পৃ ৩০৬-৩০৮)

২৪৯. মাল্টায় হযরত শায়খুলহিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যক্তিগত আমলী কর্মসূচী ছিল- ইশার নামাযের পর কিছুক্ষণ জেগে থাকতেন। এ সময় সামান্য ওয়াযীফা পাঠ করতেন। এরপর ইস্‌তিনজা ওপ্রয়োজনীয় জরূরত সমাধা করে ওযূ করতেন। কারো সাথে কোন আলোচনার প্রয়োজন হলে তা সমাপন করতেন, অন্যথায় শুয়ে পড়তেন। দশটার মধ্যে আলো নিভিয়ে দেয়া সকলের উপর অর্ডার ছিল। তাই সবাই দশটার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। শায়খুল হিন্দ দেড়টা বা দু'টার মধ্যে পুনরায় জাগ্রত হতেন। এরপর সন্তর্পণে ওযূ করতেন। শীতকালে ঠাণ্ডা পানির সাহায্যে ওযূ কষ্টসাধ্য ছিল বলে পানি গরম করে দশ/বার লোটা ভর্তি একটি টিনে কম্বল দ্বারা আবৃত করে রেখে তা দ্বারা তিনি ওযূ ও ইস্‌তিনজা করতেন। এরপর নফল নামায সমাধা করে ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত মুরাকাবা ও নিম্নস্বরে যিক্‌র করতেন। ফজরের নামাযের পূর্বে পুনরায় ইস্‌তিনজা করে ওযূ করার পর জামআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতেন। নামাযের পর একই স্থানে বসে ওয়াযীফা পড়তেন এবং ইশ্‌রাকের সময় হলে ইশ্‌রাক পড়ে নিজ শয্যায় যেতেন। এ সময়ে সিদ্ধ ডিম দিয়ে নাশ্‌তা করে চা পান করতেন। অতপর দালায়িলুল খায়রাত এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। বন্দীশালায় তথাকার নিয়ম

দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ডাক্তার মুখ্‌তার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে 'আঞ্জুমানে ইআনতে নযরবন্দানে ইসলাম' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন দিল্লী থেকে শায়খুল হিন্দের মুক্তির জন্য জোর তৎপরতা চালায়। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন জেলা ও শহরের জনগণের পক্ষ থেকে ভারতের ভাইসরয় ও লন্ডনে অবস্থিত ভারত সচিবের নিকট তারবার্তা পাঠিয়ে মুক্তির দাবী জানানো হয়। প্রায় ৮/১০টি দৈনিক পত্রিকা শায়খুল হিন্দের মুক্তির পক্ষে নিয়মিত আর্টিক্যাল প্রকাশ করে। শায়খুল হিন্দের স্ত্রী নিজেও সরকারের কাছে মুক্তির আবেদন জানান। কিন্তু নেতিবাচক জবাব পেয়ে মর্মাহত হন। অবশেষে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মামলায় তিনি বেকসুর প্রমাণিত হলে তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদেরকে ভারতে পাঠানো হয়। ১৯২০ সালের ৮ জুন তাঁদের মুক্তি প্রদান করা হয়।[২৫০]

অনুযায়ী সপ্তাহে মাত্র দু'দিন পত্র লেখা যেত। তাই পত্র লেখার দিন পত্র লিখতেন নতুবা মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ মাদানীকে কিতাব পড়াতে থাকতেন। কুরআন মজীদ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন। ভোর বেলা মাওলানা ওয়াহীদকে পড়াবার সুযোগ না ঘটলে যুহরের পূর্ব সময়ে পড়াতেন। 'মিশকাতুল মাসাবীহ' এবং 'জামি তিরমিযী' তাঁদের সাথে পড়ার জন্য রাখা ছিল বলে এ দু'খানা হাদীস গ্রন্থ তাঁকে সম্পূর্ণ পড়িয়ে দেন। তাফসীর গ্রন্থ 'জালালায়ন'ও তাঁকে সম্পূর্ণ পড়িয়ে দিয়েছেন। পাঠ দানের পর কুরআন মজীদের অনুবাদের কাজে লেগে যেতেন। দুপুরে খাবার গ্রহণের পর পুনরায় চা পান করতেন। আর কেউ সাক্ষাতের জন্য তাঁর নিকট আগমন করলে তার সাথে সে সময়ে মিলিত হয়ে আলোচনা করতেন। গরমের মৌসুমে নিজ কক্ষে শয্যায় এবং শীতের মৌসুমে বাইরে রৌদ্রে সামান্য সময় কায়লূলা অর্থাৎ শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। কিছু সময় আহারের পর এভাবে বিশ্রাম করে ওযূ করতেন এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। সপ্তাহে তিন দিন যুহরের পর বিভিন্ন ক্যাম্পে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন। একদিন তিনি রোগেট ক্যাম্পে, একদিন সেন্ট ক্লিম্যান্ট ক্যাম্পে এবং একদিন বলগার ক্যাম্পে গমন করতেন। এ সময় তাঁর সহচরবৃন্দও সঙ্গে থাকতেন। আসরের নামাযের পর নিম্নস্বরে যিকর করতেন। চাদর অথবা রুমালের অভ্যন্তরে লুকিয়ে 'হাজার দানা'-এর তাসবীহ পাঠ করতেন। এরপর খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে আহার সমাধা করে মাগরিব নামাযের পর নফল আদায় করে তসবীহ নিয়ে বসতেন। এ সময় তাঁর নিকট সাক্ষাতের জন্য কেউ আসলে আলাপ করতেন। নতুবা ওয়াযীফা পড়তে থাকতেন। কোন কোন সময়ে দশটা থেকে বারটার মধ্যে আবার কোন কোন সময়ে দু'টা থেকে চারটার মধ্যে তুর্কী কয়েদীরা তাঁর নিকট সাক্ষাতের জন্য আগমন করলে তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত কাজ ছেড়ে আলাপ আলোচনা করতেন। (ড.এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন, প্রাগুক্ত)

২৫০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১; ফরীদুল ওয়াহীদী বলেন :

হযরত শায়খুল হিন্দের মুক্তি সংবাদে বিপ্লবী দলের নেতাকর্মীসহ সাধারণ জনগণ থেকে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সকলের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। বোম্বাইর মিনারা মসজিদে খেলাফত কমিটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও দেওবন্দের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী[২৫১], হাকীম আবদুর

رخصت کے وقت عجیب و غریب منظر تھا مسلمان تو مسلمان ہی تھے غیر مسلم بھی ازردہ اور نیم دیدہ تھے قیدی ہی نہیں بلکہ چھوٹے بڑے ساری ہی ذمہ داران اور افسران وداع کرنے کیلیے، بندرگاہ پر جمع تھے حضرت شیخ نے سواری پر قدم رکھا تو شیخ الاسلام خیر الدین افندی نے باواز بلند دعا مانگی حاضرین نے بھرائی ہوئی آوازوں سے آمین کہا مالٹا سے بڑے بڑے قیدی وزراء شاہزادگان افسران اور ذمہ داران حضرت رخصت ہوئے مگر ایسے روح پرور اجتماع ایسی تعظیم و تکریم جو ان بوریا نشین فقیروں کی کبھی کسی کے حصہ میں نہیں ائی تھی غیر مسلم افسران اور دیگر انگریز ذمہ داران اس غیر معمولی عقیدت و محبوبیت پر انگشت بدنداں تھے ص۲۱٤

২৫১. হযরত মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরী ১৩০৪ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানূতবীর অন্যতম সুযোগ্য ও মেধাবী শাগিরদ রূপে তিনি সুপরিচিত। ওয়ায নসীহত ও মুনাযারায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। গোটা কর্মজীবন বিদ্‌আত ও কাদিয়ানিয়্যাতের প্রতিরোধে কাজ করে যান। দুর্লভ কিতাব অধ্যয়ন এবং অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে তিনি ৮ হাজার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার সেই পাণ্ডুলিপিগুলো দারুল উলূম দেওবন্দের লাইব্রেরীতে দান করে দেন। মাওলানা মুরতাযা হাসান প্রথম জীবনে চাঁদপুরের বিভিন্ন মাদ্রাসায় সদরুল মুদাররিস হিসেবে কাজ করেন। স্বাধীনতা জিহাদেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। শেষ জীবনে দারুল উলূম দেওন্দের প্রথমত তালীমাত বিভাগের এবং পরে তাবলীগ বিভাগের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। তিনি হযরত

রায্‌যাক, নওয়াব মুহীউদ্দীন খান, মুফতী কিফায়েত উল্লাহ, ডাক্তার আনসারী, হাজী আহমদ মির্যা, মাওলানা আবদুল বারী, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বোম্বাইতে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনিও সকলকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতের সকল মানুষের মধ্যে নতুন জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছিল। বোম্বাই থেকে দেওবন্দ পৌঁছা পর্যন্ত প্রতিটি স্টেশনে হাজার হাজার জনতা তাঁকে এক নজর দেখার জন্য সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়ে পড়েছিল। ফলে বোম্বাই থেকে বাড়ী পৌঁছতে বেশ বিলম্ব ঘটে। ১৪ জুন সকাল ৯ টায় তিনি দেওবন্দে পদার্পণ করেন।[২৫২]

বস্তুত হযরত শায়খুল হিন্দ ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতার একটি বিশেষ মাইলফলক। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে অবিচল সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার যেই সুদৃঢ় ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন, সেই ভিত্তিই উত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদের যাঁতাকল থেকে ভারতের মুক্তি ছিনিয়ে আনে। তবে তিনি নিজে ঐ ভিত্তির উপর চূড়ান্ত সংগ্রামের ইমারত দেখে যাওয়ার সুযোগ পাননি। কারণ মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মাত্র ৫ মাস ২২ দিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন তাঁরই সুযোগ্য শাগিরদ ও স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, যিনি আমাদের এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচিত ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বয়ং হযরত শায়খুল হিন্দের হাতে লালিত হন এবং শায়খুল হিন্দ তথা ভারতীয় বিপ্লবী আলিমগণের দীর্ঘ ১ শত ১৭ বছরের জিহাদ ও সংগ্রামকে সফলতা ও পূর্ণতা প্রদান করেন। পরবর্তী আলোচনায় তাঁরই বিস্তারিত জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হল।

থানবীর (১৮৬২-১৯৪৩) মুরীদ ও মাজায ছিলেন। ১৩৭১/১৯৫১ সালে নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। (সায়্যিদ মাহবুব রেযবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩)

২৫২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৫-৬৫৭।

২য় অধ্যায়

জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম ও বংশ পরিচয়

এক

শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ১২৯৬ সালের ১৯ শাওওয়াল সোমবার দিবাগত রাত ১১টার সময় জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মস্থান ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত উন্নাও জেলার বাঙ্গারমৌ নামক মৌজা। পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ (১৮৫৩-১৯১৬) অন্যান্য পুত্রের নামের ধারা অনুসারে নাম রাখেন 'হুসাইন আহমদ'। জন্ম সন স্মরণ রাখার লক্ষ্যে আরবী বর্ণমালার সংখ্যামান অনুযায়ী শায়খুল ইসলামের অপর নাম রাখা হয়েছিল 'চেরাগ মুহাম্মদ'।[১] তিনি নিজ নাম হিসেবে সাধারণত 'হুসাইন আহমদ' ব্যবহার করতেন। তবে কখনো কখনো চেরাগ মুহাম্মদ ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

বংশগতভাবে শায়খুল ইসলাম ছিলেন হুসাইনী সায়্যিদ। বংশ পরম্পরায় তাঁর ৩৩ তম পূর্বপুরুষ ছিলেন শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন ইব্‌ন আলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা। এ বংশ বরাবরই ছিল ইল্‌ম ও আধ্যাত্মিকতার সার্থক ধারক ও প্রচারক। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তাঁর উত্তরপুরুষদের একটি শাখা পবিত্র মদীনা থেকে প্রথমে তিরমিয, তারপর লাহোর এবং আরো পরে ফয়যাবাদ জেলার এলাহ্‌দাদপুরে এসে বসতি স্থাপন করে। শায়খুল ইসলামের ২৭তম পূর্বপুরুষ ছিলেন সায়্যিদ মুহাম্মদ মাদানী। ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি মদীনা শরীফ থেকে তিরমিযে আসেন। তাঁরই প্রপৌত্র সায়্যিদ আহ্‌মদ তূখনা ওরফে 'তিমছালে

---

১. সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, নকশে হায়াত (করাচী : দারুল ইশাআত, ১ম খণ্ড, তা. বি.), পৃ. ১৫। 'আবজাদ'-(আরবী বর্ণমালার সংখ্যামান)-এর হিসাব অনুসারে চেরাগ মুহাম্মদ (چـراغ مـحمد) শব্দের সংখ্যামান হল: (৩+২০০+১+১০০০+৪০+৮+৪০+৪=) ১২৯৬।

২. মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী, ৩য় সং (ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃ ২৭।

রাসূল'[৩] ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম ও বুযর্গ। প্রথম জীবনে তিনি তিরমিয অঞ্চলে ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা দানের কাজ করেন। তারপর স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর তিরমিয থেকে লাহোরে এসে প্রচার কাজ শুরু করলে এখানে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আহমদ তূখনা হিজরী ৬১২ সালে লাহোরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর উত্তরপুরুষদের মধ্যে বহু সূফী ও মাশায়িখ ছিলেন। তাঁরা লাহোর থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।[৪]

এ সূফীগণের অন্যতম ছিলেন হযরত সায়্যিদ শাহ্ নূরুল হক টান্ডবী (আল-কাদিরী, চিশ্‌তী, সোহ্‌রাওয়ার্দী) রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি শায়খুল ইসলামের ১৭তম পূর্বপুরুষ এবং ফয়যাবাদের অন্তর্গত টান্ডার এলাহদাদপুরে প্রতিষ্ঠিত সায়্যিদ খান্দানের গোড়া পত্তনকারী। শায়খুল ইসলামের শৈশবকাল এখানেই অতিবাহিত হয়। হযরত শাহ্ নূরুল হক একজন উঁচুমানের বুযর্গ ছিলেন। বিশিষ্ট সূফী হযরত শাহ্ দাউদ চিশতী থেকে তিনি চিশ্‌তিয়্যা কালান্দারিয়্যা তরীকার খেলাফত লাভ করেন। জৌনপুর রাজ্যের স্বাধীন সুলতান ইব্‌রাহীম শাহ্ শারকী ছিলেন ধর্মপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী। শারকীর অপরিসীম উদারতা ও বদান্যতার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে উলামা ও মাশায়িখ এ অঞ্চলে ছুটে আসেন। তখন লাহোর, মুলতান ও দিল্লীর খ্যাতনামা ধর্মীয় কেন্দ্রগুলো পূর্বাঞ্চলে শাখা বিস্তার করতে থাকে।

হযরত শাহ্ নূরুল হক ঐ আমলেই টান্ডা আগমন (খ্রি.১৫০০) করে বসতি স্থাপন করেন। দিল্লী কিংবা জৌনপুরী সুলতানদের কেউ তাঁকে খানকা পরিচালনার জন্য ২৪টি গ্রামের জায়গীর প্রদান করেছিলেন।[৫]

---

৩. 'তূখনা' তুর্কী শব্দ। এর অর্থ হল 'দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাকারী'। সায়্যিদ আহমদ নিজ মুরশিদের খানকায় থাকা কালে একদা তাঁর মুরশিদ তাঁকে হুজরার ভিতরে প্রবেশের ডাক দিয়ে যিক্‌রে মগ্ন হন। সায়্যিদ আহমদ হুজরার প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দেখলেন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি সম্মুখেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রাতভর দাঁড়িয়ে থাকলেন। প্রত্যূষে মুরশিদ দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে 'তূখনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'তিমছাল' শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। ঐ যুগে জনৈক বুযর্গ স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই যুগে আপনার বংশধরের মধ্যে কেউ কি শারীরিক গঠনের দিক থেকে আপনার সাদৃশ্য আছে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদ আহমদ তূখনার নাম বললে তিনি 'তিমছালে রাসূল' উপাধিতেও ভূষিত হন। (মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২)

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

৫. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৮৭), পৃ ১৯।

শাহ্ নূরুল হক টান্ডা আগমনের পর দেখলেন যে, টান্ডা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর উপর 'রাজবহর' নামক গোত্রের লোকেরা আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং মুসলিম বাসিন্দাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জানায়। অধিকন্তু শাহ্ নূরুল হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শাহ্ নূরুল হক আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তাদের রাজাকে ভীত করে তোলেন। রাজা দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করলে তিনি দুর্গ দখল করেন। তারপর এ দুর্গের সন্নিকটে নতুন গ্রামের গোড়া পত্তন করে নিজ খান্দানের জন্য বসতি তৈয়ার করেন। আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা এলাকাটি অধিকৃত হয়েছিল বিধায় এর নাম রাখা হয় 'এলাহদাদপুরা'(আল্লাহ্ প্রদত্ত জনপদ)।[৬]

বংশগতভাবে[৭] শায়খুল ইসলাম ছিলেন 'নাজীবুত্ তারফায়ন' অর্থাৎ পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে সায়্যিদ। তাঁর পিতা ও মাতার বংশ পরম্পরা সায়্যিদ শাহ্ মুদন-এ গিয়ে একই ধারায় মিলিত হয়, যিনি ছিলেন তাঁরই পঞ্চম পূর্বপুরুষ।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৭. নক্শে হায়াত গ্রন্থে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ বংশের পরিচিতি ও ধারাবাহিকতা আলোচনা করেছেন। তিনি এ কথাও বলে দেন যে, বংশ নিয়ে অহংকার করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আল্লাহ্র নিকট ব্যক্তির আমলী জীবন সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ হবে। আকীদা, আমল ও আখ্লাকের পরিচ্ছন্নতা ব্যতিরেকে বংশগত মর্যাদার কোন মূল্য নেই। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ﴾

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে বংশের বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবরও নিবে না। যাদের আমলের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম আর যাদের পাল্লা হবে হালকা তারা এমন মানুষ যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। তারা স্থায়ী হবে জাহান্নামে। (২৩ ঃ ১০১-১০৩)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾

রাজকীয় জায়গীরদারীর সুবাদে শাহ্ নূরুল হক ও তাঁর উত্তরপুরুষদের পরিচালিত খানকার কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চলছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই স্বচ্ছল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর অর্থাৎ শায়খুল ইসলামের পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ (জ.১৮৫০ খ্রি.)-এর সময়ে পরিবারে দেখা দেয় ভীষণ অভাব অনটন। সিপাহী বিপ্লবোত্তর দেশজুড়ে সৃষ্ট অরাজকতার সুযোগে রাজবহরের তদানিন্তন অত্যাচারী রাজা 'ভেটী' (Bheety) পূর্ববর্তী শত্রুতার জের হিসেবে 'এলাহ্দাদপুরা'-এর উপর আক্রমণ চালায় এবং গোটা গ্রাম লুণ্ঠন করে। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ তখন মাত্র নয়/দশ বছরের কিশোর। তিনি পরিবারের অন্যদের সাথে টান্ডায় অবস্থিত আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এলাহ্দাদপুর দখলের পর রাজা পার্শ্বস্থ সেই গ্রামগুলোও অধিকার করে নেয় যেগুলো শায়খুল ইসলামের পূর্বপুরুষদের হাতে জায়গীর হিসেবে ছিল। এ ভাবে শায়খুল ইসলামের জন্মের পূর্বেই ঐ খান্দানে নেমে এসেছিল প্রচণ্ড অভাব অনটন।[৮] কিশোর হাবীবুল্লাহ পারিবারিক অনটনের মধ্যেই স্কুলের মডেল ক্লাস কোর্স সমাপ্ত করেন। তারপর লক্ষ্ণৌ থেকে টিচার্স ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করে প্রথমে উন্নাও জেলার সফীপুরে এবং পরে বাঙ্গারমৌ স্কুলে হেড মাস্টার পদে চাকুরী নেন। ফলত অভাব অনটন কিছু হ্রাস পায়। বাঙ্গারমৌ চাকুরী কালে তিনি সপরিবারে থাকতেন। সেখানেই শায়খুল ইসলামের জন্ম হয়েছিল।

শায়খুল ইসলামের পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ 'মৌলভী' নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। ফার্সী, উর্দু ও হিন্দি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন এবং স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ব্যক্তি জীবনে সূফী প্রকৃতির ছিলেন বিধায় লোকেরা মৌলভী বলে ডাকত। তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ বুযর্গ ছিলেন হযরত শাহ্ ফয্লুর রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ্ তাঁরই হাতে মুরীদ হন। তারপর শায়খের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থানপূর্বক যিক্র, ওয়াযীফা, শোগ্ল, মুরাকাবা ইত্যাদির মাধ্যমে তাসাওউফের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তিনি শাহ্

হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (৪৯ : ১৩)

উপরোক্ত সত্যকে নির্দেশ করছে। (নকশে হায়াত, পৃ ২৫)

৮. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, **সীরাতে শায়খুল ইসলাম** (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৮৮), পৃ ৫০-৫১।

গাঙ্গেমুরাদাবাদী থেকে খেলাফত লাভ করেন বলেও কথিত আছে।[৯] কবিতা রচনায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ফার্সী উর্দু ছাড়াও হিন্দী ভাষায় তিনি বহু না'ত ও শোকগাথা রচনা করে গিয়েছেন। শায়খুল ইসলামের মাতা[১০] ছিলেন একজন আবিদা নারী। তিনিও শাহ্ গাঙ্গেমুরাদাবাদীর মুরীদ ছিলেন। শেষরাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাহাজ্জুদ, যিক্র ও শোগ্‌ল তাঁর নিয়মিত আমল ছিল। শেষ বয়সে দৈনিক ২০০ বার সূরা ইখ্‌লাস তিলাওয়াত করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। এ নেকবখ্‌ত মাতার কোলেই লালিত হন হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী।[১১]

---

৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

১০. তাঁর মাতার নাম ছিল 'নূরুন্নিসা'। (ফরীদুল ওয়াহীদী, **মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী**, দিল্লী : কাওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২, পৃ ৩৪)

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাঁর শাজারায়ে নসব ;

سید حسین أحمد مدني بن سید حبیب الله بن سید
پیر علي بن سید جهانغیر بخش بن سید نور أشرف بن
شاه مدن بن شاه محمد ماه شاهي بن شاه خیر الله بن شاه
صفة الله بن شاه محب الله بن شاه محمود بن شاه لدهن بن
شاه قلندر بن شاه منور بن شاه راجو بن شاه عبد الواحد بن
شاه محمد زاهدي بن شاه نور الحق بن سید شاه زید بن سید شاه
أحمد زاهد بن سید شاه حمزة بن شاه أبو بكر بن سید شاه عمر
بن سید شاه محمد بن سید شاه أحمد توخنه تمثال رسول بن
سید علي بن سید حسین بن سید محمد مدني المعروف سید ناصر
ترمذي بن سید حسین بن سید موسى حمصة بن سید علي بن
سیدحسین أصغر بن الإمام علي زین العابدین بن الإمام حسین
ابن فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم

("শাজারায়ে মুবারকা" আল জমইয়্যত পত্রিকা, দিল্লী : জমইয়্যতে 'উলামায়ে হিন্দ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, পৃ ৮)

শিক্ষা

১৮৮৩/১৩০১ সালে শায়খুল ইসলামের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তখন তার বয়স মাত্র ৪ বছর কয়েক মাস। শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি দেন তাঁর বিদূষী জননী। বছর খানেক পর পিতার স্কুলে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলে তিনি ১৮৯২/১৩০৯ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে। ১৮৯৮/১৩১৬ সালে তিনি দারুল উলূমের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। শায়খুল ইসলামের অধ্যয়ন এ তিন প্রতিষ্ঠানেই ছিল। তন্মধ্যে বাড়ীর মক্তব ও পিতার স্কুলে পড়েন আট বছর, আর দেওবন্দে ছিলেন সাড়ে ছয় থেকে সাত বছর। এ ভাবে পনের বছরে তাঁর অধ্যয়ন পর্ব সমাপ্ত হয়। তখন বয়স হয়েছিল মাত্র ১৯ বছর। তবে ১৯০৮ সালে মদীনা থেকে তিন বছরের জন্য ভারতে ফিরে আসার পর এক বছর (যিলকাদা ১৩২৬ হি. থেকে শাবান ১৩২৭ হি.) দেওবন্দে হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট পুনরায় হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ হিসেবে তাঁর মোট অধ্যয়ন কাল দাঁড়ায় ১৬ বছর।[১২]

মাতার নিকট তিনি পবিত্র কুরআনের প্রথম ৫ পারা পড়েন। তারপর তাঁর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ। জন্মের সময় পিতা বাঙ্গারমৌ হাই স্কুলে থাকলেও শীঘ্রই তিনি সেখান থেকে নিজ বাড়ী এলাহদাদপুরের নিকটস্থ এক স্কুলে বদলী হয়ে আসেন। এ স্কুলেই শায়খুল ইসলামকে ভর্তি করা হয়। তিনি পিতার কাছে প্রত্যহ সকালে ধর্মীয় শিক্ষা এবং দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা লাভ করেন। তৎকালে স্কুলের শ্রেণীসমূহের নাম উপরের দিক থেকে গণনা করার রীতি ছিল। মডেল কোর্সের সর্বোচ্চ শ্রেণীকে বলা হত ১ম শ্রেণী আর সর্বনিম্ন শ্রেণীকে বলা হত ৮ম শ্রেণী। শায়খুল ইসলাম ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন এবং মাতৃভাষা উর্দু, ইতিহাস, ভূগোল, বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে সহপাঠীদের উপর তাঁর প্রাধান্য ছিল কিন্তু স্কুলশিক্ষা তাঁর পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি বিধায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষার এক বছর পূর্বেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দারুল উলূম দেওবন্দে।[১৩]

---

১২. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

১৮৯২/১৩০৯ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন।[১৪] তখন দারুল উলূমের সদ্‌র মুদার্‌রিস ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (১৮৫১/১২৬৮-১৯২০/১৩৩৯), মুহ্‌তামিম ছিলেন হযরত হাজী সায়্যিদ আবিদ হুসাইন[১৫] (১৮৩৪/১২৫০-১৯১২/১৩৩১) এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (১৮২৮/১২৪২-১৯০৫/১৩২৩)। দেওবন্দে শিক্ষার কাজে প্রধানত তাঁর তত্ত্বাবধান করেন হযরত শায়খুল হিন্দ। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমদ শায়খুল হিন্দের খাদিম ছিলেন বিধায় তিনি প্রথম দিন থেকেই শায়খুল হিন্দের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তারপর নিজ প্রতিভায় শায়খুল হিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। মীযান ও গুলিস্তাঁ থেকে অধ্যয়ন শুরু হয়। সবক উদ্বোধনের জন্য হযরত শায়খুল হিন্দের কাছে নেওয়া হলে সৌভাগ্যক্রমে সেখানে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীও (১৮৫২/১২৬৯-১৯২৭/১৩৪৬) উপস্থিত ছিলেন। শায়খুল হিন্দের অনুরোধে মাওলানা সাহারানপুরী তাঁর পাঠ শুরু করিয়ে দেন।[১৬]

দেওবন্দে তাঁর অধ্যয়ন কাল ছিল সাড়ে ছয় থেকে সাত বছর। এ সময়ে তিনি দরসে নিযামীর অন্তর্ভুক্ত ১৭টি বিষয়ের মোট ৬৭ খানা কিতাবের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ১১জন শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে বেশী সংখ্যক কিতাবের উস্তাদ ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ নিজে। তাঁর কাছে তিনি ২৪ খানা কিতাব পড়েন। তন্মধ্যে ১০ খানা কিতাব পড়েন শ্রেণীকক্ষে অন্যদের সঙ্গে। অবশিষ্ট ১৪ খানা কিতাব

---

১৪. সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, **তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ**, ২য় সং (দেওবন্দ ঃ ইদারায়ে ইহ্‌তিমামে দারুল উলূম, ১৯৯৩), পৃ ৮২।

১৫. হযরত হাজী সায়্যিদ আবিদ হুসাইন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন চিশ্‌তিয়্যা সাবিরিয়্যা তরীকার বিশিষ্ট পীর। তিনি দেওবন্দের ছাত্তা মসজিদে ইমামত করতেন। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি রামপুরের বিশিষ্ট বুযর্গ হযরত মিয়াঁজী করীম বখ্‌শ সাবিরীর খলীফা ছিলেন। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী থেকেও খেলাফত লাভ করেন। তিনি মুহাররম ১২৮৩/১৮৬৭ সাল থেকে রজব ১২৮৪/১৮৬৮ সাল সময় কালে সর্বপ্রথম মুহ্‌তামিম পদে গৃহীত হন। অতঃপর ১২৮৬/১৮৭০ সাল থেকে ১২৮৮/১৮৭২ সাল এবং সর্বশেষ রবীউল আওওয়াল ১৩০৬ হি. থেকে শাবান ১৩১০ হি. পর্যন্ত মোট ৩ বার এই পদে অধিষ্ঠিত হন। ২৭ যিলহাজ্জ ১৩৩১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। ২৮ যিলহাজ্জ শুক্রবার দেওবন্দে সমাধিস্থ করা হয়। (কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, **তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ**, করাচী, ১৯৭২ পৃ ৯৪; মাওলানা নাসীম আহমদ ফরীদী, জাওয়াহির পারে, **আল ফুরকান পত্রিকা**, লক্ষ্ণৌ, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ পৃ ৯৪)

১৬. আসীর আদরবী, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, **শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী ঃ জীবন ও সংগ্রাম** (ঢাকা ঃ জামান প্রিন্টার্স, ১৯৯১), পৃ ৬।

শায়খুল হিন্দ ক্লাস টাইমের পর ব্যক্তিগতভাবে পড়িয়ে দেন। শায়খুল হিন্দের এই বিশেষ যত্ন ও সুদৃষ্টির কারণে তাঁর পক্ষে দেওবন্দের শিক্ষাকোর্স স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল।[১৭]

শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যদের কাছেও তিনি ছিলেন স্নেহধন্য। তিনি যখন দেওবন্দে আসেন তখন বয়স ১৩ বছর হলেও শারীরিক গঠন খুবই হালকা ছিল যে, তাঁকে ১১ বছরের বেশী মনে হত না। এত অল্প বয়সে কোন ছাত্র নিজ পিতা-মাতা ও বাড়ীঘর ছেড়ে দূরদেশে শিক্ষার জন্য আসা ছিল অকল্পনীয়। তাই শিক্ষকগণ সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা ও হিসাব-নিকাশে পারদর্শিতার কারণে তিনি শিক্ষকগণের নিকট, এমনকি তাঁদের পরিবার-পরিজনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন বিধায় অন্দর মহলেও তাঁর যাতায়াতের অনুমতি ছিল। তিনি তাঁদের হিসাব-নিকাশ ও চিঠিপত্র লেখার কাজে সাহায্য করতেন। মহিলারাও তাঁকে খুব স্নেহ করত। বিশেষত শায়খুল হিন্দের স্ত্রী তাকে খুবই ভালবাসতেন। অন্দর-মহলে এই যাতায়াতের কারণে তাঁর নাম পড়ে গিয়েছিল 'মাস্তূরাতী মুন্‌শী' (মহিলা মহলের করণিক)।[১৮]

---

১৭. মুহাম্মদ সালমান মনসূরপুরী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সংকলিত, **শায়খুল ইসলাম মাদানী : হায়াত ওয়া কারনামে** (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৮৮), পৃ ৪৫০-৪৫৮। শায়খুল হিন্দের নিকট পঠিত কিতাবগুলো ছিল,

(١) دَسْتُوْرُ الْمُبْتَدِي (٢) زَرَّادِي (٣) زَنْجَانِي (٤) مَرَاحُ الْأَرْوَاح (٥) قَالَ أَقُوْلُ (٦) اَلْمِرْقَاتُ (٧) اَلتَّهْذِيْبُ (٨) شَرْحُ التَّهْذِيْب (٩) اَلْقُطْبِي تَصْدِيْقَات (١١) مِيْر قُطْبِي (١٢) مُفِيْدُ الطَّالِبِيْنَ (١٣) نَفْحَةُ الْيَمَنِ (١٤) اَلْمُطَوَّلُ (١٥) اَلْهِدَايَةُ الْأَخِيْرَيْن (١٦) اَلْجَامِعُ لِلْإِمَامِ التِّرْمِذِي (١٧) اَلصَّحِيْحُ لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ (١٨) اَلسُّنَنُ لِلْإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ (١٩) اَلتَّفْسِيْرُ لِلْبَيْضَاوِيِّ (٢٠) نُخْبَةُ الْفِكَر (٢١) شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيِّ (٢٢) حَاشِيَةٌ لِلْعَلَّامَه الْخَيَالِيِّ (٢٣) اَلْمُوَطَّأُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ (٢٤) اَلْمُوَطَّأُ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ.

১৮. মাদানী, নক্‌শে হায়াত, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

তিনি যে বছর দারুল উলূম ভর্তি হন সেটি ছিল দারুল উলূমের ২৭তম শিক্ষাবর্ষ। তখন পর্যন্ত দারুল উলূমে 'মাতবাখ' (Dining) বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান এবং দেওবন্দবাসীদের সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাহ হত। সে অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিদ্দীক আহমদের আহারের ব্যবস্থা হয় হযরত শায়খুল হিন্দের গৃহে আর শায়খুল ইসলাম মাদানীর আহারের ব্যবস্থা হয় হযরত কাসিম নানূতবী (১৮৩২/১২৪৮-১৮৮০/১২৯৭)-এর পুত্র হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ (১৮৬২/১২৭৯-১৯২৮/১৩৪৭)-এর গৃহে। হযরত শায়খুল ইসলাম বলেন, আমি যত দিন দেওবন্দে ছিলাম তার প্রায় পূর্ণ সময়টায় আমার আহারের ব্যবস্থা ছিল হাফিয সাহেবের বাড়ীতে।[১৯]

দুই

শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকে মান্‌তিক (যুক্তিবিদ্যা) ও ফাল্‌সাফা (গ্রীক দর্শন) অধ্যয়নের প্রতি তাঁর বেশী ঝোঁক ছিল। কিছুদিন পর এটি পরিবর্তিত হয়ে আরবী সাহিত্য অধ্যয়নের দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মাকামাতে হারীরী, দীওয়ানে মুতানাব্বী, সাবআ মুআল্লাকা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর প্রায় ঠোঁটস্থ ছিল। কিন্তু হাদীসের অধ্যয়ন শুরু হলে আরবী সাহিত্যের আকর্ষণও কমে যায়। নবীজীর ভালবাসা ও হাদীসে রাসূলের আকর্ষণ তাঁকে এত বেশী আকৃষ্ট করে যে, তখন থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তিনি নিজকে হাদীস চর্চার কাজেই ব্যাপৃত রাখেন।[২০]

প্রথম তিন বছর বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। পরীক্ষায় প্রত্যেক কিতাবের পূর্ণমান ছিল ২০ নম্বর। তন্মধ্যে ১ম বিভাগ ২০, ২য় বিভাগ ১৯ আর ৩য় বিভাগ ছিল ১৮। তিনি অধিকাংশ কিতাবে ২০ নম্বর লাভ করেন। এমনকি কোন কোন কিতাবে পুরস্কার স্বরূপ ২০-এর বেশী নম্বরও পান। 'আত্ তাহযীব' গ্রন্থের পরীক্ষায় তিনি পান ২৩ নম্বর। চতুর্থ বছর থেকে প্রথম লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়। দারুল উলূমের লিখিত পরীক্ষার পদ্ধতি অনবহিত থাকার দরুন ঐ বছর তাঁকে একাধিক কিতাবে অকৃতকার্য হতে হয়েছিল। তবে শীঘ্রই তিনি নিজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ১৮৯৭/১৩১৪ সালে পরীক্ষার পূর্ণমান ৫০ নির্ধারিত হয়। তিনি সব পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অর্জনসহ অতিরিক্ত

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।
২০. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।

নম্বর লাভ করেন। 'সদ্‌রা' কিতাবের পরীক্ষায় পরীক্ষক হযরত মাওলানা আবদুল আলী (মৃ.১৩৪০হি.) তাকে ৫০-এর মধ্যে ৭৫ নম্বর প্রদান করেন, যা ছিল দারুল উলূমের ইতিহাসে বিরল।[২১]

১৮৯৮/১৩১৬ সালে তাঁর শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত হয়। তাঁর শিক্ষাজীবনে দেওবন্দের সদ্‌র মুদাররিস (শায়খুল হাদীস) ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ। তবে মুহ্‌তামিম (Rector) পদে একাধিক ব্যক্তিত্ব যথা হযরত হাজী সায়্যিদ আবিদ হুসাইন, হযরত সায়্যিদ ফযলে হক দেওবন্দী,[২২] হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর নানূতবী[২৩] ও হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ[২৪] দায়িত্ব পালন করেন। শায়খুল

---

২১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯।

২২. হযরত সায়্যিদ ফযলে হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি দেওবন্দের রেযবী সায়্যিদ বংশের বিশিষ্ট বুযর্গ ও হযরত নানূতবীর মুরীদ ছিলেন। প্রথম জীবনে সাহারানপুর সরকারী শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি মজলিসে শূরার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩১০/১৮৯২ সালে হাজী আবিদ হুসাইন মুহতামিমের পদ থেকে ইস্তফা দিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন এবং ১ বছর কাল দায়িত্ব পালন করেন (সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৬-২২৭)

৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর নানূতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত শাহ্ আবদুল গনী মুজাদ্দিদীর অন্যতম শাগিরদ। ১৮৫৭ সালে শামেলীর যুদ্ধে হযরত নানূতবীর সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেন। তিনি বেরেলী সরকারী কলেজে চাকুরী করতেন। অবসর গ্রহণের পর কিছু দিন বেরেলীর মাতবায়ে সিদ্দীকীতে কাজ করেন। ঐ সময় 'সিরাজুস্ সালিকীন' শিরোনামে ইমাম গাযালীর 'মিন্‌হাজুল আবিদীন' গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাসাওউফ শাস্ত্রে তাঁর আরো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১ বছরের অধিককাল দারুল উলূমের মুহ্‌তামিম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। (প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭-২২৮)

২৪. হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত নানূতবীর পুত্র ও মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিবের পিতা। তিনি ১২৭৯/১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফ্‌য করার পর বুলন্দশহর জেলার গালাওঠিতে অবস্থিত মানবাউল উলূম মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন মুরাদাবাদের শাহী মাদ্রাসায় মাওলানা আহমদ হাসান (১৮৫০-১৯১১)-এর নিকট। তারপর দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট আরবী সাহিত্য ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব নানূতবী (১৮৩৪-১৮৮৬)-এর নিকট জামি তিরমিযীর কিছু অংশ পড়েন। সর্বশেষে হযরত গাঙ্গুহীর নিকট 'সিহাহ্ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। তিনি ১৩০৩/১৮৮৫ সালে দারুল উলূমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। মিশকাতুল মাসাবীহ, তাফসীরুল জালালায়ন, সহীহ্ মুসলিম, সুনান ইব্‌ন মাজা, মীর যাহিদ প্রভৃতি কিতাব পড়াতেন। ১০ বছর শিক্ষকতার পর ১৩১৩/১৮৯৫ সালে হযরত গাঙ্গূহীর পরামর্শক্রমে দারুল উলূমের মুহ্‌তামিম নিযুক্ত হন। তিনি আমৃত্যু (১৩৪৭/১৯২৮

ইসলাম তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং সকলের স্নেহ লাভে ধন্য হন।

তাঁর শিক্ষা কালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী (১৮৭২/১২৮৯-১৯৪৪/১৩৬৩), আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী[২৫] (১৮৭৫/১২৯২-১৯৩৩/১৩৫২) ও মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ দেহলবী (হি. ১২৯২-১৩৭২) প্রমুখ দারুল উলূমের ছাত্র ছিলেন। মাওলানা সিন্ধী হি. ১৩০৭ সালে দাওরা হাদীসে ভর্তি হলেও সে

সাল) উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুহ্তামিম হওয়ার পরও উল্লিখিত কিতাবসমূহের পাঠদান অব্যাহত রাখেন। তাঁর দায়িত্ব কালে দারুল উলূমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ঐ সময়কে দারুল উলূমের স্বর্ণযুগও বলা যায়। তিনি ১৩৪৭/১৯২৮ সালে দারুল উলূমের বিশেষ কাজে হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) গমন করলে প্রত্যাবর্তনের পথে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পথে নিযামাবাদ রেল স্টেশনে ৩ জুমাদাল উলা ১৩৪৭/১৯২৮ সালে ইন্তিকাল করেন। হায়দ্রাবাদের 'খিত্তাহ্ সালিহীন' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। (নাসীম আহমদ আমরূহী, "মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহমদ", মাসিক আল ফোরকান, লক্ষ্ণৌ, মার্চ, ১৯৭৬, পৃ ২৬-২৭; সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০)

২৫. হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দের শাগিরদ, দারুল উলূমের কৃতি সন্তান ও উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি কাশ্মীরের বিশিষ্ট সায়্যিদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সায়্যিদ মুআয্যম শাহ্। ৪ বছর বয়সে পিতার নিকট পবিত্র কুরআনের সবক শুরু হয়। মাত্র দেড় বছরে কুরআন মজীদসহ ফারসী প্রাথমিক স্তরের কিতাবসমূহ শেষ করেন। তারপর মাওলানা গোলাম মুহাম্মদের নিকট ফারসী অধ্যয়ন করেন। ১৪ বছর বয়সে হাযারা জেলার কেন্দ্রীয় মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ৩ বছর অধ্যায়ন করেন। হি. ১৩০৮ সালে দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট আরবী উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন গ্রন্থসহ 'সিহাহ্ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করে চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন। তিনি হযরত গাঙ্গুহীর কাছে মুরীদ হন এবং খেলাফত প্রাপ্ত হন। শিক্ষা সমাপনের পর দিল্লীর আমীনিয়্যা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কাশ্মীরের ফয়যে আঁম মাদ্রাসায় ২ বছর শিক্ষকতার পর ১৯০৫ সালে হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা গমন করেন। সেখানে ১৯০৯ পর্যন্ত অবস্থান করে তথাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। ১৯০৯ সালে হিজায থেকে দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে দারুল উলূমের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৯১৫ সালে তিনি সহকারী সদ্র মুদাররিস নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে সদ্র মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৭ সালে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষকদের এক মতদ্বৈততা ঘটে। ঐ সময় তিনি ইস্তফা দিয়ে ডাভেলের ইসলামিয়্যা মাদ্রাসায় চলে যান এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সেখানে শায়খুল হাদীস থাকেন। শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে দেওবন্দের নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। ২৯ মে ১৯৩৪ সালে ইন্তিকাল করেন। দেওবন্দের ঈদগাহ সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। (সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, ইয়াদরফতেগান, করাচী, ১৯৫৫ পৃ ১৬৯-১৭০; আন্যার শাহ্ মাসউদী, নক্শে দাওয়াম, দেওবন্দ, শাহ্ একাডেমী, ১৯৮৮ খৃ, পৃ ২৭-৫৭)

বছর দেওবন্দে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৩১৫ সালে পুনরায় ভর্তি হন[২৬] এবং শায়খুল ইসলামের সঙ্গে দাওরা সম্পন্ন করেন। আল্লামা কাশ্মীরী শায়খুল ইসলাম থেকে দু'বছর আগে (১৮৯০/১৩০৭) দারুল উলূমে ভর্তি হন এবং তাঁর ফারিগ হওয়ার তিন বছর আগে (১৮৯৬/১৩১৩) অধ্যয়ন শেষ করে চলে যান। আল্লামা কাশ্মীরী দাওরা পড়ার বছর মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ দেহলবীও দাওরা পড়েন। শায়খুল ইসলাম ১৯০৮/১৩২৬ সালে শায়খুল হিন্দের নিকট পুনরায় হাদীস অধ্যয়ন করলে[২৭] ঐ বছর হযরত মাওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী[২৮] (১৮৮৯/১৩০৭-১৯৭২/১৩৯২), হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বল্য়াবী[২৯] (হি.

---

২৬. আবদুর রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান (লাহোর : মাকতাবায়ে রশীদিয়্যা লিমিটেড, ১৯৬৯), পৃ ৪০৫।

২৭. মাদানী, নক্শে হায়াত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

২৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতৃভূমি মীরাঠের হাপুড়-এ অবস্থিত। তাঁর পিতামহ সায়্যিদ আবদুল করীম আজমীরের পুলিশ অফিসার ছিলেন। সেখানে পিতামহের সাথে তাঁর পিতা অবস্থান করতেন। তিনি ১৮৮৯ সালে পিতামহের বাসগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ বছর বয়সে মাতার নিকট কুরআন মজীদ অধ্যয়ন শুরু করেন। পরিবারের অন্যদের কাছে ফারসী ভাষার বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়নের পর ১২ বছর বয়সে হাপুড়ের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা খালিদের নিকট আরবী সাহিত্য, সরফ ও নাহ্ব অধ্যয়ন করেন। তিনি গালাওঠীর মান্বাউল উলূম মাদ্রাসায় মাওলানা মজীদ আলীর নিকট ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। অতঃপর দিল্লীর সরকারী মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৮ সালে হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট 'সিহাহ সিত্তাহ' অধ্যয়ন করেন। পরে আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর নিকটও হাদীস অধ্যয়ন করেন। ১৯১০ সালে তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এক বছর পর শায়খুল হিন্দ তাঁকে মুরাদাবাদের শাহী মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস পদে মনোনীত করে প্রেরণ করেন। ঐ পদে তিনি দীর্ঘ ৪৮ বছর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর শায়খুল ইসলাম মাদানীর ইন্তিকালের পর ১৯৫৭ সালে তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দের সদর মুদার্রিস ও শায়খুল হাদীস নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলনের সময় তিনি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। হযরত শায়খুল ইসলামের জীবদ্দশায় তিনি ২ বার জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। শায়খুল ইসলামের ইন্তিকালের পর আমৃত্যু (১৯৭২ সাল পর্যন্ত) তিনিই জমইয়তের সভাপতি থাকেন। ২০ সফর ১৩৯২ হি. ১৫ এপ্রিল ১৯৭২ সালে তাঁর ওফাত হয়। (সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৩-২১৫)

২৯. হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহীম বল্য়াবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পূর্ব ইউপি-এর বল্য়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মা'কূলাত শাস্ত্রে তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ফারসী প্রাথমিক

১৩০৪-১৩৮৭) ও হযরত মাওলানা মানাযির আহ্সান গীলানী[৩০] (হি. ১৩১০-১৩৭৫) তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম ১৯১০ সালে (এপ্রিল ১৬-১৭-১৮) দস্তারে ফযীলত (পাগড়ী) লাভ করেন। ঐ বছর অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে দাস্তারবন্দী (Convocation) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৬ বছরের সকল অধ্যয়নোত্তীর্ণকে পাগড়ী দেওয়া হয়েছিল। শায়খুল হিন্দ নিজে তাঁদের পাগড়ী পরিয়ে দেন। প্রথম পাগড়ীটি দেওয়া হয়েছিল হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীকে। তাঁর পরই দেওয়া হয় শায়খুল ইসলাম মাদানীকে। এ অনুষ্ঠানে অধ্যয়নোত্তীর্ণদের সকলে ১টি করে সবুজ রংয়ের পাগড়ী লাভ করেন। কিন্তু শায়খুল ইসলাম লাভ করেছিলেন ৩টি পাগড়ী। তন্মধ্যে প্রথমটি প্রদান করেন হযরত শায়খুল হিন্দ, দ্বিতীয়টি দেন হযরত গাঙ্গূহীর

শিক্ষা জৌনপুরে মাওলানা হাকীম জামীলুদ্দীনের নিকট লাভ করেন। মা'কূলাত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন মাওলানা ফারূক আহমদ চিরয়াকোটী ও মাওলানা হিদায়ত উল্লাহ খান (মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদীর শাগিরদ)-এর নিকট। দীনিয়্যাতের অন্যান্য কিতাব পড়েন হযরত গাঙ্গূহীর বিশিষ্ট শাগিরদ মাওলানা আবদুল গাফ্ফারের নিকট। অতঃপর হি. ১৩২৫ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন। ১৩২৭ সালে অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। তিনি ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৪০ থেকে ১৩৪৪ পর্যন্ত বিহার ও আযমগড়ের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৪৪ হিজরীতে পুনরায় দারুল উলূম আসেন। ১৩৬২ সালে হযরত কাশ্মীরীর সাথে ডাভেল চলে যান। ১৩৬৪ সালে চট্টগ্রামের মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৩৬৬ সালে পুনরায় দেওবন্দ আসেন। শায়খুল ইসলাম মাদানীর ওফাতের পর তিনি সদর মুদাররিস নিযুক্ত হন এবং ১৩৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। (প্রাগুক্ত, পৃ ২১৬-২১৭ ; আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১)

৩০. বিহারের অন্তর্গত গীলানের অধিবাসী হযরত মাওলানা মানাযির আহ্সান রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরী ১৩১০ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি নিজ পিতৃব্য হাকীম সায়্যিদ আবুন নাসর-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূম ভর্তি হন। হযরত শায়খুল হিন্দ, হযরত কাশ্মীরী ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ১৩৩২ হিজরীতে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপত্র 'আল কাসিম' পত্রিকার সম্পাদক পদে কাজ করেন। কয়েক বছর পর হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) জামিয়া উসমানিয়্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দীনিয়্যাত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। হায়দ্রাবাদে দীর্ঘ ২৫ বছর গবেষণা ও শিক্ষা দানের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি 'সাওয়ানিহে কাসিমী' শিরোনামে ৩ খণ্ডে হযরত নানূতবীর জীবনচরিত রচনা করেন। ২৫ শাওওয়াল, ১৩৭৫ হিজরী/৫ জুন ১৯৫৬ খৃ. তাঁর ওফাত হয়। (আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১; সায়্যিদ মাহবুব রেযবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯)

সাহেবযাদা হাকীম মাওলানা মাসউদ আহমদ আর তৃতীয়টি দেন মজলিসে শূরার অন্যতম সদস্য হযরত মাওলানা আহমদ রামপুরী। অনুষ্ঠানে হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী[৩১] ও আলীগড়ের সাহেবযাদা আফতাব আহমদ খানসহ

৩১. হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৫ রবীউস্‌সানী ১২৮০ হি./১৯ মার্চ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি কুরআন মজীদ হিফয্ করেন। অতঃপর মাধ্যমিক স্তরের ফারসী সাহিত্য এবং প্রাথমিক স্তরের আরবী ভাষা থানাবনে মাওলানা ফত্‌হ্ মুহাম্মদের নিকট অধ্যয়ন করেন। উচ্চস্তরের ফারসী সাহিত্য স্বীয় মাতুল মাওলানা ওয়াজিদ আলীর নিকট লাভ করেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দে ১২৯৫/১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হয়ে ৫ বছর অধ্যয়ন করে দাওরা হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর বিশিষ্ট উস্‌তাদগণের মধ্যে ছিলেন- মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব নানূতবী, শায়খুল হিন্দ মাহ্‌মূদ হাসান, মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মদ, মাওলানা আবদুল আলী এবং মুল্লা' মাহ্‌মূদ প্রমুখ। হযরত থানবী ছিলেন বিশ্ব সেরা আলিম, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্, সংস্কারক, সূফী ও আরিফ বিল্লাহ। হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, তাসাওউফ, তাজবীদ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি চার শতেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন ওআয-নসীহতসহ যা' মুদ্রিত হয়েছে এর সংখ্যা সহস্রাধিক। তিনি হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী থেকে সুলূকের তালকীন লাভ করেন এবং হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী থেকে খেলাফত লাভ করেন। উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বের শত শত লোক তাঁর নিকট বায়আত হয়ে যাহিরী ও বাতিনী ফয়য লাভে সক্ষম হয়েছে। তিনি 'হাকীমুল উম্মত' ও 'মুজাদ্দিদে মিল্লাত' উপাধিতে ভূষিত হন। মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দ চিন্তাধারার ঐ দলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন যাঁরা 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই দলে মাওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানী, মাওলানা যাফর আহ্‌মদ থানবী, মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী প্রমুখ ছিলেন। হযরত থানবী মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি ইসলামী রাষ্ট্র কামনা করেছিলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে লক্ষ্ণৌর এক সম্মেলনে তিনি বলেন, আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং আমি দুআ করি যে, আল্লাহ্ তাআলা ভারতে পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করেন। ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য মাওলানা থানবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সম্মেলনে তাঁর অংশগ্রহণ করার সংকল্প থাকলেও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় তিনি যোগদান করতে পারেননি। তবে তিনি একপত্রে মুসলিম লীগের কামিয়াবীর জন্য দুআ করেন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করার পর ২০ জুলাই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। থানাবনে হযরত হাফিয যামিন শহীদ (মৃ. ১৮৫৭)-এর মাযারের নিকট তাঁকে সমাহিত করা হয়। (খাজা আযীযুল হাসান, **আশরাফুস্ সাওয়ানিহ্**, লাহোর : সানাউল্লাহ্ খান এন্ড সন্স, ১৯৬০, ১ম খণ্ড, পৃ ১৭-৪৫; আবদুল কায়্যুম, **তারীখে আদ্‌বিয়ানে মুসলমানানে পাকিস্তান ও হিন্দ**, পাঞ্জাব : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২, ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৯-৪১৯; প্রফেসর আহ্‌মদ সাঈদ, **মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী আওর তাহ্‌রীকে আযাদী**, লাহোর : ফীরোয এন্ড সন্স, ১৯৭৫, পৃ ১৫২-১৫৪)

অনেকে বক্তব্য রাখেন। একই সঙ্গে তিনটি পাগড়ী লাভ করা ছিল শায়খুল ইসলামের বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর।[৩২]

মদীনা গমন

এক

১৮৯৮/১৩১৬ সালে দেওবন্দের শিক্ষা কোর্স সমাপ্তির বছর তিনি পিতামাতার সাথে মদীনা শরীফ গমন করেন। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। তাঁর পিতা হিজরতের উদ্দেশ্যেই গমন করেন। কিন্তু তিনি কিংবা পরিবারস্থ অন্য কেউ হিজরতের নিয়্যত করেননি। হযরত শায়খুল ইসলাম সেই মুহূর্তে মদীনায় যেতে মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না। কারণ তিনি আরো এক বছর হযরত শায়খুল হিন্দের সংস্পর্শে দেওবন্দ অবস্থান করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পিতার অনড় সিদ্ধান্তের কারণে শেষ পর্যন্ত নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। হিজরতের নিয়্যতে গমনকারীদের উপর সাধারণত বহু কঠিন পরীক্ষা আরোপিত হয়ে থাকে। তখন অনেকে অধৈর্য হয়ে হিজরত ভঙ্গ করে স্বদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং অহেতুক গুনাহ্গার হয়। এ কারণে হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত হাজী সাহেব উভয়ে শায়খুল ইসলাম ও তাঁর ভ্রাতা মাওলানা সিদ্দীক আহমদকে মদীনা শরীফে শুধু সাময়িক অবস্থানের নিয়্যত করতে পরামর্শ দেন। যেন পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ থাকে। হযরত শায়খুল ইসলাম ও তাঁর ভ্রাতা সেই পরামর্শ অনুসারেই কাজ করেছিলেন।[৩৩]

---

৩২. আসীর আদরবী. প্রাগুক্ত ; পৃ ১০৫।

৩৩. প্রাগুক্ত. পৃ ৪৫-৪৬। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ পবিত্র মদীনায় অবস্থানের ফযীলত লাভ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে ছিলেন। মদীনা শরীফের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী ইরশাদ করেছেন:

اَلْمَدِيْنَةُ مُهَاجَرِيْ وَمَضْجَعِيْ مِنَ الْأَرْضِ وَحَقٌّ عَلٰى أُمَّتِيْ أَنْ يُكْرِمُوْا جِيْرَانِيْ مَا اجْتَنَبُوْا الْكَبَائِرَ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ، وَقَالَ مَنْ صَبَرَ عَلٰى لَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّيْ أَكُوْنُ لَهٗ شَفِيْعًا

তিনি ১৯১৬/১৩৩৫ সাল পর্যন্ত ১৮ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁকে ৩ বার ভারতে প্রত্যাগমন করতে হয়েছিল। মদীনা শরীফ পৌছে ২ বছর অবস্থানের পরই তাঁর পীর হযরত গাঙ্গূহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে তলব করেন। ফলে ১৯০০/১৩১৮ সালে প্রথম বার ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং প্রায় ২ বছর হযরত গাঙ্গূহীর সংসর্গে থাকার পর ১৯০২/১৩২০ সালে মদীনা চলে যান। ১৯০৮/১৩২৬ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য মদীনায় উপযুক্ত পাত্রীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি বিধায় আবারো ভারতে ফিরে আসতে হয়। বাহ্যিক এ উপলক্ষকে সামনে রেখে তিনি ভারতে ৩ বছর অবস্থান করেন। তন্মধ্যে প্রথম বছর হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট পুনরায় হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় বছর দারুল উলূমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৃতীয় বছর (১৯১০) দস্তারবন্দী মহাসম্মেলনের কাজকর্ম শেষ করে ১৯১১/১৩২৯ সালে পবিত্র মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। বিবাহের সময় তাঁর উপর শর্ত করা হয়েছিল যে, মদীনা চলে যাওয়ার ১/২ বছর পর স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে এসে সাক্ষাৎ করে যেতে হবে। এ শর্ত পূরণের জন্য ১৯১২/১৩৩১ সালে তাঁকে আবার আসতে হয়। এ সফরে বেশী দিন থাকার সুযোগ হয়নি। তাই ৪ মাস পরই মদীনায়[৩৪] চলে যান। এভাবে মোট ১৮ বছরের মধ্যে ১৩ থেকে ১৪

وَشَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (كنز العمال ج ٦) عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا اَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ لَا يَدَعُهَا اَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا اِلَّا اَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ اَحَدٌ عَلٰى لَاْوَائِهَا وَجَهْدِهَا اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ — وزاد فى رواية وَلَا يُرِيْدُ اَحَدٌ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اِلَّا اَذَابَهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ اَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِى الْمَاءِ — رواه مسلم انظر الترغيب و الترهيب للامام الحافظ تقى الدين المنذرى — الجزء الثانى — دار الفكر بيروت لبنان — صفحة ٢١٩ — ٢٣١

৩৪. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১।

বছর মদীনায় অবস্থান করেন। অবশিষ্ট ৫ থেকে সাড়ে ৫ বছর ভারতে অবস্থান করেন।

পিতার নেতৃত্বে পরিবারের ১২ সদস্যবিশিষ্ট কাফেলার সঙ্গে শায়খুল ইসলাম ১৮৯৯/১৩১৭ সালের ১২ মুহার্‌রম মদীনায় পৌছেন। হিজরতকারীদের প্রতি আরোপিত কঠিন পরীক্ষার বিষয়ে ইতোপূর্বেই হযরত হাজী সাহেব থেকে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, সে আমলে আমি নিজেও বহু মুহাজির পরিবারকে বাধ্য হয়ে অনুচিত কর্মে লিপ্ত হতে দেখেছি। মাদানী পরিবারের উপরও এ ধরনের কঠিন পরীক্ষা এসেছিল। বিশেষত আবাসন, রুজি-রোজগার ও ভাষার সমস্যা তাঁদেরকে জটিলতায় ফেলে দেয়। ভিন্ন আবহাওয়া, অপরিচিত পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কারণে প্রথম ৩ বছর তাঁরা ভীষণ দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিবাহিত করেন। মক্কায় হাজী সাহেব নবাগত এ পরিবারকে অত্যধিক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করেছিলেন বলে তাঁদের পক্ষে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছিল।[৩৫]

পবিত্র মদীনা থেকে হযরত শায়খুল ইসলামের কর্মজীবন শুরু হয় (১৯০০ খ্রি.)। তিনি সেখানে পৌছে মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এ শিক্ষকতা থেকে কোন বেতন নিতেন না বলে জীবিকার উপার্জনে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হয়েছিল। তৎকালে মদীনায় হস্তশিল্প, কৃষি ও চাকরী-নকরীর প্রচলন থাকলেও সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। রোজগারের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে ভিনদেশীয় নবাগতদের জন্য কর্মসংস্থান লাভ ছিল দুরূহ ব্যাপার। অগ্যতা ব্যবসা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

তাঁর পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ মাত্র ৫,০০০/- টাকা নিয়ে ভারত থেকে মদীনায় পৌছেন। পৌছার পর অবশিষ্ট টাকা শরীঅতের অংশ বন্টনের নিয়মে পরিবারস্থ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। ঐ টাকা মূলধন করেই তিনি ও তাঁর ভ্রাতাগণ মদীনার 'বাবুর্‌ রহমত' ও 'বাবুস্‌ সালামের' মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি দ্রব্যাদির ব্যবসা শুরু করেন।[৩৬] শিক্ষকতার অবসরে তিনি নিজে দোকানে বসে বিক্রয়ের কাজ করতেন। ক্ষুদ্র দোকানের আয় দ্বারা বিরাট পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব হচ্ছিল না বিধায়

---

৩৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

৩৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (দিল্লী : কাওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২) পৃ ৪৬।

খেজুরের মৌসুমে খেজুর কিনে হজ্জের সময় তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাতেও কোন সুফল দেখা দেয়নি। ফলে তাঁকে মদীনার সরকারী গ্রন্থাগার 'কুতুবখানা মাহমূদিয়্যা' ও 'কুতুবখানা শায়খুল ইসলাম'-এ পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কপি নকলের কাজ করতে হয়।[৩৭] বস্তুত এ কালটি ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক রিয়াযত ও মুজাহাদার কাল। হযরত হাজী সাহেব নির্দেশিত আওরাদ ও ওযায়িফ তাঁকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আদায় করতে হত। তাছাড়া আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন গৃহস্থালির অনেক কাজও করতে হত নিজ হাতে। শিক্ষকতা, ওয়াযীফা আদায় ও গৃহের কাজ সম্পাদনে প্রচুর সময় ব্যয় হত বলে দোকানে কিংবা কপি নকলের কাজে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সম্ভব হত না। তাই নিদারুণ অভাব-অনটনের মধ্যেই গোটা পরিবারের দিন কাটে।

এ পরিবারের উপর সবচেয়ে কষ্টকর সময় অতিবাহিত হয় ১৯০১/১৩১৯ সালে। শায়খুল ইসলাম ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমদ হযরত গাঙ্গুহীর নির্দেশে ভারত প্রত্যাগমন করলে পরিবারের যৎসামান্য আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ পুত্রদ্বয়ের আধ্যাত্মিক দীক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে তাঁদের যেতে অনুমতি দেন। তখন গোটা পরিবার তাঁর অপর ভ্রাতা মাওলানা সায়্যিদ আহমদের টিউশনি থেকে প্রাপ্ত মাসিক মাত্র ২০ টাকা আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সংসারে অভাব-অনটন এত বৃদ্ধি পায় যে, বহু দিন অনাহারে অতিবাহিত হয়েছিল।[৩৮] আবাসন সমস্যাও তখন প্রকট আকার ধারণ করে। তাঁর পিতা অনেক টাকা ঋণী হয়ে যান। দীর্ঘ ৫/৬ মাস এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৯০২/১৩২০ সালে কতিপয় শুভাকাঙ্ক্ষীর চেষ্টায় ভূপাল সরকারের পক্ষ থেকে সায়্যিদ হাবীবুল্লাহর নামে ২০ টাকা মাসিক ভাতা চালু হলে অভাব সামান্য লাঘব হয়। এদিকে শায়খুল ইসলাম ভারতে পৌঁছলে ভারতে অবস্থিত তাঁর পিতার পীরভাইগণ মদীনায় তাঁদের সাংসারিক দুরবস্থা জেনে দুঃখিত হন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে সায়্যিদ হাবীবুল্লাহকে বেশ কিছু টাকা হাদিয়া দেন। শায়খুল ইসলাম ঐ টাকা মদীনায় হুন্ডি মারফত পাঠিয়ে দিলে পিতা ঋণ থেকে মুক্তি পান এবং সংসারে কিঞ্চিত সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।[৩৯]

---

৩৭. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮।

১৯০২/১৩২০ সালে তিনি ভারত থেকে পুনরায় মদীনা গমন করেন। অল্প কিছু দিন পরই মদীনায় ডাক্তার মুহাম্মদ খাজা কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত 'শামসিয়্যাবাগ মাদ্রাসা'-এর শিক্ষক পদে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে তাঁর চাকুরী হয়। তিনি কপি নকল বাদ দিয়ে মাদ্রাসার চাকুরী ও মসজিদে নববীতে বিনা বেতনে শিক্ষাদান চালিয়ে যান। মসজিদে নববীর শিক্ষকতায় কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। বহু শিক্ষার্থী তাঁর সবকে জমায়েত হয়। এ অবস্থা দেখে খাজা সাহেব তাঁকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মসজিদে নববীর পরিবর্তে তৎপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু পবিত্র মসজিদে নববীর বরকত লাভের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের অসম্মতির কারণে মাদানীর পক্ষে ঐ নির্দেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। খাজা সাহেব তাতে অসন্তুষ্ট হলে তিনি মাদ্রাসার চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা চালিয়ে যান।[৪০] তাঁর কাছে মদীনায় অধ্যয়নকারী ছাত্র মাওলানা আবদুল হক মাদানী বলেন, সম্মানিত উস্তাদের (শায়খুল ইসলাম) আত্মমর্যাদাবোধ এত বেশী ছিল যে, আমার পিতা দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত মোটা অংক বেতনের আশ্বাস দিয়েও তাঁকে আমাদের বাসায় টিউশনির জন্য সম্মত করতে পারেনি। তিনি প্রতিবারই আমার পিতাকে উত্তর দেন যে, আবদুল হককে মসজিদে পাঠিয়ে দিন। এখানে আমি বিনা বেতনেই পড়িয়ে দিব। অথচ সে কালে তাঁর পরিবারে অভাব-অনটন এত ছিল যে, বহু দিন তাঁকে না খেয়ে রোযা রাখতে আমি দেখেছি। তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আবদুল হক! আমার পরিবারের অবস্থা তুমি কারো কাছে ব্যক্ত করো না।[৪১]

তাওয়াক্কুলের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র অদৃশ্য মদদ শুরু হয়। ভুপালের নওয়াব সুলতান জাহান বেগম মদীনাস্থ কিছু সংখ্যক আলিমের জন্য মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। তন্মধ্যে শায়খুল ইসলাম ও তাঁর দুই ভ্রাতা মাওলানা' সিদ্দীক আহমদ ও মাওলানা সায়্যিদ আহমদের নামে মাসিক ১০ টাকা করে তিন জনের জন্য মোট ৩০ টাকা ভাতা মঞ্জুর করেন। ভুপাল সরকারের এ সকল ভাতা বণ্টন করা এবং হিসাব সংরক্ষণ ও যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন মদীনার শায়খ হাসান আবদুল জাওওয়াদ। তিনি উর্দু ভাষা জানতেন না বলে শায়খুল ইসলামকে সহযোগিতার অনুরোধ করা হয়। শায়খুল ইসলাম তাতে

---

৪০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।

৪১. সায়্যিদ রশীদ উদ্দীন হামীদী, ওয়াকিআত ওয়া কারামাত (মুরাদাবাদ : মাকতাবায়ে নেদায়ে শাহী, ১৯৯৫), পৃ ১৯৪।

সম্মত হলে তাঁকে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে সহযোগিতার কাজে নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাঁকে ভাতা প্রাপ্তির তালিকা থেকে সরিয়ে মাসিক বেতন ২৫ টাকা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। মসজিদে নববীতে প্রত্যেক শুক্রবার ও মঙ্গলবার ছুটি থাকত। হযরত শায়খুল ইসলাম সপ্তাহের ঐ ২ দিন শায়খ হাসানের সহযোগিতার কাজ করতেন। একবার রওযা শরীফের যিয়ারত সম্পাদন উপলক্ষে ভাওয়ালপুরের নওয়াব মদীনা মুনাওওয়ারা আগমন করলে তিনিও শায়খুল ইসলামের জন্য বাৎসরিক ১২০ টাকা (মাসিক ১০×১২) ভাতা মঞ্জুর করে যান। এ ভাবে শায়খুল ইসলাম এবং তাঁর পিতা ও ভ্রাতাদের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে মাসিক সর্বমোট ৭৫ টাকা ভাতার ব্যবস্থা হয়ে গেলে পরিবারে এতখানি সচ্ছলতা আসে যে, পরিবারের সকলেই নিশ্চিন্তভাবে শিক্ষাদান ও ধর্মপালনে পূর্ণ মনোনিবেশের সুযোগ পান। মদীনাবাসীদের প্রতি ভিনদেশীয় মুসলিম সরকারগুলোর এ সকল ভাতা ১ম মহাযুদ্ধের কিছুকাল পর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিদ্রোহী গভর্ণর শরীফ হুসায়নের হাতে মদীনার কর্তৃত্ব চলে গেলে সর্বপ্রকারের ভাতা বন্ধ হয়ে যায়।[৪২]

মদীনা শরীফের জীবনে শায়খুল ইসলাম একা হলে আবাসনের কোন সমস্যা হত না। মসজিদে নববীর সাহানই তাঁর রাত যাপনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছিল একটি বড় পরিবার। নিজের স্ত্রী, বার্ধক্যগ্রস্ত পিতামাতা, ৪ ভাই, ১ বোন, ১ ভ্রাতুষ্পুত্র ও ২ ভ্রাতৃবধু সব মিলিয়ে ১২ জন; তন্মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৫ জন মহিলা ও ১ জন শিশু। একটি পরিবারে ৪টি দম্পতির বসবাস; এমন পরিবার কোন উন্মুক্ত স্থানে বাস করার প্রশ্নই উঠে না।

এমতাবস্থায় তাঁরা প্রথম বছর (১৮৯৯/১৩১৭) হজ্জ ও যিয়ারত সম্পন্ন করে হরমে নববীর অন্তর্গত 'বাবুন্ নিসা'-এর নিকটে একটি কাঁচা বাড়ী ভাড়া নেন। বাড়ীটি ছিল খুবই ছোট। তাতে প্রয়োজন অনুসারে কক্ষ ও পানির কূপের ব্যবস্থা না থাকায় পরবর্তী বছর (১৯০০/১৩১৮) 'হাররাতুল আগাদাত' মহল্লার একটি বড় বাড়ীতে বাৎসরিক ১২০ টাকা ভাড়ায় চলে যান।[৪৩] সেখানে থাকার পর্যাপ্ত কক্ষ পাওয়া গেলেও ভাড়া আদায়ে অক্ষমতার দরুন এক বছরের মাথায় সেটি ছেড়ে দিতে হল। ঐ বছর দোকানে প্রচুর খুচরা বাকী পড়ে যাওয়ায় বছর শেষে দোকান তুলে নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে শায়খুল ইসলাম নিজে ভারতে চলে আসায় কপি নকলের রোজগারও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোটা পরিবারে তখন চরম দুর্দিন। বছরের শেষ প্রান্তে বাড়ীর মালিক জরিমানাসহ ভাড়া আদায় কিংবা

---

৪২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।

৪৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।

অবিলম্বে বাড়ী ত্যাগের নোটিশ দিলে সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ দিশেহারা হয়ে পড়েন। সমস্ত শহর খুঁজে পরিবার-পরিজন নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই করতে না পেরে মালিকের কাছে সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। মালিক আবেদন মঞ্জুর করেনি। অগত্যা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহকে নগরের বাইরে অবস্থিত শহরতলীর দিকে দৃষ্টি দিতে হল। সেখানে 'আলবাব আলমজীদী'-এর নিকটে নির্মাণ অসম্পূর্ণ একটি বাড়ী দেখতে পান। অর্থাভাবের দরুন বাড়ীটির কাজ স্থগিত রাখা হয়েছিল। বাড়ীর মালিক ছিলেন হায়দ্রাবাদের জনৈক রঈস নওয়াব জানি মিয়া। আর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন ডাক্তার মুহাম্মদ খাজা হায়দ্রাবাদী। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ উক্ত তত্ত্বাবধায়কের কাছে নিজের বৃত্তান্ত পেশ করলে তিনি দয়াপরবশ হন এবং নির্মাণকাজ পুনরায় চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকার অনুমতি দেন। বাড়ীটির দরজা জানালা কিছুই ছিল না। শায়খুল ইসলামের পিতা বাজার থেকে কেনা চট দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে উঠেন।[৪৪]

আবাসের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ উপলব্ধি করেন, যে কোন উপায়ে স্থায়ী ব্যবস্থা না করা গেলে মদীনা শরীফে অবস্থান সম্ভব নয়। তাই তখন থেকেই তিনি এদিকে মনোযোগ দেন। শহরের বাইরে বাবে মজীদীর অদূরে একটি পরিত্যক্ত ভূখণ্ড বিক্রি হবে বলে জানা যায়। এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজ্‌রা মুবারকের খাস্ খাদিমদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি। এ ধরনের সম্পত্তি পরিত্যক্ত হওয়ার পর স্থানীয় কাযীর অনুমোদনক্রমে লীজ নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ সেখান থেকে নিজের ৫ পুত্র ও ১ কন্যার প্রয়োজন অনুসারে মোট ৬টি বাড়ী করার উপযুক্ত সম্পত্তি লীজ নেন। শায়খুল ইসলামের বোন মুসাম্মাৎ রিয়ায ফাতিমা (হি ১৩০৫-১৩৩৫) কে বিবাহ খরচ বাবদ টাকার যে হিস্যা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা তার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ভূমির মূল্য পরিশোধ করা হয়।

এদিকে শায়খুল ইসলাম ভারতে পৌছে পিতার জন্য বন্ধুদের দেয়া হাদিয়ার টাকা প্রেরণ করলে বোনের টাকাসহ সকল ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যায়। অধিকন্তু ক্রয়কৃত ভূমির চতুর্দিকে দেয়াল তোলার কাজও সম্পন্ন হয়। শায়খুল ইসলাম পুনরায় মদীনায় পৌঁছে খাজা সাহেবের মাদ্রাসায় যোগ দিয়ে কয়েক মাস পর চাকুরী থেকে ইস্তফা দিলে খাজা সাহেব অসন্তুষ্ট হন এবং তার বাড়ী ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দেন। এ সময় শায়খুল ইসলামের পিতা নিজের সন্তানদের ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজেরাই রাত দিন খেটে ক্রয়কৃত ভূমির

---

৪৪. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬।

উপর মাটির দেয়াল তুলে বাড়ী বানানোর কাজ শুরু করেন। প্রায় ২২ দিন খাটুনীর পর বাড়ীর কাজ সম্পন্ন হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই খাজা সাহেবের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজ বাড়ীতে গিয়ে উঠেন।[৪৫]

কিছুদিন পর দেখা গেল, কাঁচা মাটির দেয়াল ও খেজুর পাতার ছাউনী বিশিষ্ট এ বাড়ী রোদ বৃষ্টির মোকাবেলা করার মোটেও উপযুক্ত নয়। তখন বাধ্য হয়ে পাকা বাড়ী নির্মাণের চিন্তা করতে হল। পরিবারের বিভিন্ন দিকের আয়ের উপর চরম কৃচ্ছ্রতা সাধন করে অবশিষ্ট টাকা দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়ী পাকা করার কাজ শুরু করা হয়। ২ বছরে বাড়ীর দোতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সন্তানদের কেউ যেন এ বাড়ী বিক্রয় করে মদীনা শরীফ ত্যাগ না করে সে উদ্দেশ্যে সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ্ বাড়ীটি সন্তানদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দেন। নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এ বাড়ীকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে এখানে গড়ে উঠে বিশাল মহল্লা। হিজাযে গাদ্দার শরীফ হুসাইনের বিদ্রোহ (জুন ১৯১৬) সংঘটিত ওয়ার পূর্বে ঐ মহল্লায় প্রায় ত্রিশ সহস্র লোকের বসতি গড়ে উঠেছিল। বিদ্রোহের র সেখানে নিরাপত্তাহীনতা ও অরাজকতা শুরু হলে অনেকে নগরের ভিতর চলে আসতে বাধ্য হন। শায়খুল ইসলাম সে সময় নিজেদের বাড়ী পাহারাদারদের হাতে অর্পণ করে পরিবার-পরিজন নিয়ে 'বাবুন্ নিসা' সংলগ্ন একটি ভাড়া বাড়ীতে চলে আসেন।[৪৬]

তরীকতের দীক্ষা

এক

১৮৯৮/১৩১৬ সালে দারুল উলূমের শিক্ষা সম্পন্ন করেই তিনি তরীকতের তালীম গ্রহণে মনোযোগী হন। শাবান মাসে বার্ষিক পরীক্ষা হয়। তিনি ঐ মাসেই তৎকালের শ্রেষ্ঠ বুযর্গ কুতবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৮২৮/১২৪২-১৯০৫/১৩২৩)-এর হাতে মুরীদ হন। হযরত গাঙ্গূহী সাধারণতঃ যাচাই করা ব্যতীত কাউকে মুরীদ করতেন না। কিন্তু শায়খুল ইসলাম তাঁর নিকট উপস্থিত হলে কোন যাচাই ব্যতিরেকেই মুরীদ করে নিয়েছিলেন। তবে তাঁকে কোন সবক দেওয়া হয়নি বরং প্রথম সবক মক্কায় পৌঁছে সায়্যিদুত তায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারূকী মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি

---

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০-৮১।
৪৬. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।

আলাইহি (১৮১৭/১২৩৩-১৮৯৯/১৩১৭) থেকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।[৪৭] সেই মতে আড়াই মাস পরে যিলকাদা (১৩১৬ হি.)-এর শেষ দিকে তিনি মক্কায় পৌঁছে হাজী সাহেবের সাক্ষাৎপূর্বক প্রথম সবক গ্রহণ ও সুলূকের সাধনা শুরু করেন। ৬ মাসের মাথায় হযরত হাজী সাহেবের ওফাত (১৩১৭ হি.) হয়ে গেলে মদীনা থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে হযরত গাঙ্গূহীর সাথে যোগাযোগ করে সুলূকের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করেন। ১৯০০/১৩১৮ সালের শাওওয়ালে হযরত গাঙ্গূহী এক চিঠির মাধ্যমে তাঁকে গাঙ্গূহ আসার নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক পরবর্তী বছর রবীউল আওওয়াল মাসে তিনি গাঙ্গূহ আসেন। এখানে শায়খের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রিয়াযত ও মুজাহাদায় টানা আড়াই মাস ব্যাপৃত থাকার পর খেলাফত প্রাপ্ত হন।[৪৮] তখন তাঁর বয়স ২২ বছর। হযরত গাঙ্গূহী এরপর মাত্র ৫ বছর জীবিত ছিলেন।

মুরীদ হওয়ার ব্যাপারে নিজ পিতার ন্যায় তিনিও পূর্বপুরুষদের ব্যতিক্রম নীতি অবলম্বন করেন। শাহ্ মুদনের পুত্র সায়্যিদ নূর আশরাফ থেকে তাঁর দাদা-পরদাদাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক পীরগিরির প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল। বাস্তী, গোন্ডাহ ও গোরাক্ষপুর প্রভৃতি জেলায় তাঁদের বহু মুরীদ ছিল। পরিবারের লোকেরা নিজেরা পীর বংশ হিসেবে বাইরে কোথাও মুরীদ হত না এবং নিজে পীর হওয়ার জন্য কোন কামিল শায়খ থেকে পূর্ণ দীক্ষা লাভের প্রয়োজনও বোধ করত না। অধিকন্তু বিভিন্ন মৌসুমে মুরীদদের এলাকায় গিয়ে নয্‌রানা উসূল করত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের মুরীদ করত।[৪৯] বিষয়টি শরীঅতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে শায়খুল ইসলামের মাতামহী সর্বপ্রথম খান্দান থেকে এ কুপ্রথা উচ্ছেদে সচেষ্ট হন। মাতামহী নিজে একজন মুত্তাকী মহিলা ছিলেন। পিত্রালয়ে থাকাকালে নিজ মাতুলের হাতে মুরীদ হয়ে সুলূকের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ তাঁরই কন্যাকে বিবাহ করলে তিনি জামাতাকে ব্যাপারটির মন্দ পরিণাম অবহিত করেন। সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ পরিবারের বাইরে গিয়ে কামিল শায়খের হাতে মুরীদ হয়ে সুলূকের কাজ সম্পন্ন করার সূচনা করেন।

---

৪৭. মাওলানা হাবীবুর রহমান, **আমরা যাদের উত্তরসূরী**, ২য় সং, (ঢাকা ঃ আল কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ ১১১।

৪৮. আসীর আদরবী, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পাদিত, **শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী ঃ জীবন ও সংগ্রাম** (ঢাকা ঃ জামান প্রিন্টার্স, ১৯৯১), পৃ ২০-২২।

৪৯. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।

পিতার অনুসরণে শায়খুল ইসলাম ও তাঁর ভ্রাতাগণও কামিল শায়খ সন্ধান করে মুরীদ হন।[৫০]

হযরত শায়খুল ইসলাম কার কাছে তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করবেন এ ব্যাপারে তাঁর পিতার মনোনীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী।[৫১] কিন্তু ইতোপূর্বে হযরত গাঞ্জে মুরাদাবাদীর ওফাত হয়ে যাওয়ায় পিতার সে ইচ্ছা পূরণ সম্ভব হয়নি। অগত্যা নির্বাচনের বিষয়টি তাঁরই উপর অর্পিত থাকে। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের মনোনীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রিয় উস্তায হযরত শায়খুল হিন্দ।[৫২] কারণ দীর্ঘ ৬/৭ বছর তাঁর কাছে পড়াশুনার দ্বারা তিনি এ ব্যাপারে শায়খুল হিন্দের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত আর কাউকে চিন্তা করতে পারেননি। হযরত শায়খুল হিন্দও তাঁকে নিজ পুত্রের মত ভালবাসতেন। তাঁর সর্বোচ্চ কল্যাণ কামনা করতেন। ফলতঃ আবেদনটি শায়খুল হিন্দের কাছে উত্থাপিত হলে তিনি নিজে মুরীদ করেননি। বরং আরো এক ধাপ উপরে নিজ শায়খ কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গূহীর নিকট পাঠিয়ে দেন। সে মতে তিনি হযরত গাঙ্গূহীর কাছে চলে যান। তখন সায়্যিদুত তায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ ফারূকী মুহাজিরে মক্কী জীবিত ছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্তানে অবস্থানরত ছিলেন না।

---

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

৫১. হযরত মাওলানা ফয্‌লুর রহমান গাঞ্জেমুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২১৩ হিজরীর ১ রমযান জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শায়খ আহ্‌লুল্লাহ। তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে শায়খ রিদ্‌ওয়ান একজন বিশিষ্ট বুযর্গ ছিলেন। অতি শৈশব কাল থেকে মাওলানা গাঞ্জেমুরাদাবাদীর চরিত্রে বিলায়তের লক্ষণ ফুটে উঠে। ১১ বছর বয়সে পিতা মারা যান। ফলে তাঁর মাতা তাঁকে খুব অভাব-অনটনের ভেতর লেখা পড়া করান। তিনি ধর্মীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন লক্ষ্ণৌতে। তারপর দিল্লী গমন করে হযরত শাহ্ আবদুল আযীযের নিকট মাত্র ২ মাস অধ্যয়নের সুযোগ পান। শাহ্ সাহেবের ওফাতের পর অবশিষ্ট শিক্ষা হযরত শাহ্ ইসহাকের নিকট সম্পন্ন করেন। বাতিনী ইল্‌ম শিক্ষার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ বুযর্গ শাহ্ মুহাম্মদ আফাকের দরবারে হাযির হন। শাহ্ আফাক তাঁকে কয়েক মাস নিজের কাছে রাখেন এবং খেলাফত প্রদান করেন। হযরত গাঞ্জেমুরাদাবাদী ছিলেন একজন সুবক্তা। অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন। তাঁর বহু কারামাত প্রসিদ্ধ আছে। জাগতিক ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর নির্মোহ জীবন যাপন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ও হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর ওফাতের তারিখ জানা যায়নি। মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, ২য় মুদ্রণ, (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৫ম খণ্ড, ১৯৮৭) পৃ ২৯২-৩০৪; মাওলানা হাবীবুর রহমান, **আমরা যাদের উত্তরসূরী**, ২য় সং, (ঢাকা : আল কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ ১২০।

৫২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।

কাজেই হযরত গাঙ্গূহী তাঁকে মুরীদ করে নেন। কিন্তু প্রথম সবক গ্রহণের জন্য আরো এক ধাপ উপরে নিজ শায়খ হযরত হাজী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন।[৫৩] এভাবে মক্কা মুকার্‌রমায় পৌঁছে হযরত হাজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁকে তরীকতের তালীম দেন। অতঃপর বিদায় বেলা অতি আদরের সহিত পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বললেন, যাও, আমি তোমাকে মহান আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করছি। শায়খুল ইসলাম কথাটি শুনে কোন উত্তর করেনি। হাজী সাহেব বললেন, বলো, আমি কবূল করলাম। তখন শায়খুল ইসলাম বললেন, আমি কবূল করলাম।[৫৪]

দুই

তিনি আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা দু'টি পর্বে সম্পন্ন করেন। প্রথম পর্বে বায়আতের পর থেকে ১৯০০/১৩১৮ সালের শাওওয়ালে গাঙ্গূহ থেকে চিঠি পাওয়া পর্যন্ত তাঁর ২ বছর ২ মাস অতিবাহিত হয়। এ পর্বে তিনি তরীকতের বুনিয়াদী গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হন। হযরত গাঙ্গূহীর ঐ চিঠি পাওয়ার পর থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বে তিনি শায়খের সান্নিধ্যে আড়াই মাস[৫৫] যাবৎ সাধনামগ্ন থাকার মাধ্যমে তরীকতের চূড়ান্ত পর্যায় অর্জন করেন।

প্রথম পর্বে হযরত গাঙ্গূহী শুধু মুরীদ করেই বিদায় দেন। কোন সবক দেননি। এরই মধ্যে বায়আতের বরকত শুরু হয়ে যায়। শায়খুল ইসলামের মনে ঐ দিন থেকে নামাযের খুশু-খুযূও প্রতি আগ্রহ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। তিনি রাতে সুস্বপ্ন লাভ করতে থাকেন। একাধিকবার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতও নসীব হয়।[৫৬] একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন, উন্মুক্ত বিশাল ময়দানে একটি কবর। এটিকে তিনি হযরত খাজা আলাউদ্দীন সাবিরী কালয়ারী[৫৭] রহমাতুল্লাহি আলাইহি (হি. ৫৯২-৬৯০) ও হযরত

---

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫।

৫৫. খালীক আহমদ নিযামী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, **শায়খুল ইসলাম হায়াত ওয়া কারনামে** (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৮৮), পৃ ৭২।

৫৬. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬; আসীর আদরবী, **মাআছিরে শায়খুল ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।

৫৭. হযরত খাজা আলাউদ্দীন সাবিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হিজরী ৫৯২ সালে মুলতানের কোত্‌ওয়াল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শাহ্ আবদুর রহীম আবদুস সালাম। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন হাসান বংশীয় সায়্যিদ। তিনি প্রথম জীবনে ১২ বছর খাযা

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী সানজিরী[৫৮] রহমাতুল্লাহি আলাইহি (১১৪২/৫৩৭-১২৩৬/৬৩৩) উভয়েরই কবর মনে করে সম্মুখের দিকে যাচ্ছেন। মুরীদ হওয়ার কয়েক দিন পরই এ ঘটনা ঘটে। কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গূহীকে স্বপ্নটি জানানো হলে তিনি বললেন, এটি সালিকের মকসূদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বাভাষ। এ ধরনের সুস্বপ্নের কারণে শায়খুল ইসলাম মানসিকভাবে ক্রমে এক নতুন জগতের দিকে ধাবিত হন।

ঐ বছর যিলকাদা (১৩১৬ হি.) মাসে মক্কায় হযরত হাজী সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর তরীকতে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক সবক শুরু হয়। হযরত হাজী সাহেব তাকে 'পাছ আন্‌ফাছ' যিক্‌রের তাল্‌কীন দেন। তিনি প্রত্যহ সকাল বেলা হাজী সাহেবের সান্নিধ্যে বসে যিক্‌রের সাধনা চালিয়ে যান। যিলহাজ্জ্ব মাসের শেষ দিকে মদীনায় যাত্রা পর্যন্ত তাঁর এ সাধনা অব্যাহত ছিল।[৫৯] মদীনা শরীফ পৌঁছার পর আবাসনের সংকট কাটিয়ে উঠতে কয়েক মাস সময় লেগেছিল। এরপর তিনি শীঘ্রই সবক আদায়ে মনোযোগী হন। হাজী সাহেবেরও তখন ওফাত হয়ে যায় (১৩ জুমাদাল উখ্‌রা)। তিনি মসজিদে নববীর বরকতময় স্থানে বসে 'পাছ আনফাছ' যিক্‌র অনুশীলন করেন। যিক্‌রের ফলে তাঁর মনে হযরত গাঙ্গূহীর ভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে হযরত শায়খুল হিন্দের ভক্তিকেও

ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশর্কর (হি. ৫৮৪-৬৫৪)-এর লঙ্গরখানার খাদিম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু প্রকাশ্য অনুমোদন না থাকায় কখনো লঙ্গরখানা থেকে কোন কিছু মুখে দিতেন না বরং রোযা রাখতেন। এ দীর্ঘকালীন ধৈর্যধারণের জন্য তিনি 'সাবির' (ধৈর্যশীল) উপাধিতে ভূষিত হন। হিজরী ৬৯০ সালে তিনি কালিয়ারে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর মাযারের গম্বুজ নির্মাণ করেন। (মুফ্‌তী নূরুল্লাহ, মাশায়েখে চিশ্‌ত, বি. বাড়ীয়া, আযীয প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ ২০৯-২১১)

৫৮. হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপমহাদেশের অন্যতম বুযর্গ ছিলেন। তিনি আফ্‌তাবে হিন্দ (ভারতসূর্য) নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন সিস্তানের অধিবাসী। ১৫ বছর বয়সে তাঁর পিতা গিয়াসুদ্দীন ইন্তিকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খোরাসানের বিভিন্ন শহরে বাস করেন। পরে বাগদাদ গমন করেন। এ সময় হযরত নাজমুদ্দীন কুব্‌রা, হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী ও হযরত আওহাদুদ্দীন কির্‌মানীসহ যুগের প্রসিদ্ধতম সূফীগণের সাথে পরিচিত হন। ১১৯৩ সালে দিল্লী আগমন করেন। অল্প কিছু দিন পর সেখান থেকে আজমীর চলে যান। ১২৩৬ সালে ইন্তিকাল করেন। আজমীরে তাঁর মাযারটি নিরতিশয় জনপ্রিয় যিয়ারতগাহে পরিণত হয়ে আছে। সম্রাট আকবর এ মাযারের উদ্দেশ্যে পদব্রজে যিয়ারত করতে আসতেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় সং, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৮৩)

৫৯. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫।

ছাড়িয়ে যায়। অথচ হযরত শায়খুল হিন্দের প্রতি পূর্বে যে ভক্তি ছিল সেটি কোন অংশে কমেনি। কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে তাঁর শরীরে চিশতীয়্যা সিলসিলার বিশেষ প্রভাব ফুটে উঠে। যিক্‌রের মধ্যে রোনাজারী প্রবল আকার ধারণ করে। সুস্বপ্ন ও যিয়ারতে নববীর পরিমাণ বেড়ে যায়।[৬০] অনেক সময় শরীরে 'অনিচ্ছাকৃত কম্পন' সূচিত হয়।[৬১] তিনি মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে সচেষ্ট হন। তাই সকালে সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেক পর যখন মসজিদে নববীতে মানুষের ভিড় থাকে না তখন যিক্‌রে মগ্ন হওয়ার নিয়ম করেন।

এভাবে প্রত্যহ দেড় দুই ঘন্টা পাছ আনফাছ আরো কিছু দিন চলতে থাকলে 'হালাত' (রিয়াযত ও মুজাহাদার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া) এত বেড়ে গিয়েছিল যে, লজ্জায় তিনি শহরের বাইরে মাঠে কিংবা কোন নির্জন স্থানে চলে যেতেন। একদিন মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ অনুভব করলেন যেন তাঁর শরীর নিজের শরীর নয়, বরং হযরত গাঙ্গূহীর শরীরে পরিণত হয়ে আছে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। নিজের দাঁত দিয়ে হাত কামড়িয়ে শরীর পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কিছুই বোঝতে পারেননি। এ অবস্থা দেড় থেকে দুই ঘন্টা স্থায়ী ছিল। হযরত গাঙ্গূহীকে বিষয়টি জানিয়ে চিঠি লিখলে তিনি বললেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটি 'ফানা ফীশ শায়খ'-এর হাল।[৬২]

১৯০০/১৩১৮ সালের শাওওয়ালে গাঙ্গূহ থেকে তাঁর নিকট চিঠি পৌঁছে। চিঠিতে তাঁকে ১ মাসের জন্য গাঙ্গূহ খানকায় আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি ঐ মাসেই গাঙ্গূহ যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হজ্জ্ব পালন ও পথের জটিলতার দরুন গন্তব্যে পৌঁছতে ৫ মাস সময় লেগে গিয়েছিল। হযরত গাঙ্গূহী প্রথমতঃ তাঁকে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করে পরীক্ষা করলেন। তাতে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে খুশী

---

৬০. প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ
الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الرُّؤْيَا
الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ)) . وفي رواية ((مَنْ
رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ))

(মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩)

৬১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬১।

হন এবং 'যাতে ইলাহী-এর মোরাকাবা'[৬৩]-এর তালীম দিয়ে বললেন, এই তালীম চিঠির মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয় বিধায় তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি। শায়খুল ইসলামকে থাকার জন্য খানকায় একটি বিশেষ কক্ষ দেওয়া হয় এবং হযরত গাঙ্গূহীর নিজ গৃহ থেকে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সেখানে বসে রিয়াযত শুরু করেন। প্রত্যহ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত খানকায় সাধারণ লোকজনের মজলিস অনুষ্ঠিত হত। ঐ সময় তিনি বারান্দায় একটি খুটির পেছনে মোরাকাবায় মগ্ন থাকতেন। শায়খের অতি নিকটে অবস্থানপূর্বক মোরাকাবা চালিয়ে যাওয়ার ফলে দ্রুত কার্যকারিতা ফুটে উঠে। তিনি হৃদয়ে রূহানী শক্তি, যোগ্যতা ও স্বাদের অনুভব করেন। শায়খের তাওয়াজ্জুহ্ ও নিজের মোরাকাবা তখন তাঁর মনে এমন প্রচণ্ড রূহানী শক্তির উদ্রেক করে যেন পিঠে কোন পাহাড় চাপানো হলেও মন বিন্দু পরিমান বিচলিত হবে না।

এ সময় সুস্বপ্ন ও কাশ্‌ফ আরো বেড়ে যায়। কিছু কাশ্‌ফের বাস্তবতা তিনি দিব্য চোখেও প্রত্যক্ষ করেন। একদিন ইশার নামায শেষে তিনি অন্যদের সাথে হযরত গাঙ্গূহীর শরীর দাবিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখে তন্দ্রার সৃষ্টি হল। তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলছেন, ৪০ দিন পর মকসূদ পূর্ণ হবে। এ কথা তিনি কাউকে জানাননি। অথচ ঠিক ৪০ দিন পরই দেখা গেল যে, আস্‌রের নামাযের পর হযরত গাঙ্গূহী নিজের রূহানিয়্যতের শাগির্দ হযরত মাদানী

---

৬৩. মুরাকাবা শব্দটি 'রাকীব' থেকে গৃহীত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে;

﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴾

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেন,

((اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) رواه مسلم ((اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ)) وَفِيْ رواية ((كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْفِكْرَةِ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ))

(শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, আবদুল মজিদ ঢাকুবী অনূদিত, শরীঅত ও তরীকত, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭, পৃ ২৬৬)

ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা সিদ্দীক আহমদের শিরে পাগড়ী পরিয়ে দিয়ে 'খেলাফত' প্রদানের ঘোষণা দেন।[৬৪]

গাঙ্গুহের সফরে তাঁর কাছে পর্যাপ্ত রাহাখরচ ছিল না বিধায় আসতে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। ইঞ্জিন চালিত জাহাজের টিকেট করা সম্ভব হয়নি। পালের জাহাজে করে করাচী পৌঁছেন। জাহাজ জিদ্দাহ্ থেকে ছেড়ে মস্কট বন্দর পৌছার কয়েক দিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেন, তিনি কুত্বুল আলম হযরত হাজী সাহেবের কাছে কিছু খেজুর হাদিয়া পাঠিয়েছেন এবং পরে নিজে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। হাজী সাহেব তাঁকে বললেন, তুমি নিজে এগুলো বণ্টন করে দাও। তিনি বললেন, হযরত! আমি এগুলো আপনার জন্য পাঠিয়েছি। আমার কাছে খেজুরের দোকান রয়েছে। তিনি বললেন, তা হয় না; আমার জানা আছে যে, কত কষ্টের পর খেজুরগুলো অর্জিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম গাঙ্গুহ পৌঁছে স্বপ্নের কথা নিজ শায়খকে জানালে তিনি বললেন, হযরত হাজী সাহেবের পক্ষ থেকে তোমাকে ইজাযত (খেলাফত) দান করা হয়েছে। আমার নিকট থেকেও ইজাযত হয়ে যাবে। ব্যাখ্যা শুনে হযরত শায়খুল ইসলাম লজ্জিত হন।[৬৫]

মুরীদ হওয়ার পূর্বে হযরত গাঙ্গূহীর প্রতি তাঁর যেমন বিশেষ কোন ভক্তি ছিল না তেমনি গাঙ্গূহীর আধ্যাত্মিক বিশাল শক্তি সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না। বরং প্রথম মুহূর্তে অনেকটা অনাগ্রহ মনেই বায়আত হয়েছিলেন। কিন্তু বায়আতের অব্যবহিত পর বরকত শুরু হতে দেখলে মনে হযরত গাঙ্গূহীর ভক্তি সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে তা 'ফানা ফীশ্ শায়খ'-এর মাকাম অতিক্রম করে যায়। তাই দেওবন্দ থেকে তিনি যখন গাঙ্গূহ যেতে মনস্থ করলেন, তখন সাওয়ারী গ্রহণের সাহস করতে পারেননি। শায়খের দরবারে সম্পূর্ণ নগ্নপদে গমন করলেন। তিনি হযরত গাঙ্গূহীর জন্য হাদিয়া হিসেবে খেজুর ও যমযমের পানি আনেন। বিশেষতঃ রওযা শরীফের খাস খাদিম যাদের কয়েকজন মদীনায় তাঁর ছাত্র ছিলেন তাদের মাধ্যমে তিনি মসজিদে নববীর চত্বরে লাগানো খেজুর গাছের কয়েকটি খেজুর এবং রওযা শরীফের ঠিক ভিতর থেকে সংগ্রহকৃত কিছু ধূলাবালি হাদিয়া হিসেবে পেশ করলে হযরত গাঙ্গূহী খুব খুশী হন। তিনি ঐ ধূলাগুলো সুরমার সাথে মিশিয়ে চোখে ব্যবহার করেন এবং খেজুরের দানাগুলো পর্যন্ত পিষে গুড়া করে দৈনিকের আহার্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেন।[৬৬] হযরত গাঙ্গূহী তাঁকে ও তাঁর ভ্রাতা মাওলানা সিদ্দীক

৬৪. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২ ; মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫।

৬৫. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

৬৬. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০।

আহমদকে এক এক জোড়া নতুন পোষাক হাদিয়া দিয়ে বললেন, আমিও তোমাদের দুই ভ্রাতার জন্য এগুলো পূর্বেই তৈরী করে রেখেছিলাম।

খানকার রিয়াযত সম্পন্ন শেষ হলে ভ্রাতৃদ্বয় কালিয়ার, ফয়যাবাদ, ভুপাল প্রভৃতি স্থান সফর করেন। তখন হজ্জের মৌসুম ঘনিয়ে আসছিল। হযরত গাঙ্গূহী তাঁদের জন্য নিজের ২ আত্মীয় থেকে বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে দিলে তাঁরা ১৯০২/১৩২০ সালের মুহার্‌রম মাসে পবিত্র মদীনা ফিরে আসেন। ১৯০৫/১৩২৩ সালে (৮ জুমাদাল উখ্‌রা) হযরত গাঙ্গূহীর ওফাত হয়। গাঙ্গূহ থেকে বিদায়ের পর শায়খের সাথে তাঁদের পুনরায় সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।[৬৭]

মসজিদে নববীতে শিক্ষকতা

এক

শায়খুল ইসলাম আজীবন শিক্ষকতা করেন। তাঁর শিক্ষকতার শুভ সূচনা হয় মদীনার পবিত্র মসজিদে নববীতে।[৬৮] দেওবন্দ থেকে বিদায়ের মুহূর্তে শায়খুল হিন্দ তাঁকে শিক্ষকতা অব্যাহত রাখার জোর অসিয়্যত করে দেন। কিন্তু হিন্দুস্তানী পাঠ্যসূচীর কয়েকখানা কিতাব অপঠিত রয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর মনে শিক্ষকতার পূর্ণ সাহস আসেনি। মদীনা পৌছার পূর্বক্ষণে স্বপ্নে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব হয়। তিনি পঠিত ও অপঠিত সকল কিতাব নিজ আয়ত্তে আনার দুআ চাইলে নবীজী দুআ করেন।[৬৯] মদীনায় তাঁর মোট ১৮ বছর সময়ের মধ্যে তিন বার ভারত প্রত্যাবর্তন করায় শিক্ষকতার কাল ৪টি উপবেশনে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে প্রথম উপবেশনে ১ বছর ৯ মাস, দ্বিতীয় উপবেশনে ৭ বছর, তৃতীয় উপবেশনে ২ বছর ও চতুর্থ উপবেশনে ৩ বছর এভাবে সর্বমোট ১৩ বছর ৯ মাস শিক্ষকতা করেন।

১৮৯৯/১৩১৭ সালের মুহার্‌রমে প্রথম উপবেশন শুরু হয়। মসজিদে নববীতে কয়েকজন ভারতীয় ও আরবীয় ছাত্র নিয়ে তিনি নাহ্‌ব, সরফ ও অন্যান্য প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাব পড়াতে আরম্ভ করেন। এদিকে জীবিকার প্রয়োজনে

৬৭. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫-১০৭।

৬৮. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১১।

৬৯. স্বপ্নে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'নানাজান' বলে আখ্যায়িত করে দুআ চান। নবীজীও তাঁকে পিঠের উপর স্নেহের হাত বুলিয়ে দুআ করে দেন। মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

দোকান পরিচালনা ও কপি রচনার কাজও করেন। তাছাড়া হযরত হাজী সাহেবের তালকীনকৃত সবক অনুসারে 'পাছ আনফাছ' যিক্‌রের জন্যও সময় দেন। তাই শিক্ষকতায় পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব হয়নি। মদীনায় শিক্ষাদানের মাধ্যম আরবী। তিনি আরবীতে বক্তৃতা দানে জটিলতা অনুভব করায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ আরবীবিদ শায়খ আফিন্দী আবদুল জলীল রহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর নিকট কিছু দিন পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।[৭০] ১৯০০/১৩১৮ সালের শাওওয়াল পর্যন্ত শিক্ষকতা অব্যাহত ছিল। এ উপবেশনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল তরীকতের কাজ সম্পন্ন করা। এ কারণে মসজিদে নববীর শিক্ষাদানে তাঁর যেমন ব্যতিক্রমধর্মী কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি তেমনি তিনি কারো কাছে হিংসার পাত্রেও পরিণত হননি। তবে এ সুযোগে তরীকতের বুনিয়াদী কাজ সম্পন্ন করে নেন এবং চূড়ান্ত পর্বের জন্য গাঙ্গূহ চলে আসেন।[৭১]

গাঙ্গূহের সফরে চৌদ্দ মাস অতিবাহিত করার পর ১৯০২/১৩২০ সালের মুহার্‌রম থেকে তাঁর দ্বিতীয় উপবেশন শুরু হয়। ঐ মাসেই মদীনার শামসিয়্যাবাগ ওরফে 'তূতিয়া মাদ্রাসা'র শিক্ষক পদে চাকুরী হয়ে গেলে তিনি অবসর সময়ে রওযা শরীফের পাশে নিজের পূর্বেকার অবৈতনিক শিক্ষকতাও চালু করেন। হযরত গাঙ্গূহীর মুবারক সুহ্‌বত ও খেলাফতের বরকতে তখন তাঁর শিক্ষকতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন শুরু করে। শিক্ষার্থীদের বিপুল আগ্রহ দেখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে কেবলমাত্র মাদ্রাসায় বসে পড়ানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেই নির্দেশ মানা সম্ভব হয়নি। অবশেষে কিছুদিন পর ইস্তফা দিয়ে রওযা শরীফের অবৈতনিক শিক্ষকতার কাজেই পূর্ণ মনোনিবেশ করেন।[৭২]

মদীনা শরীফের সিলেবাস ছিল হিন্দুস্তানের সিলেবাস অপেক্ষা অনেকটা ব্যতিক্রম। মদীনায় মালিকী ও শাফিয়ী ফিক্‌হের কিতাব বেশী পড়ানো হত। ফলে তাঁকে বহু অপঠিত কিতাবের অধ্যাপনা করতে হয়। তিনি রওযা শরীফে দৈনিক ১৪টি সবক পড়ান। এগুলোর অধ্যাপনা ও প্রস্তুতির কাজে ২০/২২ ঘন্টা সময় ব্যয় করেন। সপ্তাহে শুক্র ও মঙ্গল বারের ছুটির দিনেও তাঁর ৫টি বিশেষ সবক চলত।[৭৩] অধিক রাত পর্যন্ত মুতালাআয় থাকতে হত বিধায় অনেক সময় ওয়াযীফা আদায় সম্ভব হত না। বিষয়টি হযরত গাঙ্গূহীকে জানালে উত্তরে তিনি আরো

---

৭০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৮-১২৯।
৭১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।
৭২. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।
৭৩. প্রাগুক্ত।

উৎসাহ দিয়ে লিখেছেন, খুব মনোযোগের সহিত অধ্যাপনা অব্যাহত রাখ, তাতেই বরকত পাওয়া যাবে। উত্তরে হযরত শায়খুল ইসলামের মননশক্তি আরো অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ঐ কালে তাঁকে প্রচণ্ড অভাব-অনটনেরও মোকাবেলা করতে হয়েছিল। শায়খ আবদুল হক মাদানী বলেন, তিনি বহু দিন ১/২ টি খেজুর খেয়ে রোযা রেখেছেন। তবুও কোন চাকুরী কিংবা টিউশনী গ্রহণে সম্মত হননি।[৭৪] তাঁর অত্যধিক জনপ্রিয়তায় এক শ্রেণীর লোকেরা হিংসায় ফেটে পড়ে। তৎকালে হিজাযে ওয়াহ্হাবীরা ছিল চরম ঘৃণিত। হিংসুকরা শায়খুল ইসলাম ও তাঁর ভারতীয় শিক্ষকমণ্ডলীকে 'ওয়াহ্হাবী' আখ্যা দিয়ে রওযা শরীফে তাঁর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা নষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি। এক পর্যায়ে তারা মদীনার গভর্নর উসমান পাশা-এর ঘনিষ্ঠ সহচর সায়্যিদ ইয়াসীন কাবুলীর মাধ্যমে অযথা কান ভারী করে তাঁকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করে। ইতোপূর্বে আল্লামা শায়খ মাহমূদ শান্‌কীতী ও আল্লামা হুজ্‌রাসীকেও একই ষড়যন্ত্রের দ্বারা মদীনা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৭৫] তবে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীরাই ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু শায়খুল ইসলামের পরিচিতি আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁদের উপর কোন প্রতিশোধ নেননি। অবশেষে ৩/৪ বছরের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেরাই নির্মূল হয়ে যায়।

হযরত শায়খুল ইসলাম এ উপবেশনে একটানা ৭ বছর অধ্যাপনা করেন। তখন মাঝে মাঝে কোন ইল্‌মী বিষয়ে তাঁর মনে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও জাটিল প্রশ্নের উদ্রেক হত। সেগুলোর কোন সুষ্ঠু সমাধান মদীনায় বসে পাওয়া যেত না বলে নিজের বিজ্ঞ উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দকে পুনর্বার কাছে পাওয়ার খুব আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। ১৩২৬ হিজরীতে তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। মদীনায় উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে ব্যর্থ হলে পিতা তাঁকে ভারতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি এটিকে অপ্রত্যাশিত সুযোগ মনে করে ১৯০৮/১৩২৬ সালের যিলহজ্জ মাসে মদীনা থেকে ভারতে শায়খুল হিন্দের নিকট চলে আসেন।[৭৬]

তিনি হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট ৩ বছর অবস্থান করেন। তারপর ১৯১১/১৩২৯ সালের মুহার্‌রম থেকে আবার রওযা শরীফে অধ্যাপনা শুরু হয়। তাঁর এ উপবেশন ছিল বিগত দু'বারের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ উপবেশনেই তিনি খ্যাতির চরম শিখরে পৌছেন। মসজিদে নববীতে পূর্ব থেকেই হিজাযী ও

৭৪. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪।
৭৫. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১-৮২।
৭৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০।

মিস্‌রী শায়খগণের দরস চালু ছিল। শায়খুল ইসলামের গভীর জ্ঞান ও উচ্চাঙ্গের আলোচনা সকল শিক্ষার্থীকে তাঁর দরসের দিকে টেনে নিয়ে আসে। তাঁর শিক্ষাদানের 'হালকা' মসজিদে নববীর সর্বাপেক্ষা বড় হালকায় পরিণত হয় এবং তিনি রওযা শরীফের প্রধান শায়খের মর্যাদায় পৌছে যান। হালকাগুলোতে শুধু ছাত্রই নয়, মদীনা শরীফের উলামা, কাযী, মুফ্‌তী, মুদার্‌রিস, সরকারী কর্মকর্তা ও আমলাগণের অনেকে উপস্থিত থাকতেন।[৭৭]

তিনি সবকের মধ্যে হযরত শায়খুল হিন্দের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসারে অনেক জটিল জটিল প্রশ্ন নিজ থেকে তুলে তা অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ইল্‌মী অতিশয় সূক্ষ্ম ও গভীর কোন আলোচনায় অনেক সময় প্রিয় উস্তাদের নাম নিয়ে যখন বলতেন, এ সমাধানটি আমাদের হিন্দী শায়খ প্রদান করেছেন তখন শ্রোতাদের চেহারায় ব্যতিক্রমধর্মী ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হত। ঐ সময়ের অধ্যাপনায় তাঁর নজরে শুধু কিতাবই ছিল না, বরং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অবলম্বনে বিশ্ব মুসলিমের সমকালীন অবস্থা, তাদের সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সব কিছুই আলোচনায় স্থান পেত।[৭৮] বর্তমান মুসলমানদের তথা বিশ্ব মানবতার প্রকৃত সমস্যা কি এবং ঐ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কি করণীয় ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পেশ করতেন। সবকে হিজায, তুর্কিস্তান, বুখারা, ভারত, কাবুল, আলজেরিয়া, কাযান, মিস্‌র প্রভৃতি দেশের লোকজন সংখ্যায় অধিক ছিল বলে সে সব দেশের পরিস্থিতি নিয়েও তাঁকে বিস্তারিত আলোচনা করতে হত।

আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত শায়খ আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাদিস ও তাঁর বিশিষ্ট সহযোগী শায়খ মুহাম্মদ বশীর ইব্‌রাহীমী নিজেদের দেশ থেকে হিজরত করে মদীনা চলে এসেছিলেন। তাঁরা হযরত শায়খুল ইসলামের দরসে যোগ দেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু দিন নিজের সঙ্গে রাখেন। তাঁদেরকে হযরত শায়খুল হিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং হিজরতের নিয়্যত মুলতবী করে সংগ্রামের জন্য পুনরায় আলজেরিয়া পাঠিয়ে দেন।[৭৯] ১৯১৩/১৩৩২ সালে শায়খুল ইসলামকে তৃতীয়বার ভারত প্রত্যাগমন করতে হয়। মদীনায় তখন অধ্যাপনা জোরেসোরে চলছিল। তাই বেশী দিন অবস্থান না করে ঐ বছরই আবার ফিরে যান। ১৯১৫/১৩৩৪ সালের গোড়ার দিকে

৭৭. মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসিমী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮-১৬৯।
৭৮. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭-১৬৮।
৭৯. মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮-১৭১।

শায়খুল হিন্দ ভারতের আযাদী আন্দোলনের কর্মসূচিতে মদীনা শরীফ গমন করলে তিনি প্রত্যক্ষ জিহাদ ও রাজনীতিতে যোগ দেন।[৮০] পরবর্তী বছর ১৯১৬/১৩১৫ সালের মুহাররমে ইংরেজ সরকারের ক্রীড়নক হিজাযের তদানিন্তন তুর্কী বিদ্রোহী গভর্ণর 'শরীফ হুসাইন' কর্তৃক তিনি বন্দী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রওযা শরীফের অধ্যাপনা অব্যাহত ছিল।

দুই

রওযা শরীফে হযরত শায়খুল ইসলাম যখন শিক্ষকতা করেন তখন আরো অনেকেই শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। কেননা বহু আলিম মদীনায় বাস করতেন। তাঁর সময়ে মদীনার পবিত্র মসজিদে তুর্কী সরকারের ভাতাপ্রাপ্ত দেড় শতাধিক মুয়ায্যিন, দুই শতাধিক ইমাম এবং সত্তর জন খতীব ছিলেন।[৮১] নিয়মিত দুআ, দরূদ ও ওয়াযীফা পাঠেও অনেকে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া হজ্জ, উমরা ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সদা আগত আলিমগণের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বছরের সব সময়ই সেখানে উপস্থিত থাকতেন। ফলে সেখানে ধর্মীয় তালীম, জ্ঞানচর্চা, পঠন-পাঠনের পরিবেশ সর্বদা বিরাজিত ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থাপনা প্রাচীন নিয়মের ছিল বলে কাউকে শিক্ষক পদে আনুষ্ঠানিক নিয়োগ দানের বিধান ছিল না। অধ্যাপনায় ইচ্ছুক আলিমগণ অধ্যাপনার জন্য বসতেন আর শিক্ষার্থীগণ তাঁদের যোগ্যতা দেখে তাঁদের মজলিসে যোগ দিতেন।

রওযা শরীফে শিক্ষকতা করার সম্মান অতি দুর্লভ হওয়ায় এখানে তীব্র প্রতিযোগিতা হত। ভারতীয় আলিমগণের উচ্চ যোগ্যতা সম্পর্কে মদীনার আলিমগণের পূর্ণ স্বীকৃতি ছিল। এতদসত্ত্বেও ভাষাগত দুর্বলতার দরুন তাঁদের কম সংখ্যকই রওযা শরীফের শিক্ষকতায় সুযোগ পেয়েছিলেন। শায়খুল ইসলামের পূর্বে সিন্ধু প্রদেশের হযরত শায়খ মুহাম্মদ আবিদ আন্সারী, দিল্লীর হযরত শাহ্ আবদুল গনী নক্শবন্দী প্রমুখ উলামা মদীনায় কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করেন। তাছাড়া হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রোদলভী ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম ঐ সময়েও শিক্ষকতায় রত ছিলেন।[৮২] কিন্তু বার্ধ্যকের কারণে তাঁরা পর্যাপ্ত সময় দিতে সক্ষম ছিলেন না। এদিকে হযরত

---

৮০. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২।
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

শায়খুল ইসলাম তখন মাত্র ২০ বছর বয়সের যুবক। এ বয়সে শিক্ষকতা আরম্ভ করলে তিনি ২/৩ বছরের মধ্যেই বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।[৮৩]

হযরত শায়খুল ইসলামের উপরোক্ত কৃতিত্ব অর্জনের পেছনে কতগুলো যৌক্তিক কারণ ছিল। তৎকালে যাঁরা রওযা শরীফে দরস দিতেন তাঁদের অনেকে এমন ছিলেন যে, দরসদানের সময় সামনে মূল কিতাবসহ এক গাদা ভাষ্যগ্রন্থ রেখে দিতেন। তাঁরা ভাষ্যগ্রন্থ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুনিয়ে দিতেন।[৮৪] শিক্ষাদানের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তাতে শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষকের প্রতি গভীর আস্থা সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে শায়খুল ইসলাম ভারতের খায়রাবাদী আলিমগণের ন্যায় অধ্যাপনার পূর্বে মূল কিতাব ও ভাষ্যগ্রন্থের সব কিছু নিজে অধ্যয়ন করে আলোচনা যথারীতি স্থির করে নিতেন। দরস চলাকালে সামনে কোন কিতাব রাখতেন না। শিক্ষার্থীরা মূল কিতাব নিয়ে বসত। তিনি পঠিত অংশের উপর ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মুখস্থ পেশ করতেন। এ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে ছাত্রদের মনে তাঁর দরসের প্রতি প্রবল আস্থা ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তখন তাঁর অল্প বয়স হলেও তরীকতে পূর্ণতা প্রাপ্তির দরুন বক্তব্যে রূহানিয়্যাতের প্রভাব ছিল। সেই বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের মন ভরে যেত। তাদের জন্য তিনি ছিলেন উদারপ্রাণ। অকাতরে তাদের প্রচুর সময় দিতেন বলে নিজের বিশ্রামের জন্য দৈনিক ৩ ঘন্টার বেশী সময় রাখা সম্ভব হয়নি। হাদীস ও তফসীরের যে কিতাবই তিনি দরস দিতেন তাতে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নাহ্ব, সরফ, ফিক্হ, উসূল ইত্যাদির সব কিছু আলোচনা করতেন। মোটকথা তাঁর দরসে সামগ্রিকতা বিরাজিত ছিল। তিনি শায়খুল হিন্দের অনুসরণে নিজ থেকে প্রশ্নের অবতারণা করে নিজেই খুব সহজবোধ্য পদ্ধতিতে সমাধান দিয়ে যেতেন। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির গবেষণাকৃত তাহকীকাত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সেগুলোর অবলম্বনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, অন্তর্নিহিত বিভিন্ন রহস্য ও আস্‌রারে শরীঅত-এর আলোচনা তাঁর দরসকে পুষ্টতা দান করে।

তাঁর সর্বাধিক চমক সৃষ্টির হাতিয়ার ছিল হযরত কাসিম নানূতবী ও হযরত শায়খুল হিন্দের গবেষণাকৃত 'তাহকীকাত'। হিজাযে এ তাহকীকাত ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। অনেক সময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রিয় উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দের উদ্ধৃতি তুলে ধরতেন। ফলে ছাত্রদের মনে শায়খুল হিন্দকে দেখার সীমাহীন আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল। এ কারণে হযরত শায়খুল হিন্দ যখন মদীনা গমন

৮৩. খালীক আহমদ নিযামী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।

৮৪. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।

করেন, তখন তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য আলিমগণের একটি বিরাট দল মদীনার দুই/আড়াই মাইল বাইরে অবস্থিত বীরে আব্বা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। মদীনায় পৌছার পর তাদের অনেকেই তাঁর সাক্ষাতে মিলিত হন এবং হাদীসের সনদ ও ইজাযত গ্রহণ করেন।[৮৫]

শায়খুল ইসলামের যে সব ছাত্র তাঁর কাছে মদীনায় অধ্যয়ন করেন তাদের কোন বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যায় না। শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রাতিষ্ঠানিক ছিল বিধায় নিয়মতান্ত্রিক কোন তালিকা গোড়া থেকেও প্রস্তুত করা হয়নি। তবুও বিভিন্ন উৎস থেকে অনেকের নাম জানা যায়। প্রসিদ্ধ কবি শায়খ আবদুল হক মাদানী (মৃ. ১৯৫৪/১৩৭৪) রওযা শরীফে তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন।[৮৬] মদীনার সরকারি উচ্চ পরিষদ সদস্য শায়খ আবদুল হাকীম আল কুর্দী আল কাওরানী, নায়িবে কাযী ও হানাফী মুফ্তী শায়খ আহ্মদ আল বাসাতী, পৌর সভার চেয়ারম্যান শায়খ মাহ্মূদ আবদুল জাও্ওয়াদ প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া আলজেরিয়ার মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত ইমাম আবদুল হামীদ ইব্ন বাদিস (১৮৮৯/১৩০৬-১৯৪০/১৩৫৯) ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী শায়খ মুহাম্মদ বশীর আল ইব্রাহীমী তাঁরই শিষ্যত্বে ধন্য হন।[৮৭]

মাল্টায় কারাবরণ

এক

১৯১৫/১৩৩৪ সালের মুহার্‌রমে রেশমী রুমাল আন্দোলনের মহান নেতা হযরত শায়খুল হিন্দ বিপ্লবের জরুরী কাজে মদীনা গমন করলে শায়খুল ইসলাম ঐ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। তিনি তখন ৩৬ বছরের যুবক। তারপর এক বছরের মাথায় এখানেই তাঁর প্রথম কারাবরণ শুরু হয়। ১৯১৬/১৩৩৫ সালের সফরে তিনি শায়খুল হিন্দের সাথে মাল্টায় নির্বাসিত হন। দীর্ঘ ৩ বছর ৭ মাস নির্বাসনে থাকার পর ১৯২০/১৩৩৮ সালের পবিত্র রমযানে মুক্তি লাভ করেন।[৮৮]

---

৮৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫-১১৬।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪।

৮৭. হাবীবুর রহমান কাসিমী,ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮-১৬৯।

৮৮. মাওলানা মুশতাক আহমদ, "শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী", মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, ১৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা), পৃ ৮০-৮৩।

মদীনায় তিনি হযরত শায়খুল হিন্দকে বিপ্লবের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। প্রথম দিকে গভর্ণর বস্‌রী পাশা কতিপয় মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে শায়খুল হিন্দকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। শায়খুল ইসলামের প্রচেষ্টায় এ সমস্যার নিরসন হয় এবং কাজের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে। তুর্কী সরকারের যুদ্ধমন্ত্রী আন্‌ওয়ার পাশা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক সর্বাধিনায়ক জামাল পাশা মদীনায় আগমন করলে তাঁদের সাথে তিনিই শায়খুল হিন্দের একান্তে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি উপলক্ষে রওযা শরীফে আয়োজিত মাশায়িখ সম্মেলনে তিনি মুসলিম বিশ্বের সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন জেনারেলদ্বয় তাতে গভীরভাবে মুগ্ধ হন। তিনি শায়খুল হিন্দের মক্কা ও তায়িফ সফরে সঙ্গে থাকেন। মক্কার বিদ্রোহী গভর্ণর শরীফ হুসাইনের বিশ্বাসঘাতকতার পর শায়খুল হিন্দ তায়িফে অবরুদ্ধ হলে তাঁরই প্রচেষ্টায় বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। তারপর ইংরেজদের ইঙ্গিতে শরীফ কর্তৃক শায়খুল হিন্দের উপর গ্রেফতারীর আদেশ জারী হলে তিনিই তাঁকে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দেন। পুলিশ শায়খুল হিন্দকে খুঁজে না পেয়ে তাঁকেই থানায় আটক করে ও জেলে প্রেরণ করে।[৮৯] তিনি হাসিমুখে সংগ্রামের পথে কারাবরণ আরম্ভ করেন। ইত্যবসরে শায়খুল হিন্দ গ্রেফতার হয়ে জিদ্দায় প্রেরিত হলে তিনি খুব বিচলিত হন। তাঁর উপর তখন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের বড় ধরনের কোন অভিযোগ না থাকায় তিনি সহজেই মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের উস্তাদ শায়খুল হিন্দের বার্ধক্য ও কারাজীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে তাঁর পক্ষে মদীনায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই তিনি কৌশলে কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে নিজেকে হযরত শায়খুল হিন্দের সহবন্দীরূপে পরিণত করেন এবং জিদ্দায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।[৯০]

১৯১৬/১৩৩৫ সালের সফর মাসে তাঁদেরকে মিসরের রাজধানী কায়রো প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে নীল নদের অপর তীরে অবস্থিত জীযার প্রাচীন জেলখানা 'আল মাকালুল আসওয়াদ'-এর সামরিক আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচার করা হয়।[৯১] আদালতে শায়খুল ইসলামের উত্তরগুলো জোরালো ও স্পষ্ট ছিল বলে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ দু'দিন অব্যাহত ছিল। ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে প্রেরিত রিপোর্টের নিরিখে ট্রাইবুনাল কর্মকর্তাদের ইচ্ছা

---

৮৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৫।

৯১. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহিদানা কারনামে (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ ১৫১-১৫৭।

ছিল তাঁদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের। এ লক্ষ্যে কারাগারে পূর্বেই তাঁদেরকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের সেলে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হয়। তাছাড়া তাঁদের নিজেদের মধ্যে কোন প্রকারের দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তার উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারী করে।[৯২] হযরত শায়খুল ইসলাম বলেন, মাল্টার জীবনে এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত। কারণ পারস্পরিক সাক্ষাৎ বন্ধ থাকায় কার উপর কখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে তা জানারও সুযোগ ছিল না। এক মাস পর সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। গোয়েন্দা রিপোর্টের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ ও স্বীকারোক্তি উদ্ধারে ব্যর্থ হলে আদালত তাঁদেরকে দ্বীপান্তরের রায় দেয়। ১৯১৭/১৩৩৫ সালের রবীউস্ সানী তাঁরা মাল্টা দ্বীপে প্রেরিত হন।[৯৩] সেখানে তখন বিভিন্ন দেশীয় প্রায় ৩,০০০ যুদ্ধবন্দী বিদ্যমান ছিল।

শায়খুল ইসলাম আজীবন হযরত শায়খুল হিন্দের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করেন। স্বাধীনতার দাবীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোসহীন। তাঁর এ চেতনার প্রথম সূচনা ঘটে ১৯০৯/১৩২৬ সালে যখন তিনি শায়খুল হিন্দের নিকট পুনর্বার হাদীস অধ্যয়নে রত ছিলেন। এর আগে ছাত্র জীবনে ১৮৯২/১৩০৯-১৮৯৮/১৩১৬) শায়খুল হিন্দের সহিত অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক থাকলেও বিপ্লবের কার্যক্রম চরম গোপনে পরিচালিত ছিল বিধায় তাঁর পক্ষে কিছুই টের পাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯০৯ সালে তিনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র মর্যাদা সমুন্নত রাখার স্বার্থে ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখনো শায়খুল হিন্দের গোপন কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হননি। ১৯১৫/১৩৩৪ সালের মুহার্‌রমে শায়খুল হিন্দ মদীনায় পৌঁছে তাঁকে ও হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীকে একান্তে ডেকে বিপ্লবের বিস্তারিত কর্মসূচী অবহিত করে যোগদানের আদেশ করলে উভয়ে আন্দোলনে সংযুক্ত হন।[৯৪] শায়খুল হিন্দের বিপ্লবের কর্মসূচী তখন প্রায় চূড়ান্ত পর্বে উপনীত। শায়খুল হিন্দ নিজেও জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাই মনে মনে একজন যোগ্য উত্তরাধিকারীর সন্ধান করছিলেন।

মদীনা শরীফের ঐ বৈঠকের পর হযরত শায়খুল ইসলামের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি পবিত্র রওযা শরীফে হাদীস অধ্যাপনার বদলে ইংরেজ

---

৯২. প্রাগুক্ত।

৯৩. মাদানী, নক্শে হায়াত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৪।

৯৪. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, তাহরীকে শায়খুল হিন্দ (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৫), পৃ ৮০।

বিরোধী জিহাদকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্থির করেন। শায়খুল হিন্দের সেবা শুশ্রূষা ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন করার মহৎ উদ্দেশ্য তাঁকে নিজে অভিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও মাল্টার নির্বাসিত জীবন অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঐ অঙ্গীকার ও সংকল্পের কারণে ৩ বছর পর মুক্তি পেয়েও তিনি আর মদীনায় ফিরে যাননি। বরং সোজা চলে আসেন ভারতে। হযরত শায়খুল হিন্দের দূরদৃষ্টি কতখানি সত্য ছিল সেটি পরে অনুভব করা গিয়েছে। কেননা মাল্টা থেকে ফিওে এসে মাত্র ৫ মাস ২৮ দিন পরই তিনি ইন্তিকাল করলে এই শায়খুল ইসলামই তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে এমন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত তিনি একদণ্ড বিশ্রাম গ্রহণ করেননি।[৯৫]

দুই

বন্দী অবস্থায় হযরত শায়খুল ইসলামের উপর বহু অত্যাচার ও নির্যাতন চলে। কিন্তু তাঁকে নিজ আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। মিসরের আল আস্ওয়াদ জেলখানায় তাঁকে ও তাঁর সহবন্দীদের প্রত্যেককে যেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেখানে হাত-পা প্রসারিত করে শয়নের সুযোগ ছিল না। নামায-কালাম, আহার-নিদ্রা ও পেশাব-পায়খানা সবই একই স্থানে সম্পাদন করতে হত। ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ১ ঘন্টার জন্য একজনের পরে অপরজনকে পালাক্রমে বের করা হত যেন তাঁদের পারস্পরিক সাক্ষাতের কোন সুযোগ না ঘটে।[৯৬]

হযরত শায়খুল ইসলাম ঐ দিনগুলোতে সারাক্ষণ নামায, যিক্র, কুরআন তিলাওয়াত ও মুরাকাবায় মশগূল থাকেন। মাল্টায় পৌঁছলে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়। তখন একজন অন্যজনের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পান। তবে নির্দেশ ছিল, একদিন পূর্বেই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে মঞ্জুর করিয়ে নিতে হত। বাইরে যোগাযোগের জন্য সপ্তাহে ২ দিন চিঠি-পত্রের সুযোগ দেওয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষই কাগজ ও খাম সরবরাহ করত। পত্রে অতিরিক্ত কথা লেখার জন্য নিজস্ব কাগজ ব্যবহারের অনুমতি ছিল না। (মাল্টা কারাগার থেকে লেখা তাঁর একখানা চিঠির নমুনা গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তিনি মাল্টা গমনকালে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিজ স্ত্রী, ১ কন্যা, ২ পুত্র ও বয়োবৃদ্ধ পিতাকে রেখে যান। জননী ইতোপূর্বেই

৯৫. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।
৯৬. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৩৯।

ইন্তিকাল করেন। বন্দী জীবন শেষ করে ফিরে এসে পরিবারে তাদের কাউকে জীবিত পাননি। এক এক করে সকলের মৃত্যুতে গোটা পরিবার সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়।[৯৭]

বস্তুত ইংরেজ তাঁকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার দ্বারা পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন। তাই পরিণামে তিনি আরো বেশী উপকৃত হন। তিনি হযরত শায়খুল হিন্দের দীর্ঘ সংসর্গ, যা তাঁর পরম কাম্য ছিল, লাভ করেন এবং এ সুযোগে নিজেকে ইল্‌মী, আমলী, আখ্‌লাকী ও রূহানী সকল দিক থেকে উন্নীত করে নেন। তিনি শায়খুল হিন্দের সেবায় নিজকে উৎসর্গিত করেন।[৯৮] হযরত শায়খুল হিন্দের চিন্তাধারা ও রাজনীতি গভীরভাবে আত্মস্থ করে নেন। বন্দী শিবিরে সহস্রাধিক রাজদ্রোহীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিল জার্মানী। অবশিষ্টরা ছিল অস্ট্রেলিয়ান, বুলগেরীয়, মিসরীয়, সিরীয় ও তুর্কী। মাল্টায় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অবস্থান করায় তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে এই অভিজ্ঞতা তাঁর অনেক উপকারে আসে। তাছাড়া শৈশবে পবিত্র কুরআন হিফ্য করার সুযোগ হয়নি। মাল্টায় প্রথম বছরেই কুরআন শরীফ হিফ্য করেন এবং রমযানে মিহ্‌রাব শোনান। এখানে তুর্কী বন্দীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তিনি তাদের ভাষা আয়ত্ত করেন।[৯৯]

মাল্টায় মুসলিম কয়েদীদেরকে যন্ত্রের সাহায্যে বধকৃত জন্তুর গোশত খেতে দেওয়া হত। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং অকাট্য দলীলের দ্বারা এ পদ্ধতির যবাহ্‌কে ইসলামের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ প্রমাণ করেন। তাঁর প্রবল আপত্তির কারণে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। মুসলিম কয়েদীদের কেউ মারা গেলে ইংরেজদের সরকারী নিয়মেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হত। এখানেও তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে জেলের ভিতর রীতিমত আন্দোলন গড়ে তোলেন। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সেই দাবীও মেনে নেয়। ফলে তাঁদের সহকর্মী হযরত মাওলানা হাকীম নুস্‌রত হুসাইন ইন্তিকাল করলে সুন্নত তরীকায় তাঁর গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। শায়খুল ইসলামের সাহসী উদ্যোগের দ্বারা মাল্টায় নামাযের সময় আযান ও জামাআতের ব্যবস্থা হয়। তারপর

---

৯৭. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ আল হোসাইনী, মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, চেরাগে মুহাম্মদ (ঢাকা ঃ জামেয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ, ১৯৯৮), পৃ ১০৮-১০৯।

৯৮. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৬।

৯৯. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ আল হোসাইনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩।

নামায শেষে যিক্‌র, তালীম ও তাল্‌কীনের কাজও চলে। এভাবে বন্দীখানা রীতিমত একটি ধর্ম বিদ্যালয়ে ও একটি আধ্যাত্মিক সাধনার খানকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।[১০০]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শায়খুল ইসলামের উস্তায হযরত শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু বছর পূর্বে রেশমী রুমাল আন্দোলনের গোপন তৎপরতা শুরু করেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনের সন্ধান পেতে বেশ বিলম্ব হয়। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ জোটভুক্ত মিত্রশক্তি এবং জার্মান জোটভুক্ত অক্ষশক্তির মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে। ঐ বছর নভেম্বরে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয় এবং যুদ্ধ ইউরোপ থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।[১০১] ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে মিত্রশক্তির অবস্থান ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় বাধ্য হয়। কিন্তু ইতোপূর্বেই হযরত শায়খুল হিন্দের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঐ বছর শেষ দিকে গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর এই গোপন আন্দোলনের সন্ধান পায়। গোয়েন্দা বিভাগ রেশমী রুমাল-এর সূত্র ধরে যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করে। বিশ্বযুদ্ধের নাজুক পরিস্থিতিতে এ আন্দোলনের দ্বারা কোন বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকায় বৃটিশের নির্দেশে পবিত্র মদীনা থেকে শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলামসহ ৫ নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়।

১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। তখন অনেক রাজবন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মাল্টার বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলিমের এক যৌথ জনসভায় পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের নির্দেশে নিরীহ জনসাধারণের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়েছিল। তাতে অনেক লোক হতাহত হয়।[১০২] রাওল্যাট আইনের বলে ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ নির্যাতন চলে। ফলে সারা উপমহাদেশে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এদিকে খেলাফত আন্দোলনের কারণে উপমহাদেশে বৃটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর জমইয়তে উলামা অমৃতসর অধিবেশনে বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগের প্রস্তাব পাস করে। ঐ বছর খেলাফত কমিটির আমন্ত্রণ ক্রমে মহাত্মা গান্ধীও

---

১০০. মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯-৮০।

১০১. কে.আলী, মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ ৯৯-১২৪।

১০২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২-১৯৩।

খেলাফতে যোগ দেন। এভাবে জমইয়তে উলামা, খেলাফত কমিটি ও জাতীয় কংগ্রেস মিলিতভাবে প্রতিবাদ শুরু করলে রাজনৈতিক জটিলতা চরমভাবে বৃদ্ধি পায় এবং 'এক পর্যায়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দেশ ও বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় সকল রাজবন্দীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এ সময় শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলামসহ মাল্টার বন্দীগণ মুক্তির পরওয়ানা লাভ করেন। ফলে ১৯২০ সালের ৮ জুন তাঁদেরকে মাল্টা থেকে প্রিজন জাহাজে করে বোম্বাই বন্দরে এনে বেড়ী খুলে দিয়ে মুক্তি প্রদান করা হয়।[১০৩]

খেলাফত কমিটির মাওলানা শওকত আলীসহ জমইয়তে উলামার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হযরত মাওলানা মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহ্‌তামিম হযরত মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ আহমদ, ভুপালের কাযী নওয়াব মুহীউদ্দীন খান প্রমুখসহ বহু লোক বন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান। তখন স্থানীয় মিনার মসজিদ মাঠে খেলাফত কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ নিজেদের বাড়ী না গিয়ে সোজা খেলাফত অধিবেশনে গিয়ে যোগ দেন। বোম্বাই-এ তাঁদের অবস্থান কাল ছিল মাত্র ২ দিন। এ সময়ে হযরত মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গীমহল্লী ও মহাত্মা গান্ধীও তাঁদের সাক্ষাতে মিলিত হন।[১০৪]

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

মাল্টায় মুক্তির আদেশ পাওয়ার পর হযরত শায়খুল ইসলামকে নিজের অবস্থান ক্ষেত্র নির্ধারণে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছিল। কারণ তিনি ভারত থেকে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে পরিবার-পরিজনসহ চলে গিয়েছেন দীর্ঘ ২১ বছর পূর্বে। তারপর মদীনায় বসবাসের যৎসামান্য ব্যবস্থা করা হলেও মাল্টার বন্দী জীবনে সেই ব্যবস্থার কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।[১০৫] বাড়ী ঘর সহায়-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে যায়। পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি সবাই মারা যান। বয়স তখন ৪১ বছরের কোঠায় অথচ তাঁর জন্য কোথাও আবাসের ঠাঁই নেই। সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ও

১০৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ৫১; বিলাল আহমদ ইমরাম, যার ত্যাগে আমরা স্বাধীন (সিলেট : আল আন্‌সার একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ ৩২।

১০৪. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৫।

১০৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

স্বজনহারা হয়ে তিনি জীবনের অবশিষ্টাংশ মদীনায় প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে এবং মসজিদে নববীতে হাদীসচর্চার কাজে অতিবাহিত করতে মনস্থ করেন। ইতোপূর্বে তিনি মদীনায় অবস্থান করলেও সেটি ছিল পিতামাতার সেবা যত্নের লক্ষ্যে। তাঁদের অবর্তমানে পুনরায় মদীনা চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ বস্তুতঃ সেখানে হিজরতের নিয়্যতে এবং স্থায়ীভাবে অবস্থানের মনোভাবই প্রকাশ করে। তিনি বলেন, যেহেতু আমি নিজেরই ইচ্ছায় হযরত (শায়খুল হিন্দ)-এর সহযাত্রী হয়েছি, উদ্দেশ্য ছিল যেন কষ্টকর কারাজীবনে তাঁর কিছু সেবা করতে পারি এবং যথাসম্ভব কষ্ট লাঘবে সাহায্য করতে পারি সেহেতু পূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল যে, বোম্বাই অবতরণের পরই হিজাযের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করে যাব।[১০৬]

কিন্তু তাঁর হিজায প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি। কারণ ৮ জুন বোম্বাই পৌছে হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট এ ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি অনুমতি দেননি। শায়খুল হিন্দ তখন তাঁকে দেওবন্দে নিজের সাথে আরো কিছুদিন রাখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাঁকে এ ভাবে ধরে রাখার মধ্যে শায়খুল হিন্দের কি উদ্দেশ্য ছিল তা মাদানীর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, সুয়েজ অতিক্রম কালে একদিন তাঁর (শায়খুল হিন্দ) কাছে এ মনোভাব ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, আমি বুখারী শরীফের 'তারাজিমুল আব্ওয়াব'-এর ভাষ্য রচনা করতে ইচ্ছুক। এ কাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আমি বললাম, এক শর্তে আমি ভাষ্য রচনার সমাপ্তি পর্যন্ত দেওবন্দে অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট কাজে আপনার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। তিনি বললেন, শর্তটি কি? আমি বললাম, শর্তটি হল, যে সময়টুকু আপনি এ কাজের জন্য নির্ধারণ করবেন সে সময়ে যত বড় ব্যক্তিই আপনার নিকট উপস্থিত হোক না কেন তার জন্য সেখান থেকে সময় ব্যয় করা যাবে না। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবে আমারও একটি শর্ত আছে। আমি বললাম, সেটি কি ? তিনি বললেন, তা পরে বলব।[১০৭]

হযরত শায়খুল হিন্দ ঐ শর্তের কথা পরে বলেননি। আর বলে থাকলেও শায়খুল ইসলাম তা কখনো প্রকাশ করেননি। তিনি শায়খুল হিন্দের সঙ্গে তারাজিম-এর কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বোম্বাই পৌছার পর তিনি যখন দেখলেন যে, ভারতে খেলাফত আন্দোলনের তোড়জোর চলছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শায়খুল হিন্দকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখছেন। শায়খুল হিন্দ নিজেও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজকর্মের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ছেন। এমতাবস্থায়

---

১০৬. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭১।
১০৭. প্রাগুক্ত।

'তারাজিম'-এর কাজ শীঘ্র শুরু করা আদৌ সম্ভব হবে না অনুমান করে তিনি শায়খুল হিন্দকে আবারো বললেন, তাহলে মনে হয় আমাকে এখান থেকেই মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে যাওয়া ভাল। উত্তরে শায়খুল হিন্দ বললেন, গাদ্দার শরীফ সরকারের আমলে তোমার কোন ক্রমেই মদীনায় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না।[১০৮]

বোম্বাই বন্দর পৌছা পর্যন্ত হযরত শায়খুল ইসলামের মনে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা কিংবা ভারতবর্ষে অবস্থান করার কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না বলেই মনে হয়। সম্মানিত শিক্ষকের নির্দেশ পালনার্থে তারাজিমের কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত সাময়িকভাবে অবস্থানের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেওবন্দে পৌছার পর শায়খুল হিন্দের পূর্ণ সময় ও পূর্ণ মনোযোগ স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিবেদিত দেখে তাঁরও জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত শুধু এখানে অবস্থানের সিদ্ধান্তই নয় বরং শিক্ষা ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশ ও জাতির মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেন।[১০৯]

পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোকে বোঝা যায় যে, হযরত শায়খুল হিন্দ সুয়েজের পথে যে শর্তটির[১১০] দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটি ছিল সম্ভবতঃ এই প্রতিনিধিত্ব গ্রহণেরই শর্ত। এ লক্ষ্যেই তিনি শায়খুল ইসলামকে হিজায ফিরে যেতে বারণ করেছিলেন এবং নিজের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রাখেন যে, দু'তিন দিনের জন্যও বিচ্ছিন্ন থাকা পছন্দ করেননি। হযরত মাদানী বলেন, বোম্বাই-এ আমি শায়খুল হিন্দকে বললাম, তাহলে আমি অন্তত দু'তিন দিন পরে দেওবন্দে গিয়ে পৌছি। এখানে আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আছেন, যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, তাদের সাথে সাক্ষাত সেরে আমি দেওবন্দে পৌছে যাব। তিনি বললেন, না তোমাকে আমার সঙ্গেই দেওবন্দ পৌছতে হবে।[১১১]

বোম্বাই থেকে রওয়ানার পর পথিমধ্যে বহু স্থানে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। দেওবন্দ পৌছার পর শায়খুল হিন্দের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানান যেন নিজেদের পরিবারস্থ কাউকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। মাল্টায় বৃদ্ধ শায়খুল হিন্দের সেবা ও যত্নে তিনি যে শ্রম দিয়েছিলেন, সেই

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭২।
১০৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০।
১১০. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭১।
১১১. প্রাগুক্ত।

কারণে শায়খুল হিন্দের সকল আত্মীয় তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসার চোখে দেখেন। বিশেষতঃ শায়খুল হিন্দের বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতে শুরু করেন। শায়খুল ইসলাম শৈশবে এ গৃহেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তিনি এমন বয়সে এখানে এসেছিলেন যখন অন্তঃপুরে কারো সাথে পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না। মাল্টা থেকে ফিরে আসার পর হযরত শায়খুল হিন্দকে তাঁর স্ত্রী একদিন বললেন, আমার খুব ইচ্ছা হয়, হুসাইন আহমদের মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ করি। কিন্তু সে তো এখন বড় হয়ে গিয়েছে। শায়খুল হিন্দ বললেন, আমার অন্তরও চায় না যে, তুমি তার সাথে পর্দা করে চল। যদি আমার কোন পুত্রও হত সেও এতখানি সেবা করতে সক্ষম হত না যতখানি হুসাইন আহমদ করেছে। কিন্তু যাই হোক শরীঅতের নির্দেশ পালন করা অগ্রগণ্য। মহান শরীঅত আমাদেরকে সেই অনুমতি দেয় না।[১১২]

ওফাতের পূর্বদিন হযরত শায়খুল হিন্দ নিজে তাঁকে কলিকাতার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর জানাযায় শরীক হতে পারেননি। পথিমধ্যে মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন। শায়খুল হিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা রাশিদ হাসান চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি (শায়খুল ইসলাম) তখন মর্মাহত, দুঃখ ভারাক্রান্ত, সারাক্ষণ যেন উদাস নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হয়ে আছেন। আমি নিজ চোখে দেখেছি, শায়খুল হিন্দের ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ হাসান ও মাওলানা মুহাম্মদ মুহ্‌সিন তাঁকে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসালেন। দুই পার্শ্বে দুই ভ্রাতা আর মাঝখানে শায়খুল ইসলাম মাদানী। আমি নিজ কানে শুনেছি যে, শায়খুল ইসলাম বলছিলেন এখন আর ভারতে আমার কে আছে। আমার অভিভাবক বেঁচে নেই। আমি আশ্রয়হীন হয়ে গিয়েছি। ভ্রাতৃদ্বয় কাঁদতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হাকীম মুহাম্মদ হাসান শায়খুল ইসলামকে বললেন, এখন থেকে আপনি এ পরিবারের জ্যেষ্ঠজন এবং শায়খুল হিন্দের স্থলাভিষিক্ত। ছোট ভ্রাতা মুহাম্মদ মুহ্‌সিন বললেন, এ বাড়ী আপনার। এ বাড়ীতে যেভাবে বড় ভাই থাকতেন আপনি সেভাবেই থাকবেন। আপনার অবস্থান এ পরিবারের জন্য আশীর্বাদ।[১১৩]

স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শুধু পারিবারিকভাবেই নয়; শায়খুল ইসলাম তখন হযরত শায়খুল হিন্দের সকল ছাত্র, সকল কর্মী ও ভক্তবৃন্দের কাছে একবাক্যে

---

১১২. রাশিদ হাসান উসমানী, তায্‌কিরায়ে হযরত শায়খ মাদানী (দেওবন্দ ঃ রাশিদ কোম্পানী, তা. বি.), পৃ ১১২।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯।

'জা-নাশীনে শায়খুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।[১১৪] ঐ সময়ে রাজনৈতিক তৎপরতা জোরেসোরে চলছিল। দেশে ছোট বড় নেতৃবৃন্দের কোন অভাব ছিল না। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শায়খুল ইসলামকে হযরত শায়খুল হিন্দের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মেনে নেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর নামের পূর্বে 'জা-নাশীনে শায়খুল হিন্দ' কথাটির অবশ্যই উল্লেখ থাকত।[১১৫]

[illegible]

১৯২০ সালের এমন সময়ে শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিক্ষক শায়খুল হিন্দের সহযোগী হয়ে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন, যখন খেলাফত আন্দোলন গোটা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চেতনার গণজোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছিল। দেশবাসীর সকলে নিজেদের পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জাঠ, শীআ, সুন্নী, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, দেওবন্দী, বেরেলবী নির্বিশেষে সকলে অভিন্ন কণ্ঠে 'খেলাফত জিন্দাবাদ', 'ভারত মাতার জয়' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এতখানি উন্নতি লাভ করেছিল যে, আর্য সমাজীদের নেতা স্বামী শর্দা নন্দ দিল্লীর জামি মসজিদের ভিতর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। এই পরিস্থিতিতে শায়খুল হিন্দ ও তাঁর মাল্টার সঙ্গীগণ ভারতে প্রবেশ করলে তাঁরা আন্দোলনরত কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১১৬]

হযরত শায়খুল ইসলাম যে খেলাফতের স্বপক্ষে পবিত্র মদীনায় থাকাকালেই আওয়াজ তুলেছিলেন সেই খেলাফতের দাবীতে গোটা ভারত ঐক্যবদ্ধ দেখে তাঁর বিপ্লবী চেতনায় অগ্নির সংযোগ ঘটে। হযরত শায়খুল হিন্দ, যিনি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সফল করার জন্য নিজের মুজাহিদ শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, হাফিয যামিন শহীদ প্রমুখের স্নেহধন্য ও ইল্‌মী উত্তরাধিকারী ছিলেন, যিনি ১৯০৫ সাল থেকে রেশমী রুমাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে অবশেষে মাল্টায় নির্বাসিত হন, মুসলিম বিশ্বের চরম দুরবস্থা, বিশেষ করে মাতৃভূমি ভারতের

---

১১৪. ড. আবূ সালমান শাহ্‌জাহানপূরী, ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭-৮৯।

১১৫. খোরশেদ আলম শামীমী, "শায়খুল ইসলাম কা খেতাব" দৈনিক আল জমইয়ত (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা), পৃ ৯৬।

১১৬. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯২, ১ম খণ্ড পৃ ৪৮২।

উপর ইংরেজদের দলন ও নিপীড়ন যাঁর হৃদয়কে অহর্নিশ দগ্ধ করছিল, তিনি প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের এ বিপ্লবী পরিবেশ দেখে নতুন শক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সুদীর্ঘ বন্দী জীবনের নির্যাতন ও কষ্ট-ক্লেশ শায়খুল হিন্দের মনে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও ইংরেজ বৈরী মনোভাবে কোন ছেদ কিংবা দুর্বলতা আনতে পারেনি। বরং ভারতীয় সৈরাচারী মার্শাল ল, রাওল্যাট এ্যাক্ট-এর পাশবিকতা, জালিয়ানওয়ালাবাগ ও অন্যান্য স্থানের নির্মম ঘটনাবলী, তুরস্ক সাম্রাজ্যের নির্দয় ভাগ বন্টন ও সিউরা চুক্তি এবং তুর্কীদের সাথে সীমাহীন অন্যায় আচরণ ইত্যাদি তাঁর মনের আগুন আরো বৃদ্ধি করে দেয়। বোম্বাই অবতরণের পরই মরহুম মাওলানা শওকত আলী, খেলাফত কমিটির সদস্যবৃন্দ, মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গীমহল্লী, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের সাথে একান্তে এবং প্রকাশ্যে তাঁর কথাবার্তা হয়। তিনি তখন ভারতবর্ষকে ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার লক্ষ্যে 'অহিংস কর্মসূচী' অত্যাবশ্যকীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। একই সূত্রে তিনি তখন খেলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তসমূহের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।[১১৭]

মাল্টার বন্দীগণ যে মাসে ভারতে পদার্পণ করেন সেই মাসেরই শেষ দিকে এলাহাবাদে খেলাফত কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। খেলাফত কমিটি ভারতের ভাইসরয়কে একটি নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেন যে, সিউরা চুক্তি পরিবর্তন না করা হলে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয় 'খেলাফত'কে রক্ষা না করা হলে গোটা ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতা প্রদর্শনে বাধ্য হবে। ব্যারিস্টার মাযহারুল হক, স্যার ইয়াকুব হাসান, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল নোটিশটি সরকারের কাছে পৌঁছে দেন।[১১৮] এ নোটিশের কয়েকদিন পূর্বে মাহাত্মা গান্ধীও ভাইসরয়কে এক চিঠি দিয়ে এ কথা বলে দেন যে, আমি লন্ডনে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করিয়েছি এবং সর্বদা বৃটিশের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে ছিলাম। আমি আপনার নিকট আবেদন করছি যে, আপনি খেলাফতের বিষয়টি মুসলমানদের ইচ্ছা অনুসারে ফয়সালা করিয়ে দিন। এখনো সমাধানের সময় রয়েছে। নতুবা আমি বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হতে বাধ্য হব। আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ খোলা

১১৭. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৬; আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮২।
১১৮. প্রাগুক্ত।

আছে। সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কিংবা স্বদেশ ত্যাগ করা কিংবা অসহযোগিতা করা। আমি তাদেরকে অসহযোগিতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছি।[১১৯]

খেলাফত কমিটির এ সাহসী চ্যালেঞ্জ ও মহাত্মা গান্ধীর এ উদার উদ্যোগ সমস্ত ভারতে নতুন চেতনার বন্যা বইয়ে দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। উকীল ব্যারিস্টারগণ কোর্ট-কাচারী বর্জন করেন। সরকারী কর্মচারীরা কাজকর্ম থেকে ইস্তফা দেয়। দেশের নির্ভরযোগ্য ও শীর্ষস্থানীয় ৫০০ আলিমের স্বাক্ষরে ফত্ওয়া প্রকাশ করে ঘোষণা করা হয় যে, বৃটিশ সরকারকে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান অবৈধ।[১২০] বৃটিশের অধীনে সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করা হারাম। ১৯২০ সালের ৬ ডিসেম্বর জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে ফত্ওয়াটি প্রচার করা হয়। ঐ বছর ২৬ ডিসেম্বর নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে স্বরাজ ও অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হলে মুসলিম লীগসহ সকল মুসলিম নেতা এই ফত্ওয়ার সমর্থন করেন।[১২১]

রেশমী রুমাল আন্দোলনের মহান নেতা হযরত শায়খুল হিন্দ নিজেও এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। অন্যান্য নেতার মধ্যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিসেস এ্যানী ব্যসান্ত, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, মতিলাল নেহ্‌রু প্রমুখ অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও তাদের বিরোধিতা সামাজিকভাবে কোনই গুরুত্ব পায়নি। হযরত শায়খুল হিন্দ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করায় ভারতের শীর্ষস্থানীয় সকল উলামা ও মাশায়িখ এরই সমর্থনে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে দেওবন্দেরই কতিপয় আলিম এমন ছিলেন যারা অসহযোগ কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়াকে সমর্থন করেননি।[১২২] উত্তরকালে তাদের এ দ্বিমত পোষণ শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এদিকে আলীগড় কলেজ কর্তৃপক্ষও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম স্বাধীনচেতা তরুণদের একটি দল আন্দোলনের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। বিপ্লবী ছাত্রদের আমন্ত্রণে

---

১১৯. কাযী আদীল আব্বাসী, **তাহরীকে খেলাফত** (দিল্লী : আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দু, তা. বি.), পৃ ১৫৬; ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭; L.F. Rushbrook Williams, **India in 1920**, (Calcutta, Superintendent Government printing, 1921), p. 31.

১২০. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, **মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাকবিল** (লাহোর : বদর রশীদ প্রিন্টার্স, তা.বি.), পৃ ৫১১।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৬-৪০৭।

১২২. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯।

উপস্থিত হয়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ফলে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড.যাকির হুসাইন প্রমুখের নেতৃত্বে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন ও জাতীয় ইউনিভার্সিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শায়খুল হিন্দের নিকট আবেদন জানান। হযরত শায়খুল হিন্দ নিজে এই ইউনিভার্সিটি (জামিয়া মিল্লিয়া) উদ্বোধন করেন।[১২৩] উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আমার বার্ধক্য ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি আপনাদের আমন্ত্রণে এ কারণে উপস্থিত হয়েছি যে, এখান থেকে আমি আমার এক হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার আশাবাদী। অনেক নেক বান্দা এমন আছেন যাদের চেহারায় নামাযের নূর ও আল্লাহ্‌র যিক্‌রের জ্যোতি বিদ্যমান কিন্তু তাদেরকে যখন আহ্বান করে বলা হয় যে, জলদী করে উঠ এবং মুসলিম উম্মাহ্‌কে কাফিরদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার কর, তখন তাদের অন্তরে ভয়ভীতি ও আতংক ছেয়ে যায়। এ ভয় আল্লাহ্‌র ভয় নয়, এ ভয় হল, কতিপয় নাপাক লোক ও তাদের অস্ত্র সরঞ্জামের ভয়।[১২৪]

নতুন ইউনির্ভাসিটি 'জামিয়া মিল্লিয়া' নামে কার্যক্রম শুরু করে। বক্তৃতা শেষে ছাত্ররা শায়খুল হিন্দের নিকট অসহযোগের সমর্থনে একটি ফত্‌ওয়া স্বাক্ষরের জন্য পেশ করে। সরকারের পক্ষ থেকে স্যার রহীম বখ্‌শ প্রেরিত হয়েছিলেন। যথাসময়ে তিনি শায়খুল হিন্দকে স্বাক্ষর করতে বারণ করেন এবং স্বাক্ষরের মন্দ পরিণাম হিসেবে বহু ভয়ভীতির কথা শোনান। শায়খুল হিন্দ সেদিকে কোনই কর্ণপাত না করে স্বাক্ষর করে দেন। শায়খুল ইসলাম উপরোক্ত সকল কাজে প্রিয় শিক্ষকের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।[১২৫]

তিন

ভারতে পৌঁছে হযরত শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাজনৈতিক কাজকর্মে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সাথে অন্যতম সহযোগী শায়খুল ইসলাম মাদানী। আমরূহা মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম মাওলানা হাফিয যাহিদ হাসান শায়খুল ইসলামকে নিজ মাদ্রাসায় শিক্ষকতার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শায়খুল হিন্দ এ সময়ে শায়খুল ইসলামকে নিজের সংস্পর্শ থেকে দূরে কোথাও যেতে দিতে চাননি, তবু হাফিয যাহিদের মন রক্ষার্থে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দেন। সে মতে তিনি

---

১২৩. আ.হ.ম. মুজতবা হোসাইন, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮।
১২৪. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২।
১২৫. প্রাগুক্ত।

আমরুহা মদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।[১২৬] ঐ সময় তাঁর তৃতীয় বারের বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়। ইতোপূর্বে ২ বারই স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছিল। হাফিয যাহিদের উদ্যোগে মরহুমা দ্বিতীয় স্ত্রীর ছোট ভগ্নির সাথে এ বিবাহ হয়। শিক্ষকতায় মাত্র ২ মাস অতিবাহিত হতেই শায়খুল হিন্দ সংবাদ পাঠালেন যে, তোমাকে আমার খুব প্রয়োজন। তুমি আমার নিকটে উপস্থিত থাকা বেশী জরুরী। কাজেই সেখানে বিকল্প কোন ব্যবস্থা করে তুমি চলে এসো।[১২৭]

সংবাদ পেয়ে শায়খুল ইসলাম দেওবন্দ আসেন এবং বিকল্প কোন ব্যবস্থা করে আসার জন্য এক মাসের বর্ধিত অনুমতি নিয়ে ফিরে যান। ঐ সময় শায়খুল হিন্দ তাঁকে সঙ্গে করে সমস্ত ভারত সফর করার জন্যও মনস্থ করেছিলেন। ইত্যবসরে জামিয়া মিল্লিয়া উদ্বোধনের আমন্ত্রণে শায়খুল হিন্দ আলীগড় গমন করলে শায়খুল ইসলামকে লিখে পাঠালেন যে, আমি তোমাকে আমরুহা অবস্থানের জন্য অতিরিক্ত এক মাসের যে অনুমতি দিয়েছিলাম যদিও তা এখনো পূর্ণ হয়নি তবুও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে আমার কথা হল, তুমি আলীগড় সম্মেলনে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হও।[১২৮]

আলীগড় সম্মেলনের পর হযরত শায়খুল হিন্দের অসুস্থতা অত্যধিক বেড়ে গেল। তাঁকে চিকিৎসা ও চেকআপ করার জন্য দিল্লীতে আনা হল। শায়খুল ইসলাম নিজেও তাঁর সাথে দিল্লী পৌছলেন। তখন দিল্লীতে জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের ২য় বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়। শায়খুল হিন্দ অসুস্থতা নিয়েই সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[১২৯] অধিবেশনে তিনি আলিমদের লক্ষ্য করে যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, সেটি ছিল দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর সর্বশেষ অসিয়্যত। শায়খুল ইসলাম মাদানী, মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ, মাওলানা আহমদ সাঈদ প্রমুখ আলিম তাঁর সেই শেষ অসিয়্যতকে নিজ নিজ জীবনের পরম পাথেয় ও পথ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে শায়খুল হিন্দ তখন নিজের সুগভীর প্রজ্ঞা ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরেন।

এই অধিবেশনে হযরত শায়খুল হিন্দ বলেন যে, ইসলাম ও মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু ইংরেজ। তাই ইংরেজের সাথে সহযোগিতা বর্জন করা ফরয। মিল্লাত ও খেলাফত সংরক্ষণের নিখুঁত দাবীর সমর্থনে স্বদেশী লোকজনের (হিন্দু

---

১২৬. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১-১৫২।

১২৭. প্রাগুক্ত।

১২৮. প্রাগুক্ত।

১২৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৫।

সম্প্রদায়) পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গেলে সেটি গ্রহণ করা বৈধ এবং ধন্যবাদের যোগ্য। দেশকে শৃংখলমুক্ত করার প্রয়োজনে স্বদেশী লোকজনের সাথে কর্মসূচীর ঐক্য গঠনে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তা এমন পদ্ধতিতে হতে হবে, যেন ধর্মীয় কর্তব্যের কোথাও ছেদ না পড়ে। যদি বর্তমান কালে শত্রুর মোকাবেলা করতে তোপ, কামান, বিমান ইত্যাদির ব্যবহার করা জায়িয হয়, যা পূর্বকালে ছিল না, তাহলে মিটিং, মিছিল, পারস্পরিক ঐক্য গঠন, অভিন্ন দাবী উত্থাপন ইত্যাদি নির্বিঘ্নে জায়িয হবে। কেননা বর্তমানে আন্দোলনকারীগণ এমন পর্যায়ের লোক, যাদের হাতে তোপ কামানের ব্যবস্থা নেই, তাঁদের জন্য ঐ গুলোই হল যুদ্ধাস্ত্র। তিনি বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের স্বদেশী একটি সম্প্রদায়, যারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত তাদেরকে কোন না কোনভাবে আপনাদের দীর্ঘ দিনের লালিত পবিত্র উদ্দেশ্য সফলের পথে সহযোগী করে দিয়েছেন। আমি আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্যকে অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ মনে করি। বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঐক্যের লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি সেটি আন্তরিকভাবে পছন্দ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরিস্থিতি যদি অনৈক্যের দিকে মোড় নেয় তাহলে স্বাধীনতা অর্জন চিরদিনের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।[১৩০]

খেলাফত কমিটি কলিকাতা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাহসী তৎপরতায় কলিকাতা আলীয়া[১৩১] থেকেও ছাত্রদের একটি দল

---

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭।

১৩১. সিপাহী বিপ্লবের পর ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক আরবী,ফার্সী ও ইসলামী বিষয়ের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তার কাছে আবেদন পেশ করেন। সে সময়ে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর সুযোগ্য শাগিরদ ও প্রসিদ্ধ আলিম হযরত মাওলানা মাজদুদ্দীন (মোল্লা মাদান) ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করে ছিলেন। সাক্ষাৎকারীরা বড় লাটের মাধ্যমে তাঁকে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করেন এবং তা কার্যকর করতে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বড় লাট কোম্পানীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে সক্ষম হন এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে কলিকাতা বৈঠকখানা রোডের একটি ভাড়া বাড়ীতে ১১৯৪ শাবান: ১৭৮০ অক্টোবর মাসে মাদ্রাসার কাজ আরম্ভ করেন। মাওলানা মাজদুদ্দীন মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। ভাড়া বাড়ীতে ছাত্র-শিক্ষকের স্থানের সংকুলান হচ্ছিল না বিধায় কলিকাতার পদ্ম পুকুর লেইনে ১৭৮১ সালে একটি নিজস্ব ভবণ নির্মাণ করা হয়। ইংরেজদের সরকারী কাগজপত্রে এটি Mohamedan College নামে অভিহিত। তবে সর্ব সাধারণ্যে এটি কলিকাতা মাদ্রাসা (Calcutta Madrasah) নামে প্রসিদ্ধি লাভ

মাদ্রাসা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। মাওলানা আযাদ তাদের নিয়ে শহরের নাখোদা মসজিদে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল এটিকে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল মাদ্রাসায় পরিণত করা এবং দেশের সকল বিপ্লবী নেতা ও আলিমগণের মাধ্যমে মাদ্রাসাকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে বেগবান করে গড়ে তোলা। সেমতে তিনি মাদ্রাসার প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে হযরত শায়খুল হিন্দের নাম প্রস্তাব করেন এবং এতদ উদ্দেশ্যে দিল্লীতে তাঁর কাছে নিজের একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শায়খুল হিন্দের পক্ষে বার্ধক্য ও অসুস্থতার দরুন তখন এ দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তাই তিনি নিজের জায়গায় অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে চাইলেন। উপস্থিতভাবে তখন মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা প্রমুখের সাথে আলাপ হয়।[১৩২] দেওবন্দ থেকে কলিকাতা অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় তাঁদের কেউ সেখানে যেতে সম্মত হননি। অবশেষে কিছুক্ষণ নিরব চিন্তা করার পর তিনি (শায়খুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে) বললেন, তাহলে নিজেরই দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। মৌলবী হুসাইন আহমদ ! তুমিই

করে। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য 'মাদ্রাসা মহাল' নামে একটি বিরাট আকারের ভূসম্পত্তিও খরিদ করা হয়েছিল। কিন্তু এটি হিন্দু প্রধান মহল্লায় অবস্থিত হওয়ায় নানা রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করে ওয়েলেসলী স্ট্রীটের পার্শে 'গোল তালাব' এলাকায় ১৮২৪ সালে নতুন ভবণ নির্মাণের কাজ শুর করা হয়। ১৭৮১ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত ৩৯ বছর পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি পরিচালক পরিষদ মাদ্রাসা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৮১৯ সালে মাদ্রাসার জন্য ১ জন ইংরেজ সেক্রেটারী ও ১ জন মুসলিম সহকারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয। এ ব্যবস্থা ১৮৫০ পর্যন্ত চালু থাকে। অতঃপর কয়েকজন খ্যাতি সম্পন্ন ওরিয়েন্টালিস্ট পরপর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ঐ ওরিয়েন্টালিস্টগণই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তাদের নাম ও কার্যক্রম যথাঃ Dr. Sprenger (১৯৫০-৫৭), Sir William Nassar Less (১৮৫৭-৭০) , Herry Ferdenand Blocxman (১৮৭৩-৭৮), Dr. A.F.R. Hernle (১৮৮১-৯০; ১৮৯১-৯৮), F.J. Rowe (১৮৯২; ১৮৯৫; ১৮৯৮-৯৯), Sir Edward Denison Ross (১৯০৩; ১৯০৪-৭; ১৯০৮-১১), Alexander Hamiloton Harley (১৯১১-২৩; ১৯২৫-২৭), J. M. Botomley (১৯২৩-২৫)। অতঃপর ১৯২৭ সাল থেকে উপমহাদেশীয় শিক্ষাবিদগণ এ পদ অলংকিত করতে আরম্ভ করেন। শামসুল উলামা কামালুদ্দীন আহমদ ছিলেন দেশীয় প্রথম অধ্যক্ষ (১৯২৭-২৮), তাঁর পরে শামসুল উলামা খান বাহাদুর হেদায়েত হুসাইন (১৯২৮-৩৪), শামসুল উলামা খান বাহাদুর মুহাম্মদ মূসা (১৯৩৪-৩৭; ১৯৩৮-৪১); খান বাহাদুর মুহাম্মদ ইউসুফ (১৯৩৭-৩৮; ১৯৪১-৪৩); খান বাহাদুর মুহাম্মদ যিয়াউল হক (১৯৪৩-৪৭) দায়িত্ব পালন করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, পৃ ২৮০)

১৩২. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫।

চলে যাও। শায়খুল ইসলাম একবার বলতে চেয়েছিলেন,আপনার সেবাযত্ন করার জন্যই আমি আমরূহা ত্যাগ করে এসেছি। আর এখন সেই সেবা করা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। ইত্যবসরে শায়খুল হিন্দ বলে উঠলেন, কলিকাতা গমন আমার সেবা করার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক তাৎপর্যবহ। এ কথা শুনে শায়খুল ইসলাম কোন উত্তর করলেন না, সোজা কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।[১৩৩]

বিদায় গ্রহণের জন্য মাদানী যখন শেষ বারের মত দেখা করতে গেলেন, তখন হযরত শায়খুল হিন্দের চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল। তিনি মাদানীর হাতখানা ধরে নিজের সমস্ত শরীরের উপর ঘোরালেন এবং দুআ করে বললেন, খোদা হাফিয। হযরত মাদানী চলে যাওয়ার জন্য মুখ ফিরিয়ে আট-দশ কদম সম্মুখে যেতেই আবার ডেকে আনলেন। তারপর নিজের বুকের সাথে বুক মিলিয়ে এবং মাথার উপর হাত রেখে বললেন, যাও আমি তোমাকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দিলাম।[১৩৪]

শায়খুল ইসলাম কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে অনিবার্য কারণে একদিনের জন্য আমরূহায় তিনি যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য হন। এখানে শীআ ও সুন্নীদের মধ্যে বিতর্কের ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মহা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দেয়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের মত জনপ্রিয় নেতা উপস্থিত হয়েও তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হননি। এমতাবস্থায় হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ অনুরোধের কারণে শায়খুল ইসলাম একদিনের জন্য যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য হন।[১৩৫]

তিনি বিতর্কের ময়দানে গিয়ে শীআ সুন্নী বিতর্কের কোন কথাই তুললেন না। বরং পবিত্র মক্কা, মদীনা, কারবালায়ে মুআল্লা ও নজফে আশরাফ প্রভৃতি স্থানের উপর বৃটিশ গোলা নিক্ষেপের হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরলেন এবং বললেন, মাথার উপর এ অত্যাচারী জালিম দাঁড়িয়ে থাকতে না কারো ধর্ম টিকে থাকবে, না কারো পবিত্র স্থান রক্ষা পাবে। কাজেই এ মুহূর্তে নিজেরা কলহে জড়িত না হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর শত্রুর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা আবশ্যক। শায়খুল ইসলামের বক্তৃতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তিনি পরদিন কলিকাতার

---

১৩৩. মাদানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৬৮২; ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৮; আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।

১৩৪. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।

১৩৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।[১৩৬] স্টেশনে যাওয়ার পথেই তাঁর হাতে টেলিগ্রাম পৌঁছল যে, দিল্লীতে হযরত শায়খুল হিন্দ ইন্তিকাল করেছেন---(১৩-জুন, ১৯২০ খ্রি./ ২৫ রমযান, ১৩৩৯ হি.)। তাঁর কফিন দেওবন্দে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে সেদিন তাঁর কলিকাতা যাওয়া হল না। তিনি সোজা চলে আসেন দেওবন্দে।

হযরত শায়খুল হিন্দের ওফাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর মাথার উপর থেকে যেন ছায়া সরে গিয়েছে। তিনি বছরের পর বছর যাঁর সেবায় নিজকে উৎসর্গিত রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময়, এমনকি জানাযায় পর্যন্ত উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য জোটেনি। ভারাক্রান্ত মনে প্রিয় শিক্ষকের শূন্য আস্তানায় কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তিনি তখন দৃঢ় সংকল্প নেন, মরহুম প্রিয় শিক্ষকের পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর মিশনকে অব্যাহত রাখার। শায়খুল ইসলাম এ সংকল্প জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে জাগরূক রাখেন। তাই কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, প্রশংসা কিংবা দুর্নাম কোন কিছুই তাঁকে মহান শিক্ষকের অনুসরণে দেশ, জাতি ও ধর্মের পথে জিহাদের রণাঙ্গণ থেকে পদস্খলিত করতে পারেনি। কলিকাতা গমনের বিষয়টি ছিল তাঁর ঐ সংকল্পের সত্যতা যাচাইয়ের প্রথম পরীক্ষা।

শায়খুল হিন্দের ওফাতের পর দায়িত্বশীল উলামা ও দেওবন্দের উচ্চপদস্থ বুযর্গগণের অনেকে তাঁকে কলিকাতার মত দূরদেশে না গিয়ে দেওবন্দেই থাকার জন্য অনুরোধ করেন। দারুল উলূমে শিক্ষকতার জন্যও তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি ভাবলেন, হযরত শায়খুল হিন্দ যেখানে একদিনের জন্যও তাঁকে দূরে কোথাও থাকা পছন্দ করেননি, তাঁকে মদীনায় ফিরে যেতে অনুমতি দেননি, এমনকি বোম্বাইতে দু'চার দিন বিলম্বের সুযোগ দেননি, আমরূহার চাকুরী ত্যাগ করালেন, রাজনৈতিক সভা সম্মেলনে নিজের সঙ্গে রাখার জন্য খবর দিয়ে দিয়ে ডেকে আনতেন, সেখানে কলিকাতা গমনের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান ছিল যেটি লক্ষ্য করে তিনি নিজেই আদেশ দিয়ে এমনভাবে পাঠিয়ে ছিলেন, যেন কোন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মুজাহিদ পিতা নিজের যুবক সন্তানকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদের জন্য রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে থাকেন। এসব দিক ভেবে শায়খুল ইসলামের পক্ষে আর কারো আরজু রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তিনি কলিকাতা যাবেন বলেই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন এবং দেওবন্দের মুহ্তামিম হযরত মাওলানা হাফিয আহমদকে বললেন, হযরত শায়খুল হিন্দ আমার কলিকাতা গমন করাকে অন্য সকল কাজের উপর প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। ওফাতের পর এখন তাঁর আদেশ

---

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬।

পশ্চাতে ফেলে দিয়ে নিজে আরামের পথ অবলম্বন করা আমার কাছে কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়।[১৩৭]

কলিকাতায় অধ্যাপনা ও রাজনৈতিক কার্যক্রম

এক

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে শায়খুল ইসলাম কলিকাতা পৌছেন। এখানে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে[১৩৮] নতুন মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শায়খুল ইসলাম এ মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী শিক্ষার অধ্যাপনা শুরু করেন। এখান থেকেই তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। ইতোপূর্বে মাল্টায় কারাবরণের দরুন তাঁর মান-মর্যাদা দেশের সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কলিকাতা ও বঙ্গদেশে খেলাফত কমিটি কিংবা কংগ্রেসের যেসব সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত, তিনি তাতে প্রধান অতিথি কিংবা সভাপতি হিসেবে নিয়মিত আমন্ত্রিত হন। ফলে একদিকে যেমন একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ও আধ্যাত্মিক রাহ্‌বর হিসেবে তাঁর পরিচিতি বৃদ্ধি পায় অপরদিকে তেমনি একজন উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসেও যোগদান করেন।[১৩৯] তিনি লিখেছেন, মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক সদস্যপদ গ্রহণ করি এবং স্বাধীনতার কাজে নিজকে জড়িত রেখে সর্বদা দেশবাসীর সাথে জেল-জুলমের কষ্টও বরণ করতে থাকি।[১৪০]

এ সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিরবচিছন্ন সাধনার ফলে অতি অল্প সময়ে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রথম সারিতে পৌছে যান। এদিকে মদীনায় অবস্থিত তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ও মাওলানা সায়্যিদ আহমদ তাঁকে মদীনা ফিরে যেতে পীড়াপীড়ি করেন। তিনি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ভারতে তাঁর অবস্থান করা অধিকতর জরুরী বিবেচনা করে আরো কিছুকাল এখানে থাকবেন বলে ভ্রাতৃদ্বয়কে জানিয়ে দেন। কলিকাতা থাকা কালে সিলেটের মৌলভীবাজারে

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮।
১৩৮. কাযী আদীল আব্বাসী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭-১৭৮।
১৩৯. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯২।
১৪০. প্রাগুক্ত।

একই সময় জমইয়ত ও খেলাফত অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী।[১৪১]

১৯২১ সালের ২০-২১ ফেব্রুয়ারি সিউহারায় খেলাফত কমিটি ও জমইয়তে উলামার বার্ষিক অধিবেশন একই প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল ইসলাম উভয় সংগঠনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[১৪২] ভাষণে তিনি ইংরেজ শাসনপূর্বকালীন ভারতের অবস্থা তুলে ধরে বলেন, ভারতবর্ষ তৎকালে সুসভ্য ও সমৃদ্ধশালী ছিল, যখন পৃথিবী ছিল বর্বর। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধারক ছিল, যখন অন্যান্য ভূখণ্ড ছিল অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। ভারত হৃষ্টচিত্ত ও পরিতুষ্ট ছিল, যখন অপরাপর দেশ ছিল ক্ষুধার্ত। এই ভারত বিশ্বের মানুষকে সভ্যতা ও প্রগতির সোপান অংকশাস্ত্র ও জ্যামিতিবিদ্যা উপহার দেয়। বৈদিক দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যায় তার গৌরবময় কীর্তি বিদ্যমান। সমাজ গঠন ও রাজনীতি বিদ্যায় তার সঞ্চিত ভাণ্ডার এতখানি সমৃদ্ধ ছিল যে, বহুকাল পর্যন্ত সেটি পারস্য রাজণ্যবর্গকে অভীপ্সু করে রেখেছিল। আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চায় সে ছিল প্রতিবেশী সকল দেশের পথ প্রদর্শক। কালক্রমে ইসলাম ধর্মের চমকপ্রদ ও অতি উজ্জ্বল ভাস্কর ভারতের আকাশে উদিত হলে ভারত ভূখণ্ডের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। ইসলাম এখানকার প্রাচীন গুণাবলীর যথাযথ সংরক্ষণ করে। ঐ গুণাবলীর কিছুই নষ্ট হতে দেয়নি; অধিকন্তু আরব, অনারব, রোম-তুরস্কের ঐ সকল গুণাবলী, যার ছোঁয়া ইতোপূর্বে ভারতে পৌঁছেনি, সেগুলোকেও ভারতবাসীর ভাণ্ডারে সংযুক্ত করে দেয়। এ ভাবে ভারতবর্ষকে অত্যন্ত সচেতন বিবেক, তেজস্বী স্বভাব, তীক্ষ্ণ মেধা, সূক্ষ্ম চিন্তা-চেতনা, গভীর উপলব্ধি ও অপরিসীম ধৈর্যশীল একটি দেশে পরিণত করে দেয়। এ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য তার অহংকারের সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন সমাজ ও মানুষের সুসম মিলন কেন্দ্রে পরিণত হওয়া এ দেশের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। আর এ কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইউরোপ নিজের সকল শ্রম-সাধনা এ দেশটির দিকেই অভিনিবিষ্ট করে রেখেছে এবং বছরের পর বছর এ কামনায় অজস্র কষ্ট ক্লেষ সহ্য করে যাচ্ছে। বিগত কালে পৃথিবীর এমন কোন শক্তিশালী সম্রাট ছিল না, যার প্রলুব্ধ দৃষ্টি এ দেশের প্রতি পড়েনি। এমন কোন জাতি ছিল না, যাদের মনে ভারতবর্ষের সৌন্দর্য ও ভালবাসা দাগ কাটেনি। এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই যার ভাণ্ডার আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে অনুপস্থিত। এমন কি যোগ্যতা অন্য জাতির আছে, যা অর্জন করতে ভারতীয়রা অক্ষম?[১৪৩]

---

১৪১. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৫।

১৪২. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯-১৬০।

১৪৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৬।

সিউহারার বক্তব্যে তিনি ভারতবর্ষের আরো অনেক বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। এ ভূখণ্ড ইউরোপীয়রা বিশেষ করে ইংরেজরা কি উপায়ে অধিভুক্ত করেছিল এবং তাদের হাতে এ দেশের সম্পদ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কি পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়েছে, সে দিকে ইশারা করে তিনি বলেন, সেই ভারতবর্ষ যে কিছুকাল পূর্বেও শুধু নিজ দেশকে নয়, বরং পৃথিবীর শত শত দেশকেও নানা রকমের পোষাক উপহার দিয়ে সজ্জিত করে আসছিল, যে দেশের বস্ত্রশিল্প এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু দেশে প্রচুর চাহিদার সাথে রপ্তানী হত, সে দেশ বর্তমানে ভয়ানক অভাবী ও দায়গ্রস্ত। ইউরোপীয় কূটকৌশল ও পাশ্চাত্য 'সংস্কার স্কীম' এই দেশকে এতখানি দুর্বল ও দরিদ্রে পরিণত করেছে যে, বর্তমানে শুধু সুতি বস্ত্র আমদানির জন্য পকেট থেকে প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকা লন্ডনে পাঠাতে হচ্ছে। যেই ভারতবর্ষ নিজের উৎপাদন দ্বারা নিজ সন্তানদেরকে সাচ্ছন্দ রাখত এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকেও লালন করত, আজ সেই দেশের পক্ষে নিজ সন্তানের ক্ষুধা নিবারণে এক টুক্‌রা রুটির সংস্থান করাও সুকঠিন।[১৪৪]

ভারতবর্ষের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ইংরেজ পার্শ্ববর্তী কোন কোন ভূখণ্ডের উপর নিজের হিংস্র থাবা প্রসারিত করে রেখেছে, সে দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, বর্তমানে গোলামীর সাঁড়াশীকে আরো সুদৃঢ় করে চিরদিনের জন্য পাকাপোক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ লক্ষ্যেই জিব্রাল্টার, মাল্টা ও আদন বন্দর হস্তগত করা হচ্ছে। সমুদ্রের নেতৃত্ব ও রাজত্ব নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যেই মিসরকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, ইরাককে পিষে ফেলা হচ্ছে, ইরানের মস্তক কর্তন করা হচ্ছে, তুর্কী খেলাফতের কেন্দ্রিকতা ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে এবং আরব ও সুদানী দেশগুলোর শক্তি খান খান করা হচ্ছে।[১৪৫]

তিনি ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ দেন। বিশেষতঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ও মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের উপর আক্রমণ চালানোর কাহিনী তুলে ধরে বলেন, ইংল্যান্ডের সাধারণ খ্রিস্টান ও পাদ্রীদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা এত প্রবল যে, মুসলিম সমাজে পবিত্র কুরআনের অস্তিত্ব বজায় থাকা কিংবা কোন মসজিদ আবাদ হওয়াকেও তারা মুসলমানদের জন্য অপরাধ বলে জ্ঞান করে। তাদের মস্তকে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এত বেশী যে, যেই ভারতবর্ষ তাদের জীবন ও সম্পদ সকল দিক থেকে শক্তি সরবরাহ করছে, সেই ভারতের

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭।
১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮।

অধিবাসীদেরকে তারা শৃগাল কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে এবং নানাভাবে তাদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করে।[১৪৬] দেশ ও দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি বলেন, আজ পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, দেশ আমাদের, ভূখণ্ড আমাদের, সম্পদ আমাদের, সৈনিক আমাদের, ভাণ্ডার আমাদের, অথচ আমরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত, আমরাই দুর্বল ও শক্তিহীন। আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। আমাদের উপর কঠিন থেকে কঠিনতর আইন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাধির চিকিৎসা কি হতে পারে? ভবিষ্যতের মুক্তি ও সফলতা কিভাবে আসতে পারে? আমাদের কাঁধ থেকে গোলামীর জিঞ্জির, আমাদের পা থেকে অসহায়ত্ব ও বন্দীত্বের শিকল কেমন করে খোলা যেতে পারে? বলুন, এ সকল বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি কি? এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তাভাবনা করা এবং সংকট নিরসনের উপায় খুঁজে বের করা যুগের সর্বপ্রথম দাবী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।[১৪৭]

ঐ বছর ২৫ মার্চ রংপুরের মহিমাগঞ্জে 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গাল'-এর আহ্বানে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হযরত শায়খুল ইসলাম সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তিনি এখানে বর্তমান দেশ ও জাতির জন্য আলিম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করেন। উপস্থিত আলিমদেরকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সকল মতভেদ ভুলে গিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে এমন এক সময় অতিবাহিত হচ্ছে যে, জুলুম ও বর্বরতা ইসলামের সুসজ্জিত ইমারতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রাচ্যবিশ্বকে পুড়িয়ে ছাই করা হচ্ছে। এখনও যা অবশিষ্ট আছে তাও ভেঙ্গে চুরমার করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। এই অভিশপ্ত ঝঞ্ঝা কেবল মুসলমানদেরকেই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার সব ক'টি জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা একটু চোখ মেলে তাকান, চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, দেখুন, বর্বর হায়েনারা পৃথিবীর উপর কি পরিমাণ উদ্দাম-নৃত্য প্রদর্শন করে চলছে। অথচ আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় এবং আপন খাহেশাত নিয়ে পুরাতন কলহে মেতে আছি।[১৪৮]

রংপুর সম্মেলনে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র খেলাফত পদ্ধতির সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি চলমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য 'জিহাদ' আবশ্যক ঘোষণা করেন। মুসলিম বিশ্বের উপর বৃটিশের গোলাবর্ষণ, বিশেষতঃ

---

১৪৬. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৩।
১৪৭. প্রাগুক্ত।
১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৪-১৬৫।

পবিত্র মক্কা ও মদীনার উপর তাদের বর্বরোচিত হামলার চিত্র উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের (মুসলিম) সৈন্যরাই সেসব স্থানে (ইংরেজ সরকারের নির্দেশমত) নিরীহ মুসলমানদের উপর গুলি চালাচ্ছে। তোপ গোলা বর্ষণ করছে। আমাদের সৈন্যরা সেই মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন ও তাদের বাড়ীঘর বিধ্বস্ত করে ধর্মের শত্রু ইংরেজকে সাহায্য করছে। আপনারা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন এ কর্মকাণ্ডের পর কিভাবে আমরা আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা পাব।[১৪৯]

দুই

১৯২১ সালের ৮-৯ জুলাই করাচীতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের সভাপতিত্বে 'অল ইন্ডিয়া খেলাফত কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়।[১৫০] হযরত শায়খুল ইসলাম কলিকাতা থেকে গিয়ে কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শৃংখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করে ঘোষণা দেন যে, ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কোন মুসলমানের চাকুরী করা হারাম। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা নিসার আহমদ, ডা.সাইফুদ্দীন কিচলু ও স্বামী কৃষ্ণ তীর্থ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।[১৫১] পরে এ প্রস্তাব দেওবন্দ থেকে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী, কানপুর থেকে হযরত মাওলানা নিছার আহমদ, সিন্ধ থেকে হযরত মাওলানা পীর গোলাম মুজাদ্দিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির স্বাক্ষরে একটি ফত্ওয়ার আকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সরকার উক্ত ফত্ওয়াকে বৃটিশ বিরোধী উস্কানিমূলক ও সহিংস প্রস্তাব আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে এবং বিদ্রোহাত্মক প্রচারণার অভিযোগে ৫ নেতার উপর ওয়ারেন্ট জারী করে।[১৫২]

---

১৪৯. সম্মেলনে তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীস :

((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ-এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬।

১৫০. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ ৩৯।

১৫১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭।

১৫২. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত।

করাচী কনফারেন্সের আড়াই মাস পর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দিকে হযরত শায়খুল ইসলাম দেওবন্দে ছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য উপস্থিত হয়। দিনভর পুলিশ ও সাধারণ জনতার সংঘর্ষ চলে। সন্ধ্যায় শায়খুল ইসলাম নিজেই পুলিশের হাতে নিজেকে অর্পণ করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে করাচী নিয়ে যায়। ২৬ সেপ্টেম্বর অভিযুক্তদের সকলকে প্রথমে করাচীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট 'খালেকদীনা' হলে উপস্থিত করা হয়। তদন্তের কাজ ২২ অক্টোবর পর্যন্ত চলে।[১৫৩]

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হযরত শায়খুল ইসলাম ২ নং আসামী হিসেবে আহূত হন (১ নং আসামী ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার)। তাঁকে জেরা করা হলে তিনি লিখিত বক্তব্যে সকল প্রশ্নের জবাব দিবেন বলে জানান। এ বক্তব্য পরে ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের ১৬ পৃষ্ঠায় 'বেনজীর পহেলা বয়ান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও যুক্তির মাধ্যমে নিজের সাফাই প্রদানে প্রয়াস পান। তিনি তৎকালের প্রেক্ষাপটে কোন মুসলমানের জন্য বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করা শরীঅতের দৃষ্টিতে হারাম ও ইসলাম বিরোধী কাজ- তা পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ ও ফত্ওয়া গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করেন।[১৫৪]

বক্তব্যের শুরুতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রচারিত ঘোষণা পত্রের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, এ ঘোষণাপত্রে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের 'ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা' স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া কারো ধর্মীয় অনুভূতি ও অধিকারের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, আমার দু'টি পরিচয় আছে। আমি মুসলমান এবং আমি একজন আলিম। মুসলমান হিসেবে আমাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক চলা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আমার কোন প্রকারের অন্যথা করার সুযোগ নেই। আর একজন আলিম হিসেবে পবিত্র ধর্ম ইসলামের যথাযথ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত। পবিত্র কুরআনে আলিমগণকে ইসলামের পয়গাম প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ আছে। তিনি ৯ খানা আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এ সকল আয়াতের নির্দেশ থেকে প্রমাণিত যে, কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এভাবে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থের সূত্র উল্লেখপূর্বক ৩৪ খানা হাদীস পেশ করে প্রমাণ করেন যে, কুফ্রীর পরে একজন মুসলমানের জন্য জঘন্যতম পাপকর্ম হল কোন মুসলমানকে হত্যা করা। তিনি কালাম শাস্ত্রের জাওহারা, শারহুল

১৫৩. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৭-৪৭৮।
১৫৪. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬২-২৬৩।

আকায়িদ আন্ নাসাফী, শারহুল মাওয়াকিফ, শারহুল মাকাসিদ; ফিক্‌হ ও ফত্‌ওয়া শাস্ত্রের কাযীখান, আলমগীরী, দুররুল মুখতার, শামী, বায্‌যাযিয়া ; উসূলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের নূরুল আনওয়ার, আত্ তাওজীহ, আত্ তাল্‌বীহ, উসূলুল বায্‌দূবী ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন; ইসলামের বিধান হল, কোন স্বৈরাচারী জালিম যদি কোন মুসলমানকে অপর কোন মুসলমানের হাত, পা বিংবা অন্য কোন অঙ্গ (অন্যায়ভাবে) কর্তনের আদেশ দেয় এবং আদেশ অমান্য করার পরিণামে তাকে হত্যার হুমকি দেয়, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি নিজে নিহত হয়ে যাওয়া উত্তম, অপর ভাইয়ের উপর আঘাত করে নিজে বেঁচে যাওয়া থেকে।[১৫৫]

তিনি অতীত আলিমগণ থেকে ফত্‌ওয়া বিশেষজ্ঞ হযরত মাওলানা আবদুল হাই লখনোবী, হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী ও হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম-এর উল্লেখ করে বলেন, এদের সকলের দৃষ্টিতে বৃটিশ বাহিনীতে চাকুরী করা হারাম। কাজেই জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের গৃহীত রেজুলেশন নতুন কোন কথা নয়, এটি ইসলাম ধর্মেরই শাশ্বত বিধান। ইসলামের এ বিধান প্রচারে বাধা প্রদান করা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর হস্তক্ষেপের শামিল। দ্বিতীয়ত বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়ের মুহূর্তে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি. জর্জ এ যুদ্ধকে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' বলেছেন। মি. চার্চিলও এটিকে ক্রুসেড যুদ্ধ অভিহিত করেছেন। এমতাবস্থায় যে মুসলমান ক্রুসেডে খ্রিস্টানপক্ষ সমর্থন করবে সে শুধু পাপী নয় বরং কাফিরে পরিণত হবে।

তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, শাসকের কোন আদেশ ইসলামী বিধান ত্যাগ না করার শর্তে পালন করা যায়। আমরা আজ পর্যন্ত যতটুকু করেছি তার সবই যেমন ইসলামের আওতায় অবস্থিত, তেমনি রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রেরও আওতায় অবস্থিত। অতএব এ কারণে যদি আমাদের কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে সরকারকে।[১৫৬] আর সরকার যদি আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রহিত করার চিন্তা করে থাকে, তাহলে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া উচিত। আমরা ৭ কোটি মুসলমান চিন্তা করে দেখব যে, আমরা মুসলমান হিসেবে থাকব, না বৃটিশের প্রজা হিসেবে থাকব। অনুরূপে ২২ কোটি হিন্দুরাও নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিবে। ঐ বক্তব্যে শায়খুল ইসলাম আরো বলেন, যদি লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬) এ উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হয়ে থাকেন যে, তিনি কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দিবেন,

---

১৫৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭২-১৭৪।
১৫৬. প্রাগুক্ত।

হাদীস শরীফ মিটিয়ে দিবেন, ফিক্‌হের কিতাবপত্র খতম করে দিবেন, তাহলে পবিত্র ধর্ম ইসলামের রক্ষার্থে নিজ জীবন উৎসর্গের জন্য সর্বপ্রথম আমিই আমার নাম পেশ করলাম।[১৫৭]

শেষের বাক্যগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে 'খালেক দীনা' হল 'মারহাবা' 'মারহাবা' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন এবং আবেগ আপ্লুত বদনে শায়খুল ইসলামের পদ চুম্বন করেন।[১৫৮]

জবানবন্দির পর মামলাটি নিম্ন কোর্ট থেকে স্থানান্তর করে সেশন কোর্টে জুডিশিয়াল কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঐ কোর্টেও তিনি একই বক্তব্য আরো বিস্তারিতভাবে পেশ করেন। এটি 'দেলীরানা ওয়া শাজাআনা দূস্‌রা বয়ান' শিরোনামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ৩য় দিবসে মামলার রায় হয়। রায়ে হযরত শায়খুল ইসলামকে বিদ্রোহের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দিলেও অপরাধ আইনের ৫০৫ ও ১০৯ ধারা অনুসারে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তাঁর জীবন মাল্টার কারাগারেও ফাঁসিকাষ্ঠের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিল, এবার আবার ফাঁসযন্ত্র গলদেশের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে গেল।[১৫৯]

তিন

মাল্টা থেকে মুক্তির ১৫ মাস পর তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। তাঁকে প্রথমত করাচী জেলে, তারপর আহমেদাবাদের সাবেরমতি জেলে রাখা হয়। সশ্রম কারাদণ্ডাদেশের কারণে পেশাধারী অপরাধীদের ন্যায় তাঁকেও শারীরিক শ্রম ও খাটুনী খাট্‌তে হয়েছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, জেল কর্মকর্তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, এসব রাজবন্দীগণের সাথে যেন সাধারণ

---

১৫৭. প্রাগুক্ত।

১৫৮. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮০। এখানে কবি ইকবাল সুহায়লীর একটি কবিতাংশ প্রণিধানযোগ্য :

بگیر راه حسین أحمد از خدا خواهی

که نائب ست نبی را وهم زآل نبی ست

১৫৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত।

কয়েদীদেরই ন্যায় আচরণ করা হয়, যেন জেলের ভিতর তাদের কোন ধরনের বিশেষত্ব বোঝা না যায়। তবে আমাদের শ্রম অনেকটা সহজসাধ্য। প্রথম দিকে দৈনিক ৫ ঘন্টা কাজ করতে হয়েছিল। বর্তমানে আড়াই ঘন্টা করতে হচ্ছে।[১৬০]

ইংরেজ আমলে জেলখানার ভিতর ভারতীয় রাজবন্দীদের জন্য ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁকে পরিধানের জন্য জেল থেকে মোটা সুতি কাপড়ের কোর্তা ও হাটুছোয়া নিকর (হাফ প্যান্ট) দেওয়া হয়। এ পোষাকে সতর ঢাকা যেত না বলে নামায পড়তে ভীষণ কষ্ট হত। তিনি কয়েকজন কয়েদীকে সঙ্গে নিয়ে জেলের ভিতরেই প্রতিবাদ জানান। ফলে হাটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা নিকরের ব্যবস্থা হয়।

খাটুনীর পর ব্যারাকে ফেরার পথে গেইটে প্রত্যেক কয়েদীর জামা-কাপড় চেক হত। বিশেষ করে তাদের কোমরের রশি খুলতে বাধ্য করা হত। এতে কোন কোন কয়েদীকে উলঙ্গ পর্যন্ত করে ফেলা হত। তিনি এখানেও ৪ জন কয়েদীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ জানান। কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদকারীদের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয় এবং তাদের বাড়তি দণ্ডে দণ্ডিত করে। ঐ বাড়তি দণ্ডে প্রথমতঃ রাতে হাতকড়া দিয়ে রাখে। ফলে খাটুনী থেকে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এসে আরামে নিদ্রা যাপনের সুযোগ থাকেনি। তাঁরা প্রতিবাদ থেকে ক্ষান্ত না হওয়ায় তাঁদের স্বাভাবিক আহার বন্ধ করে দেয় এবং একান্ত নিম্নমানের আহার পরিবেশন করে। এর পরেও বিরত না হওয়ায় ১ মাসের জন্য শায়খুল ইসলামসহ প্রত্যেকের পায়ে ভারী লোহার শিকল বেঁধে দেওয়া হয়। শিকলের কারণে সাধারণ চলাফেরা দুস্কর হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী বিষয়টি অবগত হয়ে 'ইয়াং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় জোর প্রতিবাদ করেন। ফলে বাড়তি শাস্তি মওকূফ হয় এবং গেইটে চেক করার পদ্ধতিও মার্জিত হয়। জেলে মুসলিম কয়েদীদের উচ্চস্বরে আযান দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। হযরত শায়খুল ইসলাম ৭ মুসলিম ও ৩ হিন্দু কয়েদীকে নিয়ে অনশন শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ এই ১০ জনকে এক সপ্তাহ নিজ নিজ কক্ষে আবদ্ধ রাখে। অবশেষে অনুচ্চ স্বরে আযানের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।[১৬১]

জেলখানায় তাঁর প্রধান কর্মসূচী ছিল আধ্যাত্মিকতার চর্চা ও সাধনা করা। তিনি কখনো অপ্রয়োজনে কক্ষ থেকে বের হতেন না। সর্বদা যিক্‌র, তাস্‌বীহ্‌ ও মোরাকাবায় নিবিষ্ট থাকতেন। নানা ব্যস্ততার দরুন হিফ্‌যে কুরআনে কিছু দুর্বলতা

---

১৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯।

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০; সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ১২৬।

এসে গিয়েছিল। সাবেরমতি জেলের অবসরে সেটি পাকাপোক্ত করে নেন। জেলের ভিতরে তিনি কয়েকজন কয়েদীকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফ্সীরের পাঠ দান করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার সেখানেই তাঁর কাছে তর্জমা ও তাফসীর অধ্যয়ন করেছিলেন। জাওহার জেল থেকে মুক্তির পরেও তাঁকে শিক্ষকের ন্যায় উপযুক্ত সম্মান করতেন এবং অত্যন্ত গর্বের সাথে 'আমার প্রিয় বড় ভাই' বলে সম্বোধন করতেন।[১৬২] জেলে তাঁর ইবাদত ও বন্দেগীর অনুমান পীর গোলাম মুজাদ্দিদের একটি উক্তি থেকে বোঝা যায়। দিল্লীতে জনৈক লোক তাঁর কাছে মুরীদ হওয়ার আবেদন করলে তিনি বলেছিলেন, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এখানে (দিল্লীতে) উপস্থিত। অথচ তোমরা আমার কাছে এসেছ মুরীদ হওয়ার জন্য। আমার হাতে পবিত্র কুরআন রয়েছে (তখন তিনি তিলাওয়াতরত ছিলেন)। আমি শপথ করে বলছি, জেলে অবস্থান কালে তাঁর ইবাদত ও বন্দেগীর যে চিত্র আমি স্বচক্ষে অবলোকন করেছি তাতে আমার বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্বে বুযর্গী ও শরীঅতের অনুসরণে তাঁর কোন জুড়ি নেই।[১৬৩]

এই অবিচল ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা তাঁকে আধ্যাত্মিক অতি উচ্চ মাকামে পৌছিয়ে দেয়। ফলে জেলের অবর্ণনীয় কষ্ট ও যাতনা তাঁর কাছে নিজের পরম প্রেমাস্পদকে লাভের সিঁড়ির মত অতিপ্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বহু আধ্যাত্মিক পুরস্কার লাভে ধন্য হন।[১৬৪] সাবেরমতি জেল থেকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পরম অনুগ্রহে এখানে বা করাচীতেও আমার বিশেষ কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমি কোন প্রকার কৃত্রিমতা না করে বাস্তবভাবেই বলছি, এখানে আমি কোন কষ্টের মধ্যে নেই। আকাবির ও বন্ধুদের বিরহ সাময়িক সময়ের জন্য মনে যন্ত্রণার উদ্রেক করলেও 'চিঠি সাক্ষাতের অর্ধাংশ' সূত্রমতে তা নিরসন হয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফলে এখানে

---

১৬২. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০।

১৬৩. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, **হাযরত আপীয ওয়াকিআত** (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৭৫), পৃ ১৫৭-১৫৮।

১৬৪. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, **মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম** (গাওজরানাওয়ালা : মাদানী কুতবখানা, তা.বি), ২য় খণ্ড, পৃ ৫৬-৫৭। এই চিঠিতে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা দলীল হিসাবে পেশ করেন :

إذَا صَحَّ مِنْـكَ الْـوُدُّ فَالْكُـلُّ هَيِّـنٌ
وَكُلُّ الَّـذِي فَـوْقَ التُّـرَابِ تُـرَابٌ

আমি মনের যে স্থিরতা ও সন্তুষ্টি অনুভব করছি তাতে বের হওয়ার দুআ করতেও বিবেক বাধা দেয়। তবে আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। আমি তাঁর হাজার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, তিনি বন্দী অবস্থায় আমকে বহু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুরস্কার দ্বারা ধন্য করে যাচ্ছেন। আমি শপথ করে বলতে পারি, এ বন্দীত্ব আমার জন্য সম্পূর্ণ রহমত হয়ে আছে। দয়াময় আল্লাহ্ যদি এটি কবূল করেন, তাহলে প্রতিটি মুহূর্ত ইন্‌শাআল্লাহ্ আমার আখিরাতের পাথেয় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মোটকথা সব দিক থেকেই আসমানী অনুগ্রহ প্রাপ্ত হচ্ছি। আমাদের মহান বুযর্গদ্বয় কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত শায়খুল হিন্দ উভয়ই এই অধমের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখতে পাচ্ছি। এমন বন্দীত্ব বছরের পর বছর বিদ্যমান থাকলেও চিন্তা কিসের?[১৬৫]

হযরত শায়খুল ইসলাম বৃটিশের কবল থেকে স্বাধীনতা উদ্ধার করার পূর্বে কোন বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা বাহ্‌বা গ্রহণ করা লজ্জাকর বোধ করতেন। করাচীতে ২ বছর কারাবাসের পর ১৯২৩ সালের অক্টোবরে মুক্তি লাভ করলে অন্যান্য নেতার জন্য বড় বড় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। দিল্লীতে মাওলানা জাওহারের সম্মানে এত বড় সংবর্ধনা সভা করা হয়েছিল যে, পূর্বে বা পরে কখনো কোন নেতার সম্মানে এমন আয়োজন হতে দেখা যায়নি। শায়খুল ইসলামের জন্যও দেওবন্দ, সাহারানপুর, মুরাদাবাদ, মুযাফ্‌ফরনগর প্রভৃতি স্থানে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তিনি নিজ জীবনে বরাবরই ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাই ইচ্ছাকৃতভাবেই এ সকল অনুষ্ঠান এড়িয়ে যান এবং অন্যকে এগুলো করার সুযোগ দিতেও বিরত থাকেন। জেল থেকে মুক্তি সম্পর্কে পূর্বে কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে তিনি রাতে চুপচাপ বাড়ী পৌছে যান।[১৬৬] দেওবন্দে নিজের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীগণের এক অনুরোধের জবাবে তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় বলেছিলেন, আমাদের কিসের আনন্দ মিছিল? আমরা কি ইংরেজকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছি? আমার কাছে নিজের মুক্তিতে আদৌ কোন খুশি মনে হচ্ছে না। বরং আমার দুঃখ যে, ইংরেজ দিন দিন জয়ী হচ্ছে আর আমরা হেরে যাচ্ছি, এমন পরাজিতদের স্ফূর্তি মিছিল করার সুযোগ কোথায় ?[১৬৭]

তিনি যখন জেলে যাচ্ছিলেন তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণআন্দোলন পূর্ণ যৌবনে উপনীত ছিল। সর্বত্র আযাদীর নেশা দু'কুল প্লাবিত করে

১৬৫. প্রাগুক্ত।
১৬৬. রাশিদ হাসান উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯-১৪১।
১৬৭. আবদুর রশীদ আরশাদ,প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮১।

চলছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের টগবগে রক্ত সমাজের শিরা উপশিরায় তীরবেগে ছুটে চলছিল। কিন্তু যখন ফিরে আসেন তখন দেখলেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশের রাজনৈতিক স্রোতধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের উত্থানের ফলে (নভে.১৯২২) খলীফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদ পদচ্যুত হন। এর অনিবার্য প্রভাবে ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলনের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়ে যায়। অপরদিকে বৃটিশের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভীষণ অবনতি ঘটে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। 'সংগঠন' ও 'শুদ্ধি' নামে উগ্রপন্থী হিন্দুদের ২টি সংস্থা হিন্দু ধর্ম আন্দোলন শুরু করে। আবার এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের দিক থেকে 'তাবলীগ' ও 'তানযীম' নামে পাল্টা কর্মসূচী গৃহীত হয়। এভাবে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক কোন্দল, প্রতিহিংসা ও হানাহানির দিকে মোড় নেয়।

এহেন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে হযরত শায়খুল ইসলাম বিন্দুমাত্র দুর্বল হননি। তিনি ভারতের দূর-দূরান্ত সফর করে পুনঃ গণসংযোগ শুরু করেন এবং ঐক্যের প্রয়াস চালান।[১৬৮] ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে কোকনাদে জমইয়তে উলামার বার্ষিক অধিবেশন বসে। অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্য অটুট রাখতে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ইংরেজ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র শত্রু। মানবতার শত্রু। একজন মুসলমান হিসেবে এ শত্রুর প্রতিরোধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া সকলের কর্তব্য। পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ[১৬৯]

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾

তিনি উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতে শত্রুর যথাসাধ্য মোকাবেলা করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মানুসারে বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে তোলা ও যথাসম্ভব অব্যাহত রাখা জরুরী। কেননা বর্হমানে একমাত্র জাতীয় ঐক্যের মহা শক্তি দ্বারাই শত্রুকে কাবু করা যেতে পারে, শত্রুর

---

১৬৮. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৯-২৮০।

১৬৯. তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে (৮ ঃ ৬০)।

পাষাণ অন্তরকে গালানো যেতে পারে। তাই আয়াতের আলোকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গঠন শুধু জায়িযই নয় বরং ধর্মীয় দিক থেকে আবশ্যক প্রমাণিত হয়।

জেল থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে তাঁর গতিবিধি সরকারের গভীর পর্যবেক্ষণে ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি সাম্রাজ্যবাদের উৎপীড়নের কথা উল্লেখপূর্বক বলেন, এ সকল জুলুম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল দেশকে শৃংখলমুক্ত করা এবং পরাধীনতার রাহুগ্রাস থেকে স্বাধীন করা। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ভেঙ্গে পড়ার ঐ সময়েই চৌরিচৌরার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলে উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নি সংযোগ করে ১২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে হত্যা করে। তখন গান্ধীজীর মত লৌহমানবও ঘাবড়ে যান এবং অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারে বাধ্য হন। অথচ শায়খুল ইসলাম মাদানী তখনও পর্বতসম অবিচলতা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অটল। স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা তখনো তিনি উড্ডীন রেখে আযাদীর দাবীতে জোর গর্জন ও হুংকার অব্যাহত রাখেন।[১৭০]

সিলেটে দীনী তালীম

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে হযরত শায়খুল ইসলাম মুক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ ২ বছর কারাবাসের দরুন কলিকাতা কওমী মাদ্রাসার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। নিজের আবাসের জন্য বাড়ী ঘরের কোন ব্যবস্থা তখনো ছিল না। অধিকন্তু ২ বছরে প্রচুর টাকা ঋণী হন। জেল থেকে বের হওয়ার পর জীবিকার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু নিজের শ্রম ও সাধনার সবই যেখানে দেশ ও জাতির মুক্তির কাজে নিবেদিত, সেখানে জীবিকার চিন্তা করার সুযোগ কোথায়?[১৭১]

তাঁর কাছে তখন সরকারী ও বেসরকারী বহু বড় বড় চাকুরীর প্রস্তাব আসে। কিন্তু তিনি নিজকে একটি বিশেষ কাজে উৎসর্গিত রেখেছিলেন বিধায় সেসব চাকুরী গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, করাচী জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির পর 'কাউন্সিল অব বেঙ্গল'-এর জনৈক সদস্য আমাকে প্রস্তাব করলেন যে, ৪০ হাজার

১৭০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, হায়াতে শায়খুল ইসলাম (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ ১১৭।

১৭১. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৪।

টাকা অগ্রিম ও ৫ শত টাকা মাসিক বেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে অধ্যাপনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আপনি গ্রহণ করুন। আমি বললাম, আমাকে কাজ কি করতে হবে? তিনি বললেন, কাজ তেমন কিছু নয়, শুধু আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকবেন। আমি বললাম, হযরত শায়খুল হিন্দ আমাকে যে কাজে লাগিয়ে গিয়েছেন, সেটি থেকে আমি সরে যাবো তা হতে পারে না।[১৭২]

তখনকার ৪০ হাজার টাকা বর্তমানে ৪০ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশী। এমন একটি প্রস্তাব মিসর সরকারের পক্ষ থেকেও পেশ করা হয়েছিল। তদানিন্তন মিসর ছিল ইংরেজ শাসনাধীন। মিসর সরকার তাকে 'আল আযহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর শায়খুল হাদীস পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয় এবং মাসিক ১ হাজার টাকা, ফ্রি বাড়ী ও গাড়ী এবং বছরে একবার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যাতায়াতের সুযোগ প্রদান করা হবে বলে জানায়। তিনি তাতেও সম্মত হননি। বস্তুত লক্ষ টাকা ব্যয় করে হলেও হযরত শায়খুল ইসলামের কণ্ঠ স্তব্ধ করা ইংরেজের দৃষ্টিতে জরুরী ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যাকে টাকায় কেনা যায়নি।[১৭৩]

সিউহারার মাওলানা কাযী যহূরুল হাসান হযরত শায়খুল ইসলামের ছাত্র ও একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। হায়দ্রাবাদ নিযাম সরকারের সাথেও ছিল তাঁর গভীর সখ্যতা। শায়খুল ইসলামের সাংসারিক অভাব-অনটন ও ঋণগ্রস্ততা দেখে তিনি বিচলিত হন। তিনি নিজ উদ্যোগেই নিযাম সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন। তৎকালে নিযাম সরকারের পরম উদারতায় হায়দ্রাবাদে ভারতের শীর্ষস্থানীয় বহু আলিম, কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মীর ভিড় লেগে ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম মাওলানা হাফিয আহমদ, হযরত আল্লামা শাব্বীর আহ্মদ উসমানী ও শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইজায আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের মত ব্যক্তিগণও ভাতাপ্রাপ্তগণের তালিকায় ছিলেন। কাযী যহূর নিজ উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, শায়খুল ইসলামের আর্থিক সংকটের ব্যাপারটি নিয়ে হায়দ্রাবাদের অর্থ দপ্তরের সচিব নওয়াব ফখর ইয়ার জঙ্গ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে আমার কথা হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, মাওলানা মাদানীকে এখানে ডেকে আনা যেতে পারে এবং স্যার আক্বর হায়দারীসহ অন্যান্য মন্ত্রীগণের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে তাঁকে মাসিক ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিষয়টি আমি শায়খুল ইসলামকে চিঠি লিখে

---

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৫।
১৭৩. প্রাগুক্ত।

জানালে তিনি উত্তর দিলেন, আমি এই অপমানের সহিত ভাতা গ্রহণে ইচ্ছুক নই।[১৭৪]

ঐ সময় সিলেট থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তদের একটি দল তাঁকে সিলেট গমনের আমন্ত্রণ জানান।[১৭৫] হযরত শায়খুল ইসলাম কলিকাতা থাকতেই তাদের পীড়াপীড়ি শুরু হয়েছিল। সিলেট পূর্বকাল থেকেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। কিন্তু সেখানে ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার জন্য কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হত। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে সিলেটে বড় বড় আলিম ও আরবীবিদ তৈরী হলেও দেওবন্দ, সাহারানপুর ও লখনৌতে হাদীসের দরসকে কেন্দ্র করে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের যে সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে, সিলেটে তা হয়নি। তাই তারা দীর্ঘ দিন থেকে একজন যোগ্য মুহাদ্দিসের সন্ধান করে আসছিল। খেলাফত আন্দোলনে সিলেটবাসী অনন্য ভূমিকা রাখে। সেই সূত্রে শায়খুল ইসলামের সাথেও তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তাঁর সাহচর্য লাভের জন্য সিলেটের অনেকে তখন কলিকাতা যাতায়াত করতেন। তারা শায়খুল ইসলামের অপরিসীম ব্যক্তিত্ব, হাদীস শাস্ত্রে বিপুল পারদর্শিতা এবং মসজিদে নববীর মত পবিত্র স্থানে দীর্ঘ ১৩ বছর কৃতিত্বের সাথে হাদীস অধ্যাপনার কথা জেনে খুব মুগ্ধ হন এবং তাঁর মাধ্যমে সিলেটে হাদীস চর্চার সূচনা করতে প্রয়াস পান।[১৭৬]

হযরত শায়খুল ইসলামের কাছে পেশকৃত আবেদনে সিলেটবাসী লিখেছিল, সুবা আসাম ও বঙ্গদেশে ৩ কোটি মুসলমানের বসবাস। কিন্তু এখানে মুসলমানদের শিক্ষাগত অবস্থা খুব নিম্নমানের। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে। বিশেষতঃ ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষা খুবই দুর্বল। তাই আপনাকে একবার এখানে এসে অবস্থান করা এবং অন্তত সিহাহ্ সিত্তাহ্র পাঠদান করে যাওয়া আবশ্যক। তাহলে আমরা এ সূত্রে নিজেদের হাদীসের তালীম জারী করে নিব।[১৭৭]

আহ্‌মদাবাদ জেল থেকে মুক্তির পর দেওবন্দ, দিল্লী, মেড়ু প্রভৃতি মাদ্রাসা থেকেও অনুরূপ শিক্ষকতার প্রস্তাব আসে। এদিকে সিলেটবাসীর অনুরোধ জোরেশোরে শুরু হয়। তাদের অনেকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। তিনি

---

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৭।

১৭৫. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ ৩৬১-৩৬২।

১৭৬. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭।

১৭৭. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০০।

তাদের আন্তরিকতা ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিশেষ বিবেচনা করেন। বিশেষতঃ তাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও মন-মানসিকতার উপস্থিতি এবং তারা যে কর্মসূচীর প্রতি আহ্বান করেছেন সেটি হুবহু তাঁর নিজ জীবনেরও কর্মসূচী বিধায় তিনি ইস্তিখারার পর ২ বছরের জন্য আগমনে সম্মতি প্রকাশ করেন।

সে মতে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সিলেট শহরে আগমন করেন। মানিক পীরের টিলা মহল্লায় নয়া সড়ক মসজিদের নিকট অবস্থিত খেলাফত বিল্ডিং[১৭৮]-এ দরসে হাদীসের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ১ রবীউল আওওয়াল সবকের উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমতঃ হাদীস ও তাফসীরের উসূল সম্পর্কিত জরুরী বিষয় অবহিত করার লক্ষ্যে আল্লামা হাফিয ইব্‌ন হাজার আল্‌ আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'শারহু নুখ্‌বাতিল ফিকার' ও হযরত ইমামুল হিন্দ শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থদ্বয় পড়ান। তারপর হাদীস শাস্ত্রের 'জামি তিরমিযী' ও সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌র অন্যান্য গ্রন্থের পাঠদান করেন। তিনি দৈনিক ৫ ঘন্টা হাদীসের দরস দেন। পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের জন্য ও প্রত্যহ কিছু সময় বরাদ্দ রাখেন।[১৭৯]

সিলেটের প্রাকৃতিক পরিবেশ দিল্লী ও দেওবন্দের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে পুকুর, ডোবা, খাল-বিল ও নদী-নালা জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। বৃষ্টি-বাদল, ঝড়-তুফান, ঢল-বন্যা সব সময় লেগে আছে। ভাত ও মাছের উপর মানুষের জীবন। রুটি কিংবা আটা খুঁজে পাওয়া দুস্কর। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামই নয়, এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় যেতে হলেও হয়ত পানি সাঁতরিয়ে যেতে হয়, নয়ত বাঁশের সাঁকো অতিক্রম করে অতি সাবধানে পৌঁছতে হয়। এমন প্রতিকূল প্রকৃতি দিল্লী কিংবা দেওবন্দের মত উচ্চ অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরা চিন্তাও করতে পারে না। শায়খুল ইসলাম তবুও সিলেটবাসীর নিখুঁত আন্তরিকতার প্রতি সম্মান জানিয়ে এখানেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পীর-মুরীদী ও তাসাওউফ সংক্রান্ত কার্যক্রম পবিত্র মদীনা থেকে শুরু হয়েছিল বলে জানা গেলেও সিলেটবাসীর সাথে তাঁর যে আন্তরিকতা পাওয়া যাচ্ছে এবং সিলেটে যত ব্যাপক

১৭৮. মাদানী, শাহ্‌ নজরুল ইসলাম অনূদিত, দীনী শিক্ষার পথ ও পদ্ধতি (মৌলভী বাজার : বর্ণমালা প্রেস, ১৯৯১), পৃ ১০

১৭৯. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৪৫।

হারে তাঁর মুরীদ, ভক্ত ও খলীফা বিদ্যমান তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি পীর মুরীদী ও তাসাওউফের প্রধান কাজ সিলেটেই করেছিলেন।[১৮০]

হযরত শায়খুল ইসলাম খেলাফত বিল্ডিং মাদ্রাসায় দিনের বেলা হাদীস তাফসীর অধ্যাপনার পর সন্ধ্যায় স্থানীয় ছাত্রদের ২/১ এক জনকে সাথে নিয়ে দূর-দূরান্তে অবস্থিত গ্রামে চলে যেতেন। মুসলিম সর্ব সাধারণের মাঝে হিদায়াতের আলো বিতরণের মহৎ উদ্দেশ্যে রোদ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, মাটি-কাদার ভিতর দিয়েও তিনি নিভৃত পল্লীতে পৌছে যেতেন। সব সময় যে সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা থাকত তা নয়। অনেক সময় শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তদের আমন্ত্রণে সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করে গভীর রাতে নির্ধারিত বাড়ীতে পৌছেছেন। পৌছার পর বুঝতেন এলাকা বলতে শুধু এই একটি বাড়ীই মাত্র। উপস্থিত শ্রোতা ১৫/২০ জনের অধিক নয়। চতুর্দিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি কিংবা ধান ক্ষেত। বাহির থেকে নতুন শ্রোতা আগমনের সম্ভাবনাও নেই। এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মজলিসে ওয়ায করতেও তাঁর দ্বিধা হত না। তিনি বিশাল মহাসম্মেলনে যেমন বক্তব্য রাখতেন সেই প্রফুল্লতা, আবেগ ও দরদ নিয়ে ক্ষুদ্র মজলিসেও অনুরূপ বক্তব্য রাখতেন। ওয়ায নসীহতে রাত ৯/১০ টা বেজে যেত। তিনি কোথাও রাত যাপন করতেন না। পরদিন হাদীসের পাঠদান যেন বিঘ্নিত না হয় সেজন্য রাতেই আবার দুর্গম পথ পায়ে হেটে অতিক্রম করে মাদ্রাসায় পৌছে যেতেন। দীর্ঘ ৩ বছর তাঁর এ কর্মসূচী অব্যাহত ছিল।[১৮১]

সিলেটে হযরত শায়খুল ইসলামের অবিরাম সাধনার ফলে হাদীস ও ইল্‌ম চর্চার সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে। তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে বহু মকতব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আলিম উলামা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলমানের অনেকে তাঁর মুরীদ হয়। নয়া সড়ক মসজিদ ছিল তাঁর পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের স্থান। ঐ মসজিদে তিনি প্রত্যেক রমযানে ছাত্র, মুরীদ ও শিষ্যদের নিয়ে ইতিকাফ করতেন।[১৮২] তাঁর রূহানী ফয়য অল্প কালেই সিলেট ও আসামের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মনে তাঁর প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হয় যে, ৩ বছর পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ফিরে রওয়ানা করলে সিলেটবাসী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তিনি তাদের সান্তনা প্রদানে কথা দিতে বাধ্য হন যে, প্রত্যেক

---

১৮০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৯।

১৮১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮।

১৮২. আবদুল হামীদ আযমী, আবদুল মালিক মুবারকপুরী অনূদিত, **সিলেটে হযরত মদনী** (সিলেট : রহমানিয়া কিতাব প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ ২৭।

রমযান মাস তিনি সিলেটে তাদের সাথে অতিবাহিত করবেন। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি এ ওয়াদা রক্ষা করে গিয়েছেন।[১৮৩]

দুই

১৯২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়া থেকে ১৯৩০ সালে কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া পর্যন্ত মোট ৬ বছর কাল ভারতবর্ষের রাজনীতিতে চরম বিশৃংখলা ও অস্থিরতা বিরাজ করে। স্বাধীনতা আন্দোলন তখন পারস্পারিক ধর্মীয় বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনে খেলাফতের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়লে ক্ষমতাসীন ইংরেজ নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশ উপলব্ধি করে যে, ভারতীয়দের ঐক্য যে কোন মুহূর্তে ইংরেজ আধিপত্য নির্মূল করতে সক্ষম। তাই সরকার সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে ভারতীয়দের ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়ার এবং সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিহিংসা উস্কে দেওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

করাচীর মামলায় হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার প্রমুখ নেতা কারারুদ্ধ হওয়ার পর অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আরো বহু নেতা কারাগারে প্রেরিত হন। মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, চিত্ত রঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরুসহ রাজবন্দীগণের সংখ্যা তখন ২০ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকার এ কারাগারেই নেতাদের কতিপয় সংকীর্ণমনা লোককে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যসিদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত করে। ফলে স্বামী শর্দা নন্দ, যিনি এক সময় দিল্লী জামি মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়েও বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন, তাকে সরকার দণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হঠাৎ বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে দেয়। তিনি জেল থেকে বের হয়ে মালকানায় গমন করেন এবং রাজপুতদের মধ্যে 'শুদ্ধি' অভিযান শুরু করেন। রাজপুতানার ঐ লোকেরা ছিল নামে মাত্র মুসলিম। আচার-আচরণ ও রুসম-রেওয়াজ পালনে হিন্দুদের সাথে তাদের কোন পার্থক্য ছিল না। শর্দানন্দ তাই সহজেই তাদেরকে 'মুরতাদ' বানিয়ে পুনঃ হিন্দু ধর্মে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তখন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য মতান্তরে ডক্টর মুঞ্জে 'সংগঠন' নামে হিন্দুবাদী অপর একটি আন্দোলনও শুরু করেন। রাজপুতদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত

---

১৮৩. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬।

করার সংবাদে মুসলিম সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের দিক থেকেও ধর্ম রক্ষার জন্য 'তাবলীগ' ও 'তানযীম' নামে দু'টি পাল্টা আন্দোলন গড়ে উঠে। হাসান নিযামী গঠিত 'তাবলীগ'-এর সদর দপ্তর ছিল দিল্লীতে, আর ড.সায়ফুদ্দীন কিচলু পরিচালিত 'তানযীম'-এর কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাবে। এ সময় মাওলানা আবদুল মাজিদ বাদায়ূনী ও মাওলানা নিসার আহ্মদ কানপুরী খেলাফত ত্যাগ করে তানযীমে যোগ দেন।[১৮৪] পাশাপাশি কংগ্রেসের বহু নেতাও হিন্দু মহাসভায় গিয়ে যোগদান করেন।

তবে তখনো যারা মনেপ্রাণে খেলাফতপন্থী বা কংগ্রেসী ছিলেন তাঁরা অসাম্প্রদায়িকতা ও পরমত সহিষ্ণুতার নীতিতে পূর্বের ন্যায় অটল থাকেন। তারা 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' কিংবা 'তাবলীগ' ও 'তানযীম' দ্বারা প্রভাবিত হননি। সাম্প্রদায়িকতা সূচিত হওয়ায় সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁরা স্বধর্মীয় লোকের কাছেও প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হন।

হযরত শায়খুল ইসলাম জেল থেকে মুক্তির পর সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কোকনাদের ভাষণে তিনি এ ব্যাপারে প্রধানতঃ ইংরেজ সরকারকে দায়ী করেন। তিনি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরালো ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। সিলেট আগমনের পর জমইয়ত ও কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় তিনি জনগণকে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানান।[১৮৫] সিলেট থেকে লিখিত এক চিঠিতে কতিপয় হিন্দু উগ্রপন্থী নেতার সংকীর্ণচিত্ততার অভিযোগ করে তিনি বলেন, পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু সম্প্রদায় ও তাদের নেতাদের বিন্দুমাত্র অনুভূতি হচ্ছে না। তারা মনের অপ্রশস্ততা ও বিবেকের অপরিপক্কতার দরুন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখে এক কঠিন বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষ দিনে দিনে এমন অধঃপতনে চলে যাবে যেখান থেকে মুক্তির কোন উপায় অবশিষ্ট থাকবে না। মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ ও অবিচারমূলক কার্যকলাপের উপর গত ৩ বছর ধৈর্যধারণ করেছে। বর্তমানে প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রতিহিংসায় বৃটিশ সরকার খুবই খুশী, খুবই আনন্দিত। কারণ উভয়

---

১৮৪. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।
১৮৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৮।

সম্প্রদায়ের লোকজন দ্বারা জেলখানা ভর্তি করা যাচ্ছে। তাদের ফাঁসিতে ঝুলানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৮৬]

তিনি সিলেটে অধ্যাপনায় নিবিষ্ট থাকলেও মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। হিজাযে ১৯২৬ সালে ইব্‌ন সউদ-এর রাজত্ব কায়েম হলে ভারতীয় বহু উলামা তাঁদের সমালোচনা করেন। ইব্‌ন সউদের উপর অনেকে কুফ্‌রীর ফত্‌ওয়াও দেন। হযরত শায়খুল ইসলামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, আমরা এখনো এমন কিছু পাইনি যার ভিত্তিতে ইব্‌ন সউদ ও তাঁর অনুসারীগণকে 'কাফির' বলা যেতে পারে। কিংবা তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'খত্‌মে নবুওয়্যাত' তথা শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে বলেও আমাদের জানা নেই। বরং তাঁদের বইপত্র দেখে বোঝা যায় যে, তাঁরা খতমে নবুওয়্যাতের আকীদায় পূর্ণ বিশ্বাসী। অহেতুক কাউকে 'কাফির' বা 'অভিশপ্ত' বলে ফত্‌ওয়া প্রদানকারী বস্তুত নিজেই অভিশপ্ত হয়। এমন দুঃসাহস প্রদর্শন উচিত নয়। ইব্‌ন সউদ যতক্ষণ শরীঅতের খেলাফ কোন আদেশ জারী না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আরবদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা। তবে শরীঅতের খেলাফ কাজ করলে আনুগত্য উচিত হবে না।[১৮৭]

ভারতীয়দের উপর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নিপীড়ন আলোচনা করে সিলেট থেকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের জুলুম নিপীড়ন সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত আছি। এসব হল বস্তুতঃ ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের প্রতিশোধ গ্রহণ মাত্র। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র ইংরেজরা আমাদেরকে তুচ্ছ ও অপমানিতের দৃষ্টিতেই দেখবে।[১৮৮]

সিলেটের ৩ বছর কাল তিনি ভীষণ কর্মব্যস্ত থাকেন। এক চিঠিতে তিনি ব্যস্ততার উল্লেখ করে লিখেছেন, আমি দৈনিক ৫ ঘন্টা হাদীসের পাঠদান করি। অবশিষ্ট সময় নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় কাজ, চিঠি পত্রের উত্তর প্রদান ও ধর্মীয় মজলিস কিংবা সভা-সমাবেশে ব্যয় করি। টেবিলের উপর এখনো অনেক চিঠি রয়েছে যেগুলোর উত্তর লেখা সম্পন্ন হয়নি। দৈনিক ৫/৭টি চিঠি আসে। কখনো আরো বেশী। তাই উত্তর লিখতে গিয়ে আর সময় থাকে না। কোন কোন চিঠিতে বিস্তারিত বিষয়বস্তু কিংবা ফত্‌ওয়া চেয়েও পাঠানো হয়। এগুলোর উত্তর লিখতে

---

১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।
১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫।
১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।

প্রচুর সময় যায়। প্রত্যহ মানুষের সহিত মেলা-মেশা যথাসম্ভব কমিয়ে নিজের ইল্‌মী কাজ শেষ করতে মনস্থ করি। কিন্তু তার পরেও এমন পরিস্থিতি ঘটে যায় যে, মূল্যবান সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।[১৮৯]

১৯২৮ সালে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের এক জরুরী নির্দেশের কারণে তিনি সিলেট থেকে দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষের জোর অনুরোধে দারুল উলূমের 'সদ্‌র মুদার্‌রিস' (শায়খুল হাদীস)-এর পদ গ্রহণে বাধ্য হন।[১৯০]

দেওবন্দের সদ্‌র মুদার্‌রিস পদে যোগদান

শায়খুল ইসলাম সেই দারুল উলূমে অধ্যাপনার জন্য আদিষ্ট হন যা তাঁরই প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে তিনি দীর্ঘ ৭ বছর পড়াশোনা করে আলিম হয়েছেন এবং সদ্‌র মুদার্‌রিস-এর সেই পদ গ্রহণে বাধ্য হন যেখানে ছিলেন তাঁরই শিক্ষা ও রাজনীতির মহান গুরু হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এখানে আমাদের মূল বক্তব্যের সুবিধার্থে প্রথমতঃ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নেপথ্য উদ্দেশ্যটি সংক্ষেপে আলোচনা জরুরী। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রাচীন লীলাভূমি দিল্লীর ঐতিহাসিক রহীমিয়্যা মাদ্রাসার উত্তরসূরি হিসেবে।[১৯১] মোঘল আমলে ঐ মাদ্রাসা মুসলমানগণের ধর্মীয় শিক্ষা ও দর্শনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। গোটা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার ধর্মীয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই মাদ্রাসারই চিন্তা-চেতনার উপর পরিচালিত ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ কর্তৃক ঐ মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলে ইসলামী শিক্ষা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ।[১৯২]

ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষার চর্চা, গবেষণা ও প্রচার কাজে দিল্লী রহীমিয়্যা মাদ্রাসার পর এই দারুল উলূম এতখানি উন্নতি সাধন করে যে, শুধু এশিয়া নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র নিজের অবদান পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এটি

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৩।
১৯০. মুহিউদ্দীন খান ও ছফিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮-১১৯।
১৯১. সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৯২-৯৩।
১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫

'এশিয়ার আল আযহার' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের অবদান পর্যালোচনা করে মিসরের বিশিষ্ট আলিম ও মুহাদ্দিস আল্লামা রশীদ রিযা মিস্‌রী বলেন, আমি দিব্য চোখে যা দেখছি এবং যা আমাকে নিঃসংকোচে ঘোষণা দিতে বাধ্য করছে তা হল যে, যদি দেওবন্দের লীলাভূমি থেকে ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা দানের নির্মল ঝরণা প্রবাহিত না হত, তাহলে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৃথিবী কুরআন ও সুন্নাহর গভীর গবেষণা ও জ্ঞান চর্চা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত।[১৯৩]

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও ছিল। প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম ছাত্র ও মহান প্রতিষ্ঠাতার ঘনিষ্ঠতম স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খুল হিন্দের বক্তব্য থেকে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমার মহান শিক্ষক হযরত কাসিম নানূতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মদ্রাসা শুধু কি পঠন-পাঠনের জন্য স্থাপন করেছিলেন? মদ্রাসা আমার সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে। যতটুকু আমি জানি মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর এ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এমন মুজাহিদ জনবল তৈরী করা যাঁদের দ্বারা ১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার প্রতিবিধান সম্ভব হতে পারে।[১৯৪]

হযরত শায়খুল হিন্দের বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য। কারণ প্রতিষ্ঠাতা হযরত নানূতবী নিজে ছিলেন মহাবিদ্রোহের সময় সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনাকারী অন্যতম সেনাপতি। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ ফরূকী মুহাজিরে মক্কীর নেতৃত্বে গঠিত মুজাহিদ দলের পক্ষে হযরত নানূতবী ও হযরত গাঙ্গূহী শামেলীতে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন।[১৯৫] বিশিষ্ট গবেষক ও ঐতিহাসিক ড.তারা চাঁদের বক্তব্য থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯৬৪ সালে জাতীয় কনভেনশনের বক্তৃতায় তিনি বলেন, স্বাধীনতার লক্ষ্যে এ আলিমগণের সংগ্রাম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম থেকেও বহু পূর্বে শুরু হয়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁরা সৈনিক হিসেবেই নয়, সেনাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা ভারতের রাজনীতিতে বরাবর বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছেন। গোটা দেওবন্দ প্রতিষ্ঠান সূচনাকাল থেকেই ছিল

১৯৩. আবদুর রশীদ আরশাদ, মাসিক আর রশীদ (লাহোর : কুনওয়াল আর্ট প্রেস, ফেব্রু-মার্চ, ১৯৭৬, বর্ষ ৪, সংখ্যা ২-৩, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা), পৃ ১৮০।

১৯৪. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রচিত ভূমিকা, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

১৯৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী (দিল্লী : কিতাবিস্তান এম বাদার্স, ১৯৮৫), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৭৬-২৭৮।

জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী।[১৯৬] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবের বক্তব্যও লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, বস্তুত দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা ছিল বৃটিশের প্রবর্তিত বস্তুবাদী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতিরোধে এক স্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা। এ প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশে মানুষের চিন্তা ও মনোজগতের সে সব প্রতিক্রিয়া কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করে যেগুলো স্বাধীনতা ও মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক বিবেচিত হয়েছিল।[১৯৭]

দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার পর সেটিকে ক্রমে গড়ে তোলার বুনিয়াদি কাজও সম্পন্ন করেন হযরত নানূতবী। শিক্ষার্থীদের প্রধানতঃ তিনি নিজেই পড়াতেন। তিনি তাদেরকে সার্বিকভাবে সমাজ ও রাজনীতি সচেতন আলিম হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পান। এ ব্যাপারে তাঁরা কতখানি নিবেদিত ছিলেন, সে সম্পর্কে অধ্যাপক কাযী আদীল আব্বাসী বলেন, দারুল উলূমের পরিচালকগণ দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত শত্রু ইংরেজকে চিহ্নিত করে ইসলামী খেলাফতের সংরক্ষণ ও ভারতবর্ষকে শৃংখলমুক্ত করার চেষ্টা বিরামহীনভাবে চালিয়ে যান। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী ও তাঁর শায়খ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী নিজেদের শত শত ভক্ত, কর্মী ও সাহায্যকারী নিয়ে এই কঠোর সাধনা ও ধ্যানের মধ্যে জীবন উৎসর্গিত করেন।[১৯৮]

হযরত নানূতবীর ওফাতের পর দায়িত্ব পালন করেন উস্তাযুল কুল হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী। তিনি ছিলেন দারুল উলূমের সদ্‌রুল মুদার্‌রিসীন। বৃটিশ বিরোধী ঐতিহাসিক 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, হযরত আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, হযরত মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ্ দেহলবী, হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মণীষীবৃন্দ।[১৯৯]

---

১৯৬. দৈনিক আল জমইয়ত, প্রাগুক্ত, কাওমী জামহূরী কনভেনশন সংখ্যা, ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৪, পৃ ২।

১৯৭. মুহাম্মদ মুজিব, ইন্ডিয়ান মুসলিমস, দিল্লী, পৃ ৪০৯।

১৯৮. তাহ্‌রীকে খেলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮।

১৯৯. মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, ২য় সং (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ ১৪৪-১৪৮।

হযরত শায়খুল হিন্দের পর সদ্‌র মুদাররিস মনোনীত হন হযরত আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ১২ বছর অধ্যাপনার পর ইস্তফা দিয়ে ডাবেল চলে গেলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য আদিষ্ট হন হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী।

দুই

১৯২৭ সালে দারুল উলূম এক ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৬১ বছর পর এই প্রথম বার আভ্যন্তরীন মতবিরোধের পরিণতিতে দারুল উলূম দেওবন্দ অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়েছিল। ১৯১৪ সালে তদানিন্তন সদরুল মুদার্‌রিসীন হযরত শায়খুল হিন্দ হিজায যাত্রার প্রাক্‌কালে নিজের প্রিয় ও সুযোগ্য শাগিরদ আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীকে ঐ পদে মনোনীত করে যান। হযরত কাশ্মীরীর অপরিসীম মেধা ও যোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত। হাদীস শাস্ত্রে অসামান্য দক্ষতা ও সুগভীর প্রজ্ঞার কারণে তদানিন্তন বিশ্বের 'ইমাম বুখারী' নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে দারুল উলূমের পরিচিতি ও সুখ্যাতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা দলে দলে ছুটে আসে। কিন্তু ১২ বছর পর হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতি ঘটে গিয়েছিল যে, তিনি মাদ্রাসা থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। মাদ্রাসার প্রশাসন বিভাগের সহিত শিক্ষা বিভাগের মতানৈক্য থেকে এ ঘটনা ঘটে।[২০০]

হযরত শাহ্ সাহেবের নিজের পক্ষ থেকে তেমন কোন আপত্তি না থাকলেও যারা তাঁর সমর্থক ছিলেন তাদের মনে প্রশাসন বিভাগে কর্মরত দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি ছিল। মূল বিষয় ছিল খুব্ সাধারণ। কিন্তু এটি ক্রমে ফেঁপে ফুলে বিরাট পর্বতসম সমস্যায় পরিণত হয়। কাশ্মীরী সমর্থক শিক্ষকমণ্ডলীর দাবী ছিল যে, প্রশাসনিক সকল কাজকর্মে সদ্‌রুল মুদার্‌রিসীন আল্লামা কাশ্মীরীর মতামত সংযুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের রায় ছিল ভিন্ন। কর্তৃপক্ষের মতামত ছিল যে, প্রশাসন ও শিক্ষা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিভাগ। কাজেই শিক্ষকবৃন্দকে প্রশাসনে দখলদার বানানো যায় না। উভয় দল নিজ নিজ দাবীতে অটল থাকেন। প্রথমে তো দু'পক্ষের কথাবার্তা ও যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হয়। পরে তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদের রূপ নেয়। ক্রমে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, নিজেদের বিষয় জনসাধারণ্যে এবং ঘরের কথা বাজারে ও অলি-গলিতে ছড়িয়ে

---

২০০. সায়্যিদ মাহবুব রেযবী, তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৯-২৭১।

পড়ে। পরিশেষে পরস্পরে অভিযোগ আরোপ, স্লোগান উচ্চারণ, অপবাদ উত্থাপন, ধর্মঘট আহ্বান, পত্রিকায় লেখালেখি মোটকথা বিবাদ-বিসম্বাদের এমন কোন উপায় অবশিষ্ট থাকেনি, যার যাচাই ও পরীক্ষা শেষ হয়নি। পরিণাম দাঁড়াল যে, ঘাত-প্রতিঘাতের সকল অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেলে হযরত আল্লামা কাশ্মীরী নিজের সমর্থকবৃন্দসহ বহু ছাত্র নিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে চলে যান।[২০১]

দারুল উলূমের জন্য এ সময়টা ছিল অতিশয় নাজুক সময়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এতবড় আঘাত সামাল দেওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছিল। কারণ হযরত আল্লামা কাশ্মীরীর মত একজন বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিসসহ শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রদের বিপুল অংশ মাদ্রাসা ত্যাগ করে চলে গেলে গোটা দেশের মানুষের মধ্যে দেখা দেয় ভীষণ অস্থিরতা। সকলের মনে দারুল উলূমের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ প্রবল আকার ধারণ করে। তৎকালীন নেতৃস্থানীয় বড় বড় আলিম যেমন মাওলানা আতা উল্লাহ শাহ্ বুখারী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, হযরত মাওলানা হিফ্যুর রহমান সিউহারবী প্রমুখ ছিলেন আল্লামা কাশ্মীরীর ভক্ত। খেলাফত কমিটির নেতৃবৃন্দও ছিলেন তাঁর পক্ষে। এমতাবস্থায় দারুল উলূমের আরো ভয়ানক কোন ক্ষতি সাধিত হয়ে গেলে তা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।[২০২]

সৌভাগ্যক্রমে তখন নির্বাহী মুহ্তামিম ছিলেন হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও প্রশাসনিক উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী। তিনি অবিলম্বে সমস্যা নিরসনে সক্ষম হন। শায়খুল ইসলাম তখন সিলেটের নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষাদানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মাওলানা হাবীবুর রহমান তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর একজন ছিলেন। তাই শিক্ষক হিসেবে তিনি হযরত শায়খুল ইসলামকে এক চিঠিতে অবিলম্বে ও জরুরী ভিত্তিতে দেওবন্দ পৌঁছার নির্দেশ দিয়ে পাঠান। চিঠিতে কেবল আগমনের নির্দেশ ছিল। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বিবরণ কিংবা সদরুল মুদার্‌রিসীন মনোনীত করার কোন আভাস ছিল না। তিনি জানতেন যে, শায়খুল ইসলাম নিজের যে কোন শিক্ষকের নির্দেশ আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকেন।[২০৩]

হযরত শায়খুল ইসলাম দেওবন্দ পৌঁছার পর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখে খুবই দুঃখিত হন। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার

---

২০১. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৬।

২০২. প্রাগুক্ত।

২০৩. আসীর আদরবী, ফরীদুদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, **শায়খুল ইসলাম : জীবন ও সংগ্রাম** (ঢাকাঃ জামান প্রিন্টার্স, ১৯৯১), পৃ ১১৯-১২০।

জন্য হযরত আল্লামা কাশ্মীরী ও তাঁর একান্ত সমর্থক হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর সাথে মিলিত হন। তাঁর চেষ্টায় এক পর্যায়ে আল্লামা কাশ্মীরী পূর্বের দৃঢ় অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং মাদ্রাসায় পুনঃ যোগদান করে সবক পড়াতে সম্মত হন। কিন্তু পরক্ষণেই সমর্থকদের চাপে ঐ সম্মতি প্রত্যাহারে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে শয়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী বলেন, হযরত মাদানী সিলেট থেকে এসে ফজ্‌র নামাযের পর আমাকে সাথে নিয়ে শাহ্ সাহেবের বাড়ী গেলেন। শাহ্ সাহেব তখন নিজগৃহে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতরত ছিলেন। সার্বিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি শাহ্ সাহেব থেকে মতবিরোধ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উত্তরে হযরত শাহ্ সাহেব প্রশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের কথা বললেন। মাদানী বললেন, এ সকল আপত্তি কি নতুন ভাবে সৃষ্ট, না শায়খুল হিন্দের সময়েও ছিল? তিনি বললেন, আপত্তিগুলো নতুন নয়। তবে শায়খুল হিন্দ ছিলেন বড় মাপের মানুষ। আমরা এত বড় ব্যক্তিত্ব কোথায় পাব? মাদানী বললেন, আমরা এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান সবাই মিলেও গড়তে পারি না। তবে ভেঙ্গে দিতে পারি। হযরত শায়খুল হিন্দের নীতি অনুসরণ করে চললে মাদ্রাসা টিকে থাকবে বরং উন্নতি করবে। হযরত শায়খুল হিন্দের কাছেও এ সব কিছু অজানা ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি প্রশাসনকে সর্বদা সহযোগিতা করে গিয়েছেন। কাজেই আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল এ মতবিরোধ বাইরে টেনে না আনা। আপনি মাদ্রাসার ভিতরে অবস্থান করুন এবং ক্রমান্বয়ে সংশোধনের চেষ্টা করুন।

এভাবে কিছুক্ষণের আলাপ-আলোচনায় হযরত শাহ্ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্মত হয়ে যান। হযরত মাদানী তাঁকে সঙ্গে করে হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানীর দপ্তরে পৌছলেন। উভয়ে সালাম ও কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী হযরত শাহ্ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, মৌলভী আন্‌ওয়ার শাহ্! এই নিন, সকল রেজিস্ট্রার রাখা আছে, আপনি যে কর্মচারী বা ছাত্রকে ইচ্ছা মাদ্রাসায় রাখুন, যাকে ইচ্ছা বহিষ্কার করুন। কথাটি শুনে শাহ্ সাহেব রীতিমত কেঁদে দিলেন। তারপর আরো বিভিন্ন কথাবার্তা হল। উভয়ের মান অভিমান শেষ হলে তিনি শাহ্ সাহেবকে বললেন, ঠিক আছে, আপনি আসুন, সবক পড়াতে থাকুন। শাহ্ সাহেব বললেন, ইনশা আল্লাহ, আজই বিকাল থেকে পড়াতে শুরু করব। শাহ্ সাহেব ফিরে বাড়ী গেলেন। সমর্থক শিক্ষকমণ্ডলী তখন তাঁর বাড়ীতে অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পর নিম্মোক্ত বক্তব্যসহ হযরত শাহ্ সাহেবের স্বাক্ষরযুক্ত একটি চিরকুট প্রশাসনে হযরত মুহতামিম সাহেবের দপ্তরে

এসে পৌছল যে, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচেছ যে সঙ্গীদের মন রক্ষার্থে আমার পক্ষে দারুল উলূম ফিরে আসা সম্ভব নয়।[২০৪]

পরদিন যুহ্‌র নামাযের পর মুহ্‌তামিম হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ ও নির্বাহী মুহ্‌তামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী স্থানীয় কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বীদের নিয়ে হযরত শায়খুল হিন্দের বাড়ীতে বসেন এবং অগত্যা শায়খুল ইসলামকে 'সদ্‌রুল মুদার্‌রিসীন'-এর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। শায়খুল ইসলাম বিভিন্ন কারণে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন। এদিকে আল্লামা কাশ্মীরীর পক্ষ থেকেও মতামত পরিবর্তনের কোন লক্ষণ ছিল না। বৈঠকে নির্বাহী মুহ্‌তামিম মাওলানা হাবীবুর রহমান দারুল উলূমের সকল চাবি শায়খুল ইসলামের সম্মুখে নিক্ষেপ করে বললেন, হযরত শায়খুল হিন্দ ও হযরত নানূতবীর এই পবিত্র আমানত আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনি ইচ্ছা করলে এ আমানত বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। মুহ্‌তামিম মাওলানা হাফিয আহমদ বলে উঠলেন, আজকের এই বিপদ কালে যদি আপনি দারুল উলূমের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহলে আমরাও চলে গেলাম। দারুল উলূম টিকে থাকুক আর বিনষ্ট হোক চিন্তা করব না। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরকে ততটুকু জবাব দিতে হবে যতটুকু দিতে হবে আপনাকে।[২০৫]

উপরোক্ত বক্তব্যে হযরত শায়খুল ইসলাম ভীষণ প্রভাবিত হন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হন। বস্তুত দায়িত্ব গ্রহণে তাঁর যেটি বিশেষ বাধা ছিল সেটি হল, তিনি হযরত শায়খুল হিন্দের মিশনকে নিজ জীবনের প্রধান কর্মরূপে স্থির করে রেখেছিলেন। সদরুল মুদার্‌রিসীন-এর দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারা তাঁর ঐ কর্মের অভীষ্ট লক্ষ্য তথা দেশ ও জাতির শৃংখল মুক্তির কাজ ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া খোদ দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষও হয়ত তাঁর জিহাদী কার্যকলাপ সমর্থন কিংবা সামাল দিতে সক্ষম হবে না। এ কারণে তিনি বারবার অসম্মতি প্রকাশ করেন। অবশেষে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি নিযুক্তির শুরুতেই প্রশাসন বিভাগ ও মজলিসে শূরা থেকে ১৯টি শর্ত মঞ্জুর করিয়ে নেন।[২০৬] শর্তাবলীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যেমন,

এক. রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ব্যাপারে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ ব্যাপারে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ করা চলবে

---

২০৪. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ আল হুসাইনী, মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, চেরাগ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩-১৮৪।

২০৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২১।

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১২২-১২৩।

না। দুই. রাজনৈতিক তৎপরতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার অংশ গ্রহণের উপর মাদ্রাসা থেকে কোন বাধা আরোপ করা যাবে না। তিন. প্রত্যেক মাসে আমার জন্য ছুটিবিহীন ১ সপ্তাহ সফর করার অনুমতি থাকবে এবং এ অনুপস্থিতির কারণে বেতন কর্তন করা যাবে না।[২০৭]

হযরত শায়খুল ইসলাম দীর্ঘকাল পর্যন্ত সদরুল মুদাররিসীন হিসেবে অধ্যাপনা ও দায়িত্ব পালনে কখনো বিন্দুমাত্র অবহেলা করেননি। তাঁর আরোপিত ১৯টি শর্তের আদ্যোপ্রান্ত পড়লে বোঝা যায় যে, শর্তারোপের দ্বারা তিনি নিজের আত্মসম্মান বৃদ্ধি কিংবা বৈষয়িক স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করেননি। বরঞ্চ দেশ ও জাতির শৃংখল মুক্ত করার মহান কাজে নিজের ত্যাগী ও সংগ্রামী অমিততেজ প্রতিভাকে আরো বিপুল শক্তিতে পরিণত করার দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন। এহেন উচ্চ মন-মানসিকতাকে কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে তুচ্ছভাবে দেখার সুযোগ নেই। দারুল উলূম একটি অতি উচ্চ মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর শিক্ষা পরিচালকের পদে এমন উচ্চ মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বকেই মানায়। তাই প্রশাসন ও মজলিসে শূরার সকলে ঐ শর্তাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন প্রদান করলে তিনি সদ্‌রুল মুদাররিসীন পদে যোগদান করেন।[২০৮]

তিন

সদরুল মুদাররিসীন পদে তাঁর যোগদানের ফলে বিগত দেড় বছর যাবত দারুল উলূমের অভ্যন্তরে যে অস্থিরতা ও বিশৃংখলা বিরাজ করছিল, সেটি দ্রুত প্রশমিত হতে থাকে। মাদ্রাসার ভিতর সকলে একজোট হয়ে কাজকর্ম শুরু করে। দারুল উলূম নিশ্চিত বিনাশ থেকে রক্ষা পায়। মাওলানা আবদুস সালাম কিদ্‌ওয়ায়ী বলেন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এসব ঘটনা নিয়ে বাদানুবাদ চলে আসছিল। কোন কোন পত্রিকা শুধু এসব ঘৃণ্য আলোচনার জন্যই বের করা হত। অবস্থা এত ভয়ানক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, বুযর্গানে দ্বীনের অর্ধ শতাব্দী কালের অমূল্য সঞ্চয় ধূলায় বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। মহান আল্লাহ্ এ বিরাট ক্ষতি থেকে প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করেছেন। একদিকে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী দারুল উলূমের সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীসের পদ সামাল দেন, অন্যদিকে কয়েকজন দানশীল ব্যক্তি ডাবেলে হযরত

---

২০৭. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ আল হুসাইনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮২।
২০৮. প্রাগুক্ত।

শাহ্ সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে একটি নতুন শিক্ষা কেন্দ্রের বুনিয়াদ স্থাপন করেন।[২০৯]

হযরত আল্লামা কাশ্মীরী ছিলেন খেলাফত আন্দোলনের তৎকালীন অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। এই কারণে বিবাদ কালে কোন কোন পত্রিকায় অভিযোগ প্রচারিত হয়েছিল যে, দারুল উলূমের প্রশাসন বিভাগ খেলাফত আন্দোলনের সাথে বৈরী মনোভাব পোষণ করে। অভিযোগটি তদন্তের জন্য খেলাফত কমিটি থেকে হাফিয ইব্রাহীমকে পাঠানো হয়। মাওলানা জাওহার নিজেও এসে সংবাদ নিবেন বলে জানান। মাওলানা কাযী যাহিদ হুসাইনী বলেন, হাফিয ইব্রাহীম দেওবন্দ পৌঁছে হযরত মাদানীকে বললেন, পত্রিকায় কিছু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। খেলাফত কমিটি এগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। মাদানী তাকে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আমি এখানে উপস্থিত আছি অথচ আপনারা আমার সাথে কথা না বলেই তদন্তের জন্য পৌঁছে গেলেন। এতে বিবাদ আরো চাঙ্গা হবে। হাফিয ইব্রাহীম কথাটি শুনে সোজা ফিরে গেলেন। তিনি মাওলানা জাওহারকেও আসতে নিষেধ করলেন।[২১০]

বস্তুতঃ বিবাদ ছিল প্রশাসন বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের মধ্যে। সদ্রুল মুদার্রিসীন হিসেবে হযরত শায়খুল ইসলাম শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারা উভয় বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি ফিরে আসে। দারুল উলূমের তৎকালীন মুখপাত্র মাসিক 'আল কাসিম' পত্রিকার সম্পাদক কারী মুহাম্মদ তাহির (হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) তখনকার অবস্থা রিপোর্ট করে বলেন, দারুল উলূমের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ শান্ত। সবক'টি বিভাগ যথারীতি চালু আছে। কোন প্রকার বিশৃংখলা নেই। শিক্ষার কাজ পূর্বের ন্যায় চলছে। ছাত্রদের আগমন অব্যাহত আছে। শুরুবর্ষে নতুন ছাত্র ভর্তির বিষয়টিও কোনরূপ প্রভাবিত হয়নি। সর্বসাধারণের মধ্যেও কোন উত্তেজনা নেই বরং দারুল উলূম পুরোপুরি শান্ত।[২১১]

যে ছাত্ররা এক বছর পূর্বেও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল, হযরত শায়খুল ইসলামের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাদেরকে কর্তৃপক্ষের পরম অনুগত ভক্তে পরিণত করে দেয়। তাঁর গৃহে সর্বদা ছাত্রদের ভিড় লেগে থাকে। বিশেষতঃ দাওরা হাদীস শ্রেণীর ছাত্রদেরকে তাঁর প্রতি মন্ত্রমুগ্ধ বলে মনে

২০৯. মাসিক আল বায়্যিনাত, করাচী, ইউসুফ বিন্নৌরী সংখ্যা, পৃ ৬৭৪।

২১০. চেরাগ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৪।

২১১. আল কাসিম, দারুল উলূম দেওবন্দ, পৃ ৪।

হত। তাই কোন কোন সময় তিনি সফর থেকে রাত ১২ টার সময় ফিরে আসতেন। গভীর নিদ্রা যাপনের ঐ মুহূর্তেও দেখা যেত সংবাদ শোনা মাত্র সকলে পঙ্গপালের ন্যায় ক্লাসের দিকে ছুটে আসছে। বস্তুত শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর সীমাহীন স্নেহ ও মমত্ববোধ তাদেরকে এতখানি অনুগত করে দিয়েছিল। এ মর্মে 'তারীখে দারুল উলূম' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সদরুল মুদাররিসীন পদে তাঁর দায়িত্ব পালন কালে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বিশেষতঃ দাওরা হাদীস শ্রেণীর ছাত্রদের সংখ্যা তিন গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। হিজরী ১৩৪৬ থেকে ১৩৭৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পূর্বে বিগত ৬১ বছরে দারুল উলূম থেকে অধ্যয়নোত্তীর্ণদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২৭৫১ জন। অথচ এককভাবে তাঁর কাছে অধ্যয়নোত্তীর্ণদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪৭৩ জনে।[২১২]

শায়খুল ইসলাম দেওবন্দে আগমনের ২ বছরের মধ্যেই তৎকালীন মুহ্তামিম হযরত মাওলানা হাফিয আহ্মদ ও নির্বাহী মুহ্তামিম মাওলানা হাবীবুর রহ্মান উসমানী ইন্তিকাল করেন। নতুন মুহ্তামিম হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। শায়খুল ইসলাম তখন নতুন মুহ্তামিম ও মজলিসে শূরা থেকে ঐ শর্তাবলীর পুনর্বার মঞ্জুরী নেন। যদিও এই নবায়নের আইনগত কোন প্রয়োজন ছিল না তবুও উপস্থিত কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি সরাসরি সংশ্লিষ্ট রাখার স্বার্থে তিনি এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[২১৩]

জিহাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আলিমগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় ১৮০৩ থেকে। তখন থেকে রেশমী রুমাল আন্দোলন পর্যন্ত সংগ্রামে তাঁদের নীতি ছিল সশস্ত্র বিপ্লব তথা বল প্রয়োগের নীতি (التشـــدد)।[২১৪] শায়খুল হিন্দ মাল্টা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এ নীতির পরিবর্তন ঘটে। তখন সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবেশ না থাকায় তিনি সরকারের সার্বিক অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, আমাদের আকাবির ও আমরা বিগত কালে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চেষ্টা করে আসছি। বর্তমানে সশস্ত্র সংগ্রামের সেই পরিবেশ নেই। তাই

২১২. তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৯-২১০।
২১৩. আসীর আদরবী, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬।
২১৪. মাসিক আর রশীদ, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯-৪৯২।

আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচির পথে অগ্রসর হচ্ছি। এ পর্যায়ে অসহযোগিতার কর্মসূচিকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করি। তাঁর যুক্তি ছিল, জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত কোন সরকার টিকে থাকতে পারে না। কাজেই গণমানুষের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা বর্জনের পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী সরকার আপনা থেকেই সরে পড়তে বাধ্য হবে। এ নিরিখে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে স্বদেশী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দু সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। একই কারণে তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ মাল্টা থেকে ফিরে আসার পর দেশীয় অন্যতম রাজনৈতিক বিরোধী দল 'কংগ্রেস' ও 'খেলাফত কমিটি'তে যোগ দেন। জমইয়তে উলামার ২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে যদি ভারতবর্ষের প্রধান ২টি সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দুদের সকলে মিলে এমনকি শিখদের বিপ্লবী দলকেও সঙ্গে নিয়ে ৩টি দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে, তাহলে চতুর্থ শক্তি তা যতই বড় হোক না কেন, দেশীয় সম্প্রদায়গুলোর সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হতে বাধ্য।[২১৫]

এ নীতি গ্রহণের ফলে মুজাহিদ উলামা ও দেশীয় রাজনীতিকদের কর্মসূচীর মধ্যে অনেকাংশে ঐক্য স্থাপিত হয়। পার্থক্য কেবল এতটুকু থাকে যে, দেশীয় রাজনীতিকবৃন্দ সরকারের সাথে যুক্ত হয়ে 'ডোমিনিয়ন' (Dominion) ও 'স্বরাজ' আদায়ের চেষ্টা করেছেন। আর মুজাহিদ উলামা সরকারের কাজকর্মের সাথে কোন ধরনের সংযুক্তি হারাম মনে করে স্বাধীনতার একক দাবীতে অটল হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। শায়খুল হিন্দের পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন বস্তুত সুফল বয়ে এনেছিল। কেননা এর ফলেই দেশীয় রাজনীতিকদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সম্প্রসারিত হয় এবং এক পর্যায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হয়। শায়খুল হিন্দ পদ্ধতির সূচনা করে গেলেও তিনি পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি। মাল্টা থেকে মুক্তির ৫ মাস পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। তারপর তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম মাদানী, মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ, মাওলানা আহমদ সাঈদ, মাওলানা হিফ্যুর রহমান, মাওলানা আবুল মাহাসিন সাজ্জাদ প্রমুখ এটিকে পূর্ণতায় পৌছিয়ে দেন।[২১৬]

---

২১৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬।

২১৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭।

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী সশস্ত্র বিপ্লবের শেষ দিকে পবিত্র মদীনা থেকে জিহাদের কাজকর্মে সংযুক্ত হন। তারপর ভারতে ফিরে এসে পরিস্থিতি অনুসারে অসহযোগ নীতির আন্দোলন শুরু করেন। হযরত শায়খুল হিন্দের ওফাতের পর তাঁকেই প্রধানতঃ সিপাহসালারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলন দেশজুড়ে গণজোয়ারের সৃষ্টি করেছিল। মুসলিম ও অমুসলিম সকলে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় এমন এক বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠেছিল, যে ঐ ঐক্যের দাপটে সাম্রাজ্যবাদী সিংহাসন টলটলায়মান হয়ে গিয়েছিল। তখন বৃটিশের কাছে দু'টি পথের যে কোন একটি অবলম্বন ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকেনি। হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করা, নয়ত স্বদেশীদের ঐক্য ভেঙ্গে দিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ইংরেজ শেষোক্ত বিকল্পটি গ্রহণ করে। তারই ফলশ্রুতিতে ইংরেজ প্রথমতঃ মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ও শায়খুল ইসলামসহ বহু খেলাফত নেতাকে ২ বছরের জন্য করাচীর জেলে আটক করে।[২১৭] অপরদিকে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নবাদিতা কার্যকর করার অপচেষ্টায় মেতে উঠে। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার ঐ বিষাক্ত ছোবল অব্যাহত ছিল। ফলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ আরো ২ দশকের জন্য পিছিয়ে যায়।

দুই

ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন একত্রে বসবাস করে আসছে। কখনো তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি কিংবা দাঙ্গা হয়নি। ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর সরকারী প্ররোচনায় এদেশে সাম্প্রদায়িকতা জন্ম নেয়। তারপর এই ইংরেজদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িকতা একাডেমিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি অর্জন করে এবং এটিই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়।[২১৮] বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একটু গোড়া থেকেই আলোচনা করা সমীচীন হবে।

ভারত ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দা ছিল অনার্যরা। খাইবার গিরিপথ দিয়ে আর্যরা এ দেশে আসে এবং অনার্যদের তাড়িয়ে এখানে বসবাস শুরু করে।

---

২১৭. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহম্মদ আলী জওহর, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

১১৮. ড.বদিউজ্জামান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী জীবন ও সাহিত্য (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ ২৮।

উত্তরকালে এ আর্য সম্প্রদায়গুলো 'হিন্দু সমাজ' নামে পরিচিত হয়।[২১৯] মহানবীর আবির্ভাবের পর হিজরী ১ম শতকেই ভারতীয়রা ইসলামের সাথে পরিচিত হয়। তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর প্রায় ১২ শত বছর এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান চলে। মুসলমানরা হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে দেয়নি বরং সকল কাজে পারস্পরিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দেশ হিসেবে গড়ে তোলে।

মুসলমানগণ মৌলিকভাবে এ দেশেরই বাসিন্দা। তারা এদেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর যারা ভিন্ন ভূখণ্ড থেকে এসেছিলেন তারাও এখানকার মাটি, আলো, বাতাস ও প্রকৃতিকে নিজের আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করেন এবং মাতৃভূমির মর্যাদা দিয়ে এ ভূখণ্ডের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের অনেকে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য শাসন করেছেন। কিন্তু ধর্মের পার্থক্য তাঁদের রাজ্য শাসনের কোথাও কোন ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। মেধা ও যোগ্যতার নিরিখে হিন্দু মুসলিম সকলেই সমান মর্যাদা ভোগ করেছিল। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর গভীর আস্থাশীল ছিল। তাই হিন্দু রাজাদের সহযোগিতায় উচ্চপদস্থ বহু মুসলিম কর্মকর্তা এবং মুসলিম বাদশাহদের সহযোগিতায় বহু হিন্দু কর্মকর্তা সর্বত্র দেখা যেত।[২২০] রাজনীতি ও রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনেক সময় পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহও ঘটেছে। ঐ সকল যুদ্ধেও হিন্দু রাজাদের সাথে মুসলিম প্রজারা এবং মুসলিম বাদশাহদের সাথে হিন্দু প্রজারা সামরিক বিভাগের বড় বড় পদ থেকে সাধারণ পদে পর্যন্ত সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রশাসনেরও উঁচু থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে সকলে কর্মরত ছিলেন।

মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামরিক বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'তোপখানা'-এর দায়িত্বে ছিলেন রাজা বিক্রমাদিৎ। হিন্দু মারাঠাদের তোপখানার দায়িত্বে ছিলেন জনৈক মুসলমান মুহাম্মদ ইব্রাহীম কুর্দী। সুলতান টিপুর গোটা অর্থ-বিভাগ শ্রী সরদার পুরনিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন শ্রী মোহন লাল, আর পাটনাস্থ গভর্ণর ছিলেন শ্রী রাম নারায়ণ। অযোধ্যার নওয়াব আসিফুদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শ্রী ভাওলাল দায়িত্ব পালন করেন। শ্রী রাজা রাম রায় রোহিলাখণ্ডের নওয়াব হাফিয রহমত খানের প্রধানমন্ত্রী

---

২১৯. বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), ১ম খণ্ড, পৃ ২৪-২৫।

২২০. মাদানী, নকশে হায়াত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১১।

ছিলেন। এ ধরনের সম্প্রীতি শিখদের সাথেও ছিল। শিখ রাজা রণজিৎ সিংয়ের মন্ত্রী ও একান্ত বিশ্বস্ত পরিষদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পীরযাদা খাজা আযীমুদ্দীন। তার তোপখানার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন জনৈক মুসলমান এলাহী বখ্শ। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ যখন শিখদের সাথে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁর তোপখানা জনৈক হিন্দু শ্রী রাজা রাম রাজপুতের উপর ন্যস্ত ছিল। মহামতি আলমগীরকে ইংরেজ গবেষকরা ধর্মান্ধ বলে অপপ্রচার করে থাকে।[২২১] অথচ এই আলমগীরের শাসননীতি সম্পর্কে স্যার পি.সি.রায় বলেন, সম্রাট আলমগীরের শাসনামলে বাঙ্গালী হিন্দুদেরকে মনসবদারীসহ বড় বড় জায়গীর প্রদান করা হয়। অনেক হিন্দুকে জমিদারী দেওয়া হয়। মহামতি আলমগীর হিন্দু প্রজাদেরকে গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন, ভাইসরয় নিযুক্ত করেছেন। এমনকি একান্ত মুসলিম সুবা 'আফগানিস্তান'-এর জন্য নিজের প্রতিনিধি হিসেবে যাকে নিযুক্ত করেন তিনি ছিলেন হিন্দু রাজপুতদেরই একজন।[২২২]

এ সব ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, ঐ আমলে হিন্দু কিংবা মুসলিম কারো অন্তরেই ধর্মের কারণে পার্থক্য করার মনোবৃত্তি ছিল না। রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যেকে যোগ্যতা অনুসারে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করত। বস্তুত হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই ভারত ভূখণ্ডকে নিজের প্রিয় আবাসভূমি রূপে গ্রহণের দরুন হাজার বছরেও তাদের মধ্যে রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কোন্দল, হানাহানি কিংবা দাঙ্গা সংঘটিত হয়নি।

অপর দিকে ইংরেজ শাসন কায়েমের পর উপমহাদেশে শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়, লালন করে এবং পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও দাঙ্গা উস্কে দেয়। ইংরেজ এ দেশে এসেছিল বণিক হিসেবে। তারপর বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জন থেকে শুরু করে কূট কৌশলের মাধ্যমে রাজত্বের আসন কেড়ে নেয়। ভারত উপমহাদেশকে ইংরেজ নিজেদের অর্থ রোজগারের উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের কিংবা হিন্দুদের মত নিজের প্রিয় আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেনি। এ কারণে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে ইংরেজ দৃষ্টিভঙ্গি আর মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দুস্তর তফাৎ ঘটে গিয়েছে। মুসলমানগণ ভারত থেকে অর্থ উপার্জন করে সেটি ভারত ও ভারতবাসীর মধ্যেই ব্যয় করেন। ভারতের বাইরে কোথাও পাচার হতে দেননি। পক্ষান্তরে ইংরেজ

২২১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১২-৩১৫।

২২২. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাকবিল (লাহোর : বদর রশীদ প্রিন্টার্স, তা. বি.), পৃ ৫৪।

এখান থেকে অর্থ ও শক্তি সঞ্চয় করে তা পাচার করে দেয় বিলাতে। মুসলমানগণ ভারতবাসীকে আপন করে নিয়ে তাদের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আর ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখার প্রয়াস পায়।[২২৩]

ভারতে ইংরেজরা এহেন নীতি কেন গ্রহণ করেছিল তার ব্যাখ্যা করে স্যার জন মিলকম বলেন, ভারতের সুবিশাল ভূখণ্ডে আমাদের যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সেটি নিরাপদ ও অক্ষুন্ন রাখার একমাত্র ব্যবস্থা হল যে, আমাদের শাসনভুক্ত অঞ্চলগুলোর ভিতর যে সকল বড় বড় দল রয়েছে, সেগুলোকে ব্যাপক হারে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়া এবং প্রত্যেক খণ্ডকে আবার বিভিন্ন ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির দ্বারা বিখণ্ডিত করে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ও পৃথক করে রাখা। কেননা যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়রা পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে ততদিন আমরা আশা করতে পারি যে, কোন বিদ্রোহ মাথা তুলে আমাদের রাজত্ব নড়বড়ে করে দিতে সক্ষম হবে না।[২২৪]

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রথম বীজ বপন করেন জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা স্যার হেনরী এলিট। তিনি ইংরেজ সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের সচিব পদে কাজ করতেন। তিনি ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উৎস সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভারতের নতুন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি গবেষণার নামে মুসলিম শাসনামলের প্রকৃত ঘটনাবলী এড়িয়ে গিয়ে কিংবা বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এবং বহু অবান্তর বিষয় নিজ থেকে সংযুক্ত করে দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, পূর্বকালে হিন্দুদের উপর মুসলিম শাসকগণ অনেক নির্যাতন করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানে ইংরেজ শাসকগণ তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। মি.এলিট উল্লেখিত বানোয়াট ঘটনাবলীকে হিন্দু নির্যাতনের মর্মস্পর্শী চিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটিই সর্বপ্রথমে রচিত ইতিহাসের সেই গ্রন্থ, যেখানে ভারতের প্রাচীন কাল বিশেষতঃ মুসলিম শাসনামলের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিষ ছড়ানো হয়েছে, সরকার এটিকে দেশীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত শিশু, কিশোর

---

২২৩. আবদুল ওয়াহিদ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ ১৭-২১।

২২৪. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৮।

ও যুবকদের পড়তে দেয় এবং হিন্দুদের মনে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করে।[২২৫]

অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে ভারতীয় পণ্ডিতগণ ইতোপূর্বে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। রচনাকারীদের মধ্যে অনেক হিন্দু পণ্ডিতও রয়েছেন। কিন্তু মি.এলিট যে কাজটি করেছেন সেটি হিন্দু কিংবা মুসলিম কোন লেখকের রচনায় ছিল না।

এলিটের পর মি.কিমসন একাডেমিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার কাজটি আরো পাকাপোক্ত করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের শিক্ষা দফতরে ডিরেক্টর পদে চাকুরী করেন। এলিটের ন্যায় তিনিও ভারতের নতুন ইতিহাস রচনা করে সেটি স্কুল-কলেজের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বইটি অনুবাদ করে সরকারী তত্ত্বাবধানে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন।[২২৬] ফলে এ সকল বিকৃত ও মিথ্যা ঘটনা গলধঃকরণ করে ছাত্রদের মন-মানসিকতায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্ম নিতে থাকে। এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ দেশে পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। অধিকন্তু বিকৃত ধ্যান-ধারণার দূষিত পরিবেশ থেকে নামসর্বস্ব এমন কিছু রাজনীতিক দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে মনোযাগী না হয়ে উল্টা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সাহায্যকারী তাবেদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বস্তুত ভারতীয় হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও ঐক্য সাম্রাজ্যবাদের শিরোপীড়ার কারণ ছিল। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা ইংরেজ এ শিরোপীড়া দূরীভূত করতে চেষ্টা করে। সরকার নেপথ্যে বসে এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দেয়। তাদেরকে প্রতিহিংসা ও সংঘর্ষে লিপ্ত করে সাহায্যের নামে কখনো এই দলের পক্ষ হয়ে, আবার কখনো ঐ দলের পক্ষ হয়ে

২২৫. 'প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা' শিরোনামে ইংরেজ লেখকরা প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে পেশ করার এই সুযোগটি গ্রহণ করে। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাসে অনেক অলীক কথা জুড়ে দেয়, বহু প্রাচীন মসজিদকে এক সময় সেটি মন্দির ছিল বলে নোট লিখে যায়। ঐ নোটগুলিই অদ্যাবধি ভারতে দাঙ্গার উপকরণ যুগিয়ে আসছে। দেশপ্রেমিক গবেষকগণ 'অন্ধকূপ হত্যা'-এর বানোয়াট কাহিনীসহ মিথ্যা নোটগুলির জবাব দিলেও দাঙ্গার যেই বীজ লাগানো হয়েছে তার বিষফল থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায়নি। প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৯।

২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১০।

সাম্প্রদায়িকতা পূর্ণভাবে লালন করতে থাকে।[২২৭] ইংরেজ লেখক মি.টমসন স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেছেন। এক প্রসঙ্গে টমসন বলেন, ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য ও পারস্পরিক বিদ্বেষ জিইয়ে রাখা গোড়া থেকেই আমাদের নীতি নির্ধারক মহলের সুপ্রিয় কর্ম হিসেবে চলে আসে। তবে বর্তমানে ভারত নিজের ঐক্য ও সংহতি গঠনের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে।[২২৮] অনারেবল অম্বিকাচরণ মজুমদার আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমানদের বিপরীতে হিন্দুদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। আবার শেষ দিকে হিন্দুদের বিপরীতে মুসলমানদের লেলিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও কলহ সৃষ্টি করা হয়েছিল।[২২৯]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির উপরোক্ত ষড়যন্ত্রগুলি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে স্কুল শিক্ষিত কিংবা কতিপয় সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হলেও রাজনৈতিক কিংবা সাংগঠনিকভাবে কোন ভিত্তি অর্জিত হয়নি। ঐ বছর ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় মহাবিদ্রোহ ঘটে গেলে ইংরেজ দ্রুত সাম্প্রদায়িকতাকে সাংগঠনিক ভিত্তি দানের প্রয়োজন বোধ করে। সে মতে ১৮৫৯ সালে বোম্বাই গভর্ণর এ্যালফিনেস্টোন প্রাচীন রোমের সুপ্রচলিত (Divide And Rule) বিভাজন ও শাসন নীতি ভারতে প্রয়োগের আনুষ্ঠানিক সুপারিশ পেশ করেন। ১৮৭১ সালে উইলিয়াম হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স' গ্রন্থে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সরকারী আনুকূল্য প্রয়োগের ওকালতী করেন। ১৮৭৭ সালে স্যার সায়্যিদ আলীগড়ে 'এ্যাংলো অরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ইংরেজ পাঠ্যক্রমের শিক্ষা ও ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণের প্রচার কার্যে নামেন। ১৮৮৫ সালে ইংরেজ অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মি.হিউম ও কলিকাতা কোর্টের উকীল উমেষ চন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। বৃটিশের প্রেরণা দান ও তত্ত্বাবধানে কংগ্রেস জন্ম ও শৈশব অতিক্রম করলেও শীঘ্রই সরকার বিরোধী ভূমিকায় চলে যায়। ১৮৮৭ সালে ভারত সচিব লর্ড ক্রস বড় লাট ডাফরিনকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, পরিস্থিতির দাবী অনুসারে ভারতীয়দের ধর্মগত কলহ-বিবাদ জিয়িয়ে রাখা আবশ্যক। এটি ইংরেজ শাসনের পক্ষে হিতকর ও লাভজনক বিষয়।[২৩০]

---

২২৭. ড.অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস (কলিকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৮১), ২য় খণ্ড, পৃ ৩৬৬।

২২৮. মাদানী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮।

২২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৯।

২৩০. ড.অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০০।

ঐ সময় আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ ও ঘোর সাম্রাজ্যবাদী মি.থিওডোর বেক স্যার সায়্যিদকে বোঝালেন যে, ইঙ্গ-মুসলিম সহযোগিতা ভারতে হিন্দুদের বিপরীতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধন করবে। ফলে তিনি মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন। স্যার সায়্যিদের মাধ্যমে মি. বেক মুসলমানদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দল খাড়া করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সফল হননি। ফলে স্যার সায়্যিদ শুধু শিক্ষা বিস্তার ও সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার তালীম দানেই ক্ষান্ত থাকেন।

১৯০১ সালে ঐ কলেজের সাধারণ সম্পাদক নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌ক 'মোহামেডান রাজনৈতিক সংঘ' নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালে মুহসিনুল মুল্‌ক ও স্যার আগা খান দেশের ৩৫ জন মুসলমানকে নিয়ে লর্ড মিন্টোর সহিত স্বাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রিত হন। প্রতিনিধিদল বড় লাটের নিকট নিজেদের আনুগত্য প্রকাশপূর্বক কাউন্সিল ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য পর্যাপ্ত আসনের সংরক্ষণ এবং 'ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচন'-এর দাবী জানান।[২৩১] বড় লাট তাদের প্রস্তাব শোনেন এবং সানুগ্রহ মঞ্জুরী দান করেন। বস্তুত এ সাক্ষাতকারটি ছিল বৃটিশের সম্পূর্ণ সাজানো ও পাতানো একটি অনুষ্ঠান। সাম্প্রদায়িক সংগঠন স্থাপন করানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এ কৌশলের অবলম্বন করে। তাই তৎকালের জাগ্রত মস্তিষ্ক মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ঐ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, এটি একটি পাতানো নাটক, যা শিমলায় বড় লাটের সামনে মঞ্চস্থ করা হয়েছে মাত্র।[২৩২]

শিমলায় অবস্থিত তখনকার ইংরেজ কর্মকর্তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে ঘটনাটির প্রকৃত রহস্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। বড় লাটের স্ত্রীকে লিখিত এক অবগতিপত্রে জনৈক সিনিয়র কর্মকর্তা সাক্ষাতকার সম্পর্কে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে লিখেছেন, মহোদয় সমীপে এই সংক্ষিপ্ত চিঠিতে অবগত করানো জরুরী মনে করি যে, আজ একটি অসামান্য কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। এটিকে নিপুণ কূটনৈতিক বিজয় বলা যেতে পারে। গোটা ভারত তথা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বহু কাল পর্যন্ত অদ্যকার এই সাক্ষাতকারের প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। এটা দাবী করা কোন অতিশয়োক্তি হবে না যে, আজ ভারতের ৬ কোটি

---

২৩১. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬০-৩৬১।
২৩২. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩০।

৩০ লক্ষ লোক(মুসলমান)-কে বিদ্রোহী (কংগ্রেস)-দের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পথ উন্মুক্ত করা সম্ভব হল।[২৩৩]

সাক্ষাতকারের ৩ মাসের মধ্যেই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় নওয়াব ভিকারুল মুল্‌কের নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। একই সময়ে উগ্রপন্থী হিন্দুদেরও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজ সরকার হিন্দুদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পূর্ব থেকেই যোগসাজস করে আসছিল। স্যার এ্যান্টনী ম্যাকডোনাল্ড-এর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯০০ সালে দিল্লীতে 'মহামণ্ডল' শিরোনামে হিন্দুদের বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বেদগ্রন্থ হাতে নিয়ে নগ্ন পদে ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে থাকেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রায় ১ লক্ষ হিন্দু যোগদান করে। ১৯০৬ সালের একই বছরে লাহোরে মহামণ্ডলের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উগ্রপন্থী হিন্দুরা 'অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাসভা' নামে হিন্দুদের 'পৃথক প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। এভাবে ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা স্যার সায়্যিদ ও ইংরেজ পোষ্য অন্যান্য খেতাবধারী তাবেদার হিন্দু কিংবা মুসলিম লোকদের দ্বারা ইতোপূর্বে সফল হয়নি, পরবর্তীকালে তাদের অনুগামীদের মাধ্যমে অতি সহজেই সেটি সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল।[২৩৪]

ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা লালিত পালিত হয়। তবে এগুলো জনগণের কোন সমর্থন পায়নি। তাদের তৎপরতা জাঁকজমকপূর্ণ অফিস ও সাইনবোর্ড পর্যন্ত সীমিত ছিল। এদিকে ১৯১৮ সালে খেলাফত আন্দোলন উপলক্ষে পুনরায় হিন্দু-মুসলিমের শক্তিশালী ঐক্য গড়ে উঠলে সরকার আবার বিচলিত হয়ে পড়ে। ইংরেজ তখন বাধ্য হয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হানাহানি মাঠে ময়দানে কার্যকর করা জরুরী বোধ করে।

১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নবাদীরা জাতীয় ঐক্যে বড় ধরনের কোন ফাটল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। বরং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য পাকাপোক্ত হয়। সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথ সভাসমিতি বলপূর্বক দমিয়ে রাখতে চাইলে তাদের পারস্পরিক ঐক্য আরো সুদৃঢ় হতে থাকে। অবশেষে চৌরিচৌরার ঘটনার পর সরকার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা স্বামী

২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩১।

২৩৪. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯-৩৭৪।

শর্দা নন্দকে দিয়ে নতুন চক্রান্তের সূচনা করে। ঐ চক্রান্তের অংশ হিসেবে শর্দা নন্দ মালকানার নবদীক্ষিত মুসলমানদের 'শুদ্ধ' (?) করে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার অভিযান চালায়। একই সময় কংগ্রেসের অপর নেতা ড.মুঞ্জে 'সংগঠন' নামে হিন্দুদের নিজস্ব আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' কংগ্রেস নেতাদের হাতে স্থাপিত হয়েছিল বিধায় গোটা দেশে কংগ্রেস সম্পর্কেও বিভিন্ন রকমের কানাঘুষা ও আপত্তি উঠে। ঐ সময় আলীগড়ে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন'-এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী স্যার মিয়াঁ ফযলে হুসাইন তাতে সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে হিন্দু অচ্ছ্যুত শ্রেণীর কাছে ইসলামের মহান দাওয়াত পৌছিয়ে দেওয়া এবং তাবলীগের কাজে সময় দেওয়ার জন্য উপস্থিত লোকজনকে বিশেষভাবে তাগিদ দেন। একান্ত শিক্ষা বিষয়ে আহূত ঐ সভায় ইংরেজ সরকারের একজন মন্ত্রী হটাৎ কেন ইসলাম দরদী হয়ে গেলেন এবং মুসলমানদের একান্ত ধর্মীয় একটি বিষয়কে কেন এতখানি গুরুত্বের সাথে পেশ করছেন সেই ব্যাপারে তখনই 'আখ্‌বারুল বাশীর' পত্রিকা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। এই সন্দেহ অমূলক হয়নি। কেননা কয়েকদিন পরই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তথাকথিত শুদ্ধি ও তাবলীগ নামে কাজ শুরু হলে ভারতবর্ষে এমন এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতা ও বিশৃংখলার উদ্ভব ঘটে, যা দমন করে পরিবেশ শান্ত করার মত কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকেনি।[২৩৫]

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সৃষ্ট ঐক্যবদ্ধ গণজাগরণ থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিত উপলব্ধি করে নিয়েছে যে, ভারতের মাটিতে তাদের কর্তৃত্ব আর বেশী দিন টিকে থাকবে না। এমতাবস্থায় তাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি একান্তভাবে চিন্তা করা হয়। হিন্দু কিংবা মুসলমানের যে কোন দল যদি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন যেন অপর দলকে ব্যবহার করা যায় সেই লক্ষ্যে ইংরেজ ভারতবর্ষকে একাধিক খণ্ডে খণ্ডিত করে দেওয়ার নীল নক্‌শাও গ্রহণ করে।

১৯৩১ সালের বৃটিশ পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়কার রাজনৈতিক সমস্যা ও সমাধান আলোচনা করে যুক্ত প্রদেশের বিচারপতি মি.প্লাউডন তাঁর জনৈক বন্ধুর চিঠির জবাবে লিখেছিলেন, দীর্ঘদিন থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। এখানে আমরা অর্ধ পার্লামেন্টারী সরকার ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখেছি। এ ব্যবস্থা বৃটিশ কর্মকর্তাদের ব্যতিরেকে ফলপ্রসূ নয়। তবে এখানে বৃটিশ কর্মকর্তাদের আর খুব

---

২৩৫. প্রাগুক্ত।

বেশী দিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না। সিভিল সার্ভিসের সকল বিভাগ বর্তমানে ভারতীয়দের দ্বারা যেভাবে পূরণ করতে হচ্ছে তাতে আগামী কয়েক বছর পর ভারতে সন্ধান করেও কোন ইংরেজ কর্মকর্তা খুঁজে পাওয়া দুস্কর হবে। এমতাবস্থায় ভারতের ব্যাপারে আমি একটাই সমাধান মনে করি। তা হল, ভারতকে হিন্দু ভূখণ্ড ও মুসলিম ভূখণ্ড এই ভাগে বিভক্ত করে ফেলা। আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিরোধ নির্মূল করতে ৩৫ বছরের অব্যাহত পার্লামেন্টারী যুদ্ধের পর আমাদের এমন সিদ্ধান্তই নিতে হয়েছিল। হিন্দুরা আমাদেরকে ভারতের সাথে বাণিজ্যিক কাজ-কারবারের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। বর্তমানে কৃষকদের স্বার্থে আমাদের খাজনা মাফ করে দিতে হল। এটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি মাত্র বিকল্প খোলা আছে। তাহল কৌশলে বদনাম ও দুর্গন্ধ ছড়ানোর পথ বন্ধ করে দিয়ে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অনুসারে ভারতকে বিভক্ত করে ফেলা। কাজেই যদি ভারতীয়রা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ না দেয়, তাহলে যেন বোম্বাই বন্দরের স্থলে করাচীকে বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে আমাদের কাজে লাগানো সম্ভব হতে পারে।[২৩৬]

তবে বিপ্লবী আলিমগণের মতে ইংরেজদের ভারত বিভক্তির এই পরিকল্পনা শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই ছিল না। বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথেও এটি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আলিমগণ বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ তথা পশ্চিমা শক্তিগুলো এশিয়ার উপর নিজেদের রাজনৈতিক মোড়লগিরি প্রতিষ্ঠিত রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বিভক্তির চক্রান্ত বাস্তবায়িত হলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভবিষ্যতে কখনো রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হবে না। ফলে পশ্চিমা শক্তিগুলো এশিয়াকে আজীবন গোলাম বানিয়ে রাখার মোক্ষম সুযোগ পাবে। তাছাড়া তুরস্কের মুসলিম খেলাফত বিধ্বস্ত করার পর ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে অবস্থিত উদীয়মান মুসলিম মুজাহিদ শক্তিটিকে তারা নিজেদের জন্য সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ মনে করে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শত শত বছর যাবৎ শক্তিশালী শাসন পরিচালনার বিগত ইতিহাস তাদেরকে এহেন আশংকা পোষণে বাধ্য করেছিল। তাই অংকুরেই সেটি বিনষ্ট করে দেওয়ার লক্ষে দেশবিভক্তির মাধ্যমে মুজাহিদ শক্তিটি কয়েক খণ্ডে খণ্ডিত করে দেওয়া তারা একান্ত আবশ্যক বলে বোধ করে। এই উপলব্ধি ও

---

২৩৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, হায়াতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৬।

চিন্তাধারার কারণেই বিপ্লবী আলিমগণ নিজেদের সকল শ্রম সাধনা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গিত করে দেন।[২৩৭]

তিন

১৯২৩ সাল থেকে সূচিত সাম্প্রদায়িক হানাহানি ভারতীয় সমাজকে প্রচণ্ড ভাবে আহত করে। ইংরেজ সরকার থেকে প্রেরণা ও শক্তি পেয়ে দাঙ্গাবাজ লোকেরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয়। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ১৯২৭ সালে সায়মন কমিশনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ক্রমে সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরে আসে। ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার জন সায়মনের নেতৃত্বে ভারতে এই কমিশন প্রেরিত হয়েছিল। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতে কতখানি কার্যকর হয়েছে তা পর্যালোচনা করে বৃটিশ পার্লামেন্টে রিপোর্ট পেশ করা। বৃটিশ পার্লামেন্টের ৭ সদস্য নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে কোন ভারতীয়কে সদস্য রাখা হয়নি। ফলে ভারতে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিষয়টি ভারতবাসী নিজেদের জন্য জাতীয় অবমাননা বলে মনে করে। তাই ভারতীয় সকল রাজনৈতিক দল এ কমিশন বয়কট করে। ১৯২৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কমিশন বোম্বাই অবতরণ করলে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন ও 'কমিশন ফিরে যাও' স্লোগান হরতালকে আশাতীত সফল করে তোলে।[২৩৮]

বয়কটের ব্যাপারে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও জমইয়তে উলামা সকলে ঐকমত্য হয়ে কাজ করেন। মাওলানা মোঙ্গলরী বলেন, ডিসেম্বর মাসে ডা. মুখতার আহ্‌মদ আনসারীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। অধিবেশনে কংগ্রেসের ভবিষ্যত কর্মসূচী হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন ও বর্তমানে সায়মন কমিশন বয়কট করার প্রস্তাব পাস হয়। অনুরূপভাবে পেশাওয়ারে হযরত আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সভাপতিত্বে জমইয়তে উলামা এবং কলিকাতা অধিবেশনে খেলাফত কমিটি কমিশন বয়কটের প্রস্তাব পাস করেন। এ ব্যাপারে লীগ নেতৃবৃন্দও পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর

---

২৩৭. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৩।
২৩৮. ড. অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭০।

মাসে লীগের অধিবেশন বসে। তাতে স্যার মুহাম্মদ ইয়াকুব সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে লীগ থেকেও সায়মন কমিশন বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৩৯]

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী কমিশন বয়কটের দাবী নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করে জনমত গঠন করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশ আমাদের, সমস্যা আমাদের, জনগণ আমাদের, অথচ আইন রচনা ও আইনের সংস্কার করবে ইংরেজ-এটি কখনো হয় না, হতে পারে না।[২৪০]

মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী গ্রুপ স্যার মুহাম্মদ শফীর নেতৃত্বে ছিল। লীগের এ গ্রুপটি বৃটিশের আনুগত্য কখনই ত্যাগ করেনি। শফী লীগ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সায়মন কমিশনের স্বাগত জানায়। লীগের অপর গ্রুপটি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হলেও সেই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন মি.এম.এ.জিন্নাহ। তাঁরই চেষ্টায় এ গ্রুপ কমিশন বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল।[২৪১]

জিন্নাহ সাহেব উত্তরকালে একপেশে চিন্তাধারা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার করলেও পূর্বকালে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয়দের স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ১৯০৬ থেকে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে রাজনীতি শুরু করেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা এতখানি প্রবল ছিল যে, ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলে লীগের গঠনতন্ত্র সংস্কারপূর্বক লীগকে সংগ্রামশীল পার্টিতে পরিণত করেন। এ কারণে তাঁকে লীগের সরকার অনুগত পূর্ববর্তী নেতাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। ১৯১৫ সালে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলে লীগ ও কংগ্রেসের দূরত্ব হ্রাস করতেও সচেষ্ট হন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়: ঐ চুক্তির ফলে লীগ ও কংগ্রেস একত্রে সভা সমিতি করে এবং তিনি লীগের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসে তাঁর সদস্য পদ বহাল থাকে। জিন্নাহ সাহেব জাতীয়তাবাদী চেতনা পোষণ করতেন বলেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা করে যান। তাঁর সেই প্রচেষ্টা মূল্যায়ন করে গোখেল মন্তব্য করে বলেছিলেন, জিন্নাহর ভিতর সাচ্চা বস্তু আছে। আর আছে তাঁর সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমুক্ত সেই মন মানসিকতা, যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শ্রেষ্ঠ রাজদূত হতে পারেন।[২৪২]

---

২৩৯. মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাকবিল, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৩।

২৪০. ফরীদুন ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২২।

২৪১. প্রাগুক্ত।

২৪২. ড.অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৪।

বস্তুত ১৯২৭-২৮ সালে জিন্নাহ্ সাহেব হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে চেষ্টা করেছিলেন, সেটি বাস্তবিকভাবেও প্রশংসার দাবী রাখে। ঐ আমলে তিনি কেমন ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন তা উপলব্ধির জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৩ সালের মে মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হবে সে দিনই ভারতীয়রা একটি দায়িত্বশীল ডোমিনিয়ন সরকার প্রাপ্ত হবে। ঐ বক্তব্যের পর গান্ধীজী তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছিলেন, আমি মি. জিন্নাহকে সমর্থন করছি। কারণ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অর্থই হল স্বরাজ। ১৯২৫ সালে এসেম্বলীর এক বক্তৃতায় জিন্নাহ সাহেব আরো পরিস্কার ভাবে বলেন, আমি আগেও জাতীয়তাবাদী, পরেও জাতীয়তাবাদী, সবশেষেও জাতীয়তাবাদী। উল্লেখ্য, এ মানসিকতার কারণেই মুসলিম লীগের শফী গ্রুপ সায়মন কমিশন সমর্থন করলেও তিনি কমিশন বয়কটের পক্ষ অবলম্বন করেন।[২৪৩]

ইংরেজ সরকার পূর্ব থেকেই ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের রীতি চালু করার চেষ্টা চালিয়ে আসে।[২৪৪] দেশের সচেতন নেতৃবৃন্দ তাতে সম্মত না হলেও ঐ সকল তাবেদার ব্যক্তি বা দল যারা সরকারের ছত্রছায়ায় ছিল, যাদের মধ্যে ধর্মের পোষাকও বিদ্যমান, তারা পৃথক নির্বাচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যায়। এ উদ্দেশ্য সফলের জন্য তারা সুযোগ মত সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টির কাজেও লিপ্ত থাকে। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব তখন পর্যন্ত 'যৌথ নির্বাচন' পদ্ধতিই সমর্থন করে আসেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ১৯২৮ সাল থেকে ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তিনি ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদ, হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও কংগ্রেস থেকে সরে যেতে থাকেন। তাঁর এ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল 'নেহরু রিপোর্ট'।

১৯২৭ সালের ২০ মার্চ দিল্লীতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের উদ্যোগে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক কনফারেন্স আহূত হয়। রাজনৈতিক বিভিন্ন মতাদর্শের ৩০ জন গণ্যমাণ্য নেতা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন জিন্নাহ সাহেব। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও রাজনৈতিক সমস্যা

২৪৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৩।
২৪৪. ড. বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫-৩৬।

সমাধানের উদ্দেশ্যে এ কনফারেন্স বসে। কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবগুলো 'দিল্লী প্রস্তাব' নামে পরিচিত।[২৪৫] এ প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) আইন সভাগুলো যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হবে তবে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা সংরক্ষিত থাকবে। (২) সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি নতুন প্রদেশে পরিণত করতে হবে। (৩) আরো দু'টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবা অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্তানে সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে। (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। (৫) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য প্রদেশ তথা পাঞ্জাব প্রদেশে ও বঙ্গ প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যেকের নিজ নিজ আবাদী অনুসারে গৃহীত হবে। তাছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব ও আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে হিন্দুদেরকে সে সব সুবিধা দেওয়া হবে যেগুলো মুসলমানরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত হবেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবগুলোর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

ঐ বছর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কংগ্রেস উপরোক্ত দিল্লী প্রস্তাবের স্বতঃস্ফুর্ত মঞ্জুরী দেয়। একই রেজুলেশনে কংগ্রেস আরো প্রস্তাব পাস করে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কোন খসড়া আইন যা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে সেটি বিধান সভায় ততক্ষণ পর্যন্ত উত্থাপিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ সেটি বিধান সভায় উত্থাপনে সম্মত না হন।[২৪৬]

উভয় দলের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গিয়েছিল। মিশ্র নির্বাচনের নীতিও সকলের কাছে গৃহীত হয়েছিল। ফলে বিধান প্রণয়নে সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকটি ছিল সেটি অপসারিত হয়ে যায়। অধিকন্তু কংগ্রেসের সংযোজনী প্রস্তাব গোটা ব্যাপারটিকে আরো সহজ করে তোলে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের কোন বিবাদ কিংবা মতানৈক্য আর অবশিষ্ট থাকার প্রশ্নই উঠে না। পরিস্থিতি যদি এখানেই শেষ হত তাহলে উপমহাদেশের মানচিত্র ভিন্ন রকমের দেখা যেত। উপমহাদেশ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ভূখণ্ডের

২৪৫. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩।
২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪-৬৫।

মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকত। তবে রাজনীতিতে শেষ কথা নেই বলে যে প্রবাদ আছে শেষ পর্যন্ত সেটিই সত্যে পরিণত হয়।

ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড দু'বার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সকল রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারতীয়দের অক্ষমতার প্রতি বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ করতেও দ্বিধা করেননি। ভারত সচিবের চ্যালেঞ্জ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দ সংবিধান রচনার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে এক কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি ১৯২৮ সালে সাংবিধানিক সংস্কারের যে প্রস্তাবনা পেশ করেছিল সেটি 'নেহরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত।[২৪৭] উল্লেখ্য, ঐ রিপোর্টে জিন্নাহ সাহেব পেশকৃত ও কংগ্রেস সভায় অনুমোদিত সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলো সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। রিপোর্টটি কংগ্রেসের অধিবেশনে উত্থাপন করা হলে কংগ্রেস তা অনুমোদন করে। সভায় খেলাফত কমিটির মাওলানা শওকত আলী ও জমইয়তের মাওলানা মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রিপোর্টের উপর জোর আপত্তি পেশ করেন। জওহরলাল নেহরু ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এটিকে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদনের সুপারিশ করেন।[২৪৮]

নেহরু রিপোর্ট কংগ্রেস অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়ার ১ বছর পর চূড়ান্ত মঞ্জুরী লাভের জন্য ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মি.জিন্নাহ ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর অভিপ্রায় ছিল যে, সম্মেলনে কংগ্রেস মি.জিন্নাহ্র দিল্লী প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। উপস্থিত বৈঠকে স্যার তেজ বাহাদুর চোপড়া এ ব্যাপারে সভাসদমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। মি.চোপড়া দিল্লী প্রস্তাবের আলোকে নেহরু রিপোর্ট সংস্কার করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, যদি এ রিপোর্টে দিল্লী প্রস্তাবকে উপেক্ষা করা হয় তা হলে গোটা দেশের উপর হয়ত এমন এক কঠিন আঘাত নেমে আসতে পারে, যে আঘাতের ক্ষত বহু বছরেও শুকাবে না।[২৪৯]

---

২৪৭. ড.অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭০।

২৪৮. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৭।

২৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৮। নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ঘোষণা করেন, We refuse to join Mr. Gandhi, because his movement is not a movement for the complete independence of India. But for making the seventy millions of Indian Musalmans dependents of the Hindu Mahasabha. (**Times of India**, 24 April, 1930, Quoted Sir Reginal

কিন্তু হিন্দু মহাসভা, শিখ নেতৃবৃন্দ ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো তাঁর বক্তব্যের চরম বিরোধিতা করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ থেকেও জিন্নাহ্‌র প্রস্তাবের পক্ষে সহানুভুতি দেখানো হয়নি। সভায় বিভিন্ন পথ ও মতাদর্শের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের কেউ কেউ জিন্নাহ সাহেবকে কটাক্ষ করেও বক্তব্য রাখেন। জনৈক নেতা এ কথাও বলে ফেলেন যে, মি.জিন্নাহ্ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নেই। জিন্নাহ সাহেব এ ঘটনায় দারুণ মর্মাহত হন। তিনি ওয়াক আউট করেন।[২৫০] ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী যিনি জিন্নাহ সাহেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু-জমশেদ নওশেরওয়াঁ বলেন, সভায় জিন্নাহ সাহেব ইংল্যান্ড থেকে আনা উন্নত পোষাকে সজ্জিত হয়ে বক্তৃতার জন্য দাঁড়ালেন এবং দিল্লী প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলো এক এক করে রদ করে দেওয়া হয়। একজন তো বলেই ফেললেন যে, জিন্নাহ সাহেব মুসলমানদের প্রতিনিধি নন। মুসলমানদের পক্ষ হয়ে কথা বলার তাঁর অধিকার নেই। এমন অপমানজনক উক্তি তাঁর মনে ভীষণ আঘাত হানে। তিনি সোজা নিজ হোটেলে চলে যান। পরদিন ট্রেন যোগে কলিকাতা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আমি তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য স্টেশনে পৌছি। তিনি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের দরজা ধরে দাঁড়ানো ছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। তিনি আমার হাত টেনে কাছে নিয়ে বললেন, জমশেদ! আজ থেকে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল।[২৫১]

মহাত্মা গান্ধী অবশ্য ব্যাপারটি তখনই অনুধাবন করেছেন কিন্তু কোন সক্রিয় উদ্যোগ নেননি। তিনি পরে মি.জিন্নাহ্‌র কাছে দুঃখ করে বলেছেন, আমি মুসলমানদের দাবী দাওয়া মঞ্জুর করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু শিখ নেতারা পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে যে, যদি নেহরু রিপোর্টে কোন পরিবর্তন আনা হয় তাহলে আমরা সম্মেলন থেকে ওয়াক আউট করবো।[২৫২]

এ ধরনের ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে। উভয় দলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মতবিরোধ হয়েছে। কখনো কখনো বাক-বিতণ্ডার পর্যায়েও গিয়েছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি, এমন ধারণা এ-ই প্রথম বারের মত স্পষ্ট আকারে ফুটে

Coupland. **The Indian Problem** 1823-1935. Oxford. At the University press, p 111)

২৫০. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩; আবুল আসাদ, **একশ বছরের রাজনীতি** (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪), পৃ ১০১-১০৪।

২৫১. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৭।

২৫২. প্রাগুক্ত।

উঠে। চৌধুরী খালীকুয্যামান নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে লিখেছেন, এ ঘটনার ফলে গোটা ভারতবর্ষের ভাগ্যের উপর সীল মোহর লেগে গিয়েছে। হিন্দু রাজনীতিকরা দৃষ্টিভঙ্গির যেই সংকীর্ণতা প্রদর্শন করেছেন সেটির আর প্রতিবিধান সম্ভব হয়নি।[২৫৩]

কলিকাতা সর্বদলীয় অধিবেশনের ১ বছর পরই ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে জরহরলাল নেহ্রুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সিদ্ধান্তে বলা হয়, 'অদ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল এবং নেহরু রিপোর্ট রহিত করে দিয়ে রাভী নদীর অতল গর্ভে নিক্ষেপ করা হল'। উল্লেখ্য, এই ১ বছর পর কথিত নেহরু রিপোর্ট নিজে নদীগর্ভে বিলীন হলেও ভারত বিভক্তির একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছে।[২৫৪]

[illegible]

রেশমী রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবী আলিমগণ পুনরায় নিজেদের সংগঠিত করার চিন্তা করেন। এ লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে উপমহাদেশের প্রায় ৫০ জন শীর্ষস্থানীয় আলিম দিল্লীতে একত্রিত হন এবং হযরত হযরত শায়খুল হিন্দকে সভাপতি করে 'জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ' গঠন করেন। শায়খুল হিন্দ তখনো মাল্টায় বন্দী ছিলেন বিধায় তাঁর জায়গায় হযরত মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মাওলানা আহমদ সাঈদকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লীর সভাপতিত্বে জমইয়তের ১ম অধিবেশন বসে। প্রায় ৮০ জন শীর্ষস্থানীয় আলিম অধিবেশনে যোগদান করেন।[২৫৫] তখন থেকে এ প্রতিষ্ঠান বিপ্লবী আলিমগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তখন ইংরেজ সরকার বিরোধী প্লাটফরমের ভূমিকায় ছিল বলে বিপ্লবী আলিমগণের অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি নৈতিক সমর্থন

---

২৫৩. প্রাগুক্ত।

২৫৪. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৪-৪৩৫।

২৫৫. আবদুর রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩০।

জ্ঞাপন করেন।[২৫৬] হযরত শায়খুল হিন্দ, হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী, মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা আরো বেগবান করে তোলেন। অনেকে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার নির্বাচিত হন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ একাধিক বার সভাপতির পদও অলংকৃত করেন।

আলিমগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও কংগ্রেসের সাথে তাঁদের বহু বিষয়ে মতানৈক্যও ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে কংগ্রেস মুসলিম ধর্মানুভূতির বিপরীতে কোন সিদ্ধান্ত নিলে আলিমগণ নির্দ্বিধায় তাতে আপত্তি পেশ করে শোধরানোর চেষ্টা করেন। কংগ্রেস সাংবিধানিকভাবে কোন ধর্মের প্রতি আঘাত না করার শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল বলে তাঁদের আপত্তিসমূহ বিবেচনা করতে বাধ্য ছিল। কংগ্রেসের সভায় জমইয়ত সভাপতি মুফ্তী কিফায়েত রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, আমরা প্রথমে মুসলমান তারপরে হিন্দুস্তানী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আমাদের দৃষ্টিতে 'জিহাদ' হিসেবে গণ্য। সেই জিহাদের অংশ হিসেবেই কংগ্রেসের প্রতি আমাদের এই সমর্থন।[২৫৭] শায়খুল ইসলাম থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।

বস্তুতঃ কংগ্রেস ছিল একটি রাজনৈতিক বিরোধী দল মাত্র, যা প্রচলিত নিয়মে ক্ষমতাসীন ইংরেজ সরকারের বিপরীতে রাজনীতি করে। পক্ষান্তরে জমইয়ত ছিল মুজাহিদ আলিমগণের সংগঠন, যেখানে শুধু সরকারের বিরোধিতা করাই নয় বরং সকল কাজে ইসলামী শরীঅত ও জিহাদের নিয়ম-নীতিও মেনে চলতে হত। প্রকৃতিগতভাবে দুই সংগঠনের মধ্যে এহেন ব্যবধান থাকার দরুন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় উভয়ের পথ অভিন্ন হলেও পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকে যায়। কংগ্রেস সরকার বিরোধী পার্টি বটে তবে সরকারের সাথে উঠা বসা বজায় রাখে এবং সুযোগ মত সরকার থেকে রাজনৈতিক

---

২৫৬. প্রতিষ্ঠা কালে কংগ্রেস বিপ্লবী ছিল না। তবে পরবর্তীকালে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে। কংগ্রেস গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রতিষ্ঠাতা মি. হিউম বলেন, সে সময় ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র চলছিল। ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী যেন ঐ সম্ভাব্য বিপ্লবে যোগ না দেয় সে উদ্দেশ্যে তিনি কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা করেন। হিউম কংগ্রেসকে বৃটিশ সরকারের স্বার্থে একটি 'সেফটি বালব' অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতিরোধক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (ড.অতুল চন্দ্র, ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৩)

২৫৭. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৭।

সুবিধাও ভোগ করে।[২৫৮] পক্ষান্তরে জমইয়তে উলামা সরকার থেকে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা তো নয়ই, উঠা বসা করাও হারাম মনে করে।

অন্যান্য পার্টি তথা মুসলিম লীগ, খেলাফত কমিটি ও অল পার্টিজ কনভেনশনের ন্যায় কংগ্রেসও বৃটিশ ভারতের পার্লামেন্টে সদস্যপদ গ্রহণ করত, সরকারের সাথে সলা-পরামর্শে যোগ দিত, মন্ত্রিসভা গঠন করত, লন্ডন ভ্রমণ ও গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করত, ভাইসরয় কিংবা ইংরেজ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভোজানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হত। অথচ এরই বিপরীতে জমইয়তে উলামার নেতৃত্বে ছিলেন ঐ সকল নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ আলিম যাঁরা জীবনের সকল সুখ শান্তি, জাগতিক আরাম-আয়েশ, ঘরবাড়ী, সবকিছু দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন। এই আলিমগণ ইংরেজের সাথে কোন ধরনের সহযোগিতা করা, তাদের নিয়ন্ত্রিত কোন কাউন্সিলের সদস্য হওয়া, তাদের রাজত্বাধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা ইত্যাদিকে শুধু নিষ্ফল প্রয়াস ও সময়ের অপচয়ই নয় বরং অবৈধ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী জ্ঞান করতেন।[২৫৯]

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জমইয়তের জন্ম। তাই ১৯২৩ সালেই জমইয়ত এ দাবীর স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করে। ঐ বছর কোকনাদে জমইয়তের বার্ষিক অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী। তিনি করাচীর জেলে ২ বছরের কারাভোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সম্মেলনে যোগ দেন। ভাষণ শেষে জমইয়তের পক্ষ থেকে তিনি ঘোষণা দেন, বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল, বৃটিশ অপকৌশলসমূহের পূর্ণ শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করা এবং এই মোকাবেলাকে নিজেদের প্রধান উদ্দেশ্য ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। যতদিন পর্যন্ত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত না নিজেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব আর না সাম্রাজ্যবাদকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিব।[২৬০]

---

২৫৮. কবি আকবর এলাহাবাদী সুন্দর করে বলেছেন :

کام لیدر کا بہت ہے مگر آرام کیساتھ

قوم کے غم میں ڈنر کہاتے ہیں حکام کیساتھ .

২৫৯. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১২।

২৬০. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫।

তখন পর্যন্ত কংগ্রেস ইংরেজ বিরোধী রাজনীতি করলেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করতে পারেনি। কংগ্রেসকে সেন্ট্রাল পরিষদ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করে নিতে আরো ৬ বছর বিলম্ব করতে হয়েছিল।

বিপ্লবী আলিমগণের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ১৯২৫ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত জমইয়তের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, জমইয়ত বৃটিশের কোন প্রকার সহযোগিতায় অংশ নিবে না। জমইয়তের দৃষ্টিতে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করা হারাম। ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ যখন সাম্প্রদায়িক তুমুল হানাহানি উস্কিয়ে দেয়, বিপ্লবী উলামা তখন সাম্প্রদায়িক ঐক্য ফিরিয়ে আনা এবং জনগণকে আযাদীর মূল চেতনা ও দাবীর দিকে নিয়ে যাওয়ার সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যান। এমনকি এক পর্যায়ে শুধু মুসলমানদের নিয়ে হলেও স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। তাই ১৯২৬ সালে জমইয়তের কলিকাতা অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় ; যেহেতু স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের বৈরী কর্মকাণ্ডের দরুন হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে সংগঠিত করে নিজেদেরই বাহুবলে আযাদীর চেষ্টা করে যাবে। তবে অমুসলিমদের যারা এ ব্যাপারে একমত হবে তাদের সাথে কর্মসূচীর ঐক্য গঠনের সুযোগ থাকবে।[২৬১]

১৯২৭ সালে সায়মন কমিশনকে প্রতিবাদ করতে সকলে পুনরায় মাঠে অবতীর্ণ হলে সাম্প্রদায়িক হানাহানি অনেকটা হ্রাস পায়। ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের পরিবেশ গড়ে উঠে। কমিশনের প্রতিবাদে বিপ্লবী আলিমগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯২৮ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর রিপোর্টে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি বলে জমইয়ত সভাপতি মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ দেহলবী কংগ্রেসের সভায় জোর আপত্তি উত্থাপন করেন। ঐ বছর বৃটিশ সার্দা এ্যাক্টের[২৬২] আলোকে

---

২৬১. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৩।

২৬২. ১৯২৫ সালে আজমীরের হরবিলাস সার্দা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন যে, কম বয়স্ক ছেলে মেয়ের বিয়েশাদীর যে অহিতকর রেওয়াজ হিন্দু সমাজে চালু আছে, আইন করে তা বন্ধ করা হোক। তখন মুসলিম সদস্য মিয়াঁ স্যার ফযলে হুসাইন প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং ভারতের সব সম্প্রদায়ের জন্য ঐ আইন কার্যকর করার জন্য পরিষদকে অনুরোধ জানান। তার সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালে উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানের জন্য সেটি

বাল্যবিবাহ বেআইনী ঘোষণা করে। এ আইন হিন্দু মহিলাদের জন্য যথেষ্ট উপকারী ছিল। কারণ হিন্দু ধর্মমতে বিধবার জন্য পুনঃ বিবাহের সুযোগ নেই। ফলে বাল্যকালে বিবাহ হলে কোন কোন সময় স্ত্রী প্রাপ্তবয়সে পৌঁছার পূর্বে স্বামী মারা যায়। আর তখন আজীবন তাকে বৈধব্যের গ্লানি পোহাতে হয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে বাল্যকালে কোন বিবাহ সম্পাদিত হলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মুহূর্তে বর ও কনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে। তাছাড়া স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন আপত্তি নেই। উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ রহিতকরণ আইনের প্রতি কংগ্রেস সমর্থন ব্যক্ত করে অথচ জমইয়তে উলামা এ আইন ইসলামী বিধানের উপর অহেতুক হস্তক্ষেপ হিসেবে প্রতিবাদ জানায় এবং মুসলমানদের জন্য এ আইন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করে।[২৬৩]

উপমহাদেশে স্বাধীনতা ও আযাদীর চেতনা বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে বিপ্লবী আলিমগণ দেশের অপরাপর জাতীয়তাবাদী দলের সমন্বয়ে 'ন্যাশনালিস্ট মুসলিম কনফারেন্স' নামে সম্মিলিত জোট কায়েম করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উদ্যোগে ১৯২৯ সালে দিল্লীতে এ জোটের সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৬৪] জমইয়ত নেতৃবৃন্দই প্রধানতঃ জোটের নেতৃত্ব দেন। জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, শীআ পলিটিক্যাল কনফারেন্স, মজলিসে আহ্‌রার, সীমান্ত গান্ধী গাফ্‌ফার খানের 'খোদায়ী খেদমতগার' ঐ জোটে অংশ গ্রহণ করে। ঐ বছর ৩১ ডিসেম্বর কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস করলে দীর্ঘ ৬ বছর পর কংগ্রেসের দাবী জমইয়তের দীর্ঘদিনের লালিত দাবীর সাথে মিশে যায়। এতে জ'মইয়ত ও কংগ্রেসের মধ্যে সাংগঠনিক সম্প্রীতির পরিবেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। এভাবে রাজনৈতিক প্রধান দাবীর ক্ষেত্রে উভয়ের ঐক্য সৃষ্টি হওয়ায় সংগঠনদ্বয়ের যুক্ত কর্মসূচী শুরু হয়। নতুবা ইতোপূর্বে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেয়ে বিরোধের বিষয়ই বেশী ছিল।[২৬৫]

এ্যাক্টে পরিণত হয়। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭)

২৬৩. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৩।

২৬৪. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলানা আবুল কালাম আযাদ (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ বা.) ,পৃ ১৫২।

২৬৫. আসরারুল হক কাসিমী, আযাদী কি লড়াই মেঁ উলামা কা ইমতিয়াযী রোল (নয়াদিল্লী : প্রকাশনা বিভাগ, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, তা. বি.), পৃ ১৫।

জাতীয় কংগ্রেসের সেন্ট্রাল পরিষদে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হলে জমইয়তের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে স্বাগত জানানো হয়। ১৯৩০ সালের মে মাসে আমরূহায় জমইয়তের বার্ষিক অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন হযরত শায়খুল ইসলাম। এই অধিবেশনে বিশিষ্ট আলিম হযরত মাওলানা হিফযুর রহমানের প্রস্তাব ক্রমে জমইয়ত সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এবং প্রস্তাব পাস করে যে, জমইয়তের নেতৃত্বে মুসলমানগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে একজোটে কাজ করবে। তখন জমইয়তের মূল সভাপতি যদিও ছিলেন মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে হযরত শায়খুল ইসলামকে প্রধান প্রাণশক্তি মনে করা হত বিধায় তাঁরই সভাপতিত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[২৬৬]

কর্মসূচীর ঐক্য স্থাপিত হওয়ায় ঐ বছরই জমইয়ত ও কংগ্রেসের যৌথ আহবানে ইংরেজের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বিপ্লবী আলিমগণ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীসহ মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ডা.মুখতার আহমদ আনসারী প্রমুখ কারারুদ্ধ হন। এ সময় জমইয়তের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অফিস কর্মচারীদের কয়েক মাসের বেতন বাকী পড়ে যায়। সভাপতি মুফ্তী সাহেব জেলে । কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু তখন জমইয়তকে কংগ্রেসের ফান্ড থেকে কিছু অনুদান প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আলিমগণ সেটি গ্রহণে অসম্মতি জানান। নেহরু হযরত মুফ্তী সাহেবকে অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, আযাদীর রণাঙ্গণে আমরা কারো উপর নির্ভর করে অবতীর্ণ হইনি। যদি আমরা নিজেরা নিজেদের সংগঠন চালাতে সক্ষম না হই তাহলে অফিস বন্ধ করে দিব। তবুও কারো অনুদান গ্রহণ করব না।[২৬৭]

১৯৩১ সালে হযরত শায়খুল ইসলাম হজ্জে গমন করেন। পবিত্র মদীনা থেকে শায়খুল হিন্দের সাথে মাল্টার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দীর্ঘ ১৩ বছর পর তিনি মদীনায় সাক্ষাতের জন্য ফিরে যাচ্ছেন। সফরে স্ত্রী পুত্রসহ পরিবারের ৮ সদস্য তাঁর সহযাত্রী ছিল। শায়খুল ইসলামের অগ্রজ মাওলানা সায়্যিদ আহমদ ও অনুজ মাওলানা সায়্যিদ মাহমূদ তখন মদীনা শরীফের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁরা উভয়ে জিদ্দা নৌ বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হজ্জ ও যিয়ারত সমাপনের পর ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে মদীনার পবিত্র ভূখণ্ডে বসবাস গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তিনি উত্তর করেন,

---

২৬৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৯।

২৬৭. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৬।

ভারতবর্ষে মহান আকাবিরের দীর্ঘকালীন শ্রম সাধনার ফসল বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। সেখানে সত্য ও ন্যায়ের কালেমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রূহানী কাজকর্মের জন্য সেখানে শ্রম দেওয়া প্রয়োজন। আজ আমি শারীরিক আরাম-আয়েশকে সামনে রেখে এখানে রয়ে গেলে এবং কষ্ট-ক্লেষ থেকে পলায়নের পথ বেছে নিলে কাল আল্লাহ্র সামনে কিভাবে মুখ দেখাব? তিনি এ জবাব দিয়ে হজ্জ ও যিয়ারতের পর পূর্ণ কাফেলাসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৬৮]

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩২ সালে কংগ্রেস ও জমইয়তের যৌথ নেতৃত্বে পুনরায় আইন আমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করে। কংগ্রেস ও জমইয়ত উভয় সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। উভয়ের কাগজপত্র ও তহবীল বাজেয়াপ্ত করা হয়। জমইয়তে উলামা তখন নিজের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করে দেয়। তদস্থলে একটি 'এ্যাকশন কমিটি' গঠনপূর্বক ধারাবাহিক অধিনায়ক নিযুক্ত করে। তন্মধ্যে ৩য় অধিনায়ক মনোনীত হন হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী। ১ম এবং ২য় অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে হযরত মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ ও হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ। এ সকল অধিনায়কের নাম গোপন রাখা হয়েছিল যেন ইংরেজরা সকলকে একসাথে গ্রেফতারের সুযোগ না পায়। অধিনায়কমণ্ডলী আন্দোলনের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে একজনের পর একজন গ্রেফতার হতে থাকেন। একজন গ্রেফতার হলে পরবর্তী জন আপনা থেকেই নেতৃত্বের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিতেন।[২৬৯]

হযরত মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ ও মাওলানা আহমদ সাঈদ গ্রেফতার হওয়ার পর ৩য় অধিনায়ক শায়খুল ইসলাম নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শুক্রবার জুমুআর পর দিল্লী জামি মসজিদে বক্তব্য দানের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ থেকে রওয়ানা হন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য সম্পর্কে সরকারের আতংক ছিল বিধায় পথিমধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করা জরুরী মনে করে। তিনিও ব্যাপারটি উপলব্ধি করে নিজের বক্তব্য একখানা কাগজে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। মুযাফ্ফরনগর স্টেশন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে তুলে নেওয়ার মুহূর্তে তিনি ঐ কাগজটি দিল্লী জামি মসজিদে তাঁর পক্ষ থেকে পড়ে শোনানোর জন্য মাওলানা আবুল মাহাসিন সাজ্জাদের নিকট

---

২৬৮. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৬।

২৬৯. আসরারুল হক কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭।

পাঠিয়ে দেন। স্বাধীনতার মহান সংগ্রামে করাচী জেল থেকে মুক্তির পর এই তৃতীয়বার তিনি আবার কারারুদ্ধ হলেন।[২৭০]

সমকালীন রাজনীতিকদের ভূমিকা

এক

বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে 'গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট' পাস করে। এ এ্যাক্ট ভারতীয়দের জন্য প্রদেশে ও কেন্দ্রে বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সুযোগ করে দেয়। শাসনকার্যে ভারতীয়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বৃটিশের এটি ছিল সর্বোচ্চ সংস্কার। কেননা কোম্পানীর আমলে প্রশাসনে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত রাখাই হয়নি। বৃটিশ সরকারের আমলে ১৮৬১ সালে মাত্র ১ জন ভারতীয়কে ভাইসরয় কাউন্সিলে উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর ১৮৮৩ সালে বিভিন্ন 'লোকাল বোর্ডে' তাদের অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়। ১৮৮৫ থেকে কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয়দেরকে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার সংগ্রাম চলে এবং কংগ্রেস এ সংগ্রামের দ্বারা দেশীয়দের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়ে নেয়। ১৯৩৪ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে পরবর্তী বছর বৃটিশ ভারতীয়দের জন্য 'বিধানসভা' ও 'মন্ত্রিপরিষদ' গঠনের আইন পাস করে।[২৭১] এ আইনে বর্ণিত মন্ত্রিত্বের সুযোগ প্রাপ্তি রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বস্তুত এ আইনে দু'টি মন্দ দিকও ছিল। এক. বিধান সভার সদস্য নির্বাচন করার পদ্ধতি হিসেবে ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিমের পৃথক নির্বাচন নীতি বহাল রাখা হয়। দুই. গভর্ণর কিংবা ভাইসরয়ের জন্য চূড়ান্ত রায় প্রদানের অধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়, ফলে এ এ্যাক্ট বাহ্যতঃ স্বায়ত্ত শাসনের ঘোষণা হলেও কার্যতঃ এই শাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত দায়িত্বশীল বলার সুযোগ নেই।

জমইয়তে উলামা ও কংগ্রেসের নিকট এ্যাক্ট মনঃপুত হয়নি। তাই উভয় দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অসম্মতি জানায়। গভীর দৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায় যে, এ এ্যাক্ট বস্তুত স্বাধীনতার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে বৃটিশের অপর একটি চক্রান্ত মাত্র। জওহরলাল তাই এটিকে দাসত্বের নতুন অধ্যায় বলে অভিহিত করেন। জিন্নাহ সাহেব এ্যাক্টে বর্ণিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের

---

২৭০. মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, হায়াতে মাওলানা মদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩।

২৭১. ড.অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৮-৪৯৯।

বিধানগুলো সমর্থন করেন, তবে অবশিষ্ট বিধানের নিন্দা করেন। কিন্তু ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করলে লীগও নির্বাচনে যোগ দেয়।[২৭২]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণসংযোগপূর্ণ কোন সংগঠন ছিল না। এটি ছিল কিছু সংখ্যক খেতাবপ্রাপ্ত নওয়াব, জমিদার, তালুকদার ও অভিজাত শ্রেণীর সংগঠন, যা সাধারণ জনগণ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন।[২৭৩] ফলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে সভাপতি জিন্নাহ সাহেব কয়েকটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন এক. লীগের জনবিচ্ছিন্নতা, দুই. মুসলিম সাধারণ ভোটদাতাদের উপর বিপ্লবী উলামা ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের প্রবল প্রতিপত্তি, তিন. সর্বসাধারণ মুসলমানের নিকট স্বয়ং জিন্নাহ সাহেবের পরিচিতিহীনতা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি খুব বিচক্ষণতার সাথে উপরোক্ত সব সমস্যার মোকাবেলা করেন।

নির্বাচন সফল করার লক্ষ্যে ঐ বছর মার্চে দিল্লীতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মিটিং হয়। সেখানে চৌধুরী খালীকুয্যামান, নওয়াব ইসমাঈল খান, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জিন্নাহর পক্ষ থেকে পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল মতীন চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে, আসন্ন নির্বাচনের জন্য মুসলমানদের নতুন কোন পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন না করে লীগের নির্বাচনী বোর্ড থেকেই নির্বাচন করা হোক। চৌধুরী খালীকুয্যামান তাতে আপত্তি করলে তিনি বললেন, জিন্নাহ সাহেব নিজেও স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত করে আনতে ইচ্ছুক। জিন্নাহ্র উপরোক্ত অভিপ্রায়ের কথা বিপ্লবী আলিমগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা ভাবলেন, জিন্নাহ সাহেব নিজে একজন যোগ্য ও দক্ষ রাজনীতিক। কিন্তু তিনি যাদের নিয়ে কাজ করছেন, তাদের অধিকাংশই হল ইংরেজ সমর্থক ও তাবেদার। নির্বাচন উপলক্ষে যদি লীগকে তাবেদারীর চরিত্র থেকে মুক্ত করে জাতি সংগঠক দলে পরিণত করা যায় তাহলে ভারতে মুসলিম রাজনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যাটির সুন্দর সমাধান হয়ে যায়। সে মতে পরদিন জিন্নাহ্সহ বিপ্লবী আলিমগণের মিটিং হয়। মাওলনা শওকত আলী, মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ, মাওলানা আহমদ সাঈদ, মাওলানা ইনায়েত উল্লাহ ফিরিঙ্গীমহল্লী, সায়্যিদ তোফাইল আহমদ মোঙ্গলরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে, সকলে লীগের নির্বাচনী বোর্ড থেকেই নির্বাচন করবেন। তবে বোর্ড গঠনের দায়িত্ব থাকবে জিন্নাহ

---

২৭২. প্রাগুক্ত।

২৭৩. ড.বদিউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭০-৩৭১।

সাহেবের উপর। তিনি বোর্ড এমনভাবে গঠন করবেন যেন তাবেদারী মানসিকতার চেয়ে জাতিসংগঠক দলগুলোর সদস্যরা সংখ্যায় অধিক থাকতে পারেন।

জিন্নাহ সাহেব এ অঙ্গীকারে কোন অন্যথা করেননি। বোর্ডের ৫২ জন সদস্যের মধ্যে তিনি ২০ সদস্য জমইয়তে উলামা থেকেই গ্রহণ করেন। আর অবশিষ্ট সদস্যদেরকে মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সংগঠন থেকে নেন। শায়খুল ইসলাম মাদানী জরুরী কাজে দিল্লীর বাইরে ছিলেন বলে মিটিংয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। এতদসত্ত্বেও জিন্নাহ সাহেব ও অন্যান্য নেতারা ঐক্যের ব্যাপারে শায়খুল ইসলামের সম্মতি অত্যাবশ্যক মনে করেন। ফলে তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনা হল এবং স্থানীয় একটি হোটেলে শায়খুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতার সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হল। জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় শায়খুল ইসলামকে আশ্বস্ত করেন যে, নির্বাচিত হওয়ার পর সকলে মিলে একযোগে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর বর্তমান পার্লামেন্টারী বোর্ড এমনভাবে গঠন করবেন, যেন বিপ্লবের মন-মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। এ আলোচনার পর বিপ্লবী আলিমগণের সকলে লীগের পতাকাতলে একজোট হয়ে কাজ শুরু করেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম দারুল উলূম থেকে ২ মাসের ছুটি নেন এবং রতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে মানুষের কাছে লীগের আহ্বান পৌঁছিয়ে দেন। ঐ য়ে লীগের চেহারা ইংরেজ সমর্থক পুরাতন লীগ বলে দেখা যায়নি। বরং ধীনতার দাবীতে আন্দোলনকারী অন্যতম বিপ্লবী সংগঠন বলে দেখা য়েছিল।[২৭৪]

তখন মুসলিম লীগ নির্বাচনী কমিটি থেকে ঠিক সেই ইশ্‌তিহারই প্রকাশ হয় যেটি কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। এভাবে প্রধান সংগঠনের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, নীতি ও পদ্ধতি বহুলাংশে অভিন্ন হয়ে তাছাড়া ইতোপূর্বে ছোটখাট যে সব ব্যাপারে উভয়ের বিবাদ ছিল সেগুলোও মিটে যায়। বহুদিন পর তখন লীগ ও কংগ্রেস উভয়ের প্লাটফরম থেকে একই উচ্চারিত হয়েছিল হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ, বিপ্লব জিন্দাবাদ, স্বাধীনতা প্রাদ।[২৭৫]

সীর আদরবী, ফরীদুদ্দীন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭-১৪৮।

রিদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৪।

আলিমগণের সাথে লীগের উপরোক্ত সমন্বয়ের ফলে লীগ অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে। কারণ যেই লীগ মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর কতিপয় তাবেদার নওয়াব, রঈস, জায়গীরদার, স্যার ও খান বাহাদুরের মুষ্ঠি বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, যার কার্যক্রম সরকারী বড় বড় রেস্ট হাউজ, হোটেল ও কাচারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল- আলিমগণের সংশ্লিষ্টতার ফলে সেই লীগের পরিচিতি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছে যায়। লীগ নির্বাচন যুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণের ৮০ শতাংশ ভোট কুড়িয়ে আনতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নিজেকে মুসলমানদের অন্যতম রাজনৈতিক দলের মর্যাদায় উপনীত করে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং শায়খুল ইসলাম বলেন, আমরা লীগের পূর্ণ সহযোগিতা করি। আমি নিজে দারুল উলূম থেকে ২ মাসের ছুটি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করি। আমাদের প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এগ্রিকালচারিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য তাবেদার দলগুলোর ব্যাপক পরাজয় ঘটে। প্রায় ৩০-এর অধিক প্রার্থী লীগ থেকে জয়লাভ করেন। এরই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী খালীকুয্যামান আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেন যে, আপনি ৩০ বছরের মৃত মুসলিম লীগকে নতুনভাবে জীবন্ত করে দিয়েছেন।[২৭৬]

কিন্তু নির্বাচন বৈতরণী অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুজাহিদ উলামা ও লীগ নেতাদের মধ্যে ক্রমে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। উভয়ের মধ্যে ইখ্‌লাস তথা দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারীর পার্থক্য সূচিত হয়। বিপ্লবী আলিমগণ যেই স্বাধীনতার আওয়াজ বুলন্দ করার আশায় লীগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন, বিজয়ের পর লীগ নেতাদের কাছে সেই স্বাধীনতার আওয়াজ ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং মন্ত্রিত্ব অর্জনের ব্যাপারটি মূখ্য বিষয়ে পরিণত হয়।[২৭৭]

নির্বাচনে লীগ মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে সমস্ত দেশে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসনের অধিকারী ছিল কংগ্রেস। তাই ভাইসরয় আগে কংগ্রেসকেই সরকার গঠনের আহ্বান জানান। কংগ্রেস তখন মৃদু অভিমান এবং জল্পনা-কল্পনার মধ্যে ছিল। অন্যদিকে লীগের জন্য অপরাপর ছোট ছোট দলগুলো নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনেরও সুযোগ ছিল। এহেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুহূর্তে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি রাজা সলীমপুর লীগের সাংগঠনিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই নিজে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর আসন দখল করে বসেন। এদিকে কংগ্রেসও সরকার গঠনের প্রতি সম্মতি ঘোষণা করে বসে। সরকার

---

২৭৬. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৩৫২।

২৭৭. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯-১৫০।

গঠনকে কেন্দ্র করে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমে তিক্ততার দিকে চলে যায়। জিন্নাহ সাহেব এক চিঠিতে মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছেন যে, আপনি যদি সামান্য মনোযোগী হন, তা হলে পারস্পরিক তিক্ততার নিরসন করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একটি সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। জিন্নাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা। উল্লেখ্য, মহাত্মা গান্ধী তখন যদিও সাময়িকভাবে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তবুও কংগ্রেসের উপর তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। গান্ধী জবাবে লিখেছেন, ঐক্যের ব্যাপারে আমি নিজেও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি নিজকে অক্ষম দেখতে পাচ্ছি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আবশ্যকতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই অটল আছে। কিন্তু বর্তমানে এ ক্ষেত্রে কোন আশাব্যঞ্জক অবস্থা দেখা যাচ্ছে না।[২৭৮]

কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপক বিজয় লাভের দরুন আত্মম্ভরিতায় আক্রান্ত হয়েছিল। তখন কংগ্রেসের ভিতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সাম্প্রদায়িক মেধাগুলো প্রবল হয়ে উঠে। এই আত্মম্ভরিতার প্রথম প্রকাশ ঘটে বোম্বাই প্রদেশে সরকার কংগ্রেসের গঠনকে কেন্দ্র করে।

কংগ্রেস বোম্বাই শাখার সভাপতি মি.নরেমা স্থানীয় নির্বাচনী যুদ্ধে জয়লাভ করেন। স্বাভাবিকভাবে বোম্বাই সরকার গঠনের জন্য তাঁকেই আহ্বান করার কথা ছিল। কিন্তু বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে নরেমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। নরেমা ফার্সী বংশোদ্ভূত ছিলেন। প্যাটেলের একরোখা বিরোধিতার কারণে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। তদস্থলে সরকার গঠনের সুযোগ পেয়ে গেলেন জনৈক হিন্দু বি.জি.খীর। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপরোক্ত পক্ষপাতিত্ব পুনর্বিবেচনার জন্য নরেমা শেষতক মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত পৌঁছেও কোন সুফল পাননি। এ ঘটনার পর নরেমার মত একজন উচ্চপদস্থ নেতা রাজনীতির অঙ্গন থেকেও বিদায় নেন।[২৭৯]

ইউপিতে কংগ্রেস সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে গিয়ে নির্বাচিত সদস্যদের আনুপাতিক নিয়ম রক্ষার প্রয়োজনে লীগ সদস্যদেরকেও মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত রাখতে বাধ্য হয়। কংগ্রেসের সংকীর্ণমনা সদস্যরা এটি পছন্দ করেনি। তাই প্যাটেল প্রস্তাব করেন যে, লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্যদেরকে কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ডে যোগ দিতে হবে। তারপর তাদেরকে মন্ত্রিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। লীগ নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাব নিজেদের জন্য আত্মসম্মানের হানি মনে করলেন। ফলে ইউপি সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে লীগ ও

২৭৮. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৯।
২৭৯. আবুল কালাম আযাদ, **ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম** (দিল্লী : অরিয়েন্ট লংম্যান), পৃ ১৫।

কংগ্রেসের মধ্যে এক নতুন সংঘাত জন্ম নেয়। ব্যাপারটি নিয়ে উভয় দলের একাধিক দেন-দরবার হয়। এক পর্যায়ে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে যে, লীগ থেকে মোট ২ জনকে মন্ত্রিপরিষদে নেওয়া হবে। তন্মধ্যে একজনকে মনোনীত করবে লীগ আর অপরজনকে মনোনীত করবে কংগ্রেস। উল্লেখ্য, সদস্য নেওয়া হবে লীগ থেকে অথচ বাছাই করবে কংগ্রেস এটিও লীগ নেতাদেরকে ভীষণভাবে আহত করে।[২৮০]

নির্বাচনে ইউপিতে মুসলিম লীগ থেকে বিজয়ীদের অন্যতম ছিলেন চৌধুরী খালীকুয্যামান ও নওয়াব ইসমাঈল খান। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁদের উভয়ে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্তির আশাবাদী হওয়া অযৌক্তিক কিছু ছিল না। চৌধুরী খালীকুয্যামান কংগ্রেসের সাথে এ ব্যাপারে সম্মানজনক কোন সমঝোতার পক্ষপাতি ছিলেন।[২৮১] তিনি নিজেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। ইতোপূর্বে প্রায় ২০ বছর তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়েই কাজ করেন। মতিলাল নেহরু ও জওহরলালের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে দেখা গেল কংগ্রেস উপরোক্ত উভয় নেতাকেই উপেক্ষা করে গিয়েছে। তাঁদের বদলে নিজের পছন্দমত অপর দুই সদস্য তথা রফী আহমদ কিদ্ওয়ায়ী ও হাফিয মুহাম্মদ ইব্রাহীমকে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ফলে খালীকুয্যামান ও নওয়াব ইসমাঈল খান মর্মাহত হন। ইউপির এ ঘটনাও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল এমনকি মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত গড়ায় কিন্তু কোন সুফল হয়নি।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, মনোমালিন্যের এ সব ঘটনাকে মি.জিন্নাহ খুব সুন্দরভাবে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগান। তিনি এগুলো ব্যাখ্যা করে লীগকে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ প্রমাণের চেষ্টা চালান। নির্বাচন উপলক্ষে লীগের পুরাতন বহু লোক জিন্নাহ্ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে কংগ্রেস থেকে তিনি যে সকল অপ্রীতিকর আচরণ প্রাপ্ত হন সেগুলোর কারণে তিনি লীগের পুরাতন নেতাদেরকে পুনরায় নিজের দিকে টেনে আনতে সচেষ্ট হন।[২৮২]

---

২৮০. ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশ বিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লি. ১৯৯৩), পৃ ৩৩।

২৮১. প্রাগুক্ত; আবদুর রাকিব, সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২), পৃ ১৪৬-১৪৭।

২৮২. লীগকে উত্তর প্রদেশে ক্ষমতার ভাগ দিতে অস্বীকার করার পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়। সমগ্র ব্যাপারটি মুসলিম বিরোধী প্রচার করে লীগের পক্ষে 'ইসলাম বিপন্ন' ধুয়া তুলে প্রায়

নির্বাচনে জয়লাভের পর কংগ্রেসের এই সংকীর্ণতা ভারতের রাজনীতিকে আবার ঘোলাটে করে দেয়। কংগ্রেস ঐ সময় যদি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার প্রতি সামান্য দৃষ্টি দান করত, তা হলে ভারত বিভক্তির সূত্রই জন্ম নিত না। বস্তুত কংগ্রেস তখন বিজয়গর্বে মাত্‌ওয়ারা হয়ে গিয়েছিল। ফলে নিজের আপনজনদের মনে কষ্ট দিতেও দ্বিধা করেনি। মাওলানা মোঙ্গলরী বলেন, এ ধরনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে 'মজলিসে আহ্‌রার'-এর এক অধিবেশন বসে। এই সংগঠন বরাবরই কংগ্রেস রাজনীতির সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। অধিবেশনে কংগ্রেসের সেক্রেটারী মি.করপ্লানীকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি উত্তরে লিখেছেন, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় আপনাদের অধিবেশনে উপস্থিত হতে অপারগ। তা ছাড়া সুস্থ থাকলেও আমার পক্ষে উপস্থিতির সুযোগ নেই। কারণ 'মজলিসে আহ্‌রার' একটি সাম্প্রদায়িক দল। উল্লেখ্য, করপ্লানীর এ উক্তি থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কংগ্রেস নেতারা তখন বিজয়গর্বে এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, সতীর্থ ও ঘনিষ্ট সঙ্গীদের মনে আঘাত হানতেও দ্বিধা করেনি।[২৮৩]

এ সব আচরণে রুষ্ট হয়ে ইউপির জনপ্রিয় নেতা চৌধুরী খালীকুয্‌যামান ও নওয়াব ইসমাঈল খান কংগ্রেসের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হন। তাঁরা লীগে যোগদান করে নতুন পদক্ষেপের চিন্তা করেন। তাঁরা লীগের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলেন এবং লীগকে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ দল হিসেবে সাংগঠনিকভাবে দাঁড় করানোর কাজে লেগে যান।[২৮৪] লীগের পরিচিতি ইতোপূর্বে আলিমগণ ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছেন। লীগকে নতুন ভাবে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের কাছে একমাত্র সমস্যা ছিল মি.জিন্নাহর অপরিচিতি। জিন্নাহ সাহেব দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু সর্বসাধারণ্যে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল না। তা ছাড়া মুসলিম সাধারণ জনগণের অধিকাংশ ছিল ধর্মভীরু। অথচ জিন্নাহ ছিলেন

সমগ্র দেশে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী জিহাদী ভূমিকা প্রবল করার সুযোগ উপস্থিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও ক্ষমতা না পাওয়ায় উত্তর প্রদেশের আন্দোলন সেখানে সাড়া তোলে। (শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত,পৃ ১৬৭)

২৮৩. মুসলমানোঁ কা রওশন মুস্তাকবিল, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৫।

২৮৪. লীগের অন্যতম নেতা চৌধুরী খালিকুয্‌যমান এ ব্যর্থতাগুলোকে 'বিভক্তির রাজপথ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, লীগ যখন তার দাবী উত্থাপন করেছিল, তখন কংগ্রেস যদি দাবীগুলো মেনে নিত, তা হলে আর কী কার্যকর দাবী আমরা তুলতে পারতাম-তা আমি জানি না। কংগ্রেসের এ অবিজ্ঞ দীর্ঘসূত্রিতা পাকিস্তানের পথ প্রশস্ত করে দেয়। (ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪)

পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর চাল-চলন,পোষাক-পরিচ্ছদ, নীতি-চরিত্র এমন পর্যায়ের ছিল না যে, দেখামাত্রই তাঁকে ধর্মীয় নেতা হিসেবে বরণ করা যায়। আরো সমস্যা ছিল যে, তিনি নিজের এই বেশভূষা পরিবর্তনে রাযীও ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও লীগ নেতারা তাঁকে বিভিন্ন রকমের কসরত করে মুসলিম সর্বসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন।[২৮৫]

জিন্নাহ সাহেব সম্পর্কে লীগের দীর্ঘকালের সেক্রেটারী মতিন চৌধুরী লিখেছেন যে, ছোটবেলায় স্কুলে যে নামে তাঁর রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল সেটি ছিল 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাই'। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি লন্ডন গমন করলে তাঁর কাছে নামটি বিদ্‌ঘুটে বলে মনে হল। তিনি নাম সংশোধন করেন এবং এফিডেভিটের মাধ্যমে নিজের নাম রাখেন এম.এ.জিন্নাহ। এ নামই তাঁর আমৃত্যু বলবৎ থাকে। এফিডেভিটের পর থেকে সকল দলীল ও কাগজপত্রে তিনি নিজেকে এম.এ.জিন্নাহ বলেই লিখতেন, কোথাও 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ' ব্যবহার করেননি।[২৮৬] প্রশ্ন হল, যেই শব্দ দু'টি তিনি সংক্ষেপ করলেন তাতে অসুবিধা কি ছিল? কেন তিনি নিজ নাম থেকে পবিত্র দু'টি শব্দ সংক্ষিপ্ত করতে এতটা কষ্ট করলেন? পাশাপাশি এখানে লীগ নেতাদের একটি ঘটনাও উল্লেখ করা যায়। ঐ সময় একবার জিন্নাহ সাহেব লক্ষ্ণৌ আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে লীগ কার্যালয় থেকে যে পোস্টার প্রচার করা হয় তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল;

'উরূসুল বিলাদে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র শুভাগমন'।[২৮৭]

উল্লেখ্য, উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজে 'মাওলানা মুহাম্মদ আলী' নামটির জনপ্রিয়তা সর্বজন স্বীকৃত। মুসলমান মাত্রই এই নামে নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। পোস্টারের ঐ লেখা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু যথাসময়ে জিন্নাহ সাহেব যখন সম্মেলনে উপস্থিত হন তখন সকলেই তাঁর দিকে অবাক নেত্রে চেয়ে থাকে। কারণ ইনি তো সেই মনীষী নন যার নামে তারা নিজেদেরকে উৎসর্গিত করতে প্রস্তুত ছিল। অধিকন্তু ইনি তো কোন মাওলানাও মনে হয় না। বরং মনে হচ্ছে ইংরেজ কোন সাহেব। ফলে সাধারণ লোকেরা মজলিস থেকে উঠে যায় এবং নানা সমালোচনা করতে থাকে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ লোকজনের সে সব সমালোচনার মুখ বন্ধ করার লক্ষ্যে তড়িঘড়ি জিন্নাহ্‌ সাহেবকে একটি শেরওয়ানী এনে দেয়। জিন্নাহ সাহেব সেটি

২৮৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৬।

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৭।

২৮৭. উর্দু ডাইজেস্ট পত্রিকা, লাহোর, আগস্ট ১৯৮৮, পৃ ১২৩।

গায়ে দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান। তিনি বললেন, আমি যে পোষাকে অভ্যস্ত নই, সেই পোষাক শরীরে জড়িয়ে নিজকে অদ্ভুত বস্তুতে পরিণত করতে ইচ্ছুক নই। মোটকথা জিন্নাহ সাহেবকে জনপ্রিয় ও ভক্তির পাত্র বানানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তারা শুধু 'মাওলানা' শব্দটি বাদ দিয়ে তাঁর নাম কেবল 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ' বলে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। আর এ নামেই তিনি অদ্যাবধি পরিচিত।[২৮৮]

মন্ত্রিত্বের ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেসের সাথে লীগের যেই বিরোধ ঘটেছিল সেটি শেষ পর্যন্ত উভয় দলের রাজনৈতিক মৌলিক আদর্শকেও বিঘ্নিত করে। নির্বাচনে বিপ্লবী আলিমগণের সাহায্য করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল লীগকে বিপ্লবী দলে পরিণত করা। তাঁরা মনে করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের রণক্ষেত্রে কংগ্রেস তো আছেই, যদি লীগকেও সংগ্রামী ও বিপ্লবী দলে পরিণত করা যায় তাহলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন খুব সহজ হয়ে যাবে। লীগ ও কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি এক দণ্ডও টিকতে সক্ষম হবে না। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি বিগড়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, লীগের প্রধান শত্রু তখন আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ নয়; বরং প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াল কংগ্রেস। লীগ প্রতিনিয়ত কংগ্রেসকেই চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছে। আমিলমগণ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করার যেই মহৎ উদ্দেশ্যে লীগের সমর্থন করেছিলেন সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় লীগের প্রতি তাঁদের সমর্থন অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়নি।[২৮৯]

অন্যদিকে নির্বাচনের পরে লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ড ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ১৩ মার্চ লক্ষ্ণৌতে ১ম অধিবেশনে বসেন। অধিবেশনে জিন্নাহ সাহেব ইংরেজ তাবেদার দল এগ্রিক্যালচারিস্ট পার্টি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি থেকে বিজয়ী মুসলিম সদস্যদেরকে নিজ দলে ভিড়ানোর জোর তদবীর শুরু করেন। অথচ নির্বাচনের পূর্বে ঐ সকল সদস্য লীগের টিকেটে নির্বাচন করতে শুধু অসম্মতি প্রকাশই নয়, লীগের বিরুদ্ধাচরণে নিজেদের সম্ভাব্য সকল অস্ত্রও ব্যবহার করেছেন। তাদের অনেকে এমনও ছিলেন যাদের রাজনৈতিক জীবনে বড় বড় কেলেংকারী ছিল। জিন্নাহ সাহেব ঐ সদস্যদের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করলে শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন, আপনি ইতোপূর্বে আমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আপনি স্বার্থপূজারী ও তাবেদার লোকদের লীগ থেকে সরিয়ে দিবেন এবং জাতি সংগঠক ও প্রগতিশীল

২৮৮. প্রাগুক্ত।

২৮৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫২।

লোকজনকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। উত্তরে জিন্নাহ সাহেব বললেন, সেটা তো ছি আমার রাজনৈতিক ওয়াদা।[২৯০]

কংগ্রেসের সাথে লীগের উপরোক্ত মনোমালিন্যের পর লীগের রাজনৈতি পলিসি বদলে যায়। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল কংগ্রেস নতুন আইন প্রয়োগে বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতালের ঘোষণা দেয়। জমইয়তে উলামা হরতালের সম করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাতে লীগ খুবই অসন্তুষ্ট হয়। থেকে তখন ইংরেজ সরকারের পক্ষাবলম্বন করে হরতাল বিরোধী প্রচারণা চালা হয়েছিল।[২৯১]

আলিমগণের সাথে জিন্নাহ্‌র ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং লীগের নীতি পরিব করে নেওয়ার দরুন লীগের প্রতি আলিমগণের সমর্থন অব্যাহত রাখার পরিবেশ বজায় থাকেনি। কাজেই তাঁরা নিজেদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হন এ নিজেদের অঙ্গন থেকেই আযাদীর সংগ্রামে পুনরায় মনোনিবেশ করেন। তাঁ লীগের প্লাটফরম থেকে সরে পড়লে জিন্নাহ্ তাঁদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। তাঁ মধ্যে শায়খুল ইসলাম মাদানীর উপরই ছিল তার ক্ষোভ সবচেয়ে বেশী। শায়খুল ইসলামকে নানা রকম সমালোচনার তীর বিদ্ধ করা হয়। এমনকি তি কংগ্রেস থেকে 'ঘুষ' গ্রহণ করেছেন বলেও অপপ্রচার করা হয়।

এ সব কারণে হযরত শায়খুল ইসলাম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড থে ইস্তফা দেন। তাঁর ইস্তফার কয়েক মাস পর লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপ রাজা সেলিমপুর নিজেও ইস্তফা দেন। বোর্ড সভায় উভয়ের ইস্তফানামা এ সময়ে উত্থাপিত হল। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল দুই রকমের। শায়খুল ইস ঐ সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি র সেলিমপুর লীগের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেন এবং ইংরেজ গভর্ণ যোগসাজসে মন্ত্রিত্ব দখল করে বসেন। উচিত ছিল ওয়াদা ভঙ্গের দায়ে রাজ বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অথচ তা করা হয়নি। বোর্ড সভায় ইস্তফানামা উত্থাপিত হলে সেটি গৃহীত হয়। আর আমার ইস্তফানামা যা ক

---

২৯০. মাদানী, মিস্টার জিন্নাহ কা পুরআসরার মুআম্মা আওর-উসকা হল (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ ৫

২৯১. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭।

মাস পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল সেটি উত্থাপিত হলে গ্রহণ না করে আমাকে বোর্ড থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়।[২৯২]

উপস্থিত সভায় মি.যহীরুদ্দীন ফারূকীসহ লীগের কয়েকজন উচচপদস্থ নেতা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, জমইয়ত নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর কাছে লীগ বিশেষভাবে ঋণি। কেননা তাঁদেরই ত্যাগ তিতিক্ষার কারণে লীগের পরিচিতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পৌছেছে। তাঁদেরই পরিশ্রমে লীগ কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁদের সাথে আমাদের আচরণ মার্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব কারো কথায় কর্ণপাত করেননি।[২৯৩]

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে পাটনায় লীগের ৩৬ তম বার্ষিক অধিবেশন বসে। জিন্নাহ সাহেব তাতে সভাপতিত্ব করেন। ভাষণে তিনি কংগ্রেসের প্রচণ্ড সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান মুসলমানদেরকে নিজেদের গোলাম বানাতে চায়। এ অজুহাত ব্যক্ত করে তিনি বৃটিশ গভর্ণরবৃন্দের কাছে দাবী পেশ করেন যে, কংগ্রেস বিভিন্ন সুবায় মুসলমানদের উপর যে সকল জুলুম ও নির্যাতন চালাচ্ছে সেগুলো তদন্তের জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠন করা হোক।[২৯৪] তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তিগুলো ছিল খুবই দুর্বল। ফলে গভর্ণরবৃন্দ তাতে কোন কর্ণপাত করেননি। কোন কোন গভর্ণর জবাবে লিখেছেন যে, আমার সুবায় মুসলিম নির্যাতনের কোন ঘটনা নেই।[২৯৫] এতদসত্ত্বেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগের প্রপাগান্ডা অব্যাহত থাকে। ইত্যবসরে ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেসের মতানৈক্য ঘটে। ইংরেজ সরকারের প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করলে মি.জিন্নাহর নির্দেশে লীগ বিভিন্ন শহরে উল্লাসমত্ত হয়ে 'নাজাত দিবস' পালন করে।

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মন্ত্রিত্বের এই লড়াইয়ের পরিণামে লীগের গণসংযোগ তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তবে সংগ্রামী আলিমগণের সাথে লীগের সম্পর্ক দারুনভাবে ক্ষুন্ন হয়।

---

২৯২. মাদনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

২৯৩. প্রাগুক্ত।

২৯৪. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৯।

২৯৫. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭।

[illegible]

লীগ ও কংগ্রেসের মনোমালিন্য ঘটে যাওয়ার পর লীগ নেতারা জমইয়তে উলামার কঠোর সমালোচনায় লিপ্ত হয়। জমইয়তের কাজকর্ম প্রধানতঃ হযরত শায়খুল ইসলামের নির্দেশে পরিচালিত ছিল বিধায় তিনি সমালোচনার মূল টার্গেটে পরিণত হন। জিন্নাহ সাহেব নিজে সমালোচনার সূত্রপাত ঘটান। হযরত শায়খুল ইসলামকে তারা আধুনিক রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, কংগ্রেসের সেবাদাস ইত্যাদি বলে শরবিদ্ধ করে। ঐ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ইংরেজের খেতাবপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইক্‌বাল শায়খুল ইসলামকে বিদ্রূপ করে এক কবিতা প্রকাশ করেন। সেই কবিতা ঘৃতে অগ্নির সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে ইকবাল তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও বিদ্রূপের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ক্ষতি সাধিত হয়ে গিয়েছে সেটি আর পূরণ সম্ভব হয়নি।[২৯৬]

আল্লামা ইকবালের মধ্যে দ্বিমুখী চরিত্রের মিশ্রণ ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কবি, দার্শনিক ও ব্যারিস্টার। তাঁর চিন্তা-চেতনায় মানবতার প্রতি ভালবাসা, দেশপ্রেম ও ইসলামের প্রতি দরদ কোন কিছুর অভাব ছিল না। কবিতার দ্বারা তিনি অবিভক্ত জাতীয়তাবাদের যে পয়গাম রেখে গিয়েছেন সেটি আজো ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অথচ তিনিই আবার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তথা শুধু মুসলমানদের জন্য পৃথক জাতীয়তা ও পৃথক ভূখণ্ড রচনার প্রথম প্রস্তাব[২৯৭] দিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন। ইকবাল ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশ দেন। আবার তিনিই ইংরেজ লর্ডদের কাছ থেকে সানন্দে 'স্যার' খেতাব গ্রহণ করে তোষামুদে হওয়ার দীক্ষা পেশ করেছেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি জিন্নাহ্ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাপারে তিনি জিন্নাহ্কে উৎসাহিত করেছেন। জিন্নাহ ভক্তদের তালিকায় তাঁর নাম সর্বশীর্ষে। তিনিই আবার জিন্নাহর প্রধান প্রতিপক্ষ মহাত্মা

---

২৯৬. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, **সীরতে শায়খুল ইসলাম** (দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে দীনিয়্যা ১৯৯৩), পৃ ২৭৯-২৯২।

২৯৭. **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**, প্রাগুক্ত পৃ ১০৯; ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ইকবাল উপমহাদেশীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। এই প্রস্তাবের ২ বছর আগে ১৯২৮ সালে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে পত্রযোগে স্বতন্ত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন (আহমদ সাঈদ, **মাওলানা আশরাফ আলী থানবী আওর তাহরীকে আযাদী**, করাচী, তা.বি. পৃ ২৮)

গান্ধীর গুণকীর্তন করে কবিতা রচনা করেন। ১৯২১ সালে দৈনিক 'জমিদার' পত্রিকায় তাঁর সেই কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল।[২৯৮] ইসলাম ধর্মের অনেক গভীর তত্ত্ব ও রহস্য যেমন তিনি আলোচনা করেছেন তদ্রূপ ভারতীয় সূর্যপূজারী সম্প্রদায়ের সূর্যদেব ও তার মহিমাও তিনি ব্যক্ত করেছেন কবিতার প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে। সেই কবিতা 'বাঙ্গ-ই-দারা' কাব্যগ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি 'জওয়াবে শিক্‌ওয়া' রচনা করে যদিও 'শিক্‌ওয়ার' জওয়াব দিতে চেয়েছেন তবুও বহুরূপিতার অভিযোগ থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়ার সুযোগ নেই।

হযরত শায়খুল ইসলামের প্রতি বিদ্রূপে ইকবাল মাত্র ৩ পংক্তি কবিতা লিখেছেন। এ ৩ পংক্তি কবিতা বিরুদ্ধবাদীদের হাতে ধারাল ছুরির কাজ করে। ঐ ছুরি দ্বারা লীগ নেতারা শায়খুল ইসলামকে দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর যাবত নির্মমভাবে আঘাত হানতে থাকে।

শায়খুল ইসলামের ভাষায় ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ তিনি বলেন, ১৯৩৮ সালের ৮ জানুয়ারি দিল্লী সদ্‌র বাজারে মাওলানা নূরুদ্দীনের সভাপতিত্বে ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে আমি আমন্ত্রিত হই। বক্তব্যে আমি জরুরী কয়েকটি বিষয় আলোচনার পর বহির্দেশীয় রাষ্ট্র ও জাতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললাম যে, বর্তমানে বিশ্বে কাওমিয়্যত (জাতীয়তা) ভূখণ্ডের নিরিখে নিরূপিত হচ্ছে। বংশ কিংবা ধর্মের নিরিখে নয়। পরদিন দিল্লীর দৈনিক আল আমানে আমার ঐ কথা বিকৃত করে ছাপানো হল। সেখানে বলা হল যে, হুসাইন আহমদ বলেছেন, জাতীয়তা ভূখণ্ডের নিরিখে নির্ণীত হয়; ধর্মের নিরিখে নয়। এই ভিত্তির উপরই শুরু হয় আমার উপর নানা আপত্তি ও শোরগোল। আল্ আমান ও অন্যান্য পত্রিকা আমার উপর রীতিমত গালিগালাজ আরম্ভ করে দেয়।[২৯৯]

আল্লামা ইকবাল 'আল আমান' পত্রিকা থেকে সংবাদটি অবহিত হন। পত্রিকার বিকৃত সংবাদ পাঠ করে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ইতোপূর্বেও তিনি একাধিকবার এহেন উত্তেজিত হয়ে কারো কারো সমালোচনা করে পরে লজ্জিত হন

---

২৯৮. মাসিক আর রশীদ, মাদানী ও ইকবাল সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৪। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতা রাম-এর গুণকীর্তনেও ইকবালের কবিতা পাওয়া যায়। তিনি রাম সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز

اہل نظر سمجھتے ہیں اسکو امام ہند

২৯৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪।

এবং ক্ষমা চান। একই প্রমাদ হযরত শায়খুল ইসলামের ব্যাপারেও ঘটে গিয়েছিল। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি মূল ঘটনার সাথে মিলিয়ে কোন প্রকার যাচাই না করে এবং 'কাওম' ও 'মিল্লাত' শব্দদ্বয়ের কোন পার্থক্য চিন্তা না করেই প্রতিবাদ করে বসেন। তারপর আবেগতাড়িত অবস্থায় কঠিন বিদ্রূপাত্মক এক কবিতা রচনা করে শায়খুল ইসলামের দিকে ছুড়ে মারেন। ঐ কবিতাটি ছিল;[৩০০]

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ
زدیوبند حسین أحمد ایں چہ بوالعجبی ست
سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن ست
چہ بے خبر زمقام محمد عربی ست
بمصطفی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی تمام بو لہبی ست

এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত শায়খুল ইসলামের বক্তব্য ছিল 'কাওম' প্রসঙ্গে। তাঁর বক্তব্য 'মিল্লাত' প্রসঙ্গে আদৌ ছিল না। অথচ আল্লামা ইকবাল প্রতিবাদ করেছেন মিল্লাত প্রসঙ্গে, কাওম প্রসঙ্গে নয়। আরবী অভিধান মতে

---

৩০০. কবিতাগুলোর অর্থ হল, অনারব লোকেরা আজো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি দ্বীনের গুঢ় রহস্য। নতুবা দেওবন্দে হুসাইন আহমদের নেতৃত্ব এটি কত আশ্চার্যের কথা। ধর্মব্যাখ্যার মিম্বরে বসে সে বলে যে, জাতীয়তা (মিল্লাত) ভূখণ্ডের নিরিখে হয়। আরবীয় নবী মুহাম্মদ-এর সুউচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি থেকে সে কত দূরে। তুমি আগে নিজেকে মুহাম্মদ মুস্তফা সা.পর্যন্ত পৌছানোর চেষ্টা কর। কারণ সেই পর্যন্ত যদি পৌছতে সক্ষম না হও তাহলে যা শিখেছ তার সবই হবে আবূ লাহাবের কথা। কবিতাগুলোর উৎস হল হাফিয সিরাজী মরহুমের প্রসিদ্ধ কবিতা ;

حسن زبصری بلال از حبش صہیب از روم
زخاک مکہ ابو جہل ایں چہ بوالعجبی ست

এ কবিতায় সিরাজী সাহাবীগণের বিপরীতে আবূ জাহ্লের সমালোচনা করেছিলেন। ইকবাল সেই অনুসরণে মি. জিন্নাহর বিপরীতে হযরত মাদানীর সমালোচনা করলেন ;

'কাওম' ও 'মিল্লাত' দু'টি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ। 'কাওম'-এর অর্থ হল কোন অঞ্চল, ভূখণ্ড কিংবা ভাষাভিত্তিক জনসমষ্টি। এ শব্দের অর্থে প্রচুর ব্যাপকতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে 'মিল্লাত' শব্দে সেই ব্যাপকতা নেই। মিল্লাতের অর্থ হল ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক জনসমষ্টি। শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বিধায় পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় 'কাওম' বলে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্বোধন করা হয়েছে।[৩০১] অথচ 'মিল্লাত' বলে শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইকবাল আবেগের আতিশয্যে শব্দদ্বয়ের ঐ পার্থক্য বিবেচনার সুযোগ পাননি বলেই প্রমাদ ঘটে গিয়েছিল। পরে আবেগ প্রশমিত হলে তিনি ব্যাপারটির সত্যাসত্য উপলব্ধি করেন। কিন্তু যেই তীর একবার তাঁর হাতে থেকে ছুটে গিয়েছে সেটি আর ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি।[৩০২]

সমকালীন অন্যান্য কবিগণ ইকবালের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদে তাঁরাও ইকবালের দিকে বহু বিদ্রূপাত্মক কবিতা ছুড়ে মারেন। জবাবী কবিতার সংখ্যা একশ'রও বেশী। শায়খুল ইসলামের জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী ঐ কবিতাগুলোর একটি সংকলন প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি অনুমতি দেননি।[৩০৩]

জবাবদানকারী কবিগণ বিভিন্ন দিক থেকে আল্লামা ইকবালের ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। কবি 'ইকবাল সুহায়ল' মরহুম ইকবালকে মিথ্যাচারিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। অপর এক কবি তাকে 'স্পষ্ট অপবাদ আরোপকারী' বলে দায়ী করেন। তাছাড়া তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ হওয়া সত্ত্বেও আরবী শব্দ 'কাওম' ও 'মিল্লাত'-এর পার্থক্য স্থির করতে বিলম্ব ঘটেছে তাতে অনেকে বিস্ময়

---

৩০১. আল কুরআন ২ : ৫৪, ৬ : ৮৭, ৭ : ৫৯, ৭ : ৬৫, ১০ : ৮৪, ১১ : ২৮, ১১ : ৩০, ১১ : ৫২, ১১ : ৬৪, ১১ : ৭৮, ১১ : ৮৫, ১১ : ৮৯, ২০ : ৯০, ২৩ : ২৩, ২৯ : ৩৬, ৩৬ : ২০, ৪০ : ৩০।

৩০২. অথচ ইকবালের অপর এক কবিতায় আরো শক্তিশালীভাবে স্বজাতিত্বের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا

ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا

৩০৩. শায়খুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে নববী আদর্শের অনুসরণ করেন। প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন,

((صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ)) رواه البخاري

প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে রূঢ় বাক্যে ইকবালের সমালোচনা করেছেন কবি সায়্যিদ আযীয আহমদ। তিনি ইকবালের ৩ পংক্তি বিদ্রূপের জবাবে মাত্র ১ পংক্তি কবিতা রচনা করেছেন, যা গুণগত বিচারে ৩ পংক্তির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। কবি সায়্যিদ আযীযের সেই কবিতাটি ছিল ;

خموش شاعر گستاخ قدر خویش بشناس

زحد خویش گذشتن کمال بے ادبی ست

আযীয আহমদেও কবিতা মাদানী ভক্তদেও কাছে ব্যাপক সমাদও লাভ কওে। বিদ্রূপের এই ঘঁনার ৩ মাস পরই ইশবাল মারা যান। হযরত শায়খুল ইসলাম তখন মীরাঠে ইস্‌লাহুল মুসলিমীনের এক ধর্মীয় সভায় বক্তব্যরত ছিলেন। ইশবালের মৃত্যু সংবাদে তিনি ইন্নালিল্লাহ----পড়েন। সভা শেষে তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলকে নিয়ে হাত তুলে দুআ করেন।[৩০৪]

মৃত্যুর পূর্বে ইকবাল হযরত শায়খুল ইসলামের কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন বলে লোক মুখে প্রচলিত আছে। তবে যেহেতু বিদ্রূপের ঐ কবিতাগুলো ইকবাল ভক্তরা 'বাঙ্গে দারা' সংকলনে অবশিষ্ট রেখেছেন, সেহেতু লোকমুখের উপরোক্ত তথ্য পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। মৃত্যুর পূর্বে ইকবাল লাহোরের দৈনিক ইহ্‌সান পত্রিকায় এক বিবৃতি পাঠান। ২৮ মার্চ সেই বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে বড় অক্ষরে দু'টি শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ;

'আমি মুসলমানদেরকে ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তা গ্রহণের পরামর্শ দেইনি'----মাদানী

'উপরোক্ত স্বীকারোক্তির পর তাঁর উপর আমার কোন অভিযোগ নেই'----ইকবাল

এ বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে আল্লামা ইকবাল নিজের ভুল সংশোধন করে নিয়েছেন। কাজেই এই সংশোধনীর কারণে বাঙ্গে দারা থেকে কবিতাটি প্রত্যাহার করা উচিত ছিল। কিন্তু কবিতার সংকলনকারী ভক্তরা মরহুম কবির প্রতি সেই সদাচার ও দয়া প্রদর্শন করেনি![৩০৫]

---

৩০৪. কবি আযীয আহমদের কবিতাটির অর্থ: চুপ কর, হে বেয়াদব কবি, নিজে কি সেটি বুঝতে চেষ্টা কর। নিজের সীমানার বাইরে পা বাড়ানো চরম ধৃষ্টতা। ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, হায়াত ওয়া কারনামে (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা.বি), পৃ ২৫২।

৩০৫. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪০।

তিন

১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব, ক্ষমতা লাভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে, তার অশুভ পরিণাম দু'দলের সাংঘর্ষিক ভূমিকা গ্রহণের মধ্যেই শেষ হয়নি। এটি ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব উসকিয়ে দেয়, দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্তির পথ সুগমের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের দীর্ঘ দিনের লালিত ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করে। মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক ভূখণ্ডের প্রস্তাব ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনের অনুমোদন করলেও[৩০৬] এ প্রস্তাবের অনুকূলে লীগের তাবেদার নেতারা চেষ্টা তদবীর চালিয়ে আসেন অনেক পূর্ব থেকে। উল্লেখ্য, দেশীয় রাজনীতিকদের মধ্যে পারস্পরিক এ ধরনের সংঘাত রচনার লক্ষ্যেই বৃটিশ ১৯০৯ সালে ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের নীতি চালু করেছিল।[৩০৭]

লাহোর অধিবেশনের ১০ বছর পূর্বে ১৯৩০ সালে স্যার ইকবাল লীগের ২৩ তম অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক ভূখণ্ড স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন। এরই ৩ বছর পর কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী প্রস্তাবিত ঐ ভূখণ্ডের নাম 'পাকিস্তান' বলে এক প্রচারণা চালান।[৩০৮] তখন পর্যন্ত বিভক্তি প্রস্তাবের প্রতি মি.জিন্নাহর কোন মনোযোগ ছিল না। বরং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা মনে করে তিনিও এটিকে নিজ চিন্তাভাবনার বাইরে রাখেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালে নওয়াবযাদা লিয়াকত আলী খানের বিশেষ তৎপরতায় জিন্নাহ লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে এলে তাঁর চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়।

জিন্নাহ সাহেব প্রথম জীবনে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী হিসেবেই রাজনীতি করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পয়গাম প্রচার ও কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সর্বতোভাবে মহাত্মা গান্ধীর হাতে চলে গেলে জিন্নাহর টনক নড়ে। কংগ্রেসের ভিতর তিনি নিজ ভবিষ্যতের কোন সুফল দেখতে না পেয়ে লন্ডন চলে যান এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩৩ সালে লিয়াকত আলী খান ২য় বিবাহ করে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে লন্ডনে হানিমুন করতে গেলে জিন্নাহ্‌র সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি জিন্নাহকে

---

৩০৬. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, মুসলমানোঁ কা রওশন মুস্তাকবিল, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬০-৪৬১।
৩০৭. ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।
৩০৮. চৌধুরী খালীকুযযামান, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০২।

ভারত ফিরে আসার বিশেষ অনুরোধ জানান। সে মতে ১৯৩৪ সালে জিন্নাহ ফিরে এলে তাঁকে মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি মনোনীত করা হয়। তখন থেকে জিন্নাহর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়।[৩০৯] তিনি লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে বৃটিশ 'ভারত সরকার আইন' পাস করলে তাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও সংঘাতের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। জিন্নাহ ঐ আইনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন। ১৯৩৬ সালে মন্ত্রিপরিষদ গঠনে কংগ্রেসের সহিত লীগের যে মনোমালিন্য ঘটে সেটি তাঁর সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। ১৯৩৭ সালে লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধ চরমে পৌছলে মহাত্মা গান্ধী দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার উদ্যোগ নেন এবং জিন্নাহকে ওয়ার্দা আগমনের আমন্ত্রণ জানান। জিন্নাহ তাতে অস্বীকৃতি জানালে গান্ধী নিজেই মাওলানা আযাদসহ তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। উত্তরে জিন্নাহ বললেন, আমি শুধু আপনার সাথেই মিলিত হতে পারি। গান্ধীর এহেন উদার নীতি জিন্নাহর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে দেয়। ফলে এক চিঠিতে তিনি গান্ধীকে লিখেন, এখন স্পষ্ট যে, আপনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দায়িত্বশীল সংগঠন। অন্যদিকে আপনি সমগ্র দেশের হিন্দু ও কংগ্রেসের প্রতিনিধি। আগামীতে আমরা আলোচনায় মিলিত হলে এ ভিত্তির নিরিখেই মিলিত হব।[৩১০]

এদিকে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষশক্তি হিসেবে কাজ করে বিধায় বিপ্লবী আলিমগণের জন্য কংগ্রেস ছাড়া অন্যকে সতীর্থ মনে করার সুযোগ নেই। তাই তাঁরা কংগ্রেসের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিষয়টি জিন্নাহকে ভীষণ পীড়া দিত। তাই মাওলানা আযাদকে লেখা এক চিঠিতে তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আযাদকে কংগ্রেস ত্যাগের পরামর্শ দেন। রাজ মোহন গান্ধী বলেন, ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ এক চিঠিতে কংগ্রেসের কাছে দাবী জানান যে, কংগ্রেস যেন সেন্ট্রাল কমিটিতে কোন মুসলমানকে মনোনীত না করে। তদুত্তরে কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু লিখেছেন, কংগ্রেস নিজের দীর্ঘকালের বিশ্বাস (অসাম্প্রদায়িকতা ও পরমত সহিষ্ণুতা) থেকে বিচ্যুত হবে না এবং নিজের স্বতীর্থ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে ত্যাগ করতেও সম্মত নয়।[৩১১]

---

৩০৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৯।

৩১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬১।

৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬২।

কংগ্রেস ১৯৩৬ সালের নির্বাচন বিজয়ের পর ইউপি-এর মন্ত্রিপরিষদে চৌধুরী খালীকুয্যামান ও নওয়াব ইসমাঈল খানকে অন্তর্ভুক্ত না করে যে ভুল করেছিল তার মাশুল আদায় করতে হয়েছে অনেক চড়ামূল্যে। মাওলানা আযাদ পূর্বাহ্নেই এ ভুলের মন্দ পরিণতির কথা চিন্তা করে সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সংকীর্ণমনা নেতার বিরোধিতার কারণে তিনি সফলকাম হননি। এ বঞ্চনা চৌধুরীর মনোপীড়ার কারণ হয়। তিনি কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকায় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীর পক্ষকে সুদৃঢ় করে দেন। ১৯৩৮ সালে শুরু হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ। এই বৈরী মনোভাবের দরুনই ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুমোদন করে। লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সব সুবায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা। প্রস্তাবের সমর্থনে জিন্নাহ আরো বলেন, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা শুধু সাম্প্রদায়িক নয়, এ সমস্যা বিশ্বজনীন। এর সমাধানের একমাত্র উপায় হল ভারতকে স্বশাসিত জাতীয় রাজ্যে বিভক্ত করা।[৩১২] উল্লেখ্য, লাহোর অধিবেশনে গৃহীত বিভক্তির প্রস্তাব উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও বৃটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবে ইন্ধন যোগায়। তারপর থেকে জিন্নাহ বারংবার ঘোষণা দিতে থাকেন যে, ভারত সমস্যার একমাত্র সমাধান হল ভারতের বিভক্তি।[৩১৩]

'ভারত সরকার আইন' পাস হওয়ার পর জিন্নাহ প্রচার করতে থাকেন যে, হিন্দু ও মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি। তাঁর এ অযৌক্তিক দাবীর অনিবার্য পরিণামে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুরাও দাবী উত্থাপন করে বসে যে, ভারতীয় বলতে একমাত্র হিন্দুদেরই বোঝাবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা মুসলিমরা হল বিদেশী।[৩১৪] জিন্নাহর দ্বিজাতি দর্শন হক্কানী আলিমগণের কাছেও স্বীকৃতি পায়নি। বরঞ্চ বিপ্লবী আলিমগণ শত শত বছর যাবত স্বাধীনতার লড়াইয়ে যেই অসাম্প্রদায়িকতার নীতি অবলম্বন করে আসছিলেন জিন্নাহ ঘোষিত দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল সেই চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ

---

৩১২. বস্তুত লাহোর প্রস্তাব যখন উত্থাপন করা হয়, তখন জিন্নার কাছে পাকিস্তানের বা দেশবিভক্তির কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মাদ্রাজের রাজ্যপালের সাথে এক সাক্ষাতকারে জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা উচিত। ক. দ্রাবিড়স্থান খ. হিন্দুস্থান, (বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশ) গ. বেঙ্গলীস্থান (বাংলা ও আসাম) এবং ঘ. পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩)।

৩১৩. ড.অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৫।

৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৩।

বিপরীত।[৩১৫] ভারতে জাতিসত্তার মূল নিয়ামক নিরূপণে নেতৃবৃন্দের এহেন মতানৈক্য ভারতবাসীর ভয়ানক বিভেদ ডেকে আনে। পরিণামে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়ে।

চার

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেস বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এটি 'কুইট ইন্ডিয়া' বা আগস্ট আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য এবং ইউনাইটেড নেশনস-এর সাফল্যের জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদ মহাত্মা গান্ধীকে সংগ্রাম পরিচালনার অনুরোধ জানায়। সে মতে গান্ধী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 'কারেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রের ঘোষণা দেন। তাঁর প্রচারিত মন্ত্রে অনতিকালেই স্বাধীনতার আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিক্ষোভ ক্রমে অহিংস আদর্শের সীমানা অতিক্রম করে হিংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দরুন ইংরেজ সরকার গান্ধীকে দায়ী করেন। ৯ আগস্ট মহাত্মা গান্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদসহ বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজী বিখ্যাত একুশ দিনের অনশন শুরু করেন। তাতে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভীষণ অবনতির দিকে চলে গেলে দেশব্যাপী তাঁর মুক্তির দাবী উত্থিত হয়। সরকার মানুষের এ দাবী উপেক্ষা করে যায়।[৩১৬]

---

৩১৫. আসীর আদরবী, হিন্দুস্থান কী জঙ্গে আযাদী মেঁ মুসলমান কা কিরদার (দেওবন্দ : মারকাযে দা'ওয়াতে ইসলাম, ১৯৮১), পৃ ২৫০-২৫১: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই জিন্নাহ কিন্তু ফেরত চলে গেলেন তাঁর প্রথম জীবনের অবস্থানে। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ঘোষণা দিলেন, নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অর্থে কেউ আর হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়, পাঞ্জাবী কিংবা বাঙ্গালী নয়, সবাই পাকিস্তানী। অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে ঐ তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে গেল। গড়ে উঠল একটা জাতি 'পাকিস্তানী জাতি'। কিন্তু যে মুসলমানরা ভারতে রয়ে গেল তারা কি করবে? দ্বিজাতিতত্ত্বে আস্থা রেখে তারা বলবে আমরা পাকিস্তানী, ভারতীয় নই ?' না, জিন্নাহ ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ভারতীয় মুসলমানদের পরামর্শ দিয়ে গেলেন ভারতীয় হয়ে থাকার জন্য। এভাবে গোটা তত্ত্বটাই আসলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল, এপারে এবং ওপারে। (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, দ্বিজাতি তত্ত্বের সত্য মিথ্যা, ঢাকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ ১১)

৩১৬. ড.অতুল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১০।

ঐ সময় মুসলিম লীগসহ হিন্দু মহাসভা, ডেমোক্রেটিক র‍্যাডিক্যাল দল ও দেশী রাজন্যবর্গের অধিকাংশ আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে। জিন্নাহ সাহেব লীগকে সর্বতোভাবে আগস্ট আন্দোলন থেকে সরে থাকার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতার দরুন অবশেষে আগস্ট আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এ সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অন্যত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। সুভাষ চন্দ্র আগস্ট আন্দোলনের পূর্বেই ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি গোপনে অন্তর্হিত হন। তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবে প্রথমে জার্মান এবং পরে জাপান গমন করে 'আযাদ হিন্দ ফৌয' ও 'আযাদ হিন্দ সরকার গঠন' করেন। তিনি তাঁর ফৌযকে -গান্ধী, আযাদ ও নেহরু এই ৩ বিগ্রেডে বিভক্ত করে 'দিল্লী চল' অভিযানের ঘোষণা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেলে আযাদ হিন্দ বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।[৩১৭]

সুভাষ চন্দ্রের উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও বৃটিশ সরকারের উপলব্ধি ঠিকই ঘটে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বজায় রাখা আর সম্ভবপর নয়। কিছুদিন পর ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি জার্মানীর পতন ঘটলে ইউরোপে ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। তখন পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে জাপানের সহিত মিত্রপক্ষের যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় ভারতের সহিত সমঝোতা করে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের শক্তি বলিষ্ঠ করার জন্য রাশিয়া বৃটেনের উপর চাপ দেয়। এদিকে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের বিরোধী দল 'লেবার পার্টি' ভারতের সহিত কোন একটি মিমাংসায় উপনীত না হওয়ায় রক্ষণশীল দলের সরকারকে প্রচণ্ডভাবে দায়ী করে। এমতাবস্থায় বৃটেনের প্রধামন্ত্রী চার্চিল ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার আশু নিরসনে সচেষ্ট হন।

১৯৪৪-৪৫ সালের ঐ সময়ে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ওয়াভেল। তাঁর সম্মুখে ভারতের সমস্যাগুলো ছিল জটিল। বাংলার ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা তখন পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছিল। ওয়াভেল প্রথমতঃ গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতৃবন্দকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং ভারতের মৌলিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু মি.জিন্নাহ তাঁর পাকিস্তান দাবীতে অনড়। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের সাথে

---

৩১৭. প্রাগুক্ত; পৃ ৫১৫।

জিন্নাহ দু'টি শব্দ যোগ করে ঘোষণা দেন 'ভাগ করে ভারত ছাড়'। ফলে দেশে আবার সূচিত হয় অচল অবস্থা।[৩১৮]

১৯৪৫ সালে ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৬) বৃটিশ মন্ত্রিসভার সাথে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এটি 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে অভিহিত। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার নিরসন করা। পরিকল্পনার ধারাগুলো ছিল যথা, এক. ভারতের নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। দুই. বড়লাটের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলে বর্ণহিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা সমান রাখা হবে। তিন. বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া কাউন্সিলের অপর সকল সদস্য ভারতীয়দের থেকে মনোনীত হবে। চার. যতদিন ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের উপর থাকবে ততদিন সামরিক দপ্তরের কর্তৃত্ব বৃটিশের হাতেই ন্যস্ত থাকবে।[৩১৯]

উপরোক্ত পরিকল্পনার আলোকে ঐ বছর জুনে ওয়াভেলের আমন্ত্রণে সিমলায় সর্বদলীয় অধিবেশন বসে। অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পরও জিন্নাহ ভারত বিভক্তির দাবী ত্যাগে সম্মত হননি। অধিকন্তু লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে চাপ দিতে থাকেন। তাছাড়া কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদে কোন মুসলিম সদস্য মনোনীত না করার দাবীতেও অটল থাকেন। কিন্তু গোড়া থেকেই কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী বহু মুসলমান বিদ্যমান থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। অবশেষে উভয় দলের মধ্যে কোন মিমাংসা না হওয়ায় সিমলা অধিবেশন ব্যর্থ হয়।[৩২০]

বস্তুতঃ ওয়াভেল পরিকল্পনায় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের সবিশেষ সুযোগ ছিল। লীগ নেতৃবৃন্দের অতিশয়তা ও বাড়াবাড়ির দরুন সেই সুযোগ হস্তচ্যূত হয়। তাই মাওলানা আযাদ লিখেছেন, জিন্নাহ সাহেবের অহেতুক বিরোধিতার কারণে অধিবেশন ব্যর্থ না হলে ফলাফল দাঁড়াত যে, ভাইসরয় কাউন্সিলের মোট ১৪ সদস্যের মধ্যে ৭ সদস্যই থাকতেন মুসলমান। অথচ মুসলমান ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫%। ব্যাপারটি যেমন কংগ্রেসের উদারতা বোঝাচ্ছে তেমনি লীগের নির্বুদ্ধিতাও প্রমাণ করছে। লীগ উপরোক্ত

---

৩১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৭।

৩১৯. প্রাগুক্ত।

৩২০. ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭-৬৮।

সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমানদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে নিতে পারত। কিন্তু লীগের বিরোধিতার ফলে মুসলমানগণ অবিভক্ত ভারতের অন্যতম বৃহৎ শক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকার সম্ভাব্য আসন থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে।[৩২১]

মাওলানা আযাদ অধিবেশন ব্যর্থতার জন্য স্বয়ং বৃটিশ সরকারকেও দায়ী করেছেন। তাঁর মতে সরকার যদি ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদানে পরিচ্ছন্ন মনোভাব পোষণ করত, তা হলে লীগের অযৌক্তিক শর্তারোপকে আরো চিন্তভাবনায় রেখে একটি সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌছতে পারত। কিন্তু সরকার সেটি করেনি বরং লীগের বিরোধিতা দেখে পুনরায় অচল অবস্থার ঘোষণা দিয়ে সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।[৩২২]

মাওলানা আযাদের মতে লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক সংগঠন হওয়ার দাবীও অবাস্তব ছিল। কেননা, ইতোপূর্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়েছে যে, যে সকল সুবায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানেও লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম হয়নি। যেমন মুসলিম প্রধান সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে কংগ্রেস। বাংলায় সরাসরি গভর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি সরকার গঠন করে। সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন করেন স্যার গোলাম হুসাইন। আসামের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। এমতাবস্থায় তাঁর মতে লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক সংগঠন বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।[৩২৩]

মোটকথা লীগের এ আচরণে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নিজের সর্বশেষ চক্রান্ত কার্যকর করার সুযোগ পেয়ে যায় এবং ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। নির্বাচনে লীগ নিজকে মুসলমানদের একক সংগঠন প্রমাণ ও ভারত বিভক্তি পূর্বক পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ময়দানে নামে।

---

৩২১. ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫।
৩২২. প্রাগুক্ত।
৩২৩. প্রাগুক্ত।

আলিমগণের অগ্রযাত্রা

এক

হযরত শায়খুল হিন্দের ওফাতের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্বভার সর্বতোভাবে শায়খুল ইসলামের উপর অর্পিত হয়। তখন থেকে উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, রূহানিয়্যত ও শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যার সমাধানে তাঁরই অভিমত বিশেষভাবে বিবেচিত হতে থাকে। শায়খুল ইসলাম 'জা-নেশীনে শায়খুল হিন্দ' হিসেবে[৩২৪] সর্বত্র বরিত হলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রচারবিমুখ থাকতে ভালবাসেন। জাতির স্বার্থে কোন ত্যাগ-তিতিক্ষা গ্রহণে তিনি থাকতেন সকলের আগে, আর কোন পদ গ্রহণ বা নেতৃত্ব গ্রহণে থাকতেন সকলের পেছনে।

১৯২০ সালে মুফ্তী আযম কিফায়েত উল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মনোনীত হন। ইতোপূর্বে তিনি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। ১৯৩৮ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুচারু নেতৃত্বে রেশমী রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবী আলিমগণ পুনরায় সংগঠিত হন এবং স্বাধীনতার জিহাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। মুফ্তী সাহেবের ইল্ম ও তাক্ওয়া, গভীর প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিপ্লবী মনোভাব আলিম সমাজে তাঁর নেতৃত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। কিন্তু তিনি একটানা ১৮/২০ বছর দায়িত্ব পালনের পর শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর বয়স তখন পৌঁছে গিয়েছিল ৭০ বছরের কোটায়। ১৯৩৮ সালে তিনি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।[৩২৫]

১৯৩৮-৩৯ সালের সময়গুলো ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে উপমহাদেশের সবচেয়ে নাজুক মুহূর্ত। কারণ তখন ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। বৃটিশ জার্মানীর প্রতিপক্ষ হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারত উপমহাদেশকে যুদ্ধদেশ ঘোষণা করতে এবং ভারতীয়দের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। ঐ সময় কংগ্রেস বৃটিশকে সাহায্য দানের জন্য শর্ত আরোপ করে যে, যুদ্ধশেষে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। পক্ষান্তরে লীগ শর্ত করে যে, যুদ্ধ শেষে কংগ্রেসের নিপীড়ন থেকে মুসলমানদের মুক্তি দিতে হবে। সরকারের কাছে কংগ্রেসের তুলনায় লীগের আরোপিত শর্ত সহজসাধ্য

---

৩২৪. ড.রশীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮।

৩২৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫০।

বিবেচিত হয় বিধায় উভয়ের আঁতাত গড়ে উঠে। পরিশেষে সরকার ভারতীয়দেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিলে প্রতিবাদ হিসেবে ২৩ ডিসেম্বর কংগ্রেসের সকল সদস্য মন্ত্রিসভা থেকে একযোগে পদত্যাগ করে।[৩২৬]

রাজনৈতিক এই নাজুক মুহূর্তে মুফতী আযমের অপারগতা ও ইস্তফার কারণে জমইয়ত নেতৃবৃন্দ নতুন সভাপতি মনোনয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের মতবিনিময় হয়। অবশেষে সকলের সম্মিলিত রায়ে সভাপতির দায়িত্ব হযরত শায়খুল ইসলামের উপর অর্পিত হয়। ১৯৪০ সালের ৭-৯ জুন জমইয়তের বার্ষিক অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি হিসেবেও তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। তখন থেকে শায়খুল ইসলাম জমইয়ত তথা বিপ্লবী আলিমগণের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৩২৭]

জমইয়তের জৌনপুর অধিবেশনে শায়খুল ইসলাম দেশ ও জাতির অবস্থা ও সমস্যাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তাঁর ঐ বক্তব্য ফুলস্কেপ সাইজ কাগজে ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। বক্তব্যে তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ ভারতীয়দের উপর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের জুলুম ও নিপীড়নের করুণ চিত্র তুলে ধরেন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্বাধীনতা জিহাদের আবশ্যকতা প্রমাণ করেন। তিনি চলমান বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশকে কোন প্রকার সাহায্য দান সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অবৈধ বলে উল্লেখ করেন।[৩২৮] এই সম্মেলনে শায়খুল ইসলাম আরো বলেন, কতিপয় অপরিণামদর্শী লোক বলে বেড়ায় যে, যুদ্ধের নাজুক মুহূর্তে বৃটিশকে সৈনিক ও রসদ দিয়ে সাহায্য করা উচিত। এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হল, সাহায্য দানের দ্বারা বস্তুতঃ বৃটিশের অপকার বৈ-উপকার কিছুই হবে না। বরঞ্চ তাদেরকে ও তাদের সরকারকে জাহান্নামের আরো গভীরে নিক্ষিপ্ত করা হবে। বৃটিশকে সাহায্য করার বৈধ পন্থা একটিই আছে। সেটি হল তাকে তার নিপীড়নমূলক গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত করা। খোদা না করুন, বর্তমানে যদি বৃটিশকে সৈন্য, রসদ কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহের দ্বারা সাহায্য করা হয়, তাহলে এই সাহায্যকারীরা ইংরেজদের কৃত যাবতীয় অপরাধ, পাপ, জুলুম ও নিপীড়নের অংশীদার ও সহযোগী বিবেচিত হবে। ইংরেজ মহান আল্লাহ্‌র মাখলূকের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, এমন উৎপীড়নকারী ও উৎপীড়নে

---

৩২৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহিদানা কারনামে (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৪৮), ২য় খণ্ড, পৃ ৭৮-৭৯।

৩২৭. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯২।

৩২৮. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৭-৫১৮।

সাহায্যকারীরা সকলে আল্লাহ্‌র শক্ত গযবে নিপতিত হবে। তারা আল্লাহ্‌র কঠিন পাকড়াওয়ে আবদ্ধ হবে।[৩২৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত শায়খুল ইসলাম এমন সময়ে উপরোক্ত সাহসী বক্তব্য রাখেন যখন জার্মানীর হিটলার চোখ বন্ধ করে বৃটিশ ও মিত্র শক্তির উপর গোলা বর্ষণ করে সব মিস্‌মার করে যাচ্ছিল। জীবন রক্ষার তাগিদে তখন বৃটিশও ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় যে, যুদ্ধে যারা বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা যেন জীবনের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নেয়। সেই কঠিন সময়েও শায়খুল ইসলাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী ঃ

((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

এর সাহসী ভূমিকা রাখতে দ্বিধা করেননি। জমইয়তের ঐ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, আলিমগণ সব সময়ই উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিজেদের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করে আসছেন। জমইয়তের দৃষ্টিতে এই স্বাধীনতা মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ন্যায্য অধিকার। এ অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধক যে কোন জিনিসই জমইয়ত গ্রহণের অযোগ্য মনে করে। জমইয়তে উলামার কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্তমান বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য দানের বৈধ কোন দিক আছে বলে মনে করে না।[৩৩০]

[illegible]

বৃটিশ বিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রমের দরুন ১৯৪২ সালে হযরত শায়খুল ইসলাম পুনরায় কারারুদ্ধ হন। জিহাদ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে এটি তাঁর ৪র্থ বারের কারাবরণ। এই যাত্রায় তাঁকে এলাহাবাদ জেলখানায় ২ বছর ২ মাস বন্দী থাকতে হয়।[৩৩১]

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করে। শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশকে কোন ধরনের সাহায্য প্রদান না করার জোর প্রচারণা চালান। জমইয়তে উলামা ওয়ার্কিং কমিটির

---

৩২৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৭-১৬৮।

৩৩০. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, প্রাগুক্ত।

৩৩১. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৯।

দিল্লী অধিবেশনে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করা হয়। এদিকে বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সাফল্য লাভ করে। জাপান বৃটিশের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলো হস্তগত করে যথারীতি ভারত সীমান্তে এসে পৌছে। এমতাবস্থায় ভারতের সহযোগিতা ব্যতিরেকে জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করা বৃটিশের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। ফলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান। ক্রীপস্ ১১ মার্চ ভারতে পৌছেন। তিনি ১ সপ্তাহ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার পর একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় কংগ্রেস ও জমইয়ত ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৩২]

ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হলে লীগ নেতৃবৃন্দ দুশ্চিন্তায় পড়েন। তাঁরা চলমান পরিস্থিতির নিরিখে প্রয়োজনীয় মতামত দিয়ে বৃটিশকে আশ্বস্ত করা ও সাহায্য দেওয়ার সকল দায়িত্ব মি.জিন্নাহর উপর অর্পণ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ও জমইয়তে উলামা অসহযোগিতার কর্মসূচী আরো বেগবান করেন। ২২ মার্চ হযরত শায়খুল ইসলামের সভাপতিত্বে জমইয়তের বার্ষিক অধিবেশন বসে লাহোরে। উল্লেখ্য, এই লাহোর ছিল লীগ সমর্থকদের প্রধান ঘাঁটি। এখান থেকেই আল্লামা ইক্‌বাল ভারত বিভক্তির প্রথম প্রস্তাব করেন। তার পর এখানেই জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তান প্রস্তাবের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ সব কারণে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য জমইয়তের ঐ অধিবেশন ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ। লীগের প্রপাগান্ডাকারীরা জমইয়তের নামে নানা রকমের বিদ্রূপাত্মক বাক্য লিখে বিভিন্ন পোস্টার টানিয়ে পরিবেশ নোংরা করে রাখে। এতদসত্ত্বেও যথাসময়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ অধিবেশন সফল করেন। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ লিখেছেন, সভাপতির ভাষণ শুরু হতেই প্যান্ডেলের প্রান্তদেশ থেকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান শুরু হলে গোটা সম্মেলন পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বক্তব্য চালিয়ে যান। কয়েক মিনিট পর দুষ্কৃতিকারীরা আপনা থেকেই নিরব হয়ে যায়।[৩৩৩]

অধিবেশনে হযরত শায়খুল ইসলাম সমকালীন পরিস্থিতির উপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সার্বজনীনতা ও প্রশাসনিক সুব্যবস্থার দিকে ইশারা করে বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত সমাজ ব্যবস্থার

৩৩২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৯।

৩৩৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৭।

কোথাও ফাঁকা নেই, ধোঁকা নেই, প্রতারণা নেই, ত্রুটি নেই। এ সমাজ ব্যবস্থায় নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে অপরকে অবহেলা করারও বিধান নেই। প্রকৃত গণতান্ত্রিকতা এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এ ব্যবস্থায় মানবগোষ্ঠির প্রতিটি সদস্যের প্রতি নিজ পিতামাতা ও আত্মীয়ের ন্যায় পরম দরদ ও ভালবাসা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত, সাদা-কালা, ব্রাহ্মণ-শুদ্র, শেখ-সায়্যিদ ইত্যাদির কোন ব্যবধান রাখা হয়নি। ব্যবধান হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র হুক্‌ম পালন ও তাক্‌ওয়া অবলম্বনের নিরিখে। পক্ষান্তরে যে আনুগত্য থেকে পলায়ন করে সে যেই বংশ বা পরিবারেরই হোক না কেন বিদ্রোহী ও নাফর্‌মান বলেই বিবেচিত হবে।[৩৩৪]

অধিবেশনে হযরত শায়খুল ইসলাম বৃটিশকে পুনরায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, জমইয়তে উলামা চলমান যুদ্ধে বৃটিশের সাহায্য করা কোন ক্রমেই বৈধ মনে করে না। বৃটিশের প্রদত্ত অঙ্গীকার সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে চলে আসছে। এ শতবর্ষের ভিতর বৃটিশ বহুবার অঙ্গীকার দিয়েছে এবং ভঙ্গ করেছে। তাই কোন অঙ্গীকারকে ভিত্তি করে সরকারকে বিশ্বাস করার সুযোগ নেই। মোটকথা কংগ্রেস ও জমইয়তে উলামার উপরোক্ত আপোসহীন নীতির দরুন বৃটিশ ক্ষিপ্ত হয়ে দমননীতি অবলম্বন করে। নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। জমইয়তের যারা বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারবী, হযরত মাওলানা আহমদ আলী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম শাহ্‌জাহানপুরী, হযরত মাওলানা আবুল ওয়াফা, হযরত মাওলানা শাহিদ মিয়া ফাখিরী, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সাম্ভূলী ও হযরত মাওলানা আখ্‌তারুল ইসলাম মুরাদাবাদী।[৩৩৫]

ঐ বছর ২৫ জুন শায়খুল ইসলাম মুরাদাবাদে জমইয়তের অপর এক কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও স্বাধীনতার গুরুত্ব আলোচনা করেন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের যোগদান অপরিহার্য বর্ণনা করেন। তাঁর বক্তব্য মুসলিম জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কনফারেন্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই তাঁকে সাহারানপুর রেল স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পরদিন এলাহাবাদের অন্তর্গত নৈনীতাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[৩৩৬]

---

৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৮।

৩৩৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৯।

৩৩৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, উলামায়ে হক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৯০।

কয়েক দিন পর জবানবন্দীর জন্য মুরাদাবাদ কোর্টে হাযির করা হলে তিনি ফুল স্কেপ সাইজের ২৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এক লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি নিজের চিন্তা-চেতনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯২০ সালের জুনে আমাদেরকে মাল্টা কারাগার থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। আমরা যখন ভারতে পৌছলাম, তখন খেলাফত আন্দোলন জোরেশোরে চলছিল। তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাবলী, রাওল্যাট এ্যাক্ট, মার্শাল ল প্রভৃতির নিপীড়নমূলক স্বৈরশাসনের কারণে ভারতীয়দের মন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনও চলছিল তীব্র গতিতে। সরকারের নিপীড়নমূলক উপরোক্ত কাজকর্মের দরুন আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে, ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা জরুরী। এ লক্ষ্যে আমি খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস ও জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ-এ যোগ দেই। আমি অসহযোগ আন্দোলনকে আমার কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করি। ১৯২০ থেকে আজ পর্যন্ত আমি কংগ্রেস ও জমইয়তে উলামার সদস্য হিসেবে আছি। সংগঠনদ্বয়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারাই আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা। এদের গৃহীত কর্মসূচীই আমার কর্মসূচী। খেলাফত আন্দোলন আজ অবধি অব্যাহত থাকলে আমি তাতেও অন্যতম সক্রিয় সদস্য থাকতাম। আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকেরা নিজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাকে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব মনে করে, যেভাবে তারা অন্য জাতির গোলামী মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে সকল ত্যাগকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং পরাধীন হয়ে থাকা মৃত্যু তুল্য মনে করে, আমি মনে করি সেই মনোভাব পোষণের অধিকার আমাদের ভারতীয়দের জন্যও রয়েছে। ভারতীয় প্রতিটি নাগরিকের মনে এই চেতনারই উন্মেষ ঘটুক এটা আমার কামনা।[৩৩৭]

দীর্ঘ জবানবন্দীর পর ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট শায়খুল ইসলামকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং মুরাদাবাদ জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে নৈনী জেলে স্থানান্তরিত হলে ২৬ ডি.আই.আর. ধারায় আরো ২৪ মাসের কারাদণ্ড বৃদ্ধি করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী ছিল পরবর্তী ১৩ আগস্ট। ঐ তারিখে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে আপীলের আর শুনানী সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু মাওলানা আযাদ, জরহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা হিফযুর রহমানসহ হাজার হাজার নেতা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে

---

৩৩৭. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭১।

হযরত শায়খুল ইসলামের সঙ্গী হন। এলাহাবাদ জেলখানায় শায়খুল ইসলাম ইবাদত বন্দেগীতেই বেশী সময় নিয়োজিত থাকেন।[৩৩৮]

জেলখানায় তাঁর কর্মসূচী ছিল, রাত ৩ টায় তিনি তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযের জন্য নিদ্রা থেকে উঠে যেতেন। ফজ্‌রের শুরু ওয়াক্তে আযান হত। তিনি নিয়ম মোতাবেক আকাশ খুব ফর্সা হওয়ার পর জামাআত শুরু করতেন। নামাযে ইমামত করতেন নিজেই এবং 'তিওয়ালে মুফাস্‌সাল'-এর সূরা দ্বারা মাস্‌নূন কিরাআতের মাধ্যমে নামায পড়াতেন। নামায শেষে নিজ কক্ষে গিয়ে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করতেন। তাঁর এ প্রভাতকালীন ব্যায়াম ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তারপর অন্যদের সঙ্গে নিয়ে নাশ্‌তা করতেন। এই সময় মজলিসে বিভিন্ন ধরনের ইল্‌মী, রুহানী, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কথাবার্তা হত। চা নাশতা শেষ করে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত, হিফ্‌য ও দাওর-এ মগ্ন থাকতেন। দুপুরের আহারের পর যথানিয়মে সামান্য বিশ্রাম করে যুহ্‌র নামায আদায় করতেন। তারপর আস্‌র পর্যন্ত চলত পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তাফসীর। আস্‌র থেকে মাগরিব পর্যন্ত একান্তে বসে যিক্‌র করতেন। মাগরিবের পর আউওয়াবীন ও নফল নামাযে দাঁড়িয়ে দেড় পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তারপর সাথীদের নিয়ে আহার ও ইশার নামায আদায় করে নিজ কক্ষে ফিরে যেতেন।[৩৩৯]

হযরত শায়খুল ইসলাম এলাহাবাদ জেলে পৌছে দেখলেন, সেখানে আরো অনেক রাজবন্দী রাখা আছে। তাদের অনেকে তাঁর মুরীদ ও ভক্ত ছিলেন। তাঁকে পেয়ে সবাই ঈদের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। অন্যান্য রাজবন্দীর সাথে তাঁর আচার-আচরণ কেমন ছিল সেটি আলোচনা করে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা পণ্ডিত সীতারাম বলেন, ভাই বলে সম্বোধন করতে শুনেছি অনেককে। কিন্তু ভাই বলে পূর্ণ সাম্যের আচরণ করতে দেখেছি কেবল মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে। আহার পাকানোর সময়ে বাবুর্চি বাবুর্চি থাকে আর তিনি থাকেন মালিক, কিন্তু আহার গ্রহণের সময় মালিক ও বাবুর্চি অভিন্ন হয়ে যায়। জেল থেকে তাঁর জন্য মাত্র ১ পোয়া গোশ্‌ত দেওয়া হত। অথচ আহারের সময় যেই উপস্থিত হত তাকেই তিনি আহারসঙ্গী করে নিতেন। জেলে কতদিন থাকতে হবে জানা ছিল না। তবুও সাধারণ ক্লাসের কোন কয়েদীও যদি উপস্থিত হত, তাকেও তিনি

---

৩৩৮. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৮।

৩৩৯. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২০০-২১২; আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৭-২১২।

...র সঙ্গে বসিয়ে নিতেন। ফলে আহার স্বল্পতায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ...। আমি জেল ডাক্তারকে বললাম, মাওলানা নিজের আহার অন্যদের বিতরণ ...ে ফেলেন বলেই শারীরিক অবনতি দেখা দিচ্ছে। ডাক্তার উত্তর দিলেন, তাতে ...ার কি করার আছে? নিয়ম মত তিনি ১ পোয়া গোশ্‌তই পান। অবশেষে ...তার দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে ১ পোয়া গোশত আরো বাড়িয়ে ...ণ। মাওলানার সৌজন্যে অন্যান্য কয়েদীদের আহার্যও বৃদ্ধি পায়।[৩৪০]

জেলের কষ্টকর জীবন যাপনেও তাঁর দৃঢ়তা ও অবিচলতায় কোন তফাৎ ...টেনি। মুখমণ্ডলে সর্বদা প্রফুল্লতা বিরাজ করত। কয়েদীদের প্রায় সকলেই মনে ...নে দিন গুণতেন আন্দোলন কবে শেষ হবে, কবে মুক্তি পাওয়া যাবে। একবার ...পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেল যে, মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন অনেক নেতারই চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। হযরত মাওলানা মাদানী সংবাদ পেয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, গান্ধী ঠিকই করেছেন। কি হবে, বেশী থেকে বেশী আমার কবর কোন গোরস্থানে না হয়ে জেলখানায় রচিত হবে তাই তো ?[৩৪১]

মাল্টা কারাগারেও তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তবে এলাহাবাদ কারাগারে তাঁর অবস্থান মাল্টার চেয়ে অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল। মাল্টায় থাকাকালে তাঁর ঘর-সংসার, স্ত্রী-সন্তান ও তাদের ভরণ-পোষণের কোন চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ যাত্রায় তাঁকে সেসব বিষয়েও চিন্তা করতে হয়েছিল। সংসারে তাঁর অনেক সদস্য। নিজের ৩/৪ সন্তান ও স্ত্রীসহ মরহুম ভ্রাতুষ্পুত্রের ৫ সন্তান ও ১ বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সকল দায়িত্ব তাঁর উপর। জেলে কতদিন থাকতে হবে তাও অনিশ্চিত। একটি মামলা শেষ না হতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে আরেকটি মামলা। সংসারে আয়ের ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। এতদসত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন অস্থিরতা ছিল না। মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তিনি এগিয়ে চলেন নিজের পথে। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও খাদিম কারী আসগর আলীকে ঘর সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। কারী আসগর আলীকে বিভিন্ন লোক থেকে ঋণ এনে সংসার চালানোর জন্য একটি চার্ট তৈরী করে দেন। কারী আসগরের কাছে শায়খুল ইসলামের ভক্ত ও মুরীদরা বিভিন্ন হাদিয়া দিয়ে পাঠাতেন। তিনি এগুলোর লিস্ট তৈরী করে অনুমোদনের জন্য শায়খুল ইসলামের নিকট জেলে

---

৩৪০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১২।
৩৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৪।

পাঠাতেন। ঐ লিস্টে যাদের নামের উপর ঠিক চিহ্ন দেওয়া থাকত কেবল তাদেরই হাদিয়া সংসারের কাজে ব্যয় করা হত।[৩৪২]

কারাগারে থাকাকালেই তাঁর ১৭/১৮ বছরের পুত্র (ফিদায়ে মিল্লাত) মাওলানা সায়্যিদ আস্‌আদ আল মাদানী (দামাত বারাকাতুহু)-এর বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। পরিবারের অন্যান্য সদস্য অবশ্য এই সময়ে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। শায়খুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকলে সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পৌছলেই বিবাহের কাজ সম্পাদন করে নেওয়া উচিত। এক চিঠিতে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, সন্তানের বিবাহ বালিগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পন্ন করা জরুরী। পোষাক, গহনা, ওয়ালীমা প্রভৃতির পেছনে পড়ে যুবক সন্তানকে বিবাহ থেকে বঞ্চিত রাখা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।[৩৪৩]

জেলের কতিপয় কর্মকর্তা শায়খুল ইসলামের উপর শারীরিক নির্যাতন করেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। জেলখানার বাইরেও তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রপাগান্ডা চলে। দেওবন্দ মাদ্রাসারই একটি গ্রুপ তাঁকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কারের চক্রান্তে ছিল। তিনি কারারুদ্ধ হলে তাদের প্রপাগান্ডা আরো বেড়ে যায়।[৩৪৪]

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিও মিত্রপক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূলে চলে আসে। ফলে বৃটিশ সরকার নীতির পরিবর্তন করে। সরকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ক্রমে মুক্তি দেয়। ১৯৪৪ সালের ২৬ আগস্ট শায়খুল ইসলামকেও মুক্তি দেওয়া হয়। তখন ছিল রমযান মাস। পরদিন ১৪ রমযান তিনি দেওবন্দ পৌছেন। তিনি মাত্র ২ দিন বাড়ীতে অবস্থান করার পর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী অবশিষ্ট রমযান যাপনের জন্য সিলেট চলে আসেন।[৩৪৫]

---

৩৪২. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪২।
৩৪৩. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১১৪।
৩৪৪. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৯।
৩৪৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৩।

তিন

১৯৪৫ সালের ৭-৯ মে সাহারানপুরে জমইয়তের ১৪তম অধিবেশন বসে। হযরত শায়খুল ইসলাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। জমইয়তের এ অধিবেশন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রায় ৩০ হাজারের বেশী সদস্য অধিবেশনে যোগদান করে। অধিবেশনের ভাষণে শায়খুল ইসলাম ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল ও বর্বরতা, দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার করুণ পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন অপকৌশল এবং পাকিস্তানের নামে ভারত বিভক্তির চক্রান্ত ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার সমালোচনা করে বলেন যে, ইংরেজের অমানবিক শাসন নীতির দরুন ভারতবাসীর প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। ভারতবাসী আজ চরম দারিদ্র ক্লিষ্ট ও কাঙ্গালে পরিণত হয়ে আছে।[৩৪৬]

তাঁর এ কথা শুধু দাবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কয়েক ডজন দলীল, সরকারী সূত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান, অফিসিয়াল বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে বক্তব্যের প্রমাণ পেশ করেন। অতি সম্প্রতি ২য় বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে ভারতীয়দের উপর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যেই বর্বরতা চালায়, তার সমালোচনা করে তিনি বলেন, ভারতীয়দের অসম্মতি সত্ত্বেও ইংরেজ গোটা ভারতকে মহাযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। যারা যুদ্ধে যোগদানের বিরোধিতা করেছিল তাদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে। তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। একটি স্বৈরাচারী সরকারকে বাঁচানোর জন্য 'আর্মি বিল' পাস করিয়ে নেয় এবং সৈন্য সংগ্রহের দুয়ার খোলে। এ অন্যায়ের যারা প্রতিবাদ করেছিল তাদের গলা টিপে হত্যা করে। ইংরেজ ভারতবাসীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ডাক ও টেলিযোগাযোগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়। ইংরেজের পুলিশ ও আমলাদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাচারিতা ও অপকর্মের বিরুদ্ধে যারা আওয়াজ তোলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। রিপোর্টারদের উপর আরোপ করে মোটা অংকের জরিমানা। সামরিক বিভাগের স্বার্থে এদেশের মিল কারখানাগুলো দখল করে নেয়। জনগণকে সেগুলোর উৎপাদন ভোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। খাদ্য গুদামগুলোতে ইজারাদারীর নতুন নিয়ম চালু করে সৈনিকদের রসদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষকে রাখে অনাহারে ও অর্ধাহারে। এভাবে পেট্রোল ও কেরোসিন থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ট্রেনগুলো শুধুমাত্র সৈনিকদের কাজে ব্যবহার

---

৩৪৬. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ, চেরাগে মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭০।

সীমাবদ্ধ রেখে জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেয়। দেশপ্রেমিক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদেরকে অহেতুক হয়রানী করা হয়। তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। কোন মামলা ব্যতিরেকেই গ্রেপ্তার করে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই দণ্ড প্রদান করা হয়। ১৫ আগস্টের পূর্বেই ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। অথচ তখন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী কোন সংগঠন আইন বিরোধী কোন কাজে যুক্ত হয়নি। আসাম জমইয়তে উলামার কর্মকর্তাদের অহেতুক হয়রানী করে তাঁদের সাংগঠনিক তৎপরতা বেআইনী ঘোষণা করে। গ্রামে গঞ্জে কৃষকদের বাড়ী বাড়ী প্রবেশ করে জবরদস্তিমূলক রসদপত্র ছিনিয়ে নেয়। এভাবে সমগ্র ভারতকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়ে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদের এই অপকর্মের পরিণামে 'লন্ডনের নিউ স্টেটস্ম্যান পত্রিকা' স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, ভারতের বর্তমান দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের কারণে সৃষ্টি হয়নি। এটি মানুষেরই হাতে সৃষ্ট।[৩৪৭]

সাহারানপুরের ঐ অধিবেশনে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন তথা মুসলমানদের ভৌগোলিক ঐক্য খান খান করারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আজ সরল প্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে যে, পাকিস্তানে খাঁটি ইসলামী হুকূমত কায়েম করা হবে। সেখানে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ ও খিলাফতে রাশিদার আদলে সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ স্বপ্ন নিশ্চয় একটি মধুর স্বপ্ন। লীগ নেতারা এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয়তা দান করলে ভাল ছিল। আমরা জমইয়তের সকল সদস্য একযোগে তাঁদের আহবানে সাড়া দিতাম। কিন্তু তাঁদের পক্ষে কি এ নিশ্চয়তা প্রদান আদৌ সম্ভব? যাদের দৈনন্দিন জীবনে ধার্মিকতা, ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই, ধার্মিকতা তো নয়-ই, আকার আকৃতি ও বেশভূষায় পর্যন্ত যাদের মধ্যে ইসলামের পরিচয় নেই তারা কায়েম করবে ধার্মিকতা ও ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ-ইসলামী হুকূমত? এই লোকেরা সমগ্র দেশে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের আওতায় খোলাফায়ে রাশিদূনের পদ্ধতি অনুসারে সরকার পরিচালনা করবে – এমনটি কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৩৪৮]

তিনি আরো বলেন, জিন্নাহ সাহেব 'নিউজ ক্রনিক্যল'-এর প্রতিনিধিদের যে সাক্ষাতকার দিয়েছেন, সেটি অধ্যয়ন করে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

---

৩৪৭. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৯।

৩৪৮. আসীর আদরবী, হিন্দুস্থান কী জঙ্গে আযাদী মেঁ মুসলমানূঁ কা কিরদার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯-২৬১।

সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানে যে সরকার গঠিত হবে, সেটি হবে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার। হিন্দু-মুসলিম সকলে নিজ নিজ আবাস ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবে, আর সেই প্রতিনিধিদের দিয়েই গঠন করা হবে মন্ত্রিপরিষদ।[৩৪৯]

বক্তব্যের শেষে হযরত শায়খুল ইসলাম বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরো বেগবান করতে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান। তাঁর মতে ভারতে ইংরেজের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতে কোন শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা বৃথা। সাহারানপুরের অধিবেশনে জমইয়তের প্রস্তাবিত 'খসড়া সংবিধান ও তার মূলনীতি'-এর মঞ্জুরী গ্রহণ করা হয়।[৩৫০]

ছেচল্লিশের নির্বাচন

এক

২য় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতীয়দের গণঅসন্তোষ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইংরেজ সরকারের উপর বৈদেশিক চাপ ও বৃটিশ গণপরিষদ নির্বাচনে লেবার পার্টির বিজয় ইত্যাদি ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত করে দেয়। তখন কেবল এতটুকু অবশিষ্ট থাকে যে, স্বাধীনতা কিভাবে প্রদান করা হবে? ভারতকে অবিভক্ত রেখে, না বিভক্ত করে? ছেচল্লিশের নির্বাচন বস্তুতঃ সেই বিষয়টির ফয়সালা করে।

ভারত ত্যাগের মুহূর্তে ভারতকে কি অবস্থায় রেখে যাবে সে ব্যাপারে ইংরেজরা গোড়া থেকেই বিভক্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ব্যক্ত করে আসে।[৩৫১]

---

৩৪৯. মাদানী, পাকিস্তান কিয়া হায় (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা.বি), পৃ ৫।

৩৫০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫।

৩৫১. গ্লাউডন লন্ডনের রক্ষণশীল নেতাদের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠান। এটি ছিল গোপনীয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষে যে অবস্থা চলছে তার সমাধান করতে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের দুই সম্প্রদায়কে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া উচিত। আর কংগ্রেসের বয়কটের ভীতি মোকাবেলা করতে বৃটিশ বাণিজ্যকে বোম্বাই থেকে সরিয়ে করাচীতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বোম্বাই ক্রনিকেলের লন্ডনস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন যে, লন্ডনে হিন্দু-মুসলমানের জন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার কাজ পূর্ণোদ্দমে চলছে। (ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশ বিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭)

তাছাড়া ভারতকে বিভক্ত করার মধ্যে তাদের নিজস্ব স্বার্থ নিহিত ছিল বলে প্রথম থেকেই ইংরেজ ঐ পথ সুগম করতে থাকে। মাওলানা আযাদ বলেন, বৃটিশ তখন এশিয়ায় নিজেদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে বিভক্তির সমর্থনে কাজ করে। হযরত মাদানী আরো স্পষ্ট করে বলেন, বৃটিশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই ভারতকে বিভক্ত করেছিল। কারণ হিন্দুরা বিলাতী পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা বর্জন করায় ইংরেজ মুসলমানদের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটি পৃথক ও নতুন ক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা করে যাচ্ছিল।[৩৫২]

১৯৩১ সালে তাবেদার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডন গমন করলে ইংরেজদের সাথে গোপন আঁতাত হয়। আঁতাতে বৃটেন ঐ প্রতিনিধি দল থেকে আশ্বাস পায় যে, পাকিস্তান ভূখণ্ডে বিলাতী শিল্প ও বাণিজ্যের লেনদেন অব্যাহত রাখা হবে। তাছাড়া উপমহাদেশের সমুদ্র বন্দরগুলোর মধ্যে করাচী ও কলিকাতা বৃটিশের জন্য বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া হবে।[৩৫৩]

মোটকথা ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের মুহূর্তে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শেষ চেষ্টা ছিল ভারতে প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুজাহিদ শক্তিটি দুর্বল করে এবং বৃটিশ স্বার্থ যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যাওয়া। ভারতকে যে কোন উপায়ে বিভক্ত করাই ছিল সেই স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা। কেননা নতুন ভূখণ্ড পাকিস্তান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই থাকবে দুর্বল। আর ঐ দুর্বলতা পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সমীহ করে চলতে বাধ্য করবে। তখন পাকিস্তানকে মাধ্যম বানিয়ে গোটা এশিয়ার উপর কূটনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া ১ম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর অন্যতম বৈদেশিক নীতি ছিল যে, মুসলিম শক্তি পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন সেটিকে খণ্ডিত করে দুর্বল করে দেওয়া। যেন মুসলমানরা পৃথিবীতে পুনরায় রাজশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে। ভারতবর্ষ ত্যাগ কালে পশ্চিমাদের ঐ কূটনীতি বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এ লক্ষ্যেই ইংরেজ উপমহাদেশে অবস্থিত মুসলিম শক্তিকে বিভক্তির মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত বরং ত্রিখণ্ডিত করে সম্পূর্ণ দুর্বল করে দিয়ে যায়।

দেশী নেতৃবন্দের মধ্যে লীগ নেতারা পূর্ব থেকেই বিভক্তির দাবী পেশ করে আসেন। লীগ নেতাদের কাছে মুসলিম গণমানুষের স্বার্থ-চিন্তার চেয়ে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রিত্ব অর্জনের চিন্তা ছিল বেশী। ইংরেজ আশীর্বাদের

---

৩৫২. মাদানী, প্রাগুক্ত।

৩৫৩. প্রাগুক্ত।

ভিত্তিতেই লীগের জন্ম। তারপর লীগের সকল রাজনীতি এই ইংরেজেরই পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে। এমতাবস্থায় ইংরেজ চলে যাওয়ার পর দেশে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলে এবং নেতৃত্ব লাভের বিষয়টি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর ন্যস্ত হলে তাঁদের নেতৃত্ব অর্জন করা হবে অনেকটা সুকঠিন ব্যাপার। এ কারণে লীগ গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ও পৃথক ভূখণ্ডের জোর তদ্‌বীর চালিয়ে আসে।[৩৫৪]

কংগ্রেস নেতারা অবিভক্তির পক্ষে ছিলেন। তাঁদের এই অবিভক্তির চিন্তা মুসলিম স্বার্থরক্ষার তাগিদে আদৌ ছিল না। বিভক্তির কারণে রাজনৈতিকভাবে ভারত দুর্বল হবে আশংকায় কংগ্রেস বিভক্তিকে অপছন্দ করে। অবশ্য কংগ্রেসের কিছু নেতা মানবতাবাদী ছিলেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় হিসেবে সকলকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাঁরা ভারতীয়দের সেই অভিন্নতার খণ্ডন পছন্দ করেননি। মহাত্মা গান্ধী এতটুকুও বলেছিলেন যে, কংগ্রেস যদি বিভক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে আমার লাশের উপর দিয়ে হেঁটে হিয়ে তা সম্পাদন করতে হবে। আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন অবস্থায় বিভক্তি মেনে নেব না।[৩৫৫]

অবশ্য পরবর্তী সময়ে গান্ধী এই মনোবল ধরে রাখতে সক্ষম হননি। কংগ্রেসের ভিতরে সর্দার প্যাটেলসহ কতিপয় নেতার একটি সাম্প্রদায়িক লবি সক্রিয় ছিল। এই লবি লীগ নেতাদের আদৌ সহ্য করত না। তাই তারা বাহ্যত না হলেও কাজে কর্মে বিভক্তির পথই সুগম করে যায়। তাদেরই চক্রান্তের কারণে মাওলানা আযাদসহ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ শেষ অবধি ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক গ্রুপটি জওহরলাল নেহরু ও মহাত্মা গান্ধীকেও প্রভাবিত করেছিল।[৩৫৬]

ভারত বিভক্তির সবচেয়ে কট্টর বিরোধী ছিলেন বিপ্লবী উলামায়ে কিরাম। এই উলামা যাঁরা নিজেদের নেতৃত্ব কিংবা মন্ত্রিত্বের রাজনীতি করেননি, যাঁরা ভারতীয় গণমানুষের মুক্তির জন্য নির্মোহভাবে শতাব্দী কাল থেকে মাঠে ময়দানে লড়াই করে আসছেন, তাঁরা ভারতের বিভক্তিকে ভারতীয়দের জন্য বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর বিবেচনা করেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, বিভক্তির ফলে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ স্থায়ী আসন গেড়ে নিবে। তাছাড়া সুদীর্ঘ কাল থেকে জিহাদকারী মুসলিম বিপ্লবী শক্তিটি খণ্ডিত হয়ে

---

৩৫৪. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, মুসলমানূঁ কা রওশন মুস্তাকবিল, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২১-৪২২।
৩৫৫. আবুল কালাম আযাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, প্রাগুক্ত, পৃ ২০১।
৩৫৬. ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১-১০৩।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়বে। তাঁরা আরো উপলব্ধি করেন যে, ভারতকে বিভক্ত করার এই চক্রান্ত বস্তুত বৃটেন থেকে সরবরাহকৃত। এশিয়ার উপর কূটনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বৃটিশ ভারতকে বিভক্ত করছে। কাজেই যেই বৃটিশকে এশিয়া থেকে উৎখাতের জন্য আকাবির উলামা জীবন ব্যাপী সংগ্রাম করে আসছেন, বিভক্তির মাধ্যমে সেই বৃটিশের হাতেই এশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা পূর্বেই উপলব্ধি করেন যে, ন্যায্য বিভক্তি তো হবেই না, অধিকন্তু বিভক্তির শিরোনামে দাঙ্গা ও রক্তক্ষয়ের দুয়ার খোলা হবে। তাতে এমন সহিংস পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে, যেটি প্রতিরোধের কোন উপায় থাকবে না। তারপর যারা পাকিস্তানের ভূখণ্ডে হিজরত করে যাবে তারা সেখানে গিয়েও স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাবে না। বরং বিদেশী নাগরিক (মুহাজির) হিসেবে সর্বদা দ্বিতীয় কাতারে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে যারা নিরুপায় হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে রয়ে যাবে তারা বাস্তবিক অর্থেই সংখ্যালঘু হিসেবে আজীবন নিষ্পেষিত জীবন যাপনে বাধ্য হবে। বিভক্তির কারণে ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত হাজার হাজার বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের সকল ঐতিহ্য তথা তাদের বাড়ী-ঘর, জমা-জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, দোকান-পাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ্, মাযার, গোরস্থান, ওয়াক্ফ সম্পত্তি সব কিছু হিন্দুদের হাতে বিধ্বস্ত হবে।[৩৫৭] কোন ভূখণ্ডকে এহেন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া শরীঅতের দৃষ্টিতেও বৈধ নয়। এ সব কারণে বিপ্লবী উলামা খণ্ডন ও দেশ বিভক্তির বিরোধিতা করেন।[৩৫৮]

দুই

ছেচল্লিশের নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মুসলমানদের নিজেদেরই দু'টি দলের মধ্যে। কারণ এটি ছিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। অর্থাৎ ভোট প্রয়োগের দ্বারা মুসলমানগণ মুসলিম প্রতিনিধি আর হিন্দুগণ হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেয়। নির্বাচনে অবিভক্তির সমর্থক কংগ্রেস বহু কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাস করে। আর কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও সেটি ছিল নামে মাত্র।

---

৩৫৭. মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮-৮৯।
৩৫৮. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, সীরতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৭।

পক্ষান্তরে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছিলেন দু'টি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী উলামা-এরা অবিভক্তির সমর্থক এবং অবিভক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অপর দিকে ইংরেজের আনুকূল্য ভোগী লীগ নেতৃবৃন্দ-এরা বিভক্তির সমর্থক এবং বিভক্তির জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন। নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি দিক এই ছিল যে, ভোটে মুসলমানদের যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, সেটিই তাদের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী দল বিবেচিত হবে এবং সেই দলের রায় অনুসারে ভারতের বিভক্তি কিংবা অবিভক্তি সংক্রান্ত ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে।[৩৫৯]

এ উপলক্ষে আলিমগণ মুসলমানদের বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য জোটের উদ্যোগে 'মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড' গঠিত হয়। জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিস, অল ইন্ডিয়া মজলিসে আহ্‌রার, অল ইন্ডিয়া মুমিন কনফারেন্স, ইন্ডিপ্যান্ডেন্ট পার্টি বিহার, কৃষক প্রজা পার্টি বঙ্গদেশ, খোদায়ী খেদমতগার সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জোটের সভাপতি মনোনীত হন স্বয়ং শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী।[৩৬০]

নির্বাচনে মুসলিম লীগ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শন ও নিজেদেরকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দল প্রমাণে সর্বময় চেষ্টা নিয়োজিত করে। লীগ এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করে। এ নির্বাচনেই লীগ রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে। প্রতারণামূলকভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার এবং বিপ্লবী আলিমগণকে ভয়ানকভাবে অপমানিত করে।[৩৬১]

নির্বাচনে লীগের প্রধান সমস্যা ছিল বিপ্লবী আলিমগণের সমর্থনহীনতা। এ সমস্যার কারণে ইতোপূর্বে ১৯৩৮ সালে লীগ আলিমগণের সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে আলিমগণ লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগ পুনরায় একই সমস্যায় পতিত হয়। তখন ভাগ্যক্রমে ঐ সমস্যা সমাধানের একটি পথ বেরিয়ে এসেছিল। কেননা আলিমগণেরই অপর

---

৩৫৯. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।
৩৬০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৯১।
৩৬১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৭।

একটি দল বিভিন্ন কারণে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় তাঁরা লীগ রাজনীতির সাথে এসে যোগ দেন।[৩৬২]

দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষকমণ্ডলীর একটি গ্রুপ হযরত শায়খুল ইসলামের প্রতি ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে রুষ্ট ছিলেন। মাদ্রাসার ভিতরে এবং দেশের সর্বত্র শায়খুল ইসলামের ক্রমবর্ধমান সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তাঁদের সুখকর মনে হয়নি। তিনি এলাহাবাদ জেলে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বন্দী হলে ঐ গ্রুপটি মাদ্রাসার ভিতর প্রবল হয়ে উঠে। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে গ্রেপ্তারের সময় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেছিল। ফলে সরকার দারুল উলূমের উপর চাপ দেয় এবং দারুল উলূমকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। বিরুদ্ধবাদী গ্রুপটি প্রতিষ্ঠানের এ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পতিত হওয়াকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করে। এই সুযোগে কুতুবখানার দায়িত্বশীল মাওলানা মুহাম্মদ তাহিরের নেতৃত্বে গ্রুপটি শায়খুল ইসলাম ও তাঁর সমর্থক ছাত্র শিক্ষকদেরকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কারের নীল নক্শা অংকন করে। মাদ্রাসার প্রশাসন বিভাগ ও মজলিসে শূরার সাথেও গোপন বৈঠক হয় এবং সকল পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করে নেয়।[৩৬৩]

হযরত শায়খুল ইসলামের জন্য ঐ সময়গুলো ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি ভিতর ও বাইরের আক্রমণে অত্যন্ত মর্মাহত হন। মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম ও সদ্‌রে মুহ্‌তামিমকে জেল থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন, প্রায় ৮০ জন ছাত্রকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করার যেই সিদ্ধান্ত আপনারা দু'জনে গ্রহণ করেছেন, তা জেনে আমি আন্তরিকভাবে ব্যথিত। কারণ বর্তমান যুগে মানুষকে যতখানি সম্ভব মুসলমান বানানো এবং বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন মানুষ বানানো জরুরী। হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনী শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আমাদের যে পথনির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে তাদের প্রতি আমাদের যথাসম্ভব কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করা এবং তাদেরকে সাধ্যমত সরল পথের উপর ধরে রাখা উচিত। এটা করা হলে তাদের নিজেদের অবস্থা যেমন শুদ্ধ হবে, তেমনি তারা ইসলামের সঠিক ধারক ও প্রচারক হিসেবে মুসলিম সর্ব-সাধারণের অবস্থাও পরিশুদ্ধ করার সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা থেকে যদি তাদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় তাহলে তারা একটি বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

---

৩৬২. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬১।
৩৬৩. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫২-৩৫৩।

বহিষ্কারাদেশ আমাদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বোচ্চ শাস্তি। এই শাস্তি দানের ভিতর আরো অনেক অপকারও নিহিত থাকে।[৩৬৪]

উপরোক্ত ষড়যন্ত্রে মজলিসে শূরার একাধিক সদস্যও জড়িত ছিলেন। শায়খুল ইসলাম শূরার জনৈক সদস্যকে লিখেছেন যে, আপনারা শাবানের শুরুতে বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত করে দিয়ে সাথে সাথে বোর্ডিং বন্ধ করা, ৪০ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা ও বহু ছাত্রকে সনদ প্রদান থেকে বঞ্চিত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটি একটি দুঃখজনক সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত যদি কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হয়ে থাকে তাহলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্ররা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চরম ও কঠিন প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এতদসত্ত্বেও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে না প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এতবড় শাস্তি দিয়েছে না সরকার, যতটা শাস্তি আপনারা দারুল উলূমের ছাত্রদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অথচ দারুল উলূম সম্পূর্ণ বেসরকারী ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকারের কোন দখলদারী নেই। ইংরেজ সরকারের প্রতি আপনাদের এতখানি দরদ ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের অর্থ কি থাকতে পারে? ছাত্ররা মিটিং, মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেছে। তারা কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা মান্য করেনি, এই তো তাদের অপরাধ। এতটুকু অপরাধের কারণে কি দূর-দূরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার আলো থেকে জীবনের জন্য বঞ্চিত করা যায়? দেশে যেই মুহূর্তে সরকার স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে, সেই মুহূর্তে দারুল উলূমের এক নগণ্য খাদিমের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা যদি প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে তাতে আপনাদের এতটা ক্রোধ প্রকাশের কি কারণ থাকতে পারে?[৩৬৫]

ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বহিষ্কারের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। হযরত শায়খুল ইসলাম জেলখানায় বসেই শিক্ষক বহিষ্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে শিক্ষকমণ্ডলীর বহিষ্কারের বিষয়টি স্থগিত হয়, কিন্তু তাঁর নিজের বহিষ্কার আদেশকে ঠেকানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মজলিসে শূরার একাধিক প্রভাবশালী সদস্য তাঁর বহিষ্কারের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মাদ্রাসার ভিতর থেকেও নানা রকমের তীর্যক কথাবার্তা মাদানী সমর্থকদের মর্মাহত করতে থাকে। তিনি জেলের মেয়াদ পূরণের পরেও মুক্তি না পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাঁকে অবশিষ্ট জীবন জেলের চার দেয়ালের

৩৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫১।
৩৬৫. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪৫।

ভিতরই যাপন করতে হবে ইত্যাদি গুজব ছড়ানো হয়। মোটকথা মজলিসে শূরা থেকে এতটুকু নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছিল যে, শূরার পরবর্তী অধিবেশনে শায়খুল ইসলামকে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।[৩৬৬]

এসব খবরাখবর জেলখানায় শায়খুল ইসলামের নিকটও পৌঁছে। তিনি পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা দিয়ে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, আমাকে দারুল উলূম থেকে বহিষ্কার করা হলে আমি খুশী, আর রাখা হলেও আমি খুশী। রিয্‌কের যিম্মাদার দারুল উলূম নয়। বরং যিম্মাদার হলেন আল্লাহ্ পাক। আমার সুহৃদ! এ সব পরিস্থিতি দেখে অস্থির হয়ো না। ঘটনাবলী দিন তারিখ দিয়ে লিখে রাখ। আর কঠিনভাবে ধৈর্যধারণ কর। মুখ বন্ধ রাখতে হবে। চোখ দিয়ে দেখবে কিন্তু কিছুই বলবে না। দেখ, আল্লাহ্ পাক কি ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, বে-পরোয়া এবং সর্বাধিক দয়া ও দরদের মালিক। তাঁর যেমন বাহ্যিক হাত আছে তেমনি অদৃশ্য হাতও রয়েছে। দুশ্চিন্তা করো না, কাউকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾

(তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন)

যদি কোন ঘটনা কিংবা তাদের কোন কথা তোমার মনে আঘাত করে তাহলে হযরত শায়খুল হিন্দের জীবনচরিত স্মরণ কর। তাতেও মনের স্থিরতা না এলে তাঁর কবরের পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে ২/১ পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহি ও অন্যান্য বুযর্গের রূহের উপর বখ্‌শিশ করে দাও। মাওলানা মুহাম্মদ জলীল ও মাওলানা ইজায আলীকেও এ পরামর্শ পৌঁছিয়ে দিও। মাওলানা নাফে'গুল এলে তাকেও এ কথা বলে দিও। মাওলানা সুলতানুল হক ও মুনশী শফীর কাছেও আমার এ অনুরোধ থাকল। যারা বলে বেড়ায়, আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে, হুসাইন আহমদ জেলের মেয়াদ পূর্ণ করেও মুক্তি পাবে না, তাদের কথায় আনন্দিত হওয়া উচিত। কারণ হযরত শায়খুল হিন্দের সাথেও এমন আচরণ করা হয়েছিল। আমি তো তাঁরই এক নগণ্য গোলাম। তাই এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকলে খুশিই হওয়ার কথা। আশ্চর্যের কিছুই হবে না, হয়ত সেই আমূল পরিবর্তনের ঘটনাও ঘটে যেতে পারে, যেটি হযরত শায়খুল হিন্দের বিরোধিতাকারী ও কষ্টদান কারীদের ব্যাপারে ঘটেছিল।[৩৬৭]

---

৩৬৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৭।

৩৬৭. মকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৩৭।

মজলিসে শূরার পরবর্তী অধিবেশন যথাসময়ে বসে। সদস্যগণ দেশের চলমান রাজনৈতিক অবস্থা ও মাদ্রাসার ভিতরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। তাঁরা দেখলেন যে, মূল ব্যাপারটি মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম ও সদরে মুহ্‌তামিমের মধ্যেই আবর্তিত। এখানেই সকল জটিলতা ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্যান্য সময়ে মুহ্‌তামিম ও সদরে মুহ্‌তামিমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে শায়খুল ইসলাম অগ্রসর হয়ে বিবাদ থামিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন তিনি জেলে। বিবাদ থামানোর কেউ নেই। ফলে এটি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করে এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এটিকে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর চেষ্টা চালায়। এভাবে গভীর পর্যালোচনার পর বিজ্ঞ শূরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুহ্‌তামিমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় এবং সদ্‌রে মুহ্‌তামিমের পদ বিলুপ্ত করা যায়। শূরার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এত দিনের সকল ষড়যন্ত্র এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে সদরে মুহ্‌তামিম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদ্রাসা থেকে ইস্তফা দেন। ঐ সময় হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ আরো কয়েকজন শিক্ষক ইস্তফা দিয়ে দারুল উলূম ত্যাগ করেন।[৩৬৮]

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী দেওবন্দ থেকে সরে পড়লে লীগ নেতারা তাঁর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। এই নেতারা দারুল উলূম থেকে তাঁর পদচ্যুতির জন্য কংগ্রেস ও শায়খুল ইসলামকে দায়ী করেন। ঘটনার প্রতিকারের জন্য লীগ নেতারা হযরত মাওলানা উসমানীকে সভাপতি করে জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের বিপরীতে 'জমইয়তে উলামায়ে ইসলাম' শিরোনামে লীগ সমর্থক আলিমগণের একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব করেন। এ সব ঘটনা যখন ঘটে, হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী তখন জেলখানায়। এতদসত্ত্বেও বিপ্লবী আলিমগণের যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা হিফ্‌যুর রহমান, হযরত মুফ্‌তী আতীকুর রহমান, হযরত মুফ্‌তী কিফায়েত উল্লাহ, মাওলানা আহমদ সাঈদ প্রমুখ নেতা মাওলানা উসমানীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। তাঁরা মাওলানাকে জমইয়ত বিভক্ত না করার পরামর্শ দেন। হযরত মাওলানা উসমানী তখন যদিও সাক্ষাতকারী আলিমদেরকে এ কথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি এখন পর্যন্ত লীগ সমর্থক নতুন জমইয়তের নেতৃত্ব গ্রহণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি, তবুও তাঁর কাছে লীগ নেতাদের ক্রমাগত আনাগোনা, জোর তদ্‌বীর ও বিভিন্ন চমকপ্রদ আশ্বাস-বিশ্বাস প্রদানের করণে দোদুল্যমানতা অব্যাহত থাকেনি।

৩৬৮. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৫-৩৫৬।

শায়খুল ইসলাম জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আলিমগণের নতুন দল 'জমইয়তে উলামায়ে ইসলাম' গঠিত হয় এবং মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ জমইয়তের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে লীগের সমর্থনে কাজ শুরু করেন।[৩৬৯]

পুরাতন জমইয়তের ভাঙ্গন ও নতুন জমইয়ত গঠনের দ্বারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় মুসলিম লীগ। কেননা নির্বাচন উপলক্ষে আলিমগণের সমর্থন না পাওয়ার যে অভাব লীগের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, জমইয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠিত হওয়ার দ্বারা সেই সমস্যার উত্তম সমাধান সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের বিপ্লবী আলিমগণ, যারা স্বাধীনতা ও আযাদীর জন্য জীবনভর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসেন। বিস্ময়ের বিষয় যে, হযরত মাওলানা উসমানী একমাস পূর্বেও যেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও তাবেদারী রাজনীতির বিপরীতে বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন, যিনি লীগের ভারত বিভক্তি প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রস্তাব আখ্যায়িত করে জমইয়তের 'অবিভক্তি ও জাতীয়তাবাদী শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলা' সম্পর্কে মন্তব্য লিখেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অধিকার আদায়ের জন্য এ ফর্মূলার চেয়ে উত্তম কিছু নেই, তিনি একমাস পর কেমন করে বিভক্তি প্রস্তাবের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়লেন?[৩৭০]

তিন

ভারত বিভক্ত হলে পাকিস্তান ভূখণ্ডের শাসনতন্ত্র কি হবে সে ব্যাপারে জিন্নাহ সাহেব পূর্বেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালের ৭ অক্টোবর লাহোরের 'শাহ্বায' পত্রিকায় বলা হয় যে, জিন্নাহ বরাবরই বলে আসছেন, গঠিতব্য পাকিস্তান ভূখণ্ডে ধর্মভিত্তিক কোন শাসন কায়েম হবে না, বরং সেখানে স্পষ্ট একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা হবে। মুসলমানদের তথাকথিত 'হুকূমতে ইলাহী'-এর সাথে পাকিস্তানের কোন সম্পর্ক থাকবে না। সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতেও তিনি একই বক্তব্য উচ্চারণ করে বলেছেন, পাকিস্তানের গঠিতব্য সরকার হবে আধুনিক ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার। হিন্দু-

৩৬৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬১; মুহাম্মদ আন্ওয়ারুল হাসান শেরকোটী, হায়াতে উসমানী (করাচী : মাকতাবায়ে দারুল উলূম, ১৯৮৫), পৃ ৪৮২।

৩৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬২।

মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠাবে। আর ঐ প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা আইন পরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে।[৩৭১]

কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগ নেতারা সাধারণ মুসলমানদেরকে এক মহা প্রতারণায় ফেলে দেয়। লীগ নেতারা গঠিতব্য পাকিস্তানে 'ইসলামী হুকুমত' কায়েম হবে, খিলাফতে রাশিদার আদলে মদীনার ইসলামী সরকারের এক নতুন সংস্করণ প্রতিষ্ঠা করা হবে ইত্যাদি সুমিষ্ট কথা বলে এক ধুম্রজালের সৃষ্টি করে। ফলে বহু উলামা, মাশায়িখ, শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান এ জালে আবদ্ধ হন। ধর্মীয় আবেগের আতিশয্য তাঁদেরকে লীগ নেতাদের বক্তব্য গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সুযোগ দেয়নি।[৩৭২] এ সব বক্তব্যে আবেগ আপ্লুত হয়ে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী নিজেও বলে ফেলেছিলেন, দীর্ঘ দিন থেকে আমি ছিলাম রাস্তার একটি মোড়ে দাঁড়ানো। জিন্নাহ সাহেব আমাকে পথের দিশা দিয়েছেন। আমি অন্ধকারে ছিলাম, তিনি আমাকে আলো দান করেছেন।[৩৭৩]

ঐ সময় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আলিম হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কংগ্রেস আওর মুসলিম লীগ কে মুতাআল্লাক শর্‌য়ী ফায়সালা' শিরোনামে ফত্‌ওয়া প্রকাশ করে লীগ সমর্থনের প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করেন।[৩৭৪] হযরত মাওলানা যফর আহমদ থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি[৩৭৫] ২৬ এপ্রিল এক নির্বাচনী সভায় বলেন, বর্তমান অবস্থায় গোটা

---

৩৭১. মাদানী, পাকিস্তান কিয়া হায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

৩৭২. আসীর আদরবী, হিন্দুস্তান কী জঙ্গে আযাদী মেঁ মুসলমানূঁ কা কিরদার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৯-২৬০।

৩৭৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬৪।

৩৭৪. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪।

৩৭৫. মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী ১৮৮৭ সালে ইউপির থানাভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলনে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ)-এর ভাগিনা। শৈশব থেকে তিনি নিজ মাতুলের স্নেহে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ২০ বছর যাবৎ থানাভবনের খানকায়ে ইমদাদিয়্যায় অবস্থান করে ধর্মীয় কিতাব রচনা ও ফতওয়ার কাজ করেন। ৬ খণ্ডে প্রকাশিত 'ইমদাদুল আহকাম' ফত্‌ওয়া গ্রন্থটি তারই শ্রমের ফসল। তিনি ১৯৩৮ সালে মাওলানা ইসহাক বর্ধমানীর ইন্তিকালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামমিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন। তারপর ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা পদে কাজ করেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের এক মাদ্রাসার মুহাদ্দিস পদে যোগ দান করেন। রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান অর্জনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

ভারতে যেহেতু ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, সেহেতু আপততঃ যে সব সুবায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, সে সব সুবায় ইসলামী নীতিমালার উপর সরকার গঠনের চেষ্টা করা উচিত। শরীঅতের দৃষ্টিতে এটা জরুরীও বটে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করার ঘটনা এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মক্কায় ইসলামী শাসন ও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব ছিল বিধায় তিনি হিজরত করেন এবং মদীনাকে মুসলমানদের নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ করেন। তারপর ঐ কেন্দ্র থেকে ইসলামের যেই উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়, তা সকলের কাছে সুস্পষ্ট। এখানে আশ্চর্যের কি থাকতে পারে যে, পাকিস্তান থেকেও ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হবে এবং এটি মুসলিম উম্মাহ্‌র নতুন বিজয় অর্জনের সোপানে পরিণত হবে।[৩৭৬]

অনুরূপে ৩ নভেম্বর জমইয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি হযরত মাওলানা উসমানী কলিকাতার ভাষণে বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হল আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এর অগ্রযাত্রা সবশেষে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত ন্যায় নীতির শাসন প্রতিষ্ঠায় গিয়ে শেষ হবে।[৩৭৭]

কোন সন্দেহ নেই, উপরোক্ত বক্তৃতা ও বিবৃতি থেকে আলিমগণের নিয়্যাতের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এই আলিমগণ ইতোপূর্বে স্বাধীনতার জিহাদ কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে খুব বেশী জড়িত ছিলেন না। তাঁদের অনেকে এমনও ছিলেন যারা সক্রিয় রাজনীতি করার বৈধতা নিয়েও সংশয়গ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা পূর্বে আপন গৃহের নিরাপদ কোনে ইবাদত ও বন্দেগীর কাজেই মশগূল ছিলেন। লীগ নেতাদের আমন্ত্রণ পেয়ে হঠাৎ মঞ্চে আসেন এবং রাজনৈতিক জটিল ব্যাপারে মিল্লাতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নিজেদের অনভিজ্ঞতার

তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। ইমদাদুল আহকাম, ইলাউস্ সুনান, ইবন মানসূর সফর নামা হিজায প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ ৪২৫)

৩৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪।

৩৭৭. ঐ নির্বাচনে মাওলানা সহুল উসমানী এক ফতওয়া জারী করে বলেন যে, মুসলমানদের জাতীয়তার মাপকাঠি দেশ নয়, ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমানদের জাতীয়তা নির্ণীত হয়ে থাকে। ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে পৃথক জাতি। পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দেওয়া বিশেষ জরুরী। বরং শরীঅতের দিক দিয়া ওয়াজিব। কেবল মাত্র মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া একান্ত জরুরী। (মিল্লাত, ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫, পৃ ৬)

দরুন লীগ নেতারা তাঁদের প্রতারিত করে। অবশেষে পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর বাস্তবে ইসলামী হুকূমত না পেয়ে তাঁরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত হন।[৩৭৮]

নির্বাচন চলাকালে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী অত্যন্ত দরদের সাথে মুসলমানদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা বিভক্ত না হয়ে সকলের ঐক্যবদ্ধ ও অবিভক্ত থাকার মধ্যেই অধিকতর কল্যাণ নিহিত আছে। ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা তৎকালের হিসাব মতে ছিল প্রায় ১০ কোটি। নিজেরা অবিভক্ত থাকলে এই ১০ কোটি মানুষের জনসমষ্টি ভারতের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা নিজেদের যথার্থ অধিকার আদায়ে সক্ষম থাকবে। ১০ কোটি মানুষের জনসমষ্টিকে কোথাও ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে নিজেরা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হল মুসলিম শক্তিকে খণ্ডিত ও দুর্বল করে ফেলা। এই বিভক্তির পরিণাম হল মুসলিম শক্তিটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের হাতে আজীবন গোলাম হয়ে থাকা। বিভক্তির দরুন ভারতের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমানের জীবন বিপন্ন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা বিদ্যমান। সাহারানপুর থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের সর্বত্র মুসলমানরা বসবাস করছেন, এখানে রয়েছে তাদের বড় বড় বহু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাজার হাজার মাদ্রাসা, লক্ষ লক্ষ মসজিদ, অসংখ্য মাযার ও খানকা। বিভক্তির কারণে এ সব ধর্মীয় আমানত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এই বিভক্তির অর্থ দাঁড়াবে যে, মুসলমানরা বিগত কয়েক শতাব্দী কালের চেষ্টায় ভারতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেছিল, এক মুহূর্তের মধ্যে সেটি ধ্বংস করে দেওয়া। পাকিস্তানের নামে খণ্ডিত যে অংশ মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে সেখানে ভারতের অবশিষ্ট ৩ কোটি মুসলমানের হিজরত করে যাওয়া একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। ফলে ৩ কোটি মুসলমান বাধ্য হয়ে নিজেদের বাসভূমিতে থেকে যাবে এবং আজীবন হিন্দুদের হাতে অবহেলিত, দুর্বল ও সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমাজে তাদের মানবেতর জীবন যাপন ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকবে না।

---

৩৭৮. পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর ঐ আলিমগণ দেখলেন তাঁদের নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় গণতন্ত্রের স্লোগান দিচ্ছেন। ইসলামী হুকূমতের কথা কেউ শুনতেও অনিচ্ছুক। যেই আলিমদেরকে লীগ নেতারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার মুহূর্তে মাথায় তুলে রেখেছিলেন, তাঁদেরকে তখন 'মেট্টি কা লোটা' ইস্তিঞ্জা কা ঢিলা' জ্ঞান করে ফেলে দিচ্ছেন (তাকী উসমানী, আল বালাগ পত্রিকা, করাচী, মুহাররম, হি ১৪০২, পৃ ১২)

হযরত শায়খুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী সরকার গঠনের নামে বর্তমানে যে সব আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর কোন সারবত্তা নেই। এগুলো বাকচাতুর্য ছাড়া কিছুই নয়। আর ইসলামী হুকূমত ছাড়া অন্যান্য যে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির কথা শোনানো হচ্ছে, সেগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবায় আপনা থেকেই বিদ্যমান থাকবে। কোন শক্তি এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখতে সক্ষম হবে না। কিন্তু পাকিস্তান যে সব এলাকা নিয়ে গঠিত হচ্ছে সে সব এলাকার বাইরেও মুসলমানরা রয়েছেন। বাইরে অবস্থিত মুসলমানদের সংখ্যাও কম নয়। এমতাবস্থায় জেনে শুনে ৩ কোটি মুসলমানকে কুরবানীর জন্তুতে পরিণত করা ইতিহাসের অতি নির্মম আচরণ বৈ কিছুই হবে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী হুকূমত কায়েমের কথা শুনিয়ে তোমাদের থেকে শুধু ভোট আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর যখন তোমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, তখন এ কথা নিয়ে তোমরা সেই নেতৃবৃন্দের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠায় লীগ বাস্তবভাবে আন্তরিক হয়ে থাকলে লীগের নেতৃত্বে থাকতেন উলামা ও মাশায়িখ। তখন লীগের নেতৃত্বে এমন লোকদেরই পাওয়া যেত যাদের জীবনের সবকিছু ইসলামী অনুশাসন পালনে পরিপূর্ণ। উল্লেখ্য, যাদের জীবনধারায় ইসলাম পালনের সামান্য ছোঁয়াও নেই, তাদেরকে হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত উমর রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর আসনে অধিষ্ঠিত করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই হবে না। বস্তুত ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত দেখে কায়েমী স্বার্থবাদী তথা পুঁজিপতি, জায়গীরদার ও ইংরেজ তাবেদার শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ও নিজ সন্তানদের ভাগ্য রচনার ধান্ধায় ইসলাম ও খিলাফতে রাশিদার নাম উচ্চারণ করে তোমাদের প্রতারিত করতে চায়। ইসলামী হুকূমতের মত এক সুমহান কাজ সম্পাদনের জন্য নিজেদের চিরাচরিত ভোগ বিলাসের জীবন উৎসর্গিত করার মত ঈমান তাদের আদৌ নেই। কাজেই ওহে ভারতবাসী! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভেবে চিন্তে কাজ কর। বিভক্তির পরিণামে ইউপি, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি এলাকার কোটি কোটি মুসলমানের উপর অচিরেই কিয়ামত নেমে আসবে। তখন তোমাদের আহাজারী শোনার মতও কেউ থাকবে না। পাকিস্তানের নামে তোমাদের এই ভোট তোমাদেরই ভাগ্য বিনষ্ট করবে, তোমাদেরই উপর বিপদ সওয়ার করে দিবে।[৩৭৯]

এদিকে লীগ সমর্থক আলিমরা পাকিস্তান ও ইসলামী হুকূমত অর্জনের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছে মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন জয্‌বা ও আবেগময়

---

৩৭৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭১; আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০২।

ঘটনা তুলে ধরেন। তাঁরা সাহাবায়ে কিরামের জিহাদী প্রেরণা, কুরবানী, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ঘটনাবলী উচ্চারণ করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে এক অদ্ভুদ উন্মাদনার উদ্রেক করে বলেন, প্রিয়নবী নিজ জন্মভূমি মক্কায় যখন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখলেন না, তখন হিজরত করে চলে যান মদীনায়। তারপর মদীনায় ইসলামের শক্তি অর্জিত হলে তিনি মক্কাও জয় করে নেন। আজ আমরাও এমন একটি ইসলামী সরকার গঠন করতে চাই। আমাদের কাঙ্ক্ষিত এ সরকার হবে কুরআনী সরকার। এখানে খিলাফতে রাশিদার আদলে হুদূদ ও কিসাস চালু হবে। এভাবে পাকিস্তান নিজের কাঙ্ক্ষিত শক্তি অর্জন করলে এক সময় ভারতও আমাদের করায়ত্ত হয়ে যাবে। যদি ঐ পর্যন্ত আমরা না যেতে পারি তাহলে সাহাবীগণ যেভাবে 'দারুল কুফ্র' থেকে হিজরত করে 'দারুল ইসলামে' চলে গিয়েছিলেন, আমরা ভারতীয় ৩ কোটি মুসলমান সেভাবে হিজরত করে পাকিস্তান চলে যাব।

লীগপন্থী আলিমরা আরো বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতের হিন্দুরা এ উপমহাদেশের কোথাও কুরআনী আইন ও ইসলামী সরকার গঠিত হোক তা আদৌ পছন্দ করে না। আর এই কারণেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সৃষ্টি কিংবা ভারত বিভক্তির প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত নয়। কংগ্রেস সমর্থনকারী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ করে লীগপন্থী আলিমরা বলেন, যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলে, তারা বস্তুত নিজেদের ঈমান হিন্দুদের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে। তারা কংগ্রেসের এজেন্ট, হিন্দুদের বেতনভুক্ত দালাল। কাজেই তোমাদের এক একটি ভোট মুসলিম লীগকে প্রদান করে এ কথার স্বাক্ষর রাখতে হবে যে, উপমহাদেশের মুসলমান আজো ইসলামের জন্য নিজেদের সকল কিছু উৎসর্গ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[৩৮০]

ঐ আলিমগণের এহেন জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ধারণার উদ্রেক হয় সেটি ছিল যে, উপমহাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বস্তুত ইসলাম ও কুফ্‌রের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধে একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে মুসলিম লীগের সমর্থন করা এবং ইসলামী ফৌজে ভর্তি হয়ে কুফ্‌রকে পরাস্ত করা একান্ত কর্তব্য। উল্লেখ্য, এই বক্তব্য ও অনুভূতি যখন আলিমগণের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পর আলিম নয় এমন ব্যক্তি কিংবা ইংরেজী শিক্ষিতদের নিকট পৌছে এবং ঐ বক্তব্য যখন তারা নিজেদের ভাষায় উচ্চারণ করে মঞ্চ উত্তপ্ত করেন, তখন একই বক্তব্য দ্বিগুণ এমনকি চতুর্গুণ শক্তিতে পরিণত হয়ে মুসলিম যুবকদের মধ্যে এক অপূর্ব নেশার

---

৩৮০. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৭।

উদ্রেক করে দেয়। তখন যুবকদের হাতে যেন নাঙ্গা তরবারী তুলে দেওয়া হয়েছিল, আর তারা ঐ তরবারী অত্যন্ত নির্মমভাবে ব্যবহার করে চলেছিল। কারণ তখন বড় বড় মুফ্তীদের দেওয়া ফত্ওয়া অনুসারে ঐ যুবকরা নিজেদেরকে ইসলামী ফৌজেরই এক এক জন সিপাহী ও মুজাহিদ জ্ঞান করতে থাকে।

নির্বাচন যুদ্ধের এই মোকাবেলা যেহেতু সরাসরি হিন্দুদের সাথে ছিল না বরং মোকাবেলা ছিল জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, মজলিসে আহ্রার ও দেশপ্রেমিক বিপ্লবী আলিমগণের সাথে, এক পক্ষে মুসলিম লীগ আর অপর পক্ষে দীর্ঘ কালের মুজাহিদ উলামা, সেহেতু লীগ বাহিনীর সকল গোস্যা ও ক্রোধ গিয়ে পতিত হয় সেসব আলিমগণেরই উপর। ফলে বিপ্লবী আলিমগণেরকে অপমান অপদস্থ করার এমন কোন বিকল্প অবশিষ্ট রাখা হয়নি যা লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা কার্যকরী না করেছিল। বস্তুত নির্বাচনের প্রাক্কালে সমগ্র উপমহাদেশ বাস্তবিকভাবেই একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। আর এ যুদ্ধ মুসলমানদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরই যুদ্ধ। যুদ্ধে একদিকে ছিলেন চিরবিপ্লবী ও সংগ্রামী উলামা আর অপর দিকে ছিলেন ইংরেজ পোষ্য লীগের তাবেদার মুসলমানবৃন্দ। লীগের নেতারা এ যুদ্ধে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী আলিমগণের জন্য সমগ্র উপমহাদেশকে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে দেন। আলিমগণের পেছনে যত্রতত্র গুণ্ডা বাহিনী লেলিয়ে দেন।[৩৮১]

জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের কোন নেতা ঐ গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। হযরত শায়খুল ইসলামকে রীতিমত খুন করার চেষ্টা করা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উপরেও আক্রমণ চলে। হযরত মাওলানা আবদুর রায্যাক মালীহাবাদীকে গুণ্ডারা আহত করে। মাওলানা নাসীর ফয়যাবাদী ছুরিকাহত হন। তবে সবচেয়ে কঠিন নিপীড়নের মুখে পতিত হন হযরত শায়খুল ইসলাম নিজে।[৩৮২]

১৯৪৬ সালের ২৭ এপ্রিল মাওলানা আযাদ শিমলায় অনুষ্ঠিত কেবিনেট মিশনের সাথে মিটিং করে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে গাড়ী আলীগড় স্টেশনে পৌছলে লীগ কর্মীরা শিকল টেনে গাড়ী থামিয়ে দেয়। তারপর মাওলানার সামনে এসে তাঁকে অপমান করার জন্য নিজেরা উলঙ্গ হয়ে নৃত্য প্রদর্শন করে। গাড়ী চলতে শুরু করলে পুনরায় শিকল টানা হয়। এভাবে এক ঘন্টা তাঁর উপর উৎপীড়ন চলে। পরদিন লীগ মুখপত্র 'ডন' পত্রিকায় মন্তব্য করে বলা হয়, এ অশ্লীল আচরণ যেটি

---

৩৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০১; অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (কলিকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, বাংলা ১৩৯৭), পৃ ৪৩৮।

৩৮২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৩।

লীগ নেতাদের ইঙ্গিতে করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, যারা রাজনীতিতে Show boy -এর কাজ করে তাদের ভাগ্যে পুষ্পমাল্যের পরিবর্তে ইট পাটকেলই জুটে থাকে।[৩৮৩]

পাকিস্তান লাভের নির্বাচন যুদ্ধে লীগ কর্মীরা হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর উৎপীড়ন চালায় আরো নির্মমভাবে। অক্টোবরে তিনি পাঞ্জাব যাচ্ছিলেন। গাড়ী অমৃতসর স্টেশনে পৌছলে লীগ কর্মীরা তাঁর উপর চড়াও হয়। তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে। তাঁকে নানা রকমের বিদ্রূপ, লজ্জাজনক শ্লোগান ও গালিগালাজ দ্বারা উত্যক্ত করে। দূর থেকে তাঁর মাথার উপর টমেটো নিক্ষেপ করা হয়। একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে আক্রমণের জন্য গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে আবদুর রশীদ নামক জনৈক যুবক দরজায় দাঁড়িয়ে যায় এবং শক্তভাবে প্রতিরোধ করে। ফলে দুর্বৃত্তরা আবদুর রশীদের উপর চড়াও হয়। তাকে বেদম প্রহার করে। তার ২টি দাঁত ভেঙ্গে দেয়। এতদসত্ত্বেও ঐ যুবক তাদেরকে হযরত মাদানী পর্যন্ত পৌছতে দেয়নি। এ যুবক কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিল না। নিজের প্রয়োজনে স্টেশনে এসেছিল। এখানে কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল লোক একজন বয়োবৃদ্ধ মুসাফিরের সাথে বেআদবী করতে দেখে সে নিজ থেকে প্রতিরোধের উদ্যোগ নিয়েছিল।[৩৮৪]

হযরত শায়খুল ইসলামের গাড়ী জলন্ধর স্টেশনে পৌছলে লীগ কর্মীরা সেখানেও তাঁর গতিরোধ করে। তাঁকে ঘিরে ধরে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকে। তাঁর শরীরের উপর নাপাক ময়লা নিক্ষেপ করে। সিট থেকে বালিশ কেড়ে নেয়। মাথা থেকে টুপি নিয়ে ছিড়ে ফেলে। তাঁর দাঁড়ি ধরে টানাটানি করে। শামসুল হক নামক লীগের এক কর্মী তাঁর গায়ের উপর হাত তুলেছিল। শায়খুল ইসলামের খাদিম ঐ পরিস্থিতি দেখে নিজকে স্থির রাখতে পারেনি। তাই পাল্টা আক্রমণের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে শায়খুল ইসলাম তাকে বারণ করে বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। বরদাশত না হলে অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে যাও। আমাকে আমার অবস্থার উপর থাকতে দাও। ইত্যবসরে গাড়ী ছেড়ে দিলে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।[৩৮৫]

নির্বাচনের ঐ সময় তিনি হযরত মাওলানা হিফ্যুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ মুলতান গমন করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় গাড়ী লাহোর পৌছলে লীগ কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়, গালিগালাজ করে এবং তাঁকে কংগ্রেসের

---

৩৮৩. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **হায়াতে শায়খুল ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১২।

৩৮৪. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৪।

৩৮৫. প্রাগুক্ত।

দালাল, হিন্দুদের গোলাম বলে উত্যক্ত করে। ঐ লোকেরা এক পর্যায়ে রেল লাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে তাঁর সীটের দিকে নিক্ষেপ করে। ফলে গাড়ীর জানালা ও গ্লাস ভেঙ্গে যায়। আক্রমণে মাওলানা হিফযুর রহমান হাতের কব্জিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৩৮৬]

এ সময় তিনি রংপুর পৌছলেও একই ঘটনা ঘটে। গাড়ী থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লীগের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর সঙ্গী খাদিমরা তাঁকে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছিল বিধায় দুর্বৃত্তরা খাদিমদের মারধর করে। তাদেরকে বেদম লাথি ঘুষা মেরে চীৎকার দিয়ে বলে যে, ঐ কাফির বেঈমানটাকে (হযরত মাদানী) ধরে নীচে ফেলে দাও। ওকে পা দিয়ে পিষে ফেল। টুকরা টুকরা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও ইত্যাদি। স্টেশন থেকে বের হলে আবার শুরু হয় উৎপীড়ন। তাঁকে মারার জন্য লীগ কর্মীরা ছুটে আসে। তাঁর দিকে গোবর ছুড়ে মারে। একজন তাঁর শরীরে আঘাতের জন্য লাঠি ঘোরাতে থাকে। তাঁর মাথা থেকে টুপি নিয়ে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কয়েকজন হযরত শায়খুল ইসলামকে সাহায্য করেছিল। ঐ শিক্ষার্থীরা লীগকর্মীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিজেরাও রক্তাক্ত হয়। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে শায়খুল ইসলাম স্টেশনে ফিরে আসেন। ওয়েটিং রুমে বসে তিনি বলছিলেন, আজ আমার সাথে যে দুঃখজনক আচরণ করা হল, অতীত কালে ভারতীয় বীর পুরুষদের অনেকেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটবে। তবে সেই দিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন ভারতীয় মুসলমানদেরকে এর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। সেই করুণ পরিস্থিতি হয়ত তোমরা নিজ চোখেও দেখে যাবে।[৩৮৭]

তিনি পরদিন কাটিহারে পৌছেন। সেখানেও তাঁকে অপমান করা হয়। তিনি ভাগলপুর পৌছলে পশ্চাদ দিক থেকে প্রাইভেট কারের ভিতর তাঁকে ছুরি মারা হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। আঘাত ফস্‌কে গিয়ে গাড়ীর বডিতে লাগে। ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। নির্বাচনের সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর সাথে এ ধরনের ন্যক্কারজনক আরো বহু আচরণ লীগ কর্মীরা করে। দুঃখের ব্যাপার যে, এসব অশ্লীল আচরণ পাকিস্তান কায়েম, ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনের শিরোনামে করা হয়েছিল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এত সব অপমান ও অপদস্থ করেও হযরত শায়খুল ইসলামকে নিজের অবিচলতা

---

৩৮৬. আসরারুল হক কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

৩৮৭. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪১।

থেকে বিন্দু মাত্র হটানো সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ লীগ নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম তথা ইসলামকে ব্যবহার করেছেন। তারা মানুষের ধর্মানুভূতিকে এমন সুকৌশলে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে ছিলেন যে, সেখান থেকে সাধারণ মুসলমান নিষ্কৃতি পাওয়ার চিন্তাও করতে পারেনি। ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার ঐ ধূম্রজাল সকলকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল।[৩৮৮]

চার

১৯৪৬ -এর নির্বাচনে কংগ্রেস সমগ্র ভারতে ব্যাপক বিজয় ও সরকার গঠনের উপযুক্ততা অর্জন করে। মুসলিম লীগ একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন সুবায় সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবাগুলোর সীমান্ত প্রদেশে সরকার গঠন করে কংগ্রেস। পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট পার্টির হাতে চলে যায়। সিন্ধু প্রদেশেও পর্যাপ্ত আসন না থাকায় লীগের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব হয়নি। তবে এ নির্বাচনে লীগ নিজেকে মুসলমানদের বৃহত্তম দল প্রমাণে সক্ষম হয়। মুসলিম সীটগুলোর মধ্যে লীগ ৮৫% সীট অর্জন করে। অবশিষ্ট ১৫% সীট অর্জন করে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সংগঠন। ফলে মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী একক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে লীগের যেই দাবী প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন ছিল, সেটি অনায়াসেই প্রমাণিত হয়।[৩৮৯]

ঐ বছর মার্চে স্বাধীনতার রূপরেখা ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য বৃটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আগমন করেন। মিশনের সদস্য ছিলেন পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডার। মন্ত্রীমিশন ১ এপ্রিল থেকে শিমলায় কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবন্দের সাথে বৈঠক শুরু করেন। কিন্তু কোন মতৈক্যে পৌছা সম্ভব হয়নি। মিশন জমইয়তে উলামার নেতৃবৃন্দকেও আহ্বান করে। জমইয়ত ঐ বৈঠকে 'মাদানী ফর্মূলা' পেশ করলে তাঁরা গভীর আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করেন এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ও পর্যালোচনা করে যান। ১৬ এপ্রিল বিকাল ৪টা থেকে সোয়া ৫টা পর্যন্ত মিশনের সাথে জমইয়ত নেতৃবৃন্দের বৈঠক চলে। বৈঠকের নির্ধারিত সময় ছিল মাত্র অর্ধ ঘন্টা। কিন্তু সেখানে সোয়া ১ ঘন্টা বৈঠক অব্যাহত থাকে। মন্ত্রীমিশন ঐ ফর্মূলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং উত্তর শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তাদের সন্তুষ্টির মূল্যায়নে এতটুকুই বলা যায় যে, ১

---

৩৮৮. **আর্ রশীদ পত্রিকা**, মাদানী ও ইকবাল সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১২।

৩৮৯. Harun-or Rashid, **Foreshadowing of Bangladesh**, p. 232.

মাস যাবত আলোচনা-পর্যালোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের কারণে মিশন নিজের পক্ষ থেকে যেই পরিকল্পনা পেশ করেছিল সেটি ছিল বস্তুতঃ মাদানী ফর্মূলারই ছায়া বিশেষ।[৩৯০]

ভারতের বিভক্তি ও পাকিস্তান নামে পৃথক ভূখণ্ড রচনার প্রস্তাব মিশন সদস্যদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। তাঁদের দৃষ্টিতে ঐ প্রস্তাবের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের গন্ধ রয়েছে। এভাবে পৃথক ও বিভক্ত হওয়ার দ্বারা পাকিস্তান ভূখণ্ড নিজ পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু লীগনেতারা একমাত্র পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাবে সম্মত ছিল না বিধায় মিশন শেষ পর্যন্ত নিজস্ব পরিকল্পনার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করে।[৩৯১]

মিশন প্রদত্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে লীগের কাউন্সিলে ৩ দিন পর্যন্ত পর্যালোচনা চলে। শেষ দিবসে জিন্নাহ সাহেব এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কিছু নেই। কাজেই তিনি লীগ নেতৃবৃন্দকে মিশনের পরিকল্পনা অনুমোদনের পরামর্শ দেন।[৩৯২]

মন্ত্রীমিশনের উপরোক্ত উদ্যোগের ফলে বহু দিন পর পুনরায় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐকমত্যের পরিবেশ ফিরে আসে। তবে এ ঐকমত্য স্থায়ী হয়নি। পরিকল্পনা মঞ্জুরীর পর মাওলানা আযাদ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন পণ্ডিত জরহরলাল নেহরু। তখন সাংবাদিকরা জওহরলালকে মিশন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি লঘু মন্তব্য করেন।[৩৯৩] পরদিন জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা দেন যে, কংগ্রেস সভাপতির লঘু মন্তব্যের কারণে লীগ নিজের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করবে। এভাবে মতৈক্যের পরিবেশ পুনরায় ঘোলাটে হয়ে যায়।

---

৩৯০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **হায়াতে শায়খুল ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩।

৩৯১. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮১।

৩৯২. ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫০।

৩৯৩. ১০ জুলাই নেহরু সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, কংগ্রেস কি মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে মেনে নিয়েছে। উত্তরে নেহরু বলেন, চুক্তির কারণে কংগ্রেস দায়বদ্ধ নয়। পরিস্থিতি যেভাবে দেখা দেবে তার মোকাবেলার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস আগ্রহী। কিন্তু তাতে ইংরেজ অথবা এ ধরণের অন্য কারো হস্তক্ষেপ মেনে নিতে কংগ্রেস রাযী নয় (ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৮২)

ঐ বছর মে মাসে জিন্নাহ সাহেব ব্রংকাইটিস রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। তাঁর খুব বেশী দিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বলে ডাক্তারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ফলে তিনি দ্রুত পাকিস্তান কায়েমের প্রতি সবিশেষ মনযোগী হন। ইস্পাহানী জিন্নাহর সেই অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন, ডাক্তার তাঁর ফুসফুসের এক্সরে করে রিপোর্ট দিলেন যে, তিনি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। তিনি যদি টেনশন করা থেকে মুক্ত না থাকেন এবং অতিমাত্রার ধূমপান ও মদ্যপান বর্জনপূর্বক বিশ্রামের দিকে মনোযোগ না দেন, তাহলে তাঁর পক্ষে ১/২ বছরের বেশী বেঁচে থাকা অসম্ভব। জিন্নাহ সাহেব ভাল করেই জানতেন যে, এই অসুস্থতার সংবাদ কংগ্রেসের কানে মোটেও পৌঁছানো যাবে না। তাহলে কংগ্রেস রাজনৈতিক বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলবে এবং জিন্নাহ্র মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে। পরিণামে পাকিস্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য মাটি হয়ে যাবে।[৩৯৪]

কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেলের মানসিক অবস্থাও ছিল ঠিক তদ্রূপ। পর পর ২ বার তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়। দুই বারই তিনি বেঁচে যান তবে ৩য় বারে হয়ত ইহজগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই প্যাটেলের মনেও দ্রুত কিছু ঘটে যাওয়া এবং পরিণাম সম্পর্কে কিছু একটা স্বচক্ষে দেখে যাওয়ার মানসিকতা প্রবলভাবে কাজ করছিল।[৩৯৫]

এই প্রেক্ষিতে জিন্নাহ্ ১৬ আগস্ট বিখ্যাত 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' ঘোষণা দেন। ঐ তারিখে লীগ শাসিত বঙ্গদেশে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী আলিমগণ লীগ সরকারকে ছুটির ঘোষণা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। অবশেষে সেই তারিখেই ঘটে যায় কলিকাতা ও নোয়াখালীর হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। ঐ দাঙ্গার প্রতিবাদে কংগ্রেস শাসিত বিহার সুবায় হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে খুন করে। দাঙ্গার আগুন বিহার থেকে দিল্লী ও ইউপি-এর দিকেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্যাটেল দাঙ্গার সংবাদে প্রচণ্ড উত্তেজিত হন। তিনি নিজেও হিন্দুদের পক্ষ হয়ে সশস্ত্র মোকাবেলার জন্য উত্তর ভারতে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের ঐ সব এলাকায় জমইয়তে উলামার নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম মাদানী যথাসময়ে পৌঁছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উত্তর ভারত দাঙ্গার রক্তপাত থেকে কোন মতে

৩৯৪. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮৮।

৩৯৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, উলামায়ে হক, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৫।

রক্ষা পায়।[৩৯৬] উল্লেখ্য, ডাইরেক্ট এ্যাকশন অভিযান পরিচালিত হওয়ার পর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমের বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এ বিশৃংখল পরিস্থিতির ভিতর ১২ আগস্ট মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয়। তাতেও শুরু হয় আবার সেই মন্ত্রিত্বের কোন্দল। লীগ শীর্ষনেতাদের মধ্যে চৌধুরী খালীকুয্যামান, খাজা নাযিমুদ্দীন ও নওয়াব ইসমাঈল খান মন্ত্রিত্বের জন্য শক্তিশালী লবিং করেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিত্বের জন্য মনোনীত হন আই.আই.চন্ডিগড়, আবদুর রব নশ্তর ও রাজা গযন্‌ফর আলী প্রমুখের ন্যায় স্বল্প পরিচিতির নেতৃবৃন্দ।[৩৯৭]

অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রণালয় বণ্টনেও দেখা দেয় তুমুল প্রতিযোগিতা। লীগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য দাবী করে। বল্লব ভাই প্যাটেল ঐ মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই সম্মত নন। কংগ্রেস থেকে অনেক অনুরোধ করেও তাঁকে দাবী প্রত্যাহারে সম্মত করা যায়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস লীগকে অর্থ মন্ত্রণালয় অর্পণ করে। কংগ্রেসের ধারণা ছিল, লীগ প্রথমতঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হবে না। আর সম্মত হলেও শীঘ্রই ব্যর্থ হয়ে পরিত্যাগে বাধ্য হবে। উভয় অবস্থায়ই কংগ্রেসের বিজয় রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়াল সম্পূর্ণ বিপরীত। লীগের পক্ষ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয় নওয়াবযাদা লিয়াকত আলী খানের উপর। তিনি সুদক্ষ সচিব চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর সহযোগিতায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর নিজের এমন কর্তৃত্ব স্থাপন করেন যে, অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় এই এক মন্ত্রণালয়ের অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সর্দার প্যাটেল, যিনি মনে মনে ডবল মন্ত্রণালয়ের আশা পোষণ করতেন, তিনি এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের দয়া ব্যতিরেকে নিজ মন্ত্রণালয়ের একজন পিয়নও নিযুক্ত করার সুযোগ পাচ্ছেন না। মাওলানা আযাদ বলেন, টানাপড়েনে ক্রমে পরিস্থিতি এত তিক্ততায় পৌছে গিয়েছিল যে, প্যাটেলের মত নেতাও ভারত ভূখণ্ডের নিরাপদ সামান্য অংশ পেয়ে যদি লীগের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেটিই পরম প্রাপ্তি বোধ করতে থাকেন।[৩৯৮]

অন্যদিকে লন্ডনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভারতকে যথাশীঘ্র বিভক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ভাইসরয়ের উপর চাপ দিতে থাকে। ভাইসরয় ওয়াভেল

---

৩৯৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯৫।

৩৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯৭।

৩৯৮. আবুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৯।

মানবতাবাদী ছিলেন। তাঁরই সক্রিয় সহযোগিতার দরুন মন্ত্রীমিশন জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার ভিত্তির উপর একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর কাছে বিভক্তির অনিবার্য জের হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু-মুসলিম রক্ষারক্তির বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানান যে, শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম ব্যতিরেকে বিভক্তির ঘোষণা দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হবে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হয়নি। অবশেষে তিনি নিজে আন্তর্জাতিক খিয়ানতের ঐ কালো দলীলে স্বাক্ষর করার পরিবর্তে নিজে ইস্তফা দিয়ে লন্ডন চলে যান।[৩৯৯]

১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে ভারতে পদার্পণ করেন মাউন্ট ব্যাটেন (১৯৪৭)। বৃটেন তথা ইউরোপীয়দের স্বার্থ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁর আগমনের লক্ষ্য। তিনি কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর মূল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করেন যে, দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী কয়েকজন শীর্ষনেতাকে সম্মত করা গেলে ভারত বিভক্তির পথে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। লীগের সভাপতি জিন্নাহ সাহেব বিভক্তির জন্যই লড়াই করে যাচ্ছেন। অবশিষ্টদের মধ্যে জওহরলাল ও মহাত্মা গান্ধীর বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জওহরলালকে সম্মত করার জন্য তিনি কৃষ্ণ মেননকে কাজে লাগান। তবে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন তাঁরই স্ত্রী লেডী মাউন্ট ব্যাটেন।

মহাত্মা গান্ধীকে সম্মত করতে তাঁর বেগ পেতে হয়। তিনি এ জন্য প্রধানতঃ ব্যবহার করেছিলেন বল্লভ ভাই প্যাটেলকে।[৪০০] প্যাটেল ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পোষণ করলেও গান্ধীর কাছে তিনি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। গান্ধীই তাঁকে সর্দার উপাধি দেন। এভাবে সর্দার প্যাটেলের অবিরাম চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত গান্ধীও বিভক্তির জন্য সম্মত হয়ে গেলে ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমানের জীবন বিপন্ন হওয়ার উদ্যোগকে ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে জমইয়তে উলামার নির্মোহ মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। উল্লেখ্য, পরিস্থিতি এতটুকু পর্যন্ত গড়ালেও বিপ্লবী আলিমগণ নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল ও অবিচল থাকেন। ঐ সময় ১০ মে জমইয়তের অধিবেশন বসে। নেতৃবৃন্দ তখনো পূর্ণ শক্তি দিয়ে ব্যক্ত করেন যে, ভারতের বিভক্তি ভারতীয়দের জন্য বিশেষ

---

৩৯৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০০।
৪০০. আবুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭।

করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত। এটি যৌক্তিক ও মানবতাবাদী সিদ্ধান্ত নয়।[৪০১]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বিভক্তি সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সাথে শেষ পর্যন্তও কোন আপোস করেননি। ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম গ্রন্থে চূড়ান্ত মুহূর্তের নির্মম সত্য উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

গান্ধীজী মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে সাক্ষাতের জন্য দিল্লী আসছেন-এ সংবাদ শুনে আমরা তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলাম। ১৩ মার্চ তিনি দিল্লী পৌছলে আমরা তাঁর সাক্ষাতে যাই। আমাকে দেখে তিনি প্রথমেই বলে উঠলেন, বর্তমানে বিভক্তির ব্যাপারটি আশংকায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, বল্লভ ভাই প্যাটেল এমনকি জওহরলালও হাতিয়ার সমর্পণ করে দিয়েছেন। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত থাকবেন? না আপনিও মত পরিবর্তন করে ফেলেছেন? আমি বললাম, আমি তো বরাবরই বিভক্তির বিরুদ্ধে আছি। তবে আজ যতখানি কঠিনভাবে আছি ইতোপূর্বে কখনো এমন ছিলাম না। আমারও দুঃখ হয় যে, শেষ পর্যন্ত জওহরলাল ও প্যাটেল আত্মসমর্পণ করে ফেলল? আপনার ভাষায় হাতিয়ার ছেড়ে দিল? এখন আমার সকল আশা কেবল আপনার উপর। আপনি যদি বিভক্তির বিপক্ষে অটল থাকেন, তাহলে সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। আর যদি আপনিও তাতে সম্মত হয়ে যান, তাহলে গোটা ভারত বিধ্বস্ত হবে। গান্ধীজী বললেন, আমার সম্মতির প্রশ্নই উঠে না। যদি কংগ্রেস বিভক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করতে চায়, তাহলে আমার লাশের উপর দিয়ে হেটে গিয়ে তার অনুমোদন সম্ভব হবে। যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন বিভক্তির প্রস্তাব কোন ক্রমেই আমার অনুমোদন পাবে না।[৪০২]

মাওলানা আযাদ বলেন, তারপর গান্ধীজী মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে পরপর ৩ বার বৈঠকে বসেন। সর্দার প্যাটেল ২ ঘন্টা তাঁর সাথে একান্তে আলাপ করেন। এ সকল বৈঠকে কি কথা হয়েছিল তা যদিও জানা যায়নি, তবুও পরে আমি যখন পুনরায় গান্ধীজীর সাক্ষাতে গেলাম, তখন আমি আমার গোটা জীবনের সবচেয়ে

---

৪০১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

((اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ))

মুমিন বান্দার অন্তদৃষ্টি ভয় করে চল, কারণ তিনি মহান আল্লাহর নূর দ্বারা দর্শন করে থাকেন।

৪০২. আবুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২০১-২০৪।

কষ্টকর আঘাতটি অনুভব করলাম। আমি দেখলাম যে, গান্ধীজীর মতামতও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তিনি যদিও তখন পর্যন্ত আমার কাছে বিভক্তির পক্ষে পরিষ্কার কিছু বলেননি, তবে বিভক্তির বিপক্ষেও কঠিন কথা উচ্চারণ করেননি। আমি আরো ব্যথিত হলাম যে, বিভক্তির পক্ষে তিনি তখন ঐ সকল যুক্তিই পেশ করেছেন যেগুলো ইতোপূর্বে সর্দার প্যাটলের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে আসছিল। আমি তার পরেও দীর্ঘ ২ ঘন্টা তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। তাতে কোন ফল হয়নি। পরিশেষে আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে বললাম, যদি তাই হয় তাহলে ভারতবর্ষকে আর অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা করা সম্ভব হল না।[৪০৩]

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরই অবিচল থাকেন। কখনো কোন শত্রুতা, বিরুদ্ধাচরণ, আঘাত, তিরস্কার কিংবা নিপীড়ন তাঁকে মানবতাবাদের পক্ষাবলম্বন থেকে স্খলিত করতে পারেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ মুহূর্তে পৌছে যেখানে জওহরলাল নেহরু ও মহাত্মা গান্ধীর মত নেতৃবৃন্দও সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির সম্মুখে আত্মসমর্পণ করে বসেছেন, মানবতাবাদের ঐ সিংহ পুরুষ সেখানে পৌছেও নিজ আদর্শের উপর অটল অবিচল। তবে ভারতবাসীর ভাগ্যে দুর্ভোগ ছিল বলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ অসম্মতি সত্ত্বেও ইংরেজ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়।[৪০৪]

ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে দুই খণ্ডে অবস্থিত মানুষের কাছে তিনি ঐ মানবতাবাদেরই পবিত্র পয়গাম পেশ করেন। বিভক্তির পর পাকিস্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় উত্তর দিয়ে বলেন, মানবতাবাদের অবলম্বন করা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক। উভয় ভূখণ্ডের সকলেই ইসলাম ও মানবতাবোধের পক্ষ হয়ে নিজ নিজ ভূখণ্ডের ভালবাসা, সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়া জরুরী। কারণ কোন স্থানে মসজিদ নির্মাণের পূর্বে মতবিরোধ করা যায়। এ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা উচিত কিংবা অনুচিত, ভাল কি মন্দ, উত্তম বা অনুত্তম ইত্যাকার বিষয়ে পর্যালোচনা করা যায়, স্বাধীন মতামত দেওয়া যায়। কিন্তু মসজিদ নির্মিত হয়ে গেলে তখন আর সেই সুযোগ থাকে না। তখন ঐ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। তার সম্মান রক্ষা করা পক্ষ-বিপক্ষ সকলের জন্যই কর্তব্য।[৪০৫] ইসলামের মহান মানবতাবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে

---

৪০৩. প্রাগুক্ত।

৪০৪. আসরারুল হক কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০১-২০৪।

৪০৫. আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।

উভয় ভূখণ্ডে অবস্থিত মুসলমানদের কল্যাণে কাজ করা সকলের জন্য আবশ্যক। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হল ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদিগকে কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে। এটি তাক্‌ওয়ার নিকটতর। আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন। (৫ ঃ ৮)

বিভক্তির পরিণাম

এক

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মাউন্ট ব্যাটেন বিভক্তির ঘোষণা দেন। বিশ্বমানচিত্রে তখন পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশ আত্মপ্রকাশ করে। মাউন্ট ব্যাটেনের এই ঘোষণায় ১৮০৩ সাল থেকে বিপ্লবী উলামা স্বাধীনতা ও আযাদীর যে জিহাদ পরিচালনা করে আসছিলেন সেটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেও তাঁরা যেই আঙ্গিকে স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলেন সেই আঙ্গিকে প্রদান করা হয়নি। ফলে পরম আনন্দের ঐ দিবসে অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রায় অর্ধ জনপদের অধিবাসীরা ভয়ানক নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যায় এবং স্বাধীন ভারতের ভিতরে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমান মুহূর্তের মধ্যে বিদেশী নাগরিকে পরিণত হয়। তাছাড়া নতুন ২ রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে দীর্ঘ ৬ শত বছরের পৈতৃক ভিটা মাটি থেকে শুরু করে সর্ব প্রকারের সহায়-সম্পত্তি পাই পাই হিসাব করে বন্টনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বিভক্তির ঘোষণার পর মুসলমানদের যারা সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্তান ভূখণ্ড বলে অংকিত চৌহদ্দীর ভিতর ছিলেন তারা তো পরম আনন্দিত ও পরম তৃপ্ত। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত ভূখণ্ড বলে অংকিত সীমানার মধ্যে ছিলেন, তাদের মাথার উপর আসমান ভেঙ্গে পড়ে। তারা ঐ মুহূর্তে সন্তান-সন্ততি নিয়ে গৃহবন্দী, ক্ষুধার্ত, সাত-পুরুষের ভিটায় দাঁড়িয়েও প্রাণের ভয়ে শংকিত ও সন্ত্রস্ত। ফলে

তাদের কেউ হিজরত করে পাকিস্তানে আশ্রয়ের চেষ্টা করে। আর কেউ অজানার পথে পাড়ি দিয়ে লাঞ্ছিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেয়।[৪০৬]

বন্টনের ঘোষণা মোতাবেক ২ দেশের চৌহদ্দী চিহ্নিত হলে দুই দেশের সীমান্তে জ্বলে উঠে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার ভয়াবহ দাবানল। পশ্চিমাঞ্চলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে নিরিহ হিন্দু ও শিখদের রক্ত হালাল করা হয়। আর পূর্বাঞ্চলে 'ভারত মাতার জয়' রব তোলে নিরাশ্রয় মুসলমানদের খুন করার জঘন্য কাণ্ড চলে। নিরাপত্তা বিধানের জন্য পৃথিবীর সকল দেশে পুলিশ ও আর্মি সেবামূলক কাজ করে থাকে। কিন্তু উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক নেতারা ঐ পুলিশ ও আর্মিকেও পেশীশক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।[৪০৭] মাওলানা আযাদ তাই দুঃখ করে বলেন, আমার বিশ্বাস সেনাবাহিনী যদি বিভক্ত করা না হত, তাহলে বিভক্তির ঘোষণার অব্যবহিত পরে রক্তপাতের যে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল তা ঘটতে পারত না। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমার সহকর্মীরা আমাকে সাহায্য করেনি। তারা সেনাবাহিনী অবিভক্ত রাখার কঠিন বিরোধিতা করেন। আমার আরো দুঃখ হয় যে, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ যিনি একজন শান্তিপ্রিয় ও দয়ালু প্রকৃতির লোক হিসেবে সুপরিচিত, তিনিও সেনাবাহিনীর বিভক্তির পক্ষে মতামত দেন। মাউন্ট ব্যাটেন আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, ভারতীয় হিন্দু সৈন্যরা মুসলমানদের নিধনযজ্ঞে অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষী ছিল। আমাদের বৃটিশ অফিসাররা অনেক কষ্টে তাদের বারণ করেন।[৪০৮]

দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দুর্বৃত্তরা পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করে রাখে। পাঞ্জাব সিআইডি পুলিশের প্রধান পরিচালক মি.সবুজ তখন শিখদের একটি কট্টরপন্থী দল ও আরএসএস নামে হিন্দুদের একটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রচিত এক মহা ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন। ঐ ষড়যন্ত্রের ফলে ১২ আগস্ট রাতে পাকিস্তানগামী প্রথম যেই গাড়ীটি সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, রেকর্ডপত্র ও দলীল-দস্তাবেজসহ পাকিস্তানের নতুন সচিবালয় উদ্বোধনের জন্য যাত্রা করেছিল, সেটি পথিমধ্যে গড্ডারিয়া স্টেশনে পৌছা মাত্রই সকল যাত্রীসহ বিধ্বস্ত হয়। ২ দিন পর ১৫ আগস্ট দুপুরে লাহোর থেকে ছেড়ে আসা 'ডাউন এক্সপ্রেস-১০' অমৃতসরে পৌছলে দেখা গেল গাড়ীর জানালাগুলো উন্মুক্ত, কিন্তু দরজাগুলো বন্ধ। ভিতরে যাত্রীদের শুধু লাশ পড়ে আছে। গাড়ীর পেছনে সাদা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, এ গাড়ী

---

৪০৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১৮।

৪০৭. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮।

৪০৮. আবুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২২০।

আমরা নেহরু ও প্যাটেলের নামে স্বাধীনতার প্রথম সওগাত হিসেবে প্রেরণ করলাম।[৪০৯]

এভাবে মুহূর্তের মধ্যে দুই ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শুরু হল সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা ও রক্তারক্তি, যা দ্রুত বড় বড় জনপদ থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে মুসলমানদের ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করা হয়। বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি। পর্দানশীন মুসলিম মহিলা যাঁদেরকে চন্দ্র-সূর্যও কোন দিন দেখেনি, বর্বর হিন্দু ও শিখরা তাঁদের জবরদস্তি গৃহ থেকে টেনে বের করে আনে, তাঁদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে, তাঁদের তরুণী ও যুবতীদের নিজগৃহে আটক করে। মুসলিম নিষ্পাপ শিশুদের হাত-পা টেনে ছিড়ে ফেলে দেয়। তাদের লাশগুলোকে কুকুর, শৃগাল ও চিলের আহার্যে পরিনত করে। ১৪ বছরের কিশোর মুহাম্মদ ইয়াকূব অমৃতস্বর থেকে কোন ক্রমে বেঁচে গিয়ে সাংবাদিকদের রিপোর্ট করেছিল যে, তার গ্রামে কয়েক হাজার মুসলিম বাসিন্দার কেবল ৫০ জনের মত বেঁচে আছে। অবশিষ্টরা হয়ত শহীদ হয়ে গিয়েছে, নয়ত নিখোঁজ রয়েছে।[৪১০]

পশ্চিম পাঞ্জাবেও নির্মম ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছিল। পাশবিকতার এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের পার্থক্য থাকেনি। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, কাসুলী স্যানিটারিয়ামে হিন্দু ডাক্তাররা মুসলিম রোগীদেরকে হঠাৎ স্যানিটারিয়াম ত্যাগের নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে এমন রোগীও ছিল যার একটি ফুসফুসই মাত্র সক্রিয় কিংবা এমন রোগী যার অপারেশনের ক্ষত তখনো শুকায়নি। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে স্যানিটারিয়াম ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য করা হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানের 'বাবা লাল' আশ্রমে ২৫ জন সাধু-সন্যাসী যারা জগৎ-সংসারের সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের প্রার্থনা, ধ্যান ও যপমন্ত্রের মধ্যে নিমগ্ন ছিল। তাঁদেরকেও আশ্রম ত্যাগে বাধ্য করা হলে লাল পোষাক পরিহিত ঐ সাধুরা মস্তক ঝুলিয়ে মন্ত্র যপতে যপতে ভারতের দিকে যাত্রা করে। সাধুদের চলে যাওয়ার পর মুসলমানরা আশ্রমটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[৪১১]

---

৪০৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৫,৬২১।
৪১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৫।
৪১১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৬।

বিভক্তির ঐ মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক হায়েনাদের চরিত্র কত নীচ স্তরে নেমে গিয়েছিল লরী কলিন্সের উদ্ধৃতি থেকে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন, শিখরা চতুর্দিকে চক্কর দিতে থাকে এবং মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন বুভুক্ষু শকুনের ঝাঁক কোন লাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুসলমানদের গ্রাম ও মহল্লা সম্পূর্ণ উজাড় হতে থাকে।

শিখ গুণ্ডাদের চলা পথে রেখে যাওয়া একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল যে, তারা মুসলিম পুরুষকে হত্যা করে তার পুরুষাঙ্গ কেটে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চলে যেত। অমৃতস্বরের শিখরা পাকিস্তানে মুসলমানদের জন্য বালতি ভর্তি একটি উপঢৌকন প্রেরণ করে। ঐ বালতিটি বস্তুত মুসলমানদেরই কর্তিত পুরুষাঙ্গ দ্বারা ভর্তি ছিল।

অন্যদিকে লাহোরেও চলে হিন্দুদের উপর পৈশাচিক রক্তপাত, অগ্নি সংযোগ ও সম্ভ্রম লুণ্ঠনের হাজার হাজার লোমহর্ষক ঘটনা। জনৈক ইংরেজ অফিসার লিখেছেন, তখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিল গোটা লাহোরে হিন্দুরা যেন আত্মহত্যা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। লাহোর পুলিশ বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশী। হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধানের প্রতি ঐ পুলিশদের মনে খুব আকর্ষণ ছিল না।[৪১২]

নির্বাচন চলাকালেই লীগ নেতারা মুসলমানদেরকে হিজ্‌রত করার তালীম দিয়ে রেখেছিলেন। তাই বিভক্তির পর যখন মাথার উপর আসমান ভেঙ্গে পড়ল তখন পূর্ব পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানের হাজার হাজার মুসলমান পাকিস্তানে হিজ্‌রতের উদ্দেশ্যে বের হয়। ২ দিন আগেও এই লোকেরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সওয়ারী বোঝাই মালামাল নিয়ে নির্ভয়ে যাত্রা করেছিল। ২ দিন পর দেশ স্বাধীন হলে তারা এখন ভিটাহীন, নিরাশ্রয়, নিরুদ্দেশের যাত্রী। নিজেদের সঙ্গে পান করার এক ফোঁটা পানি নিয়ে বের হওয়ার মতও সাহস নেই। রাস্তায় পায়ে হেটে চলছে ২০/৩০ হাজার মানুষের কাফেলা। পরিবারের অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, বিকলাঙ্গ সকলেই ঐ কাফেলায় অবস্থিত। পথ অতিক্রমের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ীর ব্যবস্থা কে করবে? পায়ে হেঁটেই চলছে সকলে। এদিকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত দল দাঁড়িয়ে আছে। পকেটে একটি কপর্দক থাকলে তাও সমর্পণ করে যেতে হচ্ছে। অধিকন্তু জীবনের ভয় তো আছেই। কাফেলায় পথ চলতে চলতে অক্ষম হয়ে কেউ যদি একবার বসে পড়ত, তা হলে সেখানেই রচিত হত তার জীবন-সমাধি। কারণ তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া ব্যতিরেকে

৪১২. প্রাগুক্ত।

গত্যন্তর ছিল না। স্থানে স্থানে অপেক্ষমান লুটেরা ও ঘাতকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে কোন ক্রমে স্টেশন পৌছলে সেখানেও দেখা গেল আরেক জটিলতা। স্টেশনের ভিতর প্রবেশের জায়গা নেই। মৌমাছির মত বসে আছে মানুষ আর মানুষ। অনেক বিলম্বে গাড়ী এসে পৌছলে অল্প কয়েকজন হয়ত বাম্পারে চড়ে যাত্রার চেষ্টা করে। অবশিষ্টদের অধিকাংশই আহত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কাফেলার মধ্যে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে। স্টেশনে অপেক্ষমান ঐ অসহায়দের উপরেও মাঝে মাঝে নেমে আসছে লুটেরা ও ঘাতক দলের ঝটিকা আক্রমণ। খুনীরা বহু স্থানে চলন্ত গাড়ী থামিয়েও মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।[৪১৩]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত লীগের হাজার হাজার কর্মী যাদের কাছে সীমান্তে সূচিত কিয়ামত সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না তারা পাকিস্তান ভূখণ্ডে হিজ্‌রতের জন্য নিজ নিজ এলাকা থেকে মিছিলসহ বেরিয়ে এসেছিল। পরম উল্লাসে তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত ছিল 'হাঁসকে লিয়া পাকিস্তান-লড়কে লেয়েঙ্গে হিন্দুস্তান' (হাসতে হাসতে পেয়েছি পাকিস্তান-যুদ্ধ করে আদায় করব হিন্দুস্তান) এদের সেই উল্লাস স্থায়ী হয়নি। তারা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে যখন নির্মম বাস্তবতার উপলব্ধি করতে শুরু করে তখন হয়ত স্টেশন পৌছার পথে নয়ত চলন্ত গাড়ীর ভিতরই জীবনের সকল স্বপ্নসহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়। খুব নগণ্য সংখ্যক ওপারে পৌছা সম্ভব হয়েছিল।[৪১৪]

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী বিভক্তির এ কঠিন পরিণতি চিন্তা করেই মানুষকে নির্বাচনের সময় বোঝাতে চেয়েছিলেন। তখন লীগ কর্মীরা তাঁকে ভুল বুঝে, তাঁকে অপমান-অপদস্থ করে, তিরস্কার করে, অমানবিকভাবে নির্যাতন করে। স্বপ্নবিভোর মুসলমানরা অনেক পরে তাঁর দরদপূর্ণ কথাগুলোর সত্যতা উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে পানি গড়িয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরে।

ভারত ভূখণ্ডে মুসলমানদের উপর অর্পিত এ দুরবস্থা দেখে কংগ্রেসের মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ দুঃখিত হন। তাঁদের অনেকে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কিন্তু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল দুরবস্থার ঐ সকল ঘটনা শুনে মন্তব্য করে ছিলেন, আরে এটা তো হওয়ারই কথা। তাতে বিচলিত হওয়ার কি আছে ?[৪১৫]

---

৪১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৭।
৪১৪. প্রাগুক্ত।
৪১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২৮।

উভয় ভূখণ্ডের সীমান্তে খুনাখুনি ও প্রতিহিংসার পরিণামে যেই লাহোরে ২ দিন পূর্বেও ৬ লক্ষ হিন্দু ও শিখের বসবাস ছিল, সেখানে তাদের সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে মাত্র ১ হাজার। তাও এরা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল বিধায় জীবনে বেঁচে গিয়েছে। পাকিস্তানের অন্যান্য স্থানে মৃদু উত্তেজনার পরেও ২০/৩০ হাজার হিন্দু নিরাপদে থেকে যায়। কিন্তু ভারত ভূখণ্ডে লাহোর থেকে আম্বালা তথা পানিপথ, কর্নাল ও ঘোড়াগাঁও পর্যন্ত যেখানে ব্যাপকভাবে মুসলিম বসবাস ছিল, সেখানে একজন মুসলমানকেও জীবিত থাকতে দেওয়া হয়নি। তাদেরকে হয়ত খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছে। নয়ত গলা ধাক্কা দিয়ে ওপারে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৪১৬]

প্রতিহিংসার কিছু প্রভাব উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ছিল। বিভক্তির কারণে পাকিস্তান সরকারের অফিস-আদালত, সচিবালয় ও আনুষঙ্গিক সব কিছু নতুনভাবে তৈরী করে নিতে হয়। বণ্টনে অবিভক্ত সরকারের কোষাগারে রক্ষিত অর্থের মধ্যে পাকিস্তান প্রাপ্য হয় ৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু বিভক্তির পর ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারকে এ টাকা প্রত্যর্পণে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রীয় অন্যান্য মালামাল যা হিস্যা অনুসারে পকিস্তান সরকার লাভ করে সেগুলি দিল্লী থেকে করাচী পৌছানোর জন্য বি.ও.এ.সি.-এর একটি বিমান ভাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু টাকা পরিশোধে অক্ষমতার দরুন সেই মালামাল তুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অবিভক্ত ভারত সরকারের প্রেস ছিল ৬ টি। প্যাটেল জানিয়ে দিলেন, এগুলোর একটিও করাচী যাবে না। বণ্টননামা অনুসারে পাকিস্তান ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন সামরিক সরঞ্জামাদির পাওনাদার হয়। তা থেকে পেয়েছে মাত্র ৬ হাজার টন। কথা ছিল অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে ৩ শত ট্রেন দিল্লী থেকে করাচী পৌছবে। সেখানে পৌছে মাত্র ৩টি। পাকিস্তানী কর্মকর্তারা যখন ঐ ট্রেনের দরজা খুললেন, তখন দেখলেন, তাতে রয়েছে ৫ হাজার জোড়া জুতা, নার্সদের ব্যবহৃত কিছু পুরাতন পোষাক, ৫ হাজার ভাঙ্গা ও মেরামত অনুপযুক্ত রাইফেল আর অনেকগুলো কাঠের বাক্স, যেগুলো ইট কিংবা জীবাণু নাশক ওষুধের খালি প্যাকেট দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারতে মুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা এবং বণ্টনের এহেন দুঃখজনক পরিণামের পর জিন্নাহ সাহেব দিল্লী থেকে একটি স্পেশাল বিমানে চড়ে চিরদিনের জন্য ভারত ত্যাগ করলেন। বিদায়কালে ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত তাঁর কর্মী ও সমর্থকদের শেষ অসিয়্যত করে গেলেন, যাও, তোমরা

৪১৬. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬১।

ভারতের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে বসবাস কর। জিন্নাহ্‌র এই অসিয়্যতের পর লীগকর্মীরা, যারা বিগত ৭ বছর পাকিস্তানের নামে আবেগ আপ্লুত ছিল, তাদের চোখ ফুটে। তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, তারা উভয় দিকের সংকটে পড়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে।[৪১৭]

১৫ আগস্টের পর প্রথম দিকে সাহারানপুর, দিল্লী, মীরাঠ প্রভৃতি সীমান্ত থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলো সহিংসতা থেকে তুলনামূলক নিরাপদ ছিল। কয়েকদিন পর পাকিস্তান ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের যারা পাকিস্তানীদের হাতে আহত হয়েছিল কিংবা আত্মীয় স্বজন হারিয়েছিল কিংবা সহায়-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভারতে এসেছিল, তারা ঐ সকল শহরে মুসলমানদেরকে নিরাপদ অবস্থায় দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। প্রতিশোধ গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নেশায় তারা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৪১৮] শরণার্থীদের সাথে যোগ দেয় শিখ আকালী দল, জৈন সিং ও আর.এস.এস.পার্টি।

ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ভিতরে অবস্থিত গোঁড়া সাম্প্রদায়িক গ্রুপটি গোটা দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলিম বসতি থেকে মুক্ত করে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিল। ফলে রাজধানী দিল্লীতেও শুরু হল হিংসাত্মক কার্যকলাপ। নীল নক্‌শা মোতাবেক কর্নাট প্যালেস, সবজিমন্ডী, লুধী কলোনী, পাহাড়গঞ্জ প্রভৃতি মহল্লায় ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ চলে।

তখন সবচেয়ে কঠিন বিপদের মুখে পতিত হয় লীগের মাঝারি পর্যায়ের নেতারা, যাদের শ্রমের কারণেই লীগ এতটা গতিশীলতা লাভ করেছিল। দিল্লীতে তাঁদের চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এলে তাঁরা বুঝতে পারে যে, জিন্নাহ সাহেব তাদেরকে সম্পূর্ণ অসহায় বানিয়ে করাচীর নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছেন। বিদায়কালে ভারতের বিশ্বস্ত নাগরিক হয়ে থাকার যেই শেষ পয়গাম তিনি রেখে গিয়েছেন, সেই পয়গাম মোতাবেক পূর্বেই কাজ করে এলে আজ হয়ত তাদের জীবন রক্ষায় সমস্যা হত না।[৪১৯]

[illegible]

দুই দেশের বন্টন উপলক্ষে অসংখ্য লোক স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। অগণিত মানুষ ভিটা বাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

---

৪১৭. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩১।
৪১৮. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮২।
৪১৯. আবুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭।

হতাহতের সংখ্যা বর্ণনায় এম.জে.আকবরের মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তাঁর মতানুসারে মৃতের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ আর গৃহহীনে পরিণতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। উল্লেখ্য, এটি ছিল দুই দেশের সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার সূচনাপর্বে মৃতের সংখ্যা। তার পরে বন্টনের জের হিসেবে আজ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মুহাজির, পাঠান, বিহারী, আসামীয় প্রভৃতি শিরোনামে উপমহাদেশীয় জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত প্রতিহিংসার দ্বারা বিভিন্ন সময়ে যারা হতাহত হয়েছে এবং আজো হয়ে চলছে তাদেরকেও যদি সংযুক্ত করা হয়, তাহলে এই সাম্প্রদায়িকতার পরিণামে মৃতের সংখ্যা এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। হযরত শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাম্প্রদায়িকতার এই ভয়ানক পরিণতিরই বিরোধিতা করেছিলেন।[৪২০] কিন্তু তাদ্‌বীরের উপর তাক্‌দীরের প্রাধান্য থাকে। তাই লোকেরা তাঁর গভীর উপলব্ধি দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।

১৫ আগস্ট তিনি ছিলেন দেওবন্দে। ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমানের মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়লে তিনি তাদের ধৈর্যধারণ করা এবং প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতির সাহসী মোকাবেলা করার উপদেশ দেন। দেওবন্দ জামি মসজিদে দাঁড়িয়ে তখন এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, আজ তোমাদের ভয়ভীতি ও হীনমন্যতার যেই পরিস্থিতি দেখা যাচেছ, সেটি চিন্তা করতেও লজ্জা হয়। নিজেদের বাড়ী ঘরে অবস্থান করেও তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই। পথ চলতে ভয় পাও। নিজ মহল্লা ও নিজ গ্রামে অবস্থান করেও তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত। তোমরা কি সে সব বুযর্গের উত্তরসূরি নও যারা এদেশে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র এসেছিলেন? তখন গোটা দেশটাই তাদের দুশমনে পরিপূর্ণ ছিল। আজ তোমরা ৩ কোটি মানুষ এখানে বিদ্যমান। এই ইউপিতেই তোমাদের সংখ্যা ৮৫ লক্ষের বেশী। এতদসত্ত্বেও তোমরা এত সন্ত্রস্ত যেন মাথার উপর পা রেখে ছুটে পলায়ন করছ। ভয়-ভীতি ও কাপুরুষতা মন থেকে বের করে দাও। ইসলাম ও কাপুরুষতা একত্রিত হয় না। ধৈর্যের সাথে বিপদের শক্তিশালী মোকাবেলা কর। নিজেরা কখনো ফাসাদের সূচনা করো না। কিন্তু ফাসাদীরা যদি তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে তাদের ভালভাবে বোঝাও। যদি না মানে এবং সংযত হতে না চায়, তখন তোমরা নির্দোষ। তখন সাহস নিয়ে বীরত্বের সাথে তাদের মোকাবেলা করে যাও। এমনভাবে মোকাবেলা কর যেন ফাসাদীদের শৈশবকালীন স্তন্যপান স্মরণ হয়ে যায়। তোমাদের সংখ্যা যতই নগণ্য হোক না কেন, পেছনে হটবে না। নিজের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের সংরক্ষণে জীবন উৎসর্গিত করে

---

৪২০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪৯।

দাও। এটি হবে শাহাদত ও সম্মানের মৃত্যু। এ দেশ তোমরা রক্ত দিয়ে অর্জন করেছ। ভবিষ্যতেও রক্ত দ্বারাই তার পরিচর্যা করার প্রতিজ্ঞা করে নাও। এটি হবে দেশের প্রতি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামিতা। এ মাটির উপর তোমাদের ততটুকু অধিকার রয়েছে, যতটুকু আছে অন্য বাসিন্দাদের।[৪২১]

দেশ বিভক্তির কারণে জমইয়তে উলামার শক্তিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। শায়খুল ইসলাম জমইয়তের অবশিষ্ট সহকর্মীদের একত্রিত করেন। তিনি মাওলানা হিফযুর রহমান, মাওলানা আহমদ সাঈদ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা হাবীবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখকে নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করেন। এই আলিমগণ হিংসাত্মক দাবানলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বাজি রেখে অভিভাবকহীন মুসলমানদের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা মুসলমানদের ধৈর্যের সাথে স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে থাকা এবং আর.এস.এস, জৈন সিং ও উগ্র হিন্দুদের প্রতিরোধ করার বিস্তারিত কর্মসূচী নেন। আলিমগণ যদি তাৎক্ষণিক ঐ কর্মসূচী গ্রহণ না করতেন, তাহলে হয়ত গোটা ভারত মুসলিম শূন্য ভূখণ্ডে পরিণত হত।

হযরত শায়খুল ইসলাম ঐ দুর্যোগের ভিতর দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর ও দিল্লী গমন করেন। মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তিনি জওহরলাল ও মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। পরিস্থিতির নাজুকতা অনুমান করে জওহরলাল তাঁকে বলেছিলেন যে, এহেন পরিস্থিতিতে আপনি নিজ নিরাপত্তার চিন্তা না করেই এসে গিয়েছেন। আগামীতে আবার কখনো আসতে চাইলে পূর্বেই অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন। আমি আপনাকে নিয়ে আসা এবং ফেরত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য ফৌজী গাড়ীর ব্যবস্থা করে পাঠাবো।[৪২২] সরকারী আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিভাগের অবহেলার প্রতিকারের জন্য তিনি ইউপি-এর মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পান্থের সাথে বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আপনি চাইলে দারুল উলূমের নিরাপত্তার জন্য আমি আর্মি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হযরত মাদানী রূঢ় ভাষায় বললেন, দারুল উলূম আল্লাহ্ পাকের প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজেই এর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আপনি সাহারানপুরের সংবাদ নিন। যদি মুসলমানদের জীবন রক্ষার কাজে আপনার কোন দ্বিধা হয় তাহলে আমাকে অনুমতি দিন। আমি

---

৪২১. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২১।

৪২২. মুহাম্মদ যাকরিয়্যা, আপবীতী (সাহারানপুর : মাকতাবায়ে শায়খ যাকারিয়্যা, তা.বি), ৫ম খণ্ড, পৃ ১৬-১৭।

তাদের গিয়ে বলব, তারা যেন নিজেদের জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে।[৪২৩]

শায়খুল ইসলামের এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর সাহারানপুরের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের রদবদল করে দেওয়া হয়। ফলে ক্রমে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসে। দিল্লী ও অন্যান্য শহরে জমইয়ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অসহায় মুসলমানদের জন্য সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপত্তা ক্যাম্প গঠন করেন। মুসলমানদেরকে পাকিস্তান গমন কিংবা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেন। হিন্দু ফাসাদীদের আক্রমণের দরুন রাজধানী দিল্লীর পরিস্থিতি তখন কতটা নাজুক হয়ে গিয়েছিল মাওলানা আযাদের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমরা ৩ জন (আযাদ, জওহরলাল ও প্যাটেল) গান্ধীজীর পাশে উপবিষ্ট। জওহরলাল ব্যথিত হয়ে বললেন, দিল্লীর পরিস্থিতি ধৈর্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুসলমানদের জীবন রক্ষার কোন ব্যবস্থাই সফল হচ্ছে না। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, জাতির কাছে কি জবাব দেবেন। তাই বার বার দুঃখ প্রকাশ করছেন। এ সময় প্যাটেল বলে উঠলেন, জওহরলালের অভিযোগ ঠিক নয়। কোথাও কোথাও ১/২টি ঘটনা ঘটছে মাত্র। সরকার তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রতিকারের জন্য এর চেয়ে অধিক কিছু করার নেই।[৪২৪]

ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য জমইয়ত নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দুর্গত লোকদের সাহায্যার্থে প্রশাসন ও জনগণকে সক্রিয় করার জন্য তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনিও প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবতীর্ণ হন। মহাত্মা গান্ধী দ্বিপাক্ষিক সম্পদ বণ্টনে পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ এবং সমগ্র ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে ভারত সরকারকে চাপ দেন। এক পর্যায়ে তিনি নিরাশ হয়ে গেলে ১৩ জানুয়ারি ঐ দাবীতে তিনি নিজের সর্বশেষ অস্ত্র 'আমরণ অনশন'-এর ঘোষণা দেন। গান্ধীজীর অনশনে প্যাটেলসহ হিন্দু সাম্প্রদায়িক গ্রুপটি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেও গোটা ভারতে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ৩য় দিবসে জওহরলাল নেহরু লালকিল্লায় সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে গান্ধীজীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে বক্তব্য রাখেন। অবশেষে সরকার ও সামাজিক

৪২৩. আবূ সালমান শাহজাহানপুরী, শায়খুল ইসলাম : এক সিয়াসী মুতালাআ, পৃ ৪০।

৪২৪. আবুল কালাম আযাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩২-২৩৫।

সংগঠনগুলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায়ের পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করলে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন।[৪২৫]

হযরত শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে জমইয়তে উলামা ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বুযর্গদের মাযার ও দরগাহ্ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়। নেতৃবৃন্দ সারহিন্দ শরীফ গমন করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযার ও তাঁর প্রতিবেশীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আজমীরে হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির-এর দরগাহ্ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে হাজার হাজার মুসলমান বাধ্য হয়ে হিজরতের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। হযরত শায়খুল ইসলাম নিজে সেখানে পৌঁছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরগাহটি পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের জবরদখলে চলে গিয়েছিল। আলিমগণের চেষ্টায় সেটিও দখলমুক্ত হয়। এ সব দরগাহ্ ও মাযারের কাজকর্ম সম্পর্কে দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দ ব্যতিক্রম মতাদর্শ পোষণ করলেও ঐ মুহূর্তের দাবী ছিল ভিন্ন রকমের। ঐ সময় মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই ছিল প্রধান লক্ষ্য।[৪২৬]

নিরাপত্তার প্রাথমিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ার পর লক্ষ্ণৌতে জমইয়তের উদ্যোগে 'অল ইন্ডিয়া আযাদ মুসলিম কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে সেক্রেটারী জেনারেল হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারবী উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলেন, মুসলমান কখনো অন্যায় ও অযৌক্তিক প্রস্তাবের সমর্থন করে না। আপনারা মন থেকে ভয়-ভীতি ও কাপুরুষতা তাড়িয়ে দিন। কনফারেন্সে অঙ্গীকার ব্যক্ত করুন যে, আমরা প্রতিটি জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে যাবো। আমরা যেভাবে মুসলিম নামধারী সাম্প্রদায়িকদের প্রতিহত করবো তদ্রূপ জৈন সিং, হিন্দু মহাসভা, আর এস এস ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক শ্রেণীকেও প্রতিহত করবো। সরকারের দায়িত্ব হল, দেশের সর্বত্র বাকস্বাধীনতা ও মতামতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত রাখতে নিজের সার্বিক চেষ্টা অব্যাহত রাখা।[৪২৭]

এই আলিমগণেরই সহযোগিতা ও অবিচলতার দরুন বিভিন্ন অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় উলামা ও বুযর্গ স্ব-স্ব স্থানে অবস্থানের শক্তি পান। তাঁদের স্থির অবস্থানের কারণে অন্যান্য মুসলমানও ভারতে থেকে যায়। পূর্ব পাঞ্জাবে হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানবী, পানিপথে হযরত মাওলানা লিকাউল্লাহ

৪২৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪৩।

৪২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৪-৬৫৫।

৪২৭. আল জমইয়ত পত্রিকা, প্রাগুক্ত, মুজাহিদে মিল্লাত সংখ্যা, পৃ ২৩৬।

উসমানী, আম্বালায় আবদুল গাফ্ফার খান প্রমুখ সাহসিকতার সাথে অবস্থানের ফলে ঐ সকল এলাকায় আজো মুসলমানদের কিছু বসতি অবশিষ্ট আছে। উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাআতের আন্তর্জাতিক মার্কায দিল্লীর 'নিযামুদ্দীন মসজিদ' সম্পর্কেও জটিলতা দেখা দিয়েছিল। মার্কাযের প্রধান আমীর হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে লোকেরা বার বার হিজরতের জন্য পীড়াপীড়ি করে। এ ব্যাপারে হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ৩/৪ মাস থেকে সমস্যা জটিল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানগামী বন্ধুরা হযরতজী মাওলানা ইউসুফকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কেউ কেউ বিমানের ২৫/৩০ টি টিকেট হাতে দিয়ে বলে যে, পরিবার-পরিজনের সকলকে নিয়ে পাকিস্তান চলুন। তাঁদের পরামর্শ ছিল, ভারতের অধিকাংশ মুসলমান বর্তমানে পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। কাজেই দ্বীনী দাওয়াত ও ইস্‌লাহের কাজ শক্তিশালীভাবে করতে হলে আপনার সেখানে চলে যাওয়া জরুরী। তাছাড়া ইউপি ও দিল্লীতে যে হারে মুসলমানদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে এখানে দ্বীনের কাজ করার উপযুক্ত পরিবেশ আশা করা অসম্ভব। কিন্তু হযরতজী মাওলানা ইউসুফের একটিই জবাব ছিল। তিনি বলতেন, যদি ভাই সাহেব (হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হিজরত করে যান তাহলে আমিও যাবো, নতুবা যাবো না।[৪২৮]

হযরত শায়খ যাকারিয়্যা পাকিস্তান গমনের সিদ্ধান্ত করেননি বিধায় হযরতজী মাওলানা ইউসুফেরও যাওয়া হয়নি। ফলে তবলীগের মারকাযকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মুসলমান ভারতে রয়ে যায়। সেদিন যদি হযরত শায়খ যাকারিয়্যার সিদ্ধান্ত ভিন্ন রকমের হত তাহলে আজ দিল্লীতে মুসলমান খুঁজেও পাওয়া যেত না।

ইউপির বিখ্যাত বুযর্গ হযরত আবদুল কাদির রায়পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগতভাবে ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের বাসিন্দা। তাঁর মুরীদ ও ভক্তদের অধিকাংশই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী। হযরত শায়খ আবদুর রহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহির ওফাতের পর তিনি রায়পুরী খানকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মাওলানা আবদুল কাদিরকে তাঁর ভক্তরা হিজরতের জন্য উৎসাহিত করলে তিনি উত্তর দেন, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হযরত মাদানী ও হযরত মাওলানা যাকারিয়্যার উপর নির্ভরশীল। আমি তাঁদের দু'জনের সাথে আছি। কয়েকদিন পর মাওলানা আবদুল কাদির ও মাওলানা যাকারিয়্যা উভয়ে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর নিকট এসে পরামর্শ চান। তাঁরা হযরত মাদানীর কাছে হিজরতের প্রস্তাব

---

৪২৮. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

পেশ করলে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বললেন, আমি কাউকে চলে যেতে নিষেধ করি না। তবে মুসলমানদেরকে দুর্যোগের ভিতর ফেলে রেখে নিজে নিরাপদ কোথাও হিজরত করা আমার পছন্দ নয়। আমি দুর্যোগ কবলিত মুসলমানদের সাথেই নিজের বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[৪২৯]

ঘটনাটি হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষায় নিম্নরূপ ঃ হযরত মাদানী আমাদের বক্তব্য শুনে একটি ঠাণ্ডা শ্বাস ছাড়লেন। তাঁর চোখে অশ্রু। তিনি বললেন, আমাদের পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি। যদি আমাদের পরিকল্পনা মেনে নেওয়া হত, তাহলে না এই খুনাখুনি হওয়ার কথা ছিল, আর না আবাসস্থল বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দিত। এখন আমি কাউকে চলে যেতে বারণ করি না। যদিও মদীনা শরীফে আমার থাকার জায়গা রয়েছে, আমার ভ্রাতা সায়্যিদ মাহমূদ আমাকে মদীনায় চলে যেতে বারবার পীড়াপীড়ি করছে কিন্তু আমি ভারতীয় মুসলমানদেরকে নিঃস্বতা, অসহায়ত্ব, ত্রাস ও প্রাণভয়ের এই পরিস্থিতির উপর ফেলে রেখে অন্যত্র কোথাও যাবো না। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের জীবন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও দীন-দুনিয়া এখানকার মুসলমানের জন্য উৎসর্গ করতে সম্মত, সে-ই এখানে থাকবে, আর যার পক্ষে এহেন ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করা সম্ভব নয় তার চলে যাওয়াই উচিত। মাদানীর উপরোক্ত বক্তব্য শুনে আমি দ্রুত বলে উঠলাম, হযরত! আমি আপনার সাথে আছি। তখন হযরত রায়পুরীও বললেন, তোমাদের দু'জন ব্যতিরেকে আমার পক্ষেও যাওয়া অসম্ভব।[৪৩০] শায়খুল ইসলাম মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির এই এক সিদ্ধান্ত ভারতে মুসলিম অস্তিত্ব টিকে থাকার শক্তিশালী বুনিয়াদ রচনা করে দিয়েছিল।

[redacted]

সাম্প্রদায়িক খুনাখুনি ও রক্তপাতের ঝাপটা অতিক্রমের পর ভারতে যেসব মুসলমান কোনক্রমে টিকে গিয়েছিল কিছুদিন পর তাদের উপরেও আপতিত হয় নানা সমস্যা। তাদের জমাজমি, দোকানপাট ক্রোক হতে থাকে। তাদের সরকারী চাকুরী বহাল রাখতে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। দুর্যোগের সময় বহু শিশু ও নারী হারিয়ে যায় কিংবা ভাগিয়ে নেওয়া হয়। অনেক স্থানে মুসলমানদের

---

৪২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২১।
৪৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

মসজিদ মাদ্রাসা, আওকাফ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জায়গা-জমি হিন্দুদের জবরদখলে চলে যায়। পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও মেওয়াতসহ বহু স্থানে মুসলমানরা প্রাণ ভয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। আইনগত জটিলতার দরুন তাদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের আরো অনেক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়।[৪৩১] হযরত শায়খুল ইসলাম ভারতীয় প্রশাসনের সাথে বহু দেন-দরবার করে সব সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হন। তাঁর বয়স তখন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল।

পাকিস্তানে হিজরতকারী মুসলমানদের বাড়ীঘর, জমাজমি ও দোকানপাট যথানিয়মে সংরক্ষণ করা এবং ঐগুলো পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকার 'কাস্টুডিন' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলে। পরিস্থিতির দাবী অনুসারে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকলেও শেষ পর্যন্ত এটি ভারতীয় নিরীহ মুসলমানদের নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হয়। হিন্দু দুর্বৃত্তদের নির্যাতনের কারণে যেসব মুসলমান বাড়ীঘর ছেড়ে সাময়িক সময়ের জন্য দূরে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কিংবা যারা হিজরতের পথ থেকে ফিরে এসেছিল কিংবা নিজস্ব কাজ-কারবারের তাগিদে বাড়ীর বাইরে অবস্থান করেছিল, কাস্টুডিন বিভাগ তাদের সহায়-সম্পত্তিও ক্রোক করতে থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, কোন পরিবারের হয়ত একজন পাকিস্তান চলে গিয়েছে। আর অবশিষ্টরা সকলে ভারতেই আছে। কাস্টুডিন সেই একজনের কারণে গোটা পরিবারের অবিভক্ত সকল জমিজমা ক্রোক করে নিয়েছে। ঐ সময় এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী লোকেরা মুসলমানদের সম্পদ ও জমিজমা গ্রাস করার আরো নানা রকমের পন্থা আবিষ্কার করে নিয়েছিল।

দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী মুহাম্মদ দীন ছতরী ওয়ালা, যিনি জীবনে পাকিস্তান চোখেও দেখেননি কিন্তু নিজের এক খেয়ালে লোক মাধ্যমে পাকিস্তানে একটি জমি ৪৫ হাজার টাকায় খরিদ করেন। কাস্টুডিন বিভাগ সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর দিল্লীস্থ সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট, জমাজমি 'শত্রু সম্পত্তি' (অর্পিত সম্পত্তি) বলে ঘোষণা করে। ফলে হাজী সাহেব সম্পূর্ণ কপর্দকহীনে পরিণত হয়ে রাস্তায় বসে পড়েন। হযরত শায়খুল ইসলামের নিকট এ পরিস্থিতি ভয়ানক পীড়াদায়ক মনে হল। তিনি নিজের অসুস্থতা ও বার্ধক্য সত্ত্বেও পুনরায় অপর এক যুদ্ধে নেমে যান। তাঁর স্বাধীনতার লড়াই হয়েছিল ইংরেজ বিদেশীদের সাথে। বর্তমানে তাঁকে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে নিজের স্বদেশী মানুষের বিরুদ্ধে। বিশেষতঃ এমন লোকদের বিরুদ্ধে যাদেরকে তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজের

৪৩১. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭০।

সহযোদ্ধা হিসেবে দেখে আসছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর মনন শক্তিতে বিন্দু পরিমাণ দুর্বলতা আসেনি। কাস্টুডিনের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধে তিনি আইনের আশ্রয় নেন এবং নিজে জওহরলাল ও অন্যান্য নেতার সাথে দরবার করে সমাধানের ব্যবস্থা করেন। ছতরী ওয়ালার ঐ মামলা জমইয়তের পক্ষ থেকে পরিচালনা করা হয়। জমইয়ত নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল, এই একটি মামলায় যদি তাঁরা হেরে যান তাহলে পরিণতিতে সমগ্র ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজেদের সহায়-সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। কাস্টুডিনের সাথে লড়াইয়ের জের মন্ত্রিসভা পর্যন্ত গড়ায়। মন্ত্রিপরিষদ কাস্টুডিন মহাপরিচালক মি.আচ্ছুরামের রায় বাতিল করে এবং ছতরী ওয়ালার সম্পত্তি প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত দেয়। আচ্ছুরাম ক্ষোভে চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। বিষয়টি পরে পার্লামেন্টেও উত্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল তখন জবাবী ব্যাখ্যা দিয়ে এই হিংসাত্মক আক্রমণের পথ বন্ধ করেন।[৪৩২]

এভাবে হযরত শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে জমইয়ত নেতৃবৃন্দ মুসলিম সমাজকে এক দিকে ধৈর্য ধারণ ও সাহসের সাথে দুর্বৃত্তদের মোকাবেলা করতে অনুপ্রাণিত করেন, অন্যদিকে তাদের অনুকূলে আইনগত ভিত্তি দাঁড় করিয়ে তাদের নাগরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের যে সকল বাড়ীঘর, দোকানপাট বেআইনীভাবে ক্রোক করা হয়েছিল, সেগুলো প্রত্যর্পণ করানো হয়। পানিপথ, লুধিয়ানা, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে তাদের পুনঃ বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, আওকাফ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যথাসম্ভব দখলমুক্ত করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যে সকল স্থানে মুসলমানরা সমগ্র এলাকাই খালি করে চলে গিয়েছিল, সেখানকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। যারা বিভিন্ন স্থানে প্রাণ ভয়ে কিংবা জবরদস্তির কারণে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, শায়খুল ইসলাম তাদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এক আদেশ জারী করান। আদেশে বলা হয় যে, ঐ ধর্মান্তরকরণ ছিল জবরদস্তি মূলক। এ ধরনের ধর্মান্তরকরণ ভারতীয় সংবিধান সমর্থিত নয়। কাজেই যারা পূর্বধর্মে ফিরে যেতে চাইবে তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত সাহায্য প্রদান করা হবে। উপরোক্ত আদেশ জারী হওয়ার পর আলিমগণ যথাশক্তি ব্যয় করে 'মুরতাদ' লোকদের ফিরিয়ে আনেন।[৪৩৩] যে সব মুসলমান ইতোপূর্বে সরকারী চাকুরীতে ছিলেন তাদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা করেন। এমনকি যারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, নির্ধারিত সময়ের ভিতর ফিরে আসার শর্তে তাদের জন্যও প্রত্যাবর্তনের

---

৪৩২. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৭-৩২৮।
৪৩৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬৬।

সুযোগ সৃষ্টি করেন। এ ভাবে হারিয়ে যাওয়া শিশু ও মহিলাদের খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে ঠিকানামত পৌছানোর জন্যও ব্যবস্থা করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন লীগের মৌন সমর্থক। বিভক্তির পর পাকিস্তানে ইসলামী হুকূমতের রূপরেখা নির্ণয় ও প্রতিষ্ঠার পবিত্র স্বপ্ন নিয়ে তিনি ভারত থেকে হিজরত করে চলে যান। কিন্তু কয়েক মাস পর তার ভুল ভাঙ্গে। তিনি দেখলেন, পাকিস্তানে ইসলামী হুকূমতের চিন্তা করাও কঠিন। পরে তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করতেও অসহ্য বোধ করেন। এদিকে ভারতে ফেরত আসার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ফেরত আসার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনের সাথে যোগাযোগ করেন কিন্তু কোন উপায় করতে সক্ষম হননি। অবশেষে পাকিস্তান থেকে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলে শায়খুল ইসলাম তাঁকে ফেরত আনেন এবং দারুল উলূম দেওবন্দের মুহ্তামিম পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪৩৪] ঘটনাটি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁর ভাষায় নিম্নরূপ:

হযরত শায়খুল ইসলাম দিল্লী জমইয়ত অফিস থেকে মাওলানা আযাদকে টেলিফোন করে তাঁর দপ্তরে পৌছেন। মাওলানা আযাদ বললেন, আপনার জন্য আমার দপ্তরে আসতে যে কোন সময় অনুমতি আছে। ফোন করে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। তিনি বললেন, কারী তায়্যিব সাহেব পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু দারুল উলূমে তাঁর বেশ প্রয়োজন। আপনি তাঁকে নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করে দিন। আযাদ বললেন, হযরত! তাঁকে সেখানেই থাকতে দিন। শায়খুল ইসলাম জোরালোভাবে বললেন, না আপনাকে তাঁর নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। দারুল উলূমে তাঁর প্রয়োজন রয়েছে। মাওলানা আযাদ ঐ মুহূর্তে জওহরলালকে টেলিফোন করেন এবং হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিবকে ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেন।[৪৩৫]

এলাহাবাদ জেলে থাকা কালে লীগ সমর্থক শিক্ষকরা হযরত শায়খুল ইসলামকে দারুল উলূম থেকে বহিস্কারের ষড়যন্ত্র করেছিল। আর ভারত বিভক্তির পর তিনি সরকারের সাথে সংগ্রাম করে কারী তায়্যিবকে ফিরিয়ে আনেন বরং স্বপদে পুনর্বহাল করে দেন। এই ছিল তাঁর মহানুভবতা। পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম। তাই বিভক্তির পর এই প্রতিষ্ঠান

৪৩৪. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৫।
৪৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৬।

বেশ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ রাত দিন শ্রম দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। কলিকাতার মাদ্রাসা-ই-আলীয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের শাগিরদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের একটি জামাআত মাওলানা সাঈদ আহমদ আক্‌বরাবাদী, মাওলানা হামীদুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ কফীল, মুফ্‌তী রশীদ আহমদ ও মাওলানা মোহাম্মদ তাহির রহমাতুল্লাহি আলাইহিমকে পাঠিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করেন।[৪৩৬]

পাকিস্তান ও ভারত উভয় ভূখণ্ডের মধ্যেই যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা বিভক্তির আন্দোলনে কম বেশী অংশ গ্রহণ করেন স্বাধীনতার পর প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রমের যথাযথ মূল্য আদায় করে নেন। কিছু কিছু নেতা নিজেরা প্রতিদান প্রাপ্তির কোন তদবীর না করলেও যোগ্যতার নিরিখে জাতি তাঁদের উপর দেশের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করে। তাঁরা আন্তরিকতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করে যান। হযরত শায়খুল ইসলাম উপরোক্ত কোন ধরনের সুবিধা ভোগ দ্বারা নিজের আঁচল কলুষিত হতে দেননি। ভারতীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রায় সকলেই ছিল তাঁর জেল কিংবা রেলের সঙ্গী। অথচ সামাজিক কোন জটিল প্রয়োজন ব্যতিরেকে তিনি কখনো কারো সাথে সাক্ষাত করেননি। তবে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের অনেকে স্বেচ্ছায় তাঁর সাক্ষাতে হাযির হত। তিনি তাঁদেরকে যথাসম্ভব ভদ্রতার সাথে আতিথ্য করতেন। দেশের বড় বড় নেতাদের অনেকেই ছিলেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মানবতাবাদের মহান ধারক হিসেবে সকলে তাঁকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখতেন। স্বাধীনতার পূর্বে একবার সুভাষ চন্দ্র বসু সিলেটে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তখন তিনি ইতিকাফে ছিলেন বলে মসজিদ থেকে বেরুতে পারেননি। অগত্যা সুভাষ চন্দ্র মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর সাথে দেখা করেন। ভারতের ১ম প্রেসিডেন্ট ড.রাজেন্দ্র প্রসাদ শাস্ত্রী রেলমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর সাক্ষাতের জন্য দেওবন্দ আগমন করেন। হযরত শায়খুল ইসলাম তাঁকে বিশেষ আসনে উপবেশনের ইশারা করলে তিনি মৃদু হেসে বললেন, হযরত! আপনার মনে নেই, জেলখানার ভিতরেও আমি ওখানেই বসতাম। কাজেই আজো ওখানে বসব। এভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাবীর ত্যাগী, ইউপির মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পান্থ প্রমুখ তাঁর সাক্ষাতে বহুবার যাতায়াত করেন।[৪৩৭]

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদেরকে রাজকীয় খেতাবে ভূষিত করেন। এই সব

---

৪৩৬. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮৮।

৪৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮৯-৬৯১।

খেতাবের প্রতি হযরত শায়খুল ইসলামের কখনো কোন মোহ ছিল না। এতদসত্ত্বেও ভারত সরকার ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূল্যায়ন স্বরূপ তাঁকে 'পদ্মভূষণ' খেতাব দেন। কিন্তু তিনি নিজের পবিত্র ত্যাগ ও তিতিক্ষা জাগতিক কোন প্রতিদান গ্রহণের দ্বারা কলুষিত করতে সম্মত ছিলেন না বিধায় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, রাজকীয় খেতাব প্রাপ্তির জন্য মনোনীত করে আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে আমি তার শুকরিয়া আদায় করি। আর এই শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেই আমি খেতাব প্রত্যর্পণ করছি।[৪৩৮] ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেবল এতটুকুই ছিল, এর বেশী নয়।

---

৪৩৮. আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২; ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রেরিত তাঁর প্রত্যর্পন পত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

بحضور جناب فیض ماب صدر جمهوریه هند دام اقبالهم

بعد از ادب عرض آنکه اگرچه اب تک مجهکو باقاعده کوئی اطلاع نهیں دی گئی مگر اخبارون میں شائع شده اطلاعات سے معلوم هوا کہ جناب نے پدم بهوشن ۲ کے تغمه سے بنا برین صدارت جمعیت علماء هند اور خدمات علمیه دار العلوم دیوبند اور جدوجهد آزادی وطن میری عزت افزائی هے اگر واقعه صحیح هے تو میں آپکی اس عزت افزائی اور قدردانی کا ته دل سے شکریه ادا کرتاهون اور عرض رسان هون که چونکه ایسا تغمه میرے نزدیک پبلک کی نگاهون میں بے لوث آزاد خادمان ملک و ملت کی آزادئ رائ اور اظهار حق کو کرنا اور قومی حکومت کی صحیح اور سچی راهنمائی کی راه میں ایک قسم کی رکاوٹ هے اسلئے میں ضروری سمجهتا هون که بصد شکریه اس تغمه کو واپس کرون ،

ننگ اسلاف حسین احمد غفرله

۲ ستمبر ۱۹۵٤ ع

ইনতিকাল

এক

১৯৫৫ সালে হযরত শায়খুল ইসলাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি হজ্জে গমন করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ। এরপর তিনি বেশী দিন বেঁচে থাকেননি। তিনি যদিও জাগতিক জাঁকজমক পছন্দ করতেন না, তবুও ঐ বছর জিদ্দা নৌবন্দরে তাঁকে বড় ধরনের ইস্তিক্‌বাল করা হয় এবং তাঁর প্রতি রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। হিজাযের একাধিক দৈনিক পত্রিকা যথা আল মান্‌হাল, আল বিলাদ, মাক্কাতুল মুকাররমা, উম্মুল কুরা, আল মাদীনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ ছাপা হয়। মদীনা শরীফ থেকে বিদায়ের মুহূর্তে পূর্ণ ৩ ঘন্টা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজাহা শরীফ (চেহারা মুবারকের বরাবরে অবস্থিত স্থান) দাঁড়িয়ে তিনি অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।[৪৩৯]

হজ্জের দীর্ঘ সফরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ভারত ফিরে এসে পূর্বের ন্যায় একটানা সফর করা কষ্টকর হয়। তবুও দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করে যান। অবশ্য তখনকার দিনগুলোতে জীবনের কাজকর্ম গুটিয়ে আনা এবং আখিরাতের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণের দিকেই তাঁর অধিক মনোযোগ ছিল। বার্ধক্যের কারণে তাঁর শরীরে দেখা দেয় সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা, কোমর ব্যথা, পাকস্থলীর দুর্বলতা, ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে আসে, এক পর্যায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট বোধ করেন। দারুল হাদীস দোতলায় ছিল, সেখানে তিনি বিগত ৩২ বছর সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযীর অধ্যাপনা করেন, শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে তাঁর পক্ষে দোতলায় উঠা সম্ভব না হওয়ায় নিচ তলায় সবকের ব্যবস্থা করা হয়। কিছু দিন পর বাসা থেকে পায়ে হেঁটে ঐ পর্যন্ত পৌছার শক্তিও হ্রাস পায়। তাই ঐ পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার জন্য বিশেষ সওয়ারীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৫৭ সালের ৪ জুলাই তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে বিভিন্ন স্থানে প্রায় দেড় মাসের সফরসূচী ছিল। ঐ সফরে শারীরিক অবস্থা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লে ১৫ দিন যেতেই তিনি সফর থেকে ফিরে আসেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দেয়। সাহারানপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার বরকত আলী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসা চালিয়ে যান। ঐ বছর ২৫ আগস্টের পর হাদীসের অধ্যাপনাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব হযরত মাওলানা

---

৪৩৯. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২২।

সায়্যিদ ফখরুদ্দীনের উপর ন্যস্ত করে বাসায় অবস্থান করেন। শারীরিক দুর্বলতা ও রোগ-ব্যাধির ক্রমাগত আক্রমণের ভিতরেও প্রতিটি কাজে সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং আগত অতিথিদের সেবা যত্ন করায় বিন্দুমাত্র ক্রটি হয়নি। অসুস্থতার কারণে শেষ দিকে তাঁকে বসে বসে নামায আদায় করতে হয়েছিল।[৪৪০]

ডিসেম্বরের ১ তারিখ শ্বাসকষ্টের উপশম দেখা যায়। সকলে আনন্দিত ছিল যে, শায়খুল ইসলাম ক্রমে আরোগ্য লাভ করছেন। এখন শারীরিক কিছু দুর্বলতা অবশিষ্ট আছে মাত্র। ৪ দিন পর ৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে তিনি নিজেই কামরা থেকে লাঠির উপর ভর করে বাড়ীর সম্মুখস্থ চত্বরে বেরিয়ে আসেন। বহু দিন পর সুস্থতার মৃদু লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তিনি লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলেন। দুপুর ১২ টা পর্যন্ত কথাবার্তা অব্যাহত থাকে। আগত মেহ্মানদের নিয়ে তিনি আহার করেন।[৪৪১] শিশু ও বাচ্চাদের আদর-সোহাগ করেন। স্ত্রীকে ডেকে জরুরী কথাবার্তা বলেন। পান মুখে দেন। তারপর পরিবারের সকলকে সদাচার ও শরীঅতের অনুশাসন পালনের গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করে সকলকে বিদায় দিয়ে নিজ কামরায় চলে যান। সকলের ধারণা ছিল তিনি বিশ্রাম করবেন, তাই সবাই কামরা থেকে বেরিয়ে আসে। ১ ঘন্টা পর জনৈক সাহেবযাদা কামরার ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর শারীরিক বিশ্রামের প্রয়োজন আছে এবং তিনি আরামে নিদ্রা যাপন করছেন দেখে সাহেবযাদা খুবই সন্তুষ্ট। কিছুক্ষণ পর যেহেতু নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, এখন তাঁকে জাগানো না হলে তিনি রাগ করবেন মনে করে নিদ্রা থেকে জাগানোর চেষ্টা করা হল। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। জরুরীভাবে ডাক্তার ডেকে আনা হল। ডাক্তার তাঁকে দেখলেন, তারপর বললেন, শায়খুল ইসলাম দুনিয়াতে আর বেঁচে নেই।[৪৪২]

﴿ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ﴾

ইন্তিকালের সংবাদ দ্রুত গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লোক দেওবন্দে পৌঁছে যায়। পরদিন শুক্রবার সকাল ৯টায় জানাযা প্রস্তুত করে দারুল উলূম চত্তরে আনা হয়। হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা রহমাতুল্লাহি আলাইহি জানাযার নামায পড়ান। মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁরই প্রাণপ্রিয় শিক্ষক হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহমাতুল্লাহি

---

৪৪০. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৮।

৪৪১. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, সীরতে শায়খুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩২।

৪৪২. মুহিউদ্দীন খান ও ছফিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫।

আলাইহির কবর সংলগ্নে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[৪৪৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ৬ মাস ২৪ দিন।

তিনি ৩ পুত্র ৪ কন্যাসহ অসংখ্য ছাত্র, মুরীদ, খলীফা, ভক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের প্রেসিডেন্ট ড.রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আযাদ শোক বাণী প্রেরণ করেন। দিল্লী থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও তাঁর জীবনী আলোচনাসহ শোকসংবাদ প্রচার করে। রেডিও সৌদি আরব থেকেও শোকসংবাদ প্রচার করা হয়। পরদিন ভারতের জাতীয় পত্রিকাগুলোতে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, মিসর ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তাঁর ওফাতে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।[৪৪৪]

---

৪৪৩. ড.রশীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৮।

৪৪৪.সায়্যিদ রশীদ উদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭ - ২৬৭; তাঁর মৃত্যুতে মিসরের বিশিষ্ট আলিম অধ্যাপক আবদুল মুনয়িম আন নামার লিখেছেন ;

فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي اِنْطَوَتْ صَفْحَةٌ مَجِيدَةٌ لِرَجُلٍ عَظِيمٍ قَلَّ أَنْ
يَجُودَ بِمِثْلِهِ الزَّمَانُ بَعْدَ أَنْ ظَلَّ يَشْغَلُ التَّارِيخَ وَيُتْعِبُهُ فِي
تَتَبُّعِ أَعْمَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ وَالتَّارِيخُ لَا يَفْتَحُ
صَفَحَاتِهِ وَلَا يَعْنِي إِلَّا بِالنَّوَادِرِ مِنَ الرِّجَالِ وَلَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ
الْمَدَنِي نَادِرَةً مِنْ نَوَادِرِ التَّارِيخِ وَأُعْجُوبَةً مِنْ أَعَاجِيبِ
الرِّجَالِ فِي هٰذَا الزَّمَانِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ يَجِدُ الْمُؤَرِّخُونَ
مَتَاعِبَ فِي تَدْوِينِ صَفَحَاتِ أَعْمَالِهِ كَمَا يَجِدُ الْكَاتِبُ
الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَ عَنْهُ صُعُوبَةً فِي الْكِتَابَةِ فَفِي أَيَّةِ
نَاحِيَةٍ يَكْتُبُ وَأَيَّةَ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهِ يُسَجِّلُ وَجَوَانِبُهُ كُلُّهَا
لَامِعَةٌ مُشْرِقَةٌ.

(আল জমইয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩০)

৩য় অধ্যায়

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আলিমগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী থেকে (১৮০৩)। তারপর যথাক্রমে আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা ইনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী, হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিস দেহলবী, সায়্যিদুত্ তায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুকী মুহাজিরে মক্কী, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী, কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী, উস্তাযুল কুল হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান প্রমুখ সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।[1] হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী এ আন্দোলনে যোগ দেন ১৯১৬ সালে।[2] তিনি ১৯২০ পর্যন্ত শায়খুল হিন্দের একান্ত সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ঐ বছর হযরত শায়খুল হিন্দ ইন্তিকাল করলে আন্দোলন পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর উপর। উল্লেখ্য, এটি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে জটিল ও সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর সময়। তিনি পরম অবিচলতা ও বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আকাবির উলামার পবিত্র আমানত ১৯৪৭ সালে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছিয়ে দেন।

শায়খুল ইসলাম ১৯১৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মোট ৩১ বছর স্বাধীনতার সংগ্রাম করেন। তাঁর এই ৩১ বছরের মধ্যে ৮ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয় ইংরেজের জেলখানায়। অবশিষ্ট ২৩ বছর তিনি মাঠে ময়দানে সক্রিয় আন্দোলনের সুযোগ পান। তিনি জমইয়তে উলামা, জাতীয় কংগ্রেস ও খেলাফতের বহু মিটিং, সভা ও সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। ঐ সকল বক্তৃতা পুস্তিকার আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'নক্‌শে হায়াত' গ্রন্থ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের

---

১. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **তাহরীকে শায়খুল হিন্দ** (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ ৫১-৬০।

২. সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, **নকশে হায়াত** (করাচী : দারুল ইশাআত, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ ৬৩৬।

ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যতম উপাত্ত গ্রন্থ। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, কারণ ও আলিমগণের অবদান সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং দলীল প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে।[৩] তাছাড়া 'মকতূবাতে শায়খুল ইসলাম'-এর বিশাল অংশ রাজনৈতিক বিষয়ের উপরই লিখিত। এ সব রচনা ও বক্তৃতা থেকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় সেটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

এক. তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এবং চলমান বিংশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর উপর, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহ ও মুসলমানদের খেলাফত ব্যবস্থার উপর যে সব বিশৃংখলা ও ষড়যন্ত্র আপতিত হয়ে আসছে, তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হল ইংরেজ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশ মুসলিম হওয়ার কারণে এবং মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য হওয়ার কারণে মুসলমানরা ইউরোপীয়দের চক্ষুশূলে পরিণত হয়ে আছে। ফলে ইউরোপীয় কূটনৈতিক মহল বিভিন্ন ছল-চাতুরীর মাধ্যমে মুসলমানদের বরাবর ক্ষতি সাধন করে এসেছে।[৪] কাজেই তিনি ভাবলেন যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ক্ষতি সাধনকারী এ অশুভ শক্তিটি প্রতিহত করা আবশ্যক।

মুসলিম বিশ্বের ক্ষতি সাধনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা ও ষড়যন্ত্রের চিত্র অংকন করে 'মাকতূবাত' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন; যদিও ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলিম শক্তিগুলো বরাবর শত্রুতা করে আসছে তবুও সকল শত্রু এক পর্যায়ের নয়। তাদের কেউ বড় শত্রু আবার কেউ ছোট শত্রু। শত্রুতার পর্যায় অনুসারে শত্রুর মোকাবেলা হয়ে থাকে। ইসলাম যখন থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তখন থেকেই ইংরেজরা ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি সাধন করে আসে। ইংরেজ মুসলমানদের যতটুকু ক্ষতি করেছে, অন্য কোন সম্প্রদায় কিংবা ধর্মের লোকেরা ততটুকু করেনি। বিগত দুইশত বছর থেকে এই ভারতেই তারা ইসলামকে আঘাত করে বার বার। ভারতের ইসলামী শক্তিকে চূর্ণ করে দিয়েছে।[৫] মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের নিপীড়ন চালানোর চিত্র আলোচনা করে তিনি বলেন, ইংরেজ মুসলিম বিশ্বের ইরাক, সিরিয়া, মিসর, ফিলিস্তীন, আরব, সোমালিয়া, উত্তর আফ্রিকা,

---

৩. তানবীর আহমদ উলবী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, **শায়খুল ইসলাম ঃ হায়াত ওয়া কারনামে** (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ ২২৫।

৪. বিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডে, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

৫. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, **মলফূযাতে শায়খুল ইসলাম** (দেওবন্দ ঃ মাকতাবায়ে ইল্‌ম ওয়া আদব, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৩।

সুদান, বার্মা প্রভৃতি দেশে ইসলামী শক্তিকে পদদলিত করে। নানা রকমের ষড়যন্ত্র করে মুসলিম খেলাফতের উচ্ছেদ ঘটায়। তারা হিজায, জিদ্দা, মক্কা ও মদীনার উপর সশস্ত্র ও অমানবিক আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের সুমর্ন দুর্গ ও ইস্তাম্বুল শহর বিধ্বস্ত করে। মুসলমানদের নিষ্পেষণের সম্ভাব্য কোন সুযোগ অবশিষ্ট রাখেনি। ঐ সকল দেশে মুসলমানদের রক্তে কত নদীর সৃষ্টি করা হয়েছিল তার হিসেব নেই। অধিকন্তু তাদের ভূখণ্ডগুলো ইউরোপীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা যেমন ত্রিপলী, লিবিয়ার বিস্তৃত মরুভূমি, উর্না, সওরকন প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইটালীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জনপদ যেমন বুখারা, সমরকন্দ, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, দাগিস্তান, কাযাকিস্তান প্রভৃতি বিভিন্ন চুক্তির শিরোনামে রাশিয়ার দখলে চলে যায়। বুলগেরিয়া, ইউনান, মাকদুনিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রেটসহ বলকান উপদ্বীপের দেশগুলো বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক খেলাফতের হাত থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করে দেয়। এভাবে ইংরেজ মুসলমানদের বিশ্বশক্তিকে বিধ্বস্ত করে ফেলে।[৬]

দুই. তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বের উপর যেই আধিপত্য বিস্তার করে আছে তার মূলে রয়েছে ভারতবর্ষ থেকে আহরিত তাদের সামরিক শক্তি। ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত সৈন্য ও রসদ তাদেরকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপর আধিপত্য কায়েমের রাজপথ করে দিয়েছে। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদকে কোন ক্রমে ভারত থেকে উৎখাত করা সম্ভব হলে শুধু মুসলিম দেশগুলোই নয়, বরং গোটা বিশ্ব থেকেও তারা উৎখাত হতে বাধ্য। এভাবে তখন এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলোও তাদের নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। মোটকথা, তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু ভারতবর্ষের স্বার্থেই নয় বরং সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকাকে মুক্ত করার স্বার্থেও ছিল জরুরী।[৭]

তিন. তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলমানের এবং

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫।

৭. ফরীদুল ওয়াহীদী, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (নয়াদিল্লী ঃ কাওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২) পৃ ২৫৬।

ভারতীয় প্রতিটি নাগরিকের একান্ত কর্তব্য।[৮] তাঁর মতে স্বাধীনতা ব্যতিরেকে মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে না। জন্মগত প্রতিভা ও যোগ্যতার লালন ও বিকাশের জন্যও এটি আবশ্যক। উল্লেখ্য, জীবনে স্বাধীনতার এহেন প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই তিনি ইংরেজ সরকারের প্রতি কোন প্রকার দরদ কিংবা সহযোগিতার প্রদর্শন হারাম বলে মনে করেন।

চার. হযরত শায়খুল ইসলামের নিকট এটা সুবিদিত ছিল যে, ভারত কোটি কোটি মানুষের দেশ। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়গুলো স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ না হলে ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদ তাড়ানো কখনো সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ঐক্য গঠনে জোর দেন। তাঁর মতে ঐক্যই হল স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করার একমাত্র উপায়। তবে এ ঐক্য হবে কেবল রাজনীতি ও আন্দোলনের ঐক্য, ভারতবাসীর পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ঐক্য। স্বধর্ম ত্যাগ করা কিংবা ধর্মীয় বিধান যথার্থভাবে পালনে ত্রুটি কিংবা লংঘন করার ঐক্য নয়। কাজেই প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালনে থাকবে পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর মতে স্বাধীনতার আন্দোলন সফলের জন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধ করাও আবশ্যক। সাম্প্রদায়িকতা পরিহারপূর্বকক নিজেদের দৃঢ় ঐক্য স্থাপন না করা পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কখনো সম্ভব হবে না।[৯]

পাঁচ. শায়খুল ইসলাম নিজের জন্মভূমি ভারতকে গভীর ভালবাসতেন। ভারত উপমহাদেশকে তিনি সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, নৈতিকতা, মানবতাবোধ, ইল্‌ম, আমল, আখ্‌লাক ইত্যাদি সকল দিক থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ জ্ঞান করতেন। মাতৃভূমির ভালবাসা সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বভাবগতভাবেই মানুষ যে ভূখণ্ডে জন্ম নেয়, যেখানে লালিত হয় সেই ভূখণ্ড তার কাছে পৃথিবীর সকল ভূখণ্ড থেকে প্রিয়। জন্মভূমির কষ্টদায়ক একটি কাঁটার আঘাতও অন্য জায়গার আরাম-আয়েশ থেকে উত্তম।[১০] উল্লেখ্য, ভারতের প্রতি ঐ স্বভাবজাত দুর্বলতার দরুন তিনি কখনো ভারত থেকে হিজরত করা পছন্দ করেননি।

ছয়. তাঁর মতে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য। কেননা জাগতিক সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য যেমন দেশের স্বাধীনতা

---

৮. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৮৭), পৃ ২৭১।

৯. ড.সায়্যিদ আবদুল বারী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮০।

১০. আদিল সিদ্দীকী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত প্রাগুক্ত, পৃ ৪০২।

জরুরী, তেমনি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মীয় বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে পালনের জন্যও স্বাধীনতা আবশ্যক।[১১] ইসলাম কোন ধরনের জুলুম সমর্থন করে না। বরং জুলুমের প্রতিবাদ করা এবং জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়। ইসলাম মানবতা ও মহানুভবতার ধর্ম। এ ধর্মে অন্যায়ভাবে কোন জীবজন্তুকেও কষ্ট দেওয়া হারাম। কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কিংবা নির্যাতিত অবস্থায় পরাধীন জীবন যাপনে পরিতুষ্ট হয়ে থাকাও ইসলাম পছন্দ করে না।

এক বক্তব্যে তিনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ
عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ — رواه مسلم و ابو داود و
النسائى بطريق ابى هريرة رضى الله عنه))

যে ব্যক্তি জীবনে জিহাদ করেনি এবং জিহাদের প্রতি তার মনে আগ্রহেরও উদ্রেক হয়নি এমতাবস্থায় মারা গেলে তার মৃত্যু মুনাফকীর একটি শাখা পতিত হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

((اَلْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ))

ইসলাম মানুষকে উন্নত করে, তাকে অন্যের সামনে অবনত হয়ে থাকতে দেয় না।[১২]

উল্লেখ্য, পরাধীনতার জীবন যাপনে তুষ্ট হয়ে থাকা কিংবা পরাধীনতার প্রতিরোধে কথা না বলা উপরোক্ত হাদীসসমূহের পরিপন্থী।

সাত. স্বাধীনতার এ আন্দেলনকে তিনি ইসলামে বর্ণিত 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'-এর অংশ হিসেবে জ্ঞান করেছেন। আর ঐ প্রেরণা ধারণ করেই

---

১১. আবদুল কাদির বেগ, করাচী কা তারীখী মুকাদ্দমা (পাকিস্তান ঃ উর্দু একাডেমী, তা. বি.), পৃ ৬০-৬৪।

১২. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম (গাওজরনাওয়ালা ঃ মাদানী কুতুবখানা, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ১৩৯।

আজীবন আযাদীর লড়াই করে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ববর্তী উলামা ও আকাবিরের অনুভূতিও তদ্রূপ ছিল। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয, সায়্যিদ আহমদ শহীদ, কাসিম নানূতবী, শায়খুল হিন্দসহ সকলে এটিকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্' জ্ঞান করে আসেন। এ কারণেই তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে আন্দোলনের বিজয়ীকে গাযী, জীবনদানকারীকে শহীদ ও দেশত্যাগকারীকে মুহাজির আখ্যা দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিভিন্ন হাদীস যেমন ;

((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ))

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইন্‌সাফ ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

তিনি আরো ইরশাদ করেন, জালিমের হাত থেকে নিজ সম্পদ রক্ষার্থে জীবনদানকারী শহীদ, পরিবার-পরিজন রক্ষার্থে জীবনদানকারী শহীদ----প্রভৃতি তাঁদেরকে সে মানসিকতা গ্রহণের অনুপ্রেরণা দেয়।[১৩] বস্তুত ইংরেজরা ভারতীয় নিরীহ মানুষের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছিল তার প্রতিরোধ করা এবং ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে জালিমের জুলুম থেকে উদ্ধার করা ছিল তাঁদের জিহাদের প্রধান লক্ষ্য। এক চিঠিতে শায়খুল ইসলাম স্পষ্টভাবে লিখেছেন, আমি সংগ্রামের এ কঠিন অঙ্গনে পার্থিব কোন লোভে অবতীর্ণ

১৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৭; এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষণীয়:

((عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـــ رواه ابو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجة و قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرمِذِىْ مَنْ اُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَ فِى النَّسَائِىْ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مُظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ......))

হইনি। এ আন্দোলনকে আমি 'কাফিরের বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদ' বলে বিশ্বাস করি। দ্বীন ও শরীঅতের স্বার্থে একটি পবিত্র সংগ্রাম বিবেচনা করেই আমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।[১৪]

আট. তাঁর দৃষ্টিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ নিঃসন্দেহে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। এমনকি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর শত্রু। ইংরেজ ভারতীয়দের অনিষ্টকারী এবং ভারতীয়দের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন। এহেন দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের কর্তব্য। তাই এক বক্তব্যে তিনি বলেন, মুসলমানরা প্রায় এক হাজার বছর যাবৎ ভারত শাসন করেছে। এ দেশ ছিল 'দারুল ইসলাম'। এখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন ছিল। কুফ্‌র ও শির্‌কের ঝাণ্ডা ছিল অবনমিত। ইংরেজ নানা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এবং ভারতীয়দেরকে পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত করে মুসলিম সম্রাট ও নওয়াবদের হত্যা করে। তাঁদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সর্বশ্রান্ত করে দেয়। গোটা ভারতবর্ষকে 'দারুল কুফ্‌র'-এর দিকে ঠেলে দেয়। ইসলামের পতাকা অবনমিত করে এখানে কুফ্‌রের পতাকা উড্ডীন করে। ভারতকে গোলাম বানিয়ে ভারত থেকে আহরিত সম্পদ ও সামরিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ একের পর এক পরাভূত করে। ইংরেজরা বহির্দেশীয় মুসলিম বাহিনীকে হত্যা করছে, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে পরাভূত করছে, তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্রাস করছে। তাই আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন যে, আমাদের জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত বড় শত্রু আর কে হতে পারে?[১৫]

নয়. তাঁর মতে ভারতীয়রা ইংরেজদের হাতে প্রচণ্ড নিগৃহীতের জীবন যাপন করে আসছে। ইংরেজ সরকারের কাছে তাদের মানবিক ন্যূনতম অধিকারেরও স্বীকৃতি নেই। ইংরেজ ভারতবাসীকে জীব-জন্তুর চেয়েও তুচ্ছ জ্ঞান করে। এ ধরনের তুচ্ছ জ্ঞানকারী লোকেরা কখনো কোন জাতির অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তিনি এক জায়গায় বলেন, আমি বিদেশেও লক্ষ্য করেছি যে, হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ফার্সী যে ধর্মের লোকই হোক না কেন ভারতীয় হিসেবে ইংরেজরা তাদেরকে অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে। তাদেরকে নিজেদের কেনা গোলাম মনে করে।[১৬]

---

১৪. আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪।

১৬. ড.সায়্যিদ আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৮।

দশ. তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে বস্তুবাদ ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে মানবতাবাদ ও ধার্মিকতার সংগ্রাম। এশিয়া মহাদেশ আবহমানকাল থেকে ধর্ম ও মানবতার লালনক্ষেত্র হিসেবে চলে আসছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অধিকাংশ নবী রাসূল এই এশিয়ার ভূখণ্ডেই ছিলেন। পক্ষান্তরে ইউরোপের পরিবেশ তদ্রূপ নয়। তাই ইউরোপ দীর্ঘকাল থেকে ধর্মহীনতা, নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। শায়খুল ইসলামের গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজরা রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে ধার্মিকতার লালন ক্ষেত্র এশিয়ার উপর ইউরোপীয় ধর্মহীনতা চাপিয়ে দিচ্ছে। ইউরোপীয় আগ্রাসনের ফলে এশিয়ার ধার্মিকতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে আছে।[১৭] কাজেই হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও ফার্সী নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর কর্তব্য ঐ ধর্মহীনতার আগ্রাসন প্রতিরোধ করা। নতুবা পরিণামে ভারত এবং এশিয়ার কোন ধর্মেরই অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে না।

স্বাধীনতার আন্দোলন তাঁর কাছে 'জিহাদ' গণ্য হওয়ায় তিনি আপোসহীনতার অবলম্বন করেন। সাধারণ রাজনীতিতে পট পরিবর্তন করা যায়, মতামত বদলানো যায়, প্রয়োজনে আপোস করা যায়। কিন্তু যেই রাজনীতি প্রকৃত অর্থে জিহাদ সেই রাজনীতিতে নীতির পরিবর্তন কিংবা আপোসের সুযোগ নেই বলে তাঁকে আপোসহীনতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর দিনগুলো অতিবাহিত হয় জিহাদের শ্রম ও সাধনার কাজে আর রাতগুলো অতিবাহিত হয় মহান আল্লাহ্‌র কাছে গভীর রোনাজারীর মধ্যে। এ জিহাদের শুরু থেকেই তিনি প্রত্যহ ফজ্‌র নামাযে 'কুনূতে নাযিলা' তিলাওয়াত করেন। কুনূতে নাযিলা সাধারণতঃ কোন বড় ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হলেই পড়া হয়ে থাকে। বিশ্ব মুসলিমের উপর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন তিনি মুসলিম সমাজের জন্য মহাভীতিকর সমস্যা বিবেচনা করেই এই কুনূতে নাযিলার আমল চালাতে থাকেন।[১৮] উল্লেখ্য, মুসলমানদের ধর্মীয় জিহাদে অমুসলিম থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণের অবকাশ নেই বিধায় আন্দোলনে আলিমগণ কখনো হিন্দুদের অর্থ সাহায্য

---

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী (ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃ ১২৮।

গ্রহণে সম্মত হননি। এমনকি ত্যাগের প্রতিদানস্বরূপ রাষ্ট্রীয় খেতাব গ্রহণেও তাঁদের রাযী করানো যায়নি।[১৯]

দুই

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তুমুল আন্দোলন ও সংগ্রাম দ্বারা সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ বাধ্য করা ব্যতিরেকে ভারত ত্যাগে সম্মত করা যাবে না। তাছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে সরকারকে বয়কট করা আবশ্যক। এ নীতির আলোকেই তিনি কংগ্রেসের সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং বিলাতী পণ্য পরিহারের নীতি অবলম্বন করেন। তিনি মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হন। তারপর প্রাদেশিক শাখার নেতৃত্ব দেওয়া, বিভিন্ন কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করা, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান ইত্যাদির মাধ্যমে শেষ অবধি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচির সাহায্য করে যান। এ দীর্ঘ সময়ে কংগ্রেসের কোন কোন সিদ্ধান্তের সাথে তাঁর মতানৈক্য ঘটে থাকলেও ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনের ব্যাপারে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন হননি। কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, প্রথম দিকে আমি সশস্ত্র বিপ্লব ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সমর্থক দলগুলোর সাথে যুক্ত ছিলাম। এজন্য আমাকে মাল্টায় ৪ বছর কারাবরণ করতে হয়। মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেই। ১৯২০ থেকে নিয়মিত বাৎসরিক ফিস আদায়সহ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের সদস্য হিসেবে কাজ করি। ঐ সময় থেকে আমি খেলাফত কমিটিরও সদস্য ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে খেলাফত আন্দোলন বিলুপ্ত হওয়ায় খেলাফতের কাজ করার সুযোগ থাকেনি। আমি চাই স্বাধীনতা, চাই বিপ্লব, চাই ইংরেজ রাজত্বের পতন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে এবং নির্মূল করার স্বার্থে যেই সংগঠন কাজ করবে, আমি তার সাথে অংশ গ্রহণে সর্বদা প্রস্তুত।[২০]

---

১৯. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, ওয়াকিআত ওয়া কারামাত (মুরাদাবাদ : মাকতাবায়ে নেদায়ে শাহী, ১৯৯৫), পৃ ১১০।

২০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮০; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে : Ziya-Ul-Hassan Faruqi, **The Deoband School And The Demand For Pakistan**, Bombay, Asia Publishing House, 1963, pp 24-25.

শায়খুল ইসলাম অন্যত্র বলেন, বিগত ২৫ বছর থেকে আমি কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে আছি। এ সূত্রেই আমি তাদের সভায় যোগদান করি। বক্তব্য রাখি। চাঁদা দেই। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি ও জেলে যাই। জমইয়তে উলামায়ে হিন্দেরও আমি সক্রিয় সদস্য। তবে ইংরেজ সমর্থক কিংবা ইংরেজ তাবেদার সাম্প্রদায়িক কোন দল কিংবা সংগঠনের সাথে আমি নেই, সেটি মুসলমানদের হোক কিংবা অমুসলিমদের। তাদের কোন সভা-সমিতিতেও আমি অংশগ্রহণ করি না।[২১]

কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়কে তিনি কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নয় বরং ধর্মীয় প্রয়োজনেও গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে যেহেতু বিশ্ব মুসলিমের মুক্তি লাভের বিষয়টি ভারতের স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে হলেও স্বাধীনতার আন্দোলন বেগবান করে তোলা জরুরী। এ যোগদানকে তিনি বিশ্ব মুসলিমের স্বার্থে সম্পাদিত একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন।

এক বক্তব্যে তিনি বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, আমি কংগ্রেসের একজন সদস্য হিসেবে আছি। কংগ্রেস একটি সম্মিলিত দল। এ দলের সদস্যপদ গ্রহণে অসুবিধা কোথায়? ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে সদস্য হিসেবে আছে এবং থাকতে পারে। ১৮৮৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রায় ৮/৯ জন সভাপতি মুসলমান ছিলেন। মুসলিম লীগ, খেলাফত কমিটি, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রভৃতির সকলেই ১৯২০ সালে এ সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েই কাজ করেছেন। তখন কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করতে কারোই তো আপত্তি ছিল না। এটি হিন্দুদের একান্ত ধর্মীয় সংগঠন নয়। হিন্দুদের একান্ত ধর্মীয় সংগঠন হল 'হিন্দু মহাসভা'। ঐ সংগঠন শুধুমাত্র হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া নিয়েই কাজ করে। অনুরূপে মুসলিম লীগ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংগঠন। কাজেই যেভাবে অন্যান্য মুসলমান (মুসলিম লীগ) নিজেদের নাগরিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য ইংরেজদের সাথে মিউনিসিপালিটি বোর্ড, ডিস্ট্রিক বোর্ড, কাউন্সিল ও এসেম্বলীতে যোগ দেয় এবং যোগদান করাকে অবৈধ মনে করে না, তেমনি আমিও ইংরেজ শাসনের অক্টোপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগের জন্য কংগ্রেসে যোগদান করাকে

২১. প্রাগুক্ত।

অবৈধ মনে করি না। বরং পরিস্থিতির দাবী অনুসারে এটিকে আমি 'জিহাদ' এমনকি উত্তম জিহাদ' বলে মনে করি।[২২]

হযরত শায়খুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব এবং কংগ্রেসে তাঁর যোগদান সম্পর্কে উপমহাদেশের প্রখ্যাত গবেষক মরহুম মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী একটি মূল্যবান মন্তব্য করেন। মাওলানা নাজমুদ্দীন ইসলাহী সেটি উল্লেখ করে বলেন, মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, মৌলভী নাজমুদ্দীন! তোমাকে একটি বিশেষ কথা শোনাতে চাই। তা হল, ভারতবর্ষে যদি কাউকে আমীরুল মুজাহিদীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের সার্থক উত্তরাধিকারী বলে চিন্তা করা হয়, তা হলে তিনি হবেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী। মনে রেখ, হযরত মাদানীর কংগ্রেসে যোগদান করে স্বাধীনতার আন্দোলন করা তাঁর রাতে তাহাজ্জুদ পড়া থেকে কোন অংশেই কম মানের নয়।[২৩]

---

২২. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৭ ; Hussain Ahmed Madani, **An Open Letter to Moslem League**, Lahore, Dewan's Publication, 1946, pp 72-73.

২৩. সীরতে শায়খুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২। আলিমগণের কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে মাওলানা নদভী বলেন :

آزاد مسلم مفکرین کی ایک بڑی تعداد جن میں سر
فہرست علماء دین تھے کانگریس کی تائید اور سیاسی
وقومی تحریکات میں حصہ لینے کے قائل تھے ، اور سیاست
کو شجرۂ ممنوعہ نہیں سمجھتے تھے ، مولانا محمد
صاحب لدھیانوی نے ۱۸۸۸ء میں "نصرة الأبرار" کے نام سے
فتاوی کا ایک مجموعہ شائع کیا جسمیں کانگریس کی
حمایت کی دعوت دی گئی تھی ، اسمیں نہ صرف
ہندوستان کے بڑے بڑے علماء بلکہ مدینہ منورۃ اور بغداد کے
علماء بھی دستخط کئے تھے ان علماء میں مولانا رشید

শায়খুল ইসলাম বিলাতী পণ্য ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করেন যে, বাণিজ্যের পথ ধরেই ইংরেজ ভারতের ময়ূর সিংহাসন দখল করেছে এবং এ পথ দিয়েই ভারতের ধনভাণ্ডার ইংল্যান্ডে পাচার করছে। বিলাতী পণ্যের বাণিজ্যই তাঁদের সকল উত্থানের বুনিয়াদ। কাজেই এ বুনিয়াদ বিধ্বস্ত করা আবশ্যক। তিনি ইংরেজকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার লক্ষ্যে এবং স্বদেশী পণ্যের বৃহত্তর বিকাশের স্বার্থে তাই বিলাতী পণ্য পরিহারের আন্দোলন করেন।

তাঁর ব্যক্তিগত নীতি ছিল, একান্ত বাধ্য ও নিরুপায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনো বিদেশী পণ্য ব্যবহার করতেন না। নিজের ঘরবাড়ী ও আসবাব পত্রের সর্বত্র ছিল দেশী পণ্য। ভুলক্রমে কখনো যদি কোন বিদেশী পণ্য তাঁর গৃহে এসে যেত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটি ফিরিয়ে দিতেন কিংবা নষ্ট করে ফেলতেন। উপমহাদেশের সর্বত্র তাঁর অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত ছিল। তিনি তাদের কাউকে কোন বিদেশী পণ্য ব্যবহার করতে দেখলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, কোন জানাযার কাফন যদি বিদেশী কাপড় দ্বারা করা হত তাহলে তিনি ঐ জানাযায় শরীক হতেন না। আর শরীক হলেও নিজে জানাযার নামায পড়াতেন না। তাঁরই জনৈক মামাত ভ্রাতা সায়্যিদ খলীল আহমদ ইন্তিকাল করলে তিনি তার জানাযায় যান কিন্তু কাফনে বিলাতী কাপড় ছিল বলে অনেক পীড়াপীড়ির পরেও ইমামত করেননি।[২৪] তাঁর জীবনে এ ধরনের আরো বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি আজীবন দেশী খদ্দর কাপড় ব্যবহার করেন।

হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা বলেন, হযরত মাদানীর মনে দেশী খদ্দরের প্রতি ছিল গভীর ভালবাসা। পক্ষান্তরে বিলাতী কাপড়ের প্রতি ছিল প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ। আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক অনেক দিনের। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন কিন্তু আমার শরীরে কখনো বিদেশী কাপড়ের জামা দেখলে অসন্তুষ্ট হতেন। এক পর্যায়ে এমন হল যে, আমাকে বিদেশী কাপড়ের জামা পরিহিত দেখলেই নিজে হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলতেন। তাই তাঁর জীবদ্দশায় আমি শুধু খদ্দর কাপড়ই ব্যবহার করি। কারণ তিনি এই এই অধমের বাড়ী আসতেন।

احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا لطف اللہ علی
گڑھی بھی شامل تھے۔

(আবুল হাসান আলী নদভী, হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারীখী জাযিযা, লক্ষ্ণৌ, মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৯৯২, পৃ ১৭০-১৭১)

২৪. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৪।

আগমনের কোন নির্ধারিত সময় ছিল না। যে কোন দিন যে কোন সময়ই এসে যেতেন বিধায় সর্বদাই আমাকে খদ্দরের কাপড় পরিধান করে থাকতে হত।[২৫]

স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশী পণ্যের পরিহার সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন, ভারত যদি নিজের উৎপাদিত পণ্যের উন্নতি সাধনে একনিষ্ঠ হয় এবং বিদেশী পণ্যের খরিদ বন্ধ করে দেয় তাহলে পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই, যে অর্থনৈতিকভাবে ভারতকে পরাভূত করতে পারে। বিলাতী পণ্য খরিদের দ্বারা প্রকারান্তরে ইংরেজকে সাহায্য করা হয়। এ সাহায্য দান ভারতীয়দের আত্মহননের শামিল। এক চিঠিতে তিনি উপদেশ দিয়ে লিখেছেন, তারপরেও আমি উপদেশ দিয়ে বলছি, সাবধান! ইংরেজের প্রতি তুচ্ছ পর্যায়েরও কোন সমর্থন কিংবা কোন সাহায্য সহযোগিতা করবেন না। এটি দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর। বিলাতী পণ্যের ব্যবহার থেকে বিশেষতঃ বিলাতী কাপড়ের ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকুন। অন্যদেরকেও বিরত রাখুন। যতটুকু সম্ভব মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি করুন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নির্মূল করার সর্বময় চেষ্টায় নিয়োজিত থাকুন।[২৬]

বিলাতী পণ্য পরিহারের প্রতি এতটা সাধনা থাকা সত্ত্বেও কিছু জরুরী জিনিস বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছিল। কারণ এগুলোর কোন উৎপাদন ভারতে ছিল না। বৃটিশ সাধারণভাবে ভারতকে দুই শত বছর যাবত গোলাম বানিয়ে রেখে এতটা নিঃস্ব করে দিয়েছিল যে, দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অনেক কিছু যেমন; লণ্ঠন, ছুরি, চাকু, কেঁচি, সুই, বোতল, গ্লাস, কলম, কালি, নিব, চশমা, থার্মাস সবই বিলাত থেকে আমদানী করতে হয়। এ সকল জিনিসের মধ্যে শায়খুল ইসলাম কেবল ঐ পণ্যই মনের অনিচ্ছায় ব্যবহার করেন যেগুলি ভারতে পাওয়া যেত না। এক চিঠিতে তিনি নিজের নীতি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, আমি যথাসম্ভব বিদেশী পণ্যের ব্যবহার পরিহার করে চলি। তবে যে সব জিনিস ভারতে উৎপন্ন হয় না এবং ব্যবহার না করেও উপায় নেই সেগুলি শুধু ন্যূনতম প্রয়োজনের পরিমাণে ব্যবহার করি। আমার কাছে ঘড়ি, চশমা ও ফাউন্টেন পেন ছাড়া কোন জিনিস বিদেশী নেই। ফাউন্টেন পেনটিও সফর ব্যতীত সাধারণ সময়ে ব্যবহার করি না। আপনি যে কাগজে আমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন সেটি বিদেশী। আমার কাছে ইসলাম ও দেশপ্রেম একটি মূল্যবান

---

২৫. মুহম্মদ যাকারিয়্যা, আপবীতী (সাহারানপুর ঃ মাকতাবায়ে শায়খ যাকারিয়্যা, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৬৪।

২৬. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪০।

সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। আমি মুসলমান তথা সকল ভারতবাসীর জন্য দেশী কাপড় ব্যবহার করা এবং বিলাতী পণ্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলা আবশ্যক মনে করি।[২৭]

বস্তুত এটিই ছিল তাঁর সেই মোক্ষম হাতিয়ার, যার দ্বারা তিনি একদিকে ভারতবাসীর মনে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি সচেতনতা ও স্বাধীনতার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করেন, অপর দিকে বৃটিশ স্বার্থের উপর সজোরে এমন আঘাত হানেন, যার পরিণামে বৃটিশকে বাধ্য হয়েই ভারত ত্যাগ করতে হয়েছিল।

তিন

রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান আলোচনায় দু'টি প্রান্তিক অভিমত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে ইসলামে রাজনীতি নেই। আবার কেউ কেউ বলেন ইসলাম মানেই রাজনীতি। হযরত শায়খুল ইসলাম উপরোক্ত দু'টি অভিমতকেই অতিশয়তা ও বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। তাঁর মতে রাজনীতি করা ইসলাম বহির্ভূত নয়। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজনীতি চর্চায় ইসলামের কোথাও নিষেধ করা হয়নি।[২৮] পক্ষান্তরে মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার অবলম্বন করা, সেটি রাজনীতির ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে হোক সর্বৈব পরিত্যাজ্য। মিথ্যা ও প্রতারণা জঘন্য গুনাহের কাজ।

হযরত মাদানী ছাত্র রাজনীতির সমর্থক ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে দীনী শিক্ষার্থীদের যারা নিজেদের শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করেনি এবং শিক্ষা লাভের কাজে রত আছে তাদের জন্য তালীম বাদ দিয়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ উচিত নয়। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সম্পন্ন করার প্রতি প্রথম মনোযোগ দান জরুরী। তবে ছুটির সময়ে কিংবা অবসর সময়ে রাজনীতি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতার অর্জনে দোষ নেই।[২৯]

স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে তিনি ভারতীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে যে ঐক্য স্থাপন করেন সেটি ছিল একান্ত রাজনৈতিক। আকীদা বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে ঐক্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের ঐক্য স্থাপনে বাধা নেই। তিনি দলীল পেশ করে বলেন, মদীনা মুনাওওয়ারায় পৌঁছার পর

২৭. আর্ রশীদ পত্রিকা, মাদানী ও ইকবাল সংখ্যা, পৃ ৩৪৩।
২৮. আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৭।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার ইহূদীদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। আবার হুদায়বিয়ায় তিনি ঐ মুশরিকদের সাথে সন্ধি করে ইহূদীদের সাথে যুদ্ধ করেন। উপরোক্ত ২টি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাথে ঐক্য করা বৈধ। তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, আমরা শরীঅতের বিধি-বিধানে বিকৃতি সাধন কিংবা মুসলিম বা অমুসলিম কারো নির্দেশে শরীঅতের কোন বিধান পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা কোন ক্রমেই বৈধ মনে করি না।[৩০]

বস্তুত মুসলমানদের প্রধান শত্রু ইংরেজকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে তিনি হিন্দুদের সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য হন। পরিস্থিতির দাবী অনুসারে এটি করা ব্যতিরেকে তাঁর গত্যন্তর ছিল না। কারণ তৎকালে এককভাবে মুসলমানদের শক্তি এত টুকুছিল না, যার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে কাবু করা যায়। এ কারণেই তাঁকে কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী অমুসলিমের সাথে মিলে ঐক্য গঠন করতে হয়।[৩১]

ঐক্য গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন, হিন্দুদের বর্তমান অবস্থায় এতটুকু শক্তি নেই যতটুকু শক্তি রয়েছে ইংরেজদের হাতে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিরিখে এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইংরেজ। হিন্দুদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, হয়ত ভবিষ্যতে তারা ইংরেজদের ন্যায় কিংবা তাদের চেয়েও বড় ধরনের অনিষ্টকারী হতে পারে। তবে সেটি কেবল ধারণা ও আশংকা মাত্র। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এ কারণে আকাবির উলামা ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা উদ্ধার করা এবং ইংরেজ আধিপত্য নির্মূল করার বিষয়টি সর্বদা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করে আসেন। উল্লেখ্য, এ লক্ষ্যেই কংগ্রেস গঠিত হয় এবং মুসলমানরা তাতে অংশ গ্রহণ করে। জমইয়তে উলামার নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সাথে কর্মসূচীর ঐক্য স্থাপনে এটিই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হযরত মাদানীর বক্তব্য ছিল, যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ঐক্যের আবশ্যকতা বিদ্যমান থাকবে। হ্যা, কংগ্রেস যদি এমন কোন ঘোষণা দেয় যে, তারা ইংরেজকে ভারত থেকে উৎখাত করতে ইচ্ছুক নয়, তখন জমইয়ত অবশ্যই কংগ্রেসের সাথে কর্মসূচীর উপরোক্ত ঐক্য পরিত্যাগ করবে।[৩২]

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

৩১. আবদুর রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান (লাহোর : মাকতাবায়ে রশীদিয়্যা, তা. বি.), পৃ ৪৮৪।

৩২. আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭৬।

আজ আপনাদের সুযোগ হয়েছে নিজের শত্রুকে দমন করার। কাজেই অসহযোগের অস্ত্র দ্বারা বড় শত্রুটি দমন করুন। তাকে পরাস্ত করতে অন্যদেরকেও সঙ্গে নিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে খায়বার যুদ্ধে বনূ হারিসার ইহূদীদেরকে, হুনায়ন যুদ্ধে মক্কার সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়া ও অন্যান্য তুলাকাকে এবং হুদায়বিয়্যার সন্ধিকালে খোযা গোত্রের লোকদেরকে এ নীতির উপরই মুসলমানদের সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।[৩৩]

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন আইন অমান্য আন্দোলনে বিপ্লবী আলিমগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাসহ অংশ গ্রহণ করেন। আন্দোলনে বহু আলিম কারারুদ্ধও হন। তাঁদের এ অবদান দেশবাসীর শ্রদ্ধা কুড়িয়ে আনলেও কতিপয় সমালোচক তখন তিরস্কার করে বলেছিল যে, কোন অমুসলিমের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ইসলামের পবিত্র জিহাদ হতে পারে না। তাদের দলীল ছিল যে, অমুসলিমের ইমামত মুসলমানের জন্য নাজায়িয ও হারাম। শায়খুল ইসলাম উপরোক্ত অভিযোগের খণ্ডনে বলেন, অমুসলিমকে জিহাদের ইমাম নিযুক্ত করা যায় না। তবে জিহাদের অধীনে পরিচালিত কোন কাজে অমুসলিমের সহযোগিতা নেওয়া বা নেতৃত্ব দ্বারা নিজেরা উপকৃত হওয়া দোষের বিষয় নয়। যেমন কোন হিন্দুকে মসজিদের ইমাম বানানো যায় না। কিন্তু মসজিদের নির্মাণ কাজে কিংবা কোন মুসলিম রোগীর চিকিৎসা কাজে অমুসলিমকে নেতা বানানো যায়। তিনি বলেন, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে, জমইয়তে উলামা কোন অমুসলিমকে নিজদের কায়িদ কিংবা ইমাম নিযুক্ত করেছে। জমইয়ত স্বায়ত্তশাসিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি অন্য কোন দল বা সংগঠনের তাবেদার বা লেজুড় নয়। কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, জমইয়তে উলামা ঐ সকল সিদ্ধান্ত নিজেদের বৈঠকে গভীর পর্যালোচনা করে থাকে। তারপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তথা কুরআন-হাদীস ও ফিকহের আলোকে ঐ সিদ্ধান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মুসলমানদের জন্য যতটুকু সঠিক ও উপযুক্ত বিবেচিত হয়, ততটুকুই গ্রহণ করেন। আর যা শরীঅতের খেলাফ কিংবা উম্মতের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হয় তা বর্জন করেন।

যদি ইমামত ও নেতৃত্বের অর্থ সেটিই হয় যা সমালোচকরা বলে বেড়াচ্ছেন এবং যদি অমুসলিমের কোন ধরনের নেতৃত্বই মুসলমানের জন্য নাজায়িয হয়, তা হলে মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড, ডিস্ট্রিক বোর্ড প্রভৃতিতেও কোন মুসলমানের অংশগ্রহণ জায়িয হবে না। কারণ ঐ সকল বোর্ডের অধিকাংশেরই

৩৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৩।

প্রেসিডেন্ট কিংবা সেক্রেটারী অমুসলিম। অনুরূপে ইংরেজ সরকারের প্রশাসন, সামরিক, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিভাগেও মুসলমানদের চাকুরী করা বৈধ হবে না। অথচ সমালোকরা কখনো ঐ ক্ষেত্রগুলিতে অংশ গ্রহণ হারাম বলেন না বরং নিজেরা প্রতিযোগিতা করে সেখানে প্রবেশ করে থাকেন।[৩৪]

কংগ্রেসের সাথে আলিমগণের ঐক্য স্থাপন আলিমগণেরই অপর একটি ক্ষুদ্র দল সমর্থন করেননি। তাঁদের সাথে জমইয়তের সভাপতি মাওলানা মুফতী কিফায়েত উল্লাহর এক প্রশ্নোত্তর হয়। প্রশ্নোত্তরটি ছিল নিম্নরূপ :

প্রশ্ন : জমইয়তে উলামার মতে কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান করা ধর্মীয়ভাবে জরুরী। এর কারণ কি? কংগ্রেস থেকে পৃথক থাকার মধ্যে মুসলমানদের ক্ষতি আছে কি?

উত্তর : শুধু জমইয়তে উলামায়ে হিন্দই নয় বরং ভারতের উল্লেখযোগ্য সকল রাজনৈতিক সংগঠনেরই উদ্দেশ্য ইংরেজের শৃংখল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা এবং ভারতকে একটি স্বাধীন দেশে পরিণত করা। উল্লেখ্য, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের সকল সম্প্রদায় ও সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার দাবী না তুলবে, বাহ্যতঃস্পষ্ট যে, ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। এই স্বাধীনতা ও আযাদীর স্বার্থে জমইয়তে উলামা বর্তমানে কংগ্রেসের সাথে যোগ দিয়ে হলেও আন্দোলন বেগবান করা জরুরী মনে করে। আর যেহেতু ইংরেজের কারণে বিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্রীয় খেলাফত ও বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকারগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকায় পতিত হয়ে আছে, সেহেতু মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য হল যতটুকু সম্ভব ইসলামী শক্তিকে সাহায্য করা এবং ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুর শক্তিকে দুর্বল করে রাখতে চেষ্টা করা।

প্রশ্ন : বর্তমানে মুসলমানরা কংগ্রেসে যে শর্তহীনভাবে যোগ দিচ্ছে তা উচিত হচ্ছে কি না? তাছাড়া নির্বাচনে মুসলিম সিটগুলোর জন্য কংগ্রেস যেভাবে সরাসরি প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে, তাতে ইসলাম ও মুসলমানের কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি? যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

উত্তর : কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কর্মরত বিভিন্ন জনগোষ্টির লোকদের নিয়ে গঠিত একটি সম্মিলিত দল। মুসলমানরা নিজ ধর্মে অটল অবস্থান করেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশীদার থাকতে পারে।

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪-১১৫।

অকংগ্রেসী মুসলমান, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার অনুরাগী তাদের মধ্যে ইসলামের সহিত সম্পর্কহীনতা আরো বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। কংগ্রেসী মুসলমানরা ইসলাম থেকে এতটুকু সম্পর্কহীন নয়, যতটুকু সম্পর্কহীন অবস্থায় রয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার অনুরাগী অকংগ্রেসী মুসলমানরা। এমতাবস্থায় কারা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর আপনিই ভেবে দেখুন?

প্রশ্ন : মুসলিম লীগের সাথে জমইয়তে উলামার মতবিরোধ কেন? অথচ মুসলিম লীগ মুসলমানদেরই স্বার্থ নিয়ে কথা বলে এবং তাদেরকে সংগঠিত করছে। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এ সংগঠনেরও উদ্দেশ্য।

উত্তর : মতবিরোধের কারণ হল যে, লীগের অধিকাংশ নেতা ইংরেজ শাসনকে আল্লাহ্র ছায়া মনে করে। তারা ইংরেজদের আঁচলে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকতে আগ্রহী। তারা সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করা, সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য দৃঢ় করে দেওয়া এবং দেশের কায়েমী পুঁজিপতিদের সমর্থন করাই নয় বরং পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমে পাকাপোক্ত বানাতেও আগ্রহী। দেশের কল্যাণে এ সংগঠন ইতোপূর্বে কোন কাজ করেনি। তাছাড়া এ কথা কারো অজানা নয় যে, লীগের সদস্য হওয়া কিংবা দায়িত্বশীল নিযুক্ত হওয়া বস্তুত সরকারী বড় বড় পদ প্রাপ্তিরই উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। লীগ বর্তমানে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পেশ করলেও এ কথা ঠিক যে, এককভাবে মুসলমানদের পক্ষে পূর্ণ আযাদী আদায় করে আনা অসম্ভব। তাই আযাদীর অনিবার্য শর্ত হিন্দু-মুসলিমের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ অবলম্বন না করে কেবল মুখে মুখে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ স্পষ্ট প্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে?

প্রশ্ন : যদি লীগের মধ্যে শরীঅতের দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি আছে বলে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে জমইয়তের জন্য কি উচিত নয় যে, লীগের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ সকল ত্রুটির সংশোধন করে দেওয়া?

উত্তর : লীগের সঙ্গে শরীক হয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে তবে লীগকে ঐ ত্রুটি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা বিগত সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নিষ্ফল ও অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। কোন সচেতন মুসলমান একই গর্তে ২ বার পা রাখে না।

প্রশ্ন : লীগ ও জমইয়তের মতবিরোধের কারণে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির উদ্রেক হচ্ছে। জমইয়ত এ দলাদলির প্রতিরোধে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই দলাদলির উদ্রেক হচ্ছে। তবে বিগত সময়ের ঘটনাবলী চিন্তা করে দেখুন এ দলাদলির দায়-দায়িত্ব কার উপর বর্তায়, লীগের উপর না জমইয়তের উপর।[৩৫]

চার

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী ভারতে হিন্দু-মুসলিমের যে ঐক্য ও অভিন্ন জাতীয়তার সমর্থন করেন সেটি নতুন কিছু নয়। তাঁর পূর্বসূরী উলামা তথা হযরত শায়খুল হিন্দ, হযরত নানূতবী, হযরত গাঙ্গূহী, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ শহীদ প্রমুখ বিপ্লবীও এ ঐক্যের সমর্থন করে গিয়েছেন। জাতীয়তার ব্যাপারে বিপ্লবী আলিমগণের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে গেলেও দু'য়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে আগে জাতীয়তাবাদ ও পরে স্বাধীনতা সংগ্রাম, পক্ষান্তরে বিপ্লবী আলিমগণের দৃষ্টিতে আগে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরে জাতীয়তাবাদ। কংগ্রেস জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগ্রামে নেমেছে আর উলামা সংগ্রামের স্বার্থে মিশ্র জাতীয়তা অবলম্বনে বাধ্য হয়েছে। বিপ্লবী আলিমগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন বিশ্ব মুসলিমকে ইংরেজের নির্যাতন থেকে উদ্ধারের তাড়না নিয়ে। তাই কংগ্রেসের দৃষ্টিতে এ সংগ্রাম দেশমাতৃকার সেবা মাত্র। কিন্তু আলিমগণের দৃষ্টিতে এটি শুধু দেশের সেবাই নয় বরং বিশ্ব মুসলিমকে রক্ষার প্রয়োজনে এক পবিত্র জিহাদও বটে। আর এ জিহাদকে সফল করার লক্ষ্যে তাঁরা ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশীয় সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বাধ্য হন।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য নিরূপন করে হযরত শায়খুল ইসলাম এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ জনাব মুহতারাম, আমি এ অঙ্গনে জাগতিক কোন স্বার্থে অবতীর্ণ হইনি। এটাকে আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদ মনে করি। এ যুদ্ধে আমি ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের পক্ষে আছি। দেশীয় অমুসলিমদের সাথে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচীর ঐক্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নেই। এর উদাহরণ হল যেমন বহু যাত্রী একই গাড়ীতে চড়ে কোথাও যাচ্ছে। সকলের কাছে একই রকমের টিকেট। অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও নিয়্যত ভিন্ন ভিন্ন। কেউ যাচ্ছে দীন শেখার জন্য, কেউ জাগতিক জ্ঞান আহরণের জন্য, কেউ ব্যবসার জন্য, কেউ অন্য কোন

---

৩৫. উপরোক্ত প্রশ্নগুলো থানাবনের খানকা থেকে পাঠানো হয়েছিল। মদীনা বিজনৌর পত্রিকায়, ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) প্রশ্নোত্তরটি প্রকাশিত হয়েছিল।

উদ্দেশ্যে। এতদসত্ত্বেও সকলের কামনা গাড়ীটি যেন দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারে।[৩৬]

বিপ্লবী আলিমগণ ঐক্য ও অবিভক্ত জাতীয়তাকে জিহাদের ময়দানে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি শক্তিশালী অস্ত্র জ্ঞান করেন। জিহাদে শত্রুপক্ষকে কাবু করার সম্ভাব্য সকল উপায় ও উপকরণ নিয়োজিত করা পবিত্র কুরআনেরই নির্দেশ। শায়খুল ইসলাম তাই পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯২৩ সালে জমইয়তে উলামার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের ভাষণে বলেন, পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾

এ আয়াত আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে, ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ঐক্য গঠন জরুরী। কারণ বর্তমানে এমন শক্তি, যার দ্বারা আমরা শত্রুপক্ষকে সন্ত্রস্ত করতে পারি এবং যেই শক্তি শত্রুর পাথর হৃদয়কে গলিয়ে দিতে সক্ষম, সেটি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ব্যতিরেকে কিছু নয়। এ কারণে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ধর্মীয় বিধানের আলোকে শুধু জায়িযই নয় বরং জরুরীও বটে।[৩৭]

ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা হযরত শায়খুল হিন্দ নিজেও অনুভব করে গিয়েছেন তা পূর্বে বলা হয়েছে। হযরত সায়্যিদ আহ্মদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলন, ১৮৫৭ সালে মুসলমানদের মহাবিদ্রোহ, রেশমী রুমাল আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যেও সেই ঐক্যের প্রতিফলন ছিল।[৩৮] শায়খুল হিন্দের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুলে যেই 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার' গঠন করেছিলেন তাতে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নামক জনৈক হিন্দু। শায়খুল হিন্দের সেই ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িকতার নীতি আলোচনা করে উড়িষ্যার গভর্ণর বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডুরী লিখেছেন, সশস্ত্র বিদ্রোহের ঐ রেশমী রুমাল পরিকল্পনা শুধু মুসলমানদের জন্যই বানানো হয়নি। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়

---

৩৬. আবুল হাসান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১১৭।

৩৭. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, হায়াতে শায়খুল ইসলাম (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.) পৃ ১১৮।

৩৮. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, সীরাতে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ ঃ মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৯৩), পৃ ১০১।

ও বঙ্গদেশীয় বিপ্লবীরাও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সদস্য হিসেবে যোগ দেয়। হযরত শায়খুল হিন্দ ঐ অমুসলিমদের থাকা খাওয়ার জন্য নিজ বাড়ীর সন্নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া নেন। তাঁর এ সকল প্রস্তুতি ছিল অত্যন্ত গোপনে সম্পাদিত।[৩৯]

স্বাধীনতা আন্দোলনে অমুসলিমদের সাথে ঐক্য গঠনের উপকারিতা বর্ণনা করে স্বয়ং শায়খুল হিন্দ এক ভাষণে বলেছেন, কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সহদেশী তথা ভারতের বৃহত্তম সম্প্রদায় (হিন্দুদের)-কে কোন না কোন ভাবে আপনাদের পবিত্র উদ্দেশ্য সফলের সহযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। আমি সম্প্রদায়দ্বয়ের ঐক্য ও অভিন্নতাকে খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ মনে করি। দেশের চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক সম্প্রদায়দ্বয়ের নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত যে উদ্যোগ নিচ্ছেন আমি তাতে খুবই সন্তুষ্ট। কেননা আমি জানি, পরিস্থিতি যদি বিপরীত দিকে চলে যায় এবং উভয়ের মধ্যে অনৈক্য ঘটে তা হলে স্বাধীনতার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইংরেজ সরকার দিন দিন বিভিন্ন আইন-কানুন রচনা করে সংগ্রামের পথ জটিল করে দিচ্ছে। এভাবে চলতে দিলে ইসলামী সরকার গঠনের যেই শেষ আশাটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে সেটি আমাদের কর্মদোষে হস্তচ্যুত হয়ে যাবে। তাই ভারতে বসবাসরত ২ প্রধান সম্প্রদায় বরং শিখদের বিপ্লবী অংশটিকেও সঙ্গে নিয়ে যদি পারস্পরিক সন্ধি ও অভিন্নতা গড়ে তোলা যায়, তাহলে চতুর্থ কোন জাতি তা যত বড় শক্তির অধিকারী হোক না কেন স্বদেশী সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করা কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না।[৪০]

বিপ্লবী আলিমগণের প্রচারিত এই ঐক্য ও অভিন্ন জাতীয়তা বস্তুত একটি বিশেষ অর্থ ও বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত ছিল। সেটি হল সকলে ভারতবাসী হওয়ার দিক থেকে একতা এবং একই ভূখণ্ডের অধিবাসী হওয়ার দিক থেকে অভিন্নতা। নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বিলীন করে দিয়ে অভিন্ন হওয়ার অর্থে মোটেও নয়। তাই যখনই এবং যেখানেই মুসলমানদের নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রতীক সংরক্ষণের প্রশ্ন আসবে সেখানে মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক গণ্য হবে। এ দিকের বিচারে আলিমগণের ঐ জাতীয়তাবাদকে বর্তমান ইউরোপে প্রচলিত জাতীয়তাবাদের সাথে সর্বাংশে তুলনা করা যায় না।

জাতীয়তাবোধের উপরোক্ত শর্তারোপের ব্যাপারে স্বয়ং শায়খুল হিন্দের একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, আজ আবারো বলছি যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থাপিত ঐ পারস্পরিক সন্ধি ও সম্প্রীতি যদি

৩৯. ড.রশীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।
৪০. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৫-২৩৭।

আপনারা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ রাখতে চান, তাহলে এর সীমানা খুব ভাল ভাবে জেনে নিন। সেই সীমানা হল এ দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যে, মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ পাক যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার কোথাও কোন ছেদ না পড়া। এর পদ্ধতি একটাই, সেটি হল সন্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে গিয়ে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অনুভূতির উপরেও হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা এবং জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনে এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন থেকে বিরত থাকা, যা কোন সম্প্রদায়ের মনোকষ্ট বা দুঃখবোধের কারণ হতে পারে।[৪১]

জিহাদের অনিবার্য প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাথে সন্ধি স্থাপন কিংবা কর্মের অভিন্নতা পোষণের অবকাশ ইসলামে রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মদীনায় হিজরতের পরে, খায়বার যুদ্ধের সময়ে, হুনায়ন যুদ্ধকালে ও হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনে এ ধরনের ঐক্য স্থাপন করেছেন। কাজেই ইংরেজ বিরোধী জিহাদের অনিবার্য প্রয়োজনে ভারতীয় মুসলমানরা যদি স্বদেশী হিন্দুদের সাথে ঐক্য ও সন্ধি স্থাপন করে, তাতে শরীঅতের দৃষ্টিতে কোন আপত্তির প্রশ্ন উঠে না।

হযরত শায়খুল ইসলাম স্পষ্ট করে বলেন, অভিন্ন জাতীয়তার দ্বারা আমরা সেই জাতীয়তাকেই বোঝাই, যার ভিত্তি স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীর মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। আমাদের অভিন্ন জাতীয়তার অর্থ হল, ভারতের অধিবাসী, চাই সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, ভারতীয় হওয়ার দিক থেকে একই 'কাওম', একই জাতি। কাজেই বিজাতি বা ইংরেজ যার হাতে হিন্দু-মুসলিম সবাই নিষ্পেষিত, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করা এবং ঐ অত্যাচারী নির্দয় বিজাতিকে উৎখাত করে গোলামীর শৃংখল ভেঙ্গে ফেলা আবশ্যক। নিজেরা একে অপরের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, কাজকর্মে থাকবে স্বাধীন। প্রত্যেকে নিজ ধর্ম অনুসারে চলবে। সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রেখে প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের চর্চা, প্রচার ও প্রসার করবে। প্রত্যেকের পার্সোনাল, কৃষ্টি ও কালচার অক্ষুণ্ন রাখা হবে।[৪২]

---

৪১. মাদানী, নক্শে হায়াত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৬৮০।

৪২. মাদানী, মুত্তাহিদা কাওমিয়্যাত আওর ইসলাম (দেওবন্দ : মজলিসে কাসিমুল মাআরিফ, তা. বি.), পৃ. ৭।

হযরত শায়খুল ইসলাম নিজের জন্মভূমি ভারতকে গভীর ভালবাসতেন। তাঁর এ ভালবাসা কবি সাহিত্যিকদের ন্যায় ভারতের মাটি ও প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে ছিল না। এটি ছিল ধর্মীয় পবিত্রানুভূতির ভিত্তিতে। তাঁর দৃষ্টিতে ভারত ইসলামী ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন ক্ষেত্র। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে মানবতার বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলামী বহুবিদ ঐতিহ্য ভারত নিজ বুকে ধারণ করে আছে বলেই এ ভূখণ্ডের প্রতি তাঁর ভালবাসা। তিনি বলেন, ধর্মীয় কিতাবপত্র থেকে জানা যায় যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম ভারতের মাটিতেই অবতীর্ণ হন। তিনি এখানেই বসবাস করেন এবং এখান থেকেই তাঁর বংশবিস্তার ঘটে। 'সাবহাতুল মারজান' গ্রন্থে ভারতে আদম পুত্রদের বংশবিস্তার ও ক্ষেত খামার করার কথা উল্লেখ আছে। কাজেই ইসলামী বর্ণনা ও শিক্ষা অনুসারে এই ভূখণ্ড প্রাচীন আমল থেকে মুসলমানদেরই পৈতৃক ভূখণ্ড। তবে ভারতীয়দের যারা মানব বংশবিস্তারের উপরোক্ত আকীদায় বিশ্বাসী নয় কিংবা অন্য কোন মতাদর্শে বিশ্বাস করে, তাঁদের জন্য উপরোক্ত গৌরববোধ প্রযোজ্য নয়। মুসলমানদের এ ভূখণ্ডকে নিজেদের প্রাচীন আবাস ভূমি বলে মনে করা জরুরী। কেননা ইসলামের শিক্ষা ও কুরআনের বক্তব্য অনুসারে পৃথিবীতে যত পয়গাম্বর কিংবা তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের সকলের ধর্ম ইসলামই ছিল। হযরত আদম ও তাঁর বংশের লোকেরা ইসলামেরই অনুসারী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ;

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾ [৪৩]

তারপর মানুষ বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর পৃথিবীর যেখানে যেখানে মানুষের বংশবিস্তার ঘটেছে, সেখানেই পয়গাম্বর প্রেরণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [৪৪]

﴿ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [৪৫]

সত্য পয়গাম্বর ও তাঁদের সত্যিকার প্রতিনিধিদের সকলেই ছিলেন এই ইসলামে বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের সমর্থন আছে।

মোটকথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে ভারতেও বহু পয়গাম্বর প্রেরিত

---

৪৩. আয়াতের অর্থ : মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা বিভক্ত হয় (১০ : ১৯)

৪৪. অর্থ : প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ছিল পথ প্রদর্শক নবী (১৩ : ৭)।

৪৫. অর্থ : এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যার নিকট সতর্ককারী নবী প্রেরিত হয়নি (৩৫ : ২৪)।

হয়েছেন। হিন্দুস্তানের বহু স্থানে নবীদের কবর রয়েছে বলে ওলীগণ কাশ্‌ফ ও ইল্‌হাম সূত্রে জেনেছেন। হযরত শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী, হযরত মির্জা মাযহার জানে জানাঁসহ আরো বহু বুযর্গ থেকে এ কথার স্বীকারোক্তি পাওয়া গিয়েছে। তাই বলা চলে যে, প্রাচীনকাল থেকেই এ ভূখণ্ড ইসলামের লালনভূমি ছিল এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে এ দেশ শুরু থেকে ইসলামী দেশ হিসেবেই চলে আসছে। উল্লেখ্য, এই নিরিখেই শায়খুল ইসলাম ভারতের ভূখণ্ডকে প্রিয়ভূমি হিসেবে ভালবাসেন।[৪৬]

শায়খুল ইসলামের দৃষ্টিতে ভারত উপমহাদেশে উপরোক্ত শর্তযুক্ত অভিন্ন জাতীয়তাই প্রযোজ্য। ভারতকে আরবের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। কেননা ভারতের পরিবেশ আর আরবের পরিবেশ এক নয়। ভারতে বহু ধর্মের সহঅবস্থান বিদ্যমান। এ ধরনের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর দেশে শর্তযুক্ত অভিন্ন জাতীয়তার অনুশীলন করা না হলে ধর্মে ধর্মে হানাহানি ও সাম্প্রদায়িকতা নির্ঘাত ছড়িয়ে পড়বে। পরিণামে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলামে 'জিহাদ বিল কিতাল'-এর বিধান আছে কিন্তু সাম্প্রাদায়িক হানাহানি ও প্রতিহিংসার বিধান নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ [৪৭]

﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوْا ﴾

সাম্প্রদায়িকতা, হানাহানি, পরধর্মের প্রতি অহেতুক আক্রমণ, পরধর্মগুরুদের গালি-গালাজ ইসলাম কখনো অনুমোদন করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো গর্হিত কাজ। এই ধরণের গালি গালাজ দ্বারা কখনো হিদায়াদ আসে না। ইরশাদ হচ্ছে[৪৮],

﴿ لاَ تَسُبُّوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوْا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

---

৪৬. মাদানী, হামারা হিন্দুস্তান আওর উসকে ফাযায়িল (দেওবন্দ ঃ মজলিসে কাসিমুল মাআরিফ, তা. বি.), পৃ ১১।

৪৭. অর্থ ঃ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। (৫ ঃ ৮)

৪৮. অর্থ ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তাহলে তারাও সীমা লংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দিবে। (৬ ঃ ১০৮)

তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দেশে অভিন্ন জাতীয়তার নীতি গৃহীত না হলে ঐ দেশে যেমন দাওয়াতী পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন তেমনি সে দেশের শান্তি ও ভৌগোলিক অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করাও অসম্ভব।

তিনি উপমহাদেশে শর্তযুক্ত অভিন্ন জাতীয়তার প্রচলন দ্বারা ইসলামী দাওয়াতের বিপুল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র প্রস্তুতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।[৪৯] মক্কার মুশরিকদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পরিবেশেরই সৃষ্টি করেছিলেন। গুরুত্বের দিক থেকে পবিত্র কুরআন মহানবীর সেই সন্ধিকে 'মহাবিজয়' আখ্যা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾[৫০]

শায়খুল ইসলাম উপলব্ধি করেন যে, হিন্দুদের ধর্মীয় ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া তাদের ধর্মে দাওয়াত ও তাবলীগের বিধান নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ধর্মীয় ভিত্তি অত্যন্ত সবল। এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের শক্তিশালী বিধান বিদ্যমান। মুসলমানদের মাত্র কয়েকজন লোক ভারতে এসেছিলেন। তারপর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলেই আজ ভারতের ৯ কোটি মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। ইসলামের এই ক্রমবর্ধিষ্ণু অবস্থাকে গতিশীল রাখা তথা আরো শক্তিশালী করার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার পরিবর্তে সন্ধিমূলক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব অধিক ফলপ্রসূ। এ জন্য তিনি হিন্দুদের সাথে সন্ধিমূলক সম্প্রীতির পথ অবলম্বন করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মুসলমানরা যদি নিজ ধর্ম ও নিজ আদর্শের উপর অটল থাকে এবং সম্প্রীতি, মানবতাবোধ ও দরদ নিয়ে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যায়, তাহলে অভিন্ন জাতীয়তার সুবাদে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাদের মহাবিজয় অর্জিত হবে এবং গোটা ভারতে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ধর্মে পরিণত হবে।[৫১]

অভিন্ন জাতীয়তা ভারতে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য হিতকর হয়ে থাকলেও কায়েমী স্বার্থবাদী, পুঁজিপতি, মন্ত্রিত্ব ও রাজত্বলোভী লোকদের তাতে কোন সুবিধা ছিল না। তাই মুসলমানদের ঐ শ্রেণীটি বরাবরই বিপ্লবী আলিমগণের

৪৯. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, তাঁদের প্রধান যুক্তি ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির (বিভক্তির) ফলে মুসলমানরা বিশেষ একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং তাতে তাঁরা উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। (রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ ১৩৪)

৫০. অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। (৪৮ ঃ ১)

৫১. মাদানী, মুত্তাহিদা কাওমিয়্যাত আওর ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

বিরোধিতা করে। তারা ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথক জাতীয়তা, পৃথক নির্বাচন ও পৃথক ভূখণ্ডের দাবী তুলে সস্তায় নেতৃত্ব কামাই করে নেয়।[৫২] পরিণামে ভারতে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাত ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু স্বার্থবাদীদের বিজয় ঘটে।

কতিপয় আলিম তাঁর মতাদর্শকে ইসলাম পরিপন্থী বলেও ফত্ওয়া দেন।[৫৩] তাদের ফত্ওয়ায় পরোক্ষভাবে ইংরেজ সরকারের হাতছানি ছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, হিন্দু মুসলিম অভিন্ন কাওম হতে পারে না। মুসলমানদের জাতীয়তা হল ইসলাম। হযরত শায়খুল ইসলাম তাদের জবাবে বলেন, হিন্দু মুসলিম অভিন্ন মিল্লাত হতে পারে না। তবে অভিন্ন কাওম হতে পারে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে মুসলিম ও অমুসলিম সকলকে যুক্ত করে অভিন্ন কাওম হিসেবে নির্দেশ করা আছে। 'কাওম' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এই ব্যাপকতার দরুন বহু নবী নিজের অমুসলিম কাওমকে 'ইয়া কাওমী' (হে আমার কাওম) বলে সম্বোধন করেছেন। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতেও জাতীয়তার মৌল উপাদান শুধুমাত্র ধর্ম নয়। ভাষা, অঞ্চল, ভূখণ্ড, পেশা ইত্যাদির নিরিখেও জাতীয়তা গড়ে উঠে। কাজেই হিন্দু-মুসলিমকে অভিন্ন কাওম বলা ইসলাম পরিপন্থী নয়।[৫৪]

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কোথাও জাতীয়তা হিসেবে ইসলামকে দেখানো হচ্ছে না। সর্বত্র আঞ্চলিক অবস্থানকেই জাতীয়তা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এমনকি ইসলামী জাতীয়তার দাবীতে বিভক্ত পাকিস্তানেও জাতীয়তা হিসেবে 'পাকিস্তানী' লেখা হয়। 'মুসলমান' লেখা হয় না। উপরোক্ত বাস্তবতা থেকে শায়খুল ইসলামের বিরুদ্ধে ফত্ওয়া প্রদানকারীদের ফত্ওয়ার অসারতা সহজে অনুমিত হয়।[৫৫]

---

৫২. সায়্যিদ তোফাইল আহমদ, মুসলমানূঁকা রওশন মুস্তাকবিল, (লাহোর : হাম্মাদ আল কুতবী, বদর রশীদ প্রিন্টার্স, তা. বি.), পৃ ৪২১-৪২২।

৫৩. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮০।

৫৪. গোফরান আহমদ, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৪-৩৮৯।

৫৫. আল্লাহ পাক বলেন :

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

তারা (অমুসলিম সম্প্রদায়) যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৮ : ৬১)

পাঁচ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে ভারত দ্রুত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। স্বাধীনতার শুভক্ষণ যত ঘনিয়ে আসে ভারতের শাসনতন্ত্র ও তার রূপরেখা বিষয়ক প্রশ্ন তত প্রকট হতে থাকে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি চিন্তাভাবনা করতে থাকে।

শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতারা অবিভক্তি ও অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে আগ্রহী থাকলেও সেখানে এমন কতিপয় সংকীর্ণমনা নেতা ছিল, যারা প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল কট্টর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী। এ গ্রুপটি মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুর পর্যায়ে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নেতৃত্বে সরকার গঠনের চিন্তা ভাবনা করে। শায়খুল ইসলাম তাদেরকে এ ধরনের চিন্তা ভাবনা করা অন্যায় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। ১৯৩৯ সালে জমইয়তের বার্ষিক অধিবেশনের ভাষণে ঐ গ্রুপকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, ভারতীয় রাজনীতিকদের একটি গ্রুপ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এমন স্বপ্ন দেখছেন যে, সরকার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে গঠিত হবে। আর মুসলমানদের রাখা হবে সংখ্যালঘুর পর্যায়ে। ফলে মুসলমানদের জীবন ও অস্তিত্ব ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়া ও ইচ্ছার অধীন হয়ে থাকবে। এটি তাদের একান্ত স্বপ্ন মাত্র। এ ইচ্ছা কোন দিন বাস্তবায়িত হবে না, হতে পারে না। এটি চক্ষুহীন রাজনীতিপ্রসূত কল্পনা। চক্ষুষ্মান চিন্তাশীল মানুষের কাছে এ ধারণা কোন পাত্তা পাবে না।[৫৬]

তৎকালে গোটা ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৯ কোটির কিছু বেশী। এ বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে ভারতের ২য় বৃহত্তম সম্প্রদায় বলা যায়। সংখ্যালঘু বলা যায় না। সংখ্যালঘুর নির্ধারিত সংজ্ঞা রয়েছে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে তাদের সংখ্যালঘু বলা যায় না। ভারতে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু বলে অপপ্রচারের প্রথম সূচনা করে ইংরেজরা। ইংরেজদের বহুল অপপ্রচারের দরুন এ মিথ্যা ধারণাটি অনেক হিন্দু ও মুসলিম নেতার মনেও বদ্ধমূল হয়ে যায়। ফলে সমাজে হিন্দুরা মুসলমানদের অবহেলা করতে সুযোগ পায় আর মুসলমানরা হিন্দুদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকার এক ঘৃণ্য পরিবেশের উদ্রেক হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার এটিকে আরো স্পষ্ট করে বলেন যে, এমন সম্প্রদায় যারা

---

৫৬. মাদানী, খুতবায়ে সাদারত লাহোর, ১৯৪২।

ভারতে ৯/১০ কোটির মত এবং সমগ্র বিশ্বে যারা ৫০ কোটির কাছাকাছি, তাদেরকে ঐ অর্থে সংখ্যালঘু বলা যায় না, যে অর্থে শব্দটি জেনেভায় ব্যবহৃত হচ্ছে।[৫৭]

. হযরত শায়খুল ইসলাম এ মর্মে আরো বলেন, ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা ইউরোপের বড় বড় যে কোন দেশের সম্মিলিত লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষের বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান সর্বাধিক। এখানে তাদের সংখ্যা ৯/১০ কোটি মত। এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণেও মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ভৌগোলিক দিক থেকেও তাদের সুদৃঢ় শক্তি রয়েছে। গোটা ভারতের মোট ১১টি সুবার ৪টি সুবায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদি সুবাগুলো নতুনভাবে সংস্কারপূর্বক পূনর্গঠন করা হয় তাহলে প্রস্তাবিত ১৩টি সুবার ৬টির মধ্যে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। এহেন অবস্থায় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে অপরাপর সংখ্যালঘুদের ন্যায় গণ্য করার চেয়ে মারাত্মক অন্যায় কিছুই হতে পারে না। দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর কি থাকতে পারে ?[৫৮]

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র কিরূপ হবে তা নিয়ে সবচেয়ে বেশী জটিলতা দেখা দেয় মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে। অবশ্য এ জটিলতার যৌক্তিক কারণ ছিল। কেননা সমগ্র ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৯-১০ কোটি। পাশাপাশি হিন্দুদের সংখ্যা হল ৩৫ কোটির বেশী। অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দুদের ৪ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। কাজেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠিত হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪টি সুবায় মুসলিম সরকার গঠিত হলেও মুসলিম সংখ্যালঘু অন্যান্য সুবা এবং কেন্দ্রীয় সরকারে সব সময়ই প্রাধান্য থাকবে হিন্দুদের। পরিণামে মুসলমানরা ভারতে সব সময় ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকবে।

এ সমস্যা লক্ষ্য করেই লীগনেতারা পূর্ব থেকেই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সমন্বয়ে একটি পৃথক ভূখণ্ড রচনার চিন্তা করেন। জিন্নাহ সাহেব স্পষ্ট বলে দেন যে, আমরা ৫ কোটি মুসলমানের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে ৩ কোটি মুসলমানের ক্ষতিগ্রস্ততা সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু লীগের এ চিন্তার সাথে

---

৫৭. ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ ৮৬-৮৭।

৫৮. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৬।

শায়খুল ইসলাম একমত হতে পারেন নি। তিনি মনে করেন যে, পৃথক ভূখণ্ড রচনার পদক্ষেপ হিন্দু-মুসলিম সকলের স্বার্থবিরোধী। এ পদক্ষেপ দ্বারা ভারতীয়দের বর্তমান সমস্যার নিরসন তো হবেই না বরং আরো জটিল আকার ধারণ করবে।[৫৯] এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সংখ্যালঘু সুবার ৩ কোটি মুসলমানের প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন করা হবে। অধিকন্তু উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানাবিধ সমস্যার উদ্রেক হবে। তাছাড়া শরীঅতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও এটি খিয়ানতমূলক সিদ্ধান্ত যা গ্রহণ করা কোন মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়।

লীগনেতাদের সেই চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করে সাহারানপুরের ভাষণে তিনি বলেন, অপর একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল যারা প্রথমোক্ত দলের বিপরীতে ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য খান খান করে নিজেদের পৃথক ভূখণ্ড রচনার এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে নিজেদের ভাগ্য সংশ্লিষ্ট করার জন্য ইচ্ছুক। এ দলটি বিভক্তির দাবীকে অতি উন্নত পোষাকে সজ্জিত করে পেশ করছে এবং অত্যন্ত জোরেশোরে জনগণকে গিলানোর চেষ্টা করছে। তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক সুবায় মুসলমানের বসবাস রয়েছে। প্রত্যেক সুবায় তাদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান, মসজিদ, মাদরাসা, মাযার, গোরস্তান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আওফাক ও খানকা এত বিপুল সংখ্যক বিদ্যমান, যেগুলো ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। বিভক্তির পরিণামে ঐ মুসলমানদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, সেই দিকটি তাঁরা আদৌ চিন্তা করেন না।

তিনি আরো বলেন, যারা পৃথক ভূখণ্ডের দাবী করছেন তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নিরিখে এ কথা স্পষ্ট যে, খণ্ডিত অংশের শাসন ব্যবস্থা কোন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হবে না। সেটি হবে ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। কাজেই ভারতকে হিন্দু ভূখণ্ড ও মুসলিম ভূখণ্ডে খণ্ডিত করা হলে হিন্দু ভূখণ্ডে মুসলমানদের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ১৪% আর সর্বনিম্ন ৫%। আনুপাতিক এই হার ঐ ভূখণ্ডে মুসলমানদেরকে জীবন্ত সমাধিস্ত করা বৈ কিছুই নয়। অপর দিকে মুসলিম ভূখণ্ডে অমুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৫% যা মুসলিম সরকারের জন্য নিত্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, বিভক্তির পরিণামে হিন্দু ভূখণ্ডে ৩ কোটি মুসলমানকে জীবন্ত দাফন করে দিয়ে নিজেরা পৃথকভাবে এমন এক ভূখণ্ডে গিয়ে সরকার গঠন

৫৯. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ১৯৭।

করা, যেই সরকারকে অমুসলিমরা সর্বদা অস্থির করে রাখবে, এমন সিদ্ধান্ত কোন বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত হতে পারে না।[৬০]

ভারতবর্ষ বহু ধর্মাবলম্বী লোকের দেশ বিধায় এখানে শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা নির্ধারণে হযরত শায়খুল ইসলামের মতে কয়েকটি বিশেষ পয়েন্টের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেমন- ভূখণ্ডের অখণ্ডতা বজায় রাখা, প্রধান ২টি সম্প্রদায় তথা হিন্দু ও মুসলিমের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমান অধিকার ভোগের ব্যবস্থা করা, ছোট বড় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষিত রাখা এবং সর্বপ্রকারের সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের চেষ্টা করা। জমইয়তে উলামার নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ উপরোক্ত পয়েন্টগুলোর আলোকে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের একটি ফর্মূলাও তৈয়ার করেন।[৬১] ১৯৪২ সালে জমইয়তের লাহোর অধিবেশনে ঐ ফর্মূলা গৃহীত হয়। শায়খুল ইসলাম মাদানীর উদ্যোগে ফর্মূলা রচিত হয়েছিল বিধায় এটি 'মাদানী ফর্মূলা' নামে পরিচিত। এ ফর্মূলার নিরিখে স্বাধীন ভারতের জন্য শাসনতান্ত্রিক রূপরেখার প্রস্তাবনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

স্বাধীন ভারতের জন্য মৌলিক কিছু নীতিমালার আলোকে সুবাগুলোর সমন্বয়ে কনফেডারেশন ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। এই কনফেডারেশনে যোগদানকারী প্রত্যেক সুবা নিজ নিজ স্থানে থাকবে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকার কোন সুবার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কেন্দ্রের হাতে কেবল ঐ সকল অধিকারই থাকবে যেগুলো ফেডারেশন সদস্যদের সম্মিলিত রায়ে গৃহীত হবে। সুবা সরকারের হাতে থাকবে অলিখিত অন্যান্য সকল ক্ষমতা। প্রত্যেক সরকার সংখ্যালঘুদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণে বাধ্য থাকবে এবং তারা যেভাবে ভাল মনে করবে, সে ভাবে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিজেদের গরিষ্ঠতার কারণে উপকৃত হতে পারে, পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ঠরা সামগ্রিকভাবে সুস্থির ও নিরাপদ জীবন যাপনের পূর্ণ সুযোগ পায়।[৬২]

---

৬০. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৭।

৬১. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহিদানা কারনামে (দিল্লী ঃ আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৪৮), ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৫।

৬২. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫।

শাসনতান্ত্রিক উপরোক্ত ব্যবস্থা যদি গৃহীত হত তাহলে মুসলমানদের জন্য বিভক্তি বা পৃথক ভূখণ্ড রচনার প্রশ্নই আসত না। বিভক্তির ফলে ইতিবাচক যে সকল সুবিধার কথা লীগনেতারা বলেছিলেন সেগুলো প্রাদেশিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের কারণে আপনা থেকেই অর্জিত হত। অধিকন্তু কনফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকার ফলে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশেও মুসলমানদের কোন দুর্ভোগ কিংবা অবিচারের আশংকা থাকত না। হিন্দু মুসলিম সকলে নিজ নিজ স্থানে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমান অধিকার ভোগ করে সম্মানের সাথে জীবন যাপনের সুযোগ পেত। প্রত্যেকের ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পবিত্র স্থান প্রভৃতি স্ব-স্ব স্থানে সংরক্ষিত থাকত।[৬৩]

জমইয়তের প্রস্তাবিত ফর্মূলার উপর আলোচনা করে মাওলানা হিফযুর রহমান বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়ে বিপ্লবী আলিমগণেরকে কখনো তথাকথিত কমিউনাল মুসলমানদের চেয়ে পেছনে দেখা যায়নি। এ ধরনের বিষয় যখনই উত্থাপিত হয়েছে, তখনই আলিমগণ এমন প্রস্তাব পেশ করতে চেষ্টা করেছেন, যার দ্বারা মুসলমানদের স্বার্থ সর্বোচ্চ পরিমাণে রক্ষিত থাকে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সমকক্ষ হয়ে প্রশাসনে সমান অংশীদারের মর্যাদা লাভ করতে পারে। ১৯৪১ সালে জমইয়তে উলামা ভারতের শাসনতন্ত্রের জন্য যে ফর্মূলা পেশ করে, সেটি মি. জিন্নাহর বিভক্তি প্রস্তাব থেকে বহুগুণে উত্তম ছিল। ঐ ফর্মূলার দ্বারা মুসলমানদের সমস্যাবলীকে বিভক্তির চেয়ে অধিকতর লাভজনক ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই আলিমগণ দেশীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে যেমন ধর্মীয় কিংবা আঞ্চলিকতার কোন প্রতিহিংসা পছন্দ করেননি তদ্রূপ বিদেশী কোন অশুভ শক্তিকেও এমন কোন সুযোগ দিতে নারাজ ছিলেন, যার দ্বারা বিদেশীরা ভারতকে খণ্ডিত করে মুসলমানদেরকে নিজেদের কূটনৈতিক আধিপত্য কায়েমের হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে।[৬৪]

এ প্রসঙ্গে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী বলেন, এ সব ব্যপারেকে শুধু হিন্দু বৈরিতার দৃষ্টিতে বিচার না করা চাই। পাকিস্তানের নামে যেই প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে, সেটির ভাল মন্দ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

---

৬৩. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯২।

৬৪. মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারবী, তাহরীকে পাকিস্তান পর এক নযর (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ ৪০।

আমাদের ভাবতে হবে যে, প্রস্তাবিত পাকিস্তান সরকার ব্যবস্থা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে কি না? আমাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য যথোপযুক্ত হবে কি না? সেই দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, যে সকল সুবায় মুসলমান সংখ্যালঘু, তাদের জন্য যত বেশী সম্ভব অধিকার সংরক্ষণ করে সুবাগুলোকে ভারত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাখা এবং অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় উপায়-উপকরণের দ্বারা উপকৃত হয়ে মুসলিম মিল্লাতকে একটি জীবন্ত ও শক্তি সম্পন্ন অন্যতম বৃহত্তম সম্প্রদায়ে পরিণত করা-ই হবে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার দাবী।[৬৫]

শায়খুল ইসলামের পূর্ণ অসম্মতির উপরই ভারত বিভক্ত হয়। বিভক্তির পর তিনি উভয় ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত রাখা জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর চরিত্র ছিল ক্লান্তিহীন মর্দে মুমিনের চরিত্র। তাই ভারতবর্ষে মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে তিনি যা কল্যাণকর মনে করেছেন সেটি বাস্তবায়নে সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেন। ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ভাগ্যকে মেনে নেন এবং পেছনের দিকে না তাকিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য যা করণীয় তা সম্পাদনে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারত বিভক্তির কারণে মুসলমানরা উভয় ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উভয় ভূখণ্ডেই তাঁর শাগিরদ, কর্মী ও ভক্তরা ছিলেন। তিনি প্রত্যেককে স্ব-স্ব ভূখণ্ডে অবস্থিত মুসলমানদের সেবায় আত্মনিয়োগের আদেশ দেন।[৬৬] এ আদেশের কারণে পাকিস্তান ভূখণ্ডে অবস্থিত বহু জমইয়তকর্মী পরবর্তীকালে মুসলিম লীগে যোগদান করে পাকিস্তানের সেবায় নিয়োজিত হয়।

বিভক্তির পূর্বে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৯ কোটির বেশী। কিন্তু বিভক্তির পর ভারতের মূল ভূখণ্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ৩/৪ কোটিতে নেমে যায় এবং তারা দুর্বল একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শায়খুল ইসলাম তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং ভাগ্য মেনে নেওয়ার উপদেশ দিয়ে তাদেরকে নতুনভাবে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠার সাহস যোগান। তাঁর মতে শক্তির মানদণ্ড জনসংখ্যার আধিক্য নয়। শক্তির মানদণ্ড হল খাঁটি ঈমান, তাক্‌ওয়া ও জিহাদের অনুপ্রেরণা।

---

৬৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮১-৭৮২।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জাল্লাশানুহু বলেন[৬৭] :

﴿ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

তিনি বলেন, ঈমানের এক যার্‌রা এবং লিল্লাহিয়্যতের সামান্যতম প্রেরণাও বড় বড় পর্বত টলিয়ে দিতে সক্ষম। ইসলাম পৃথিবীতে একজন মানুষ থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে ১৯৪৮ সালে জমইয়তের বোম্বাই অধিবেশনে বলেন, ভারতে মুসলিম জনশক্তি যদিও দুই সপ্তমাংশ থেকে এক সপ্তমাংশে নেমে গিয়েছে এবং তাদের বহুকালের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তবুও ইন্ডিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকার বলা যায় না। তবে এর জন্য প্রয়োজন মুসলমানদের নিজেদের কাজকর্ম ও নিজেদের অবদানের দ্বারা নিজেদেরকে দেশের কল্যাণকামী প্রমাণ করা। যদি মুসলমানরা ভারতে নিজেদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করতে চায়, তাহলে কর্ম ও অবদানের মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা আবশ্যক। তারা দেশের জন্য যতবেশী উপকারী প্রমাণিত হবে, তাদের মর্যাদা ও সম্মান ততই বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেদের মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর সত্যিকার সেবক হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করুন। নিঃসন্দেহে বিজয় ও সফলতা আপনাদের পদ চুম্বন করবে।[৬৮]

ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত মুসলমানদেরকে তিনি দাওয়াত, জিহাদ ও মুজাহাদার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর মতে ভারতে মুসলমানদের অবস্থান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা নগরীতে অবস্থানের সাথে তুলনীয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কায় থাকাকালে যেমন মুসলমানদের আকীদার পরিশুদ্ধ করা, ঈমান, আমল ও আখ্‌লাকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বেশী জোর দেন, ভারতীয় মুসলমানদেরকেও তদ্রুপ ঐ বিষয়গুলোর উপর বেশী জোর দেওয়া আবশ্যক। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তরবারীর দ্বারা নয় বরং ঈমান, আখলাক ও আদর্শের দ্বারা অমুসলিমদের জয় করার পন্থা মেনে চলতে হবে।

---

৬৭. অর্থ : আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (২ : ২৪৯)

৬৮. মাদানী, খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, বোম্বাই, ১৯৪৮।

বোম্বাই ভাষণে তিনি আরো বলেন, আপনাদের সম্মুখে ইসলামের শিক্ষা, পবিত্র কুরআনের আদেশ, উপদেশ ও বিধানাবলীর সবই উপস্থিত। আপনারা যদি এ বিধানের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হন, তা হলে আপনাদের মর্যাদা ও গৌরব পুনরায় রচিত হতে পারে এবং আপনাদের মাঝে এমন বহু মনীষী জন্ম নিতে পারেন, যারা হিন্দু-মুসলিম সকলের আরাধ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন, যাদেরকে সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ের ভাল মানুষেরা ইজ্জত ও সম্মানের চোখে দেখতে বাধ্য হবে। আজ মুসলমানদের কাছে জিহাদের শুধু শব্দটিই আছে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে যে, মক্কাবাসীর ন্যায় ইসলাম বিদ্বেষী ও ধর্ম বিদ্বেষী কাফির শ্রেণীর মোকাবেলায় মুসলমানদের ধৈর্য ও সহনশীলতার উন্নত আদর্শ প্রদর্শনকে ইসলামে সবচেয়ে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾[৬৯]

অনুরূপভাবে নিজেদেরকে মন্দ চেতনা, খাহেশাতের অনুসরণ ও মন্দ চরিত্র ইত্যাদি থেকে দূর করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ মোতাবেক মানবতার উত্তম চেতনা ও উত্তম চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

« رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ »[৭০]

এই উত্তম জিহাদ সম্পাদনের জন্য অস্ত্রসস্ত্র কিংবা গোলা বারুদের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু ইস্তিকামত তথা দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে আমল করা, যা জগতের বড় বড় যুদ্ধাস্ত্র থেকেও অনেক বেশী শক্তি সম্পন্ন।[৭১]

তিনি পাকিস্তান ও পাকিস্তানী মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল দিক থেকে সুসম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেন। বিভক্তির যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর কোথাও কোন বিতর্কে লিপ্ত হওয়া তাঁর দৃষ্টিতে একটি নিষ্ফল কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। ১৯৫১ সালে জমইয়তের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে তিনি বলেন, বিশ্ব মানচিত্রে যেভাবে ভারতের

---

৬৯. অর্থ : তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম (মুজাহাদা) চালিয়ে যাও (২৫ : ৫২)।

৭০. অর্থ : আমরা ক্ষুদ্র জিহাদ শেষ করে বৃহত্তম জিহাদের দিকে ছুটে যাচ্ছি।

৭১. মাদানী, খুত্বায়ে সাদারত, প্রাগুক্ত।

রাজনৈতিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তদ্রূপ পাকিস্তানও বিশ্ব রাজনীতির একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই এখন আর 'পুরাতন কিসসা'-এর পুনরাবৃত্তি করে শুকিয়ে যাওয়া ঘা চুলকানোর অর্থ নেই। এখন সেটি মেনে নেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ।

জনৈক উর্দু কবির একটি কবিতা প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন;

سابقی پر خاك ڈالو صلح کی باتیں کرو

تم سے نہ دانی ہوئی یا ہم نہ دانی ہوئی

এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম মাদানী আরো বলেন, বর্তমানে শুধু ভারতের জন্যই নয়, সমগ্র এশিয়ার স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেও ভারত-পাকিস্তান এই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নিরসন করা হবে কল্যাণকর পন্থা। এ চেষ্টা অব্যাহত থাকলে দুই ভূখণ্ডের মুসলমানগণ ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হবে। তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হবে। পারস্পরিক আসা-যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে। বিশেষতঃ বণ্টন ও বিভক্তিকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক যেই তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি ক্রমে দূরীভূত হয়ে সকলের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধন গড়ে উঠবে।[৭২]

তবে কখনো এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে মুসলমানদের কী করণীয় হবে সেটিও তিনি আলোচনা করেন। তাঁর মতে, যেহেতু উভয় ভূখণ্ডেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান আছেন সেহেতু প্রত্যেক দেশের মুসলমানরা নিজ নিজ দেশের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার যিম্মাদার। পাকিস্তানী মুসলিম জনগণ পাকিস্তানে অবস্থিত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়কে অগ্রাধিকারের সাথে চিন্তা করবে। ভারতীয়রা ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করবে। বোম্বাই অধিবেশনের ভাষণে তিনি স্পষ্ট বলেন, ভারতবর্ষের বিভক্তি মুসলিম স্বার্থকেও বিভক্ত করে দিয়েছে। কাজেই যেই কাজ পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হবে, সেটি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হওয়া আবশ্যক নয়। অনেক সময় দুই দেশের মুসলিম স্বার্থের মধ্যে বৈপরীত্যও ঘটে যেতে পারে। অনুরূপে যে কাজ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর, সেটি পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্যও কল্যাণকর হবে এমন নয়। বরং হতে পারে যে, কোন কাজ হয়ত পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য খুবই উপকারী

৭২. মাদানী, খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫১।

অথচ এটি ভারতীয় মুসলমানদের বেলায় সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে এ ধরনের কোন বৈপরীত্য দেখা দিলে প্রশ্ন উঠবে যে, আমরা পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করবো, না ভারতের স্বার্থ? স্পষ্ট কথা, স্বভাবিকভাবে আমাদের উপর পাকিস্তানী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বশীল। আমাদের উপর ভারতের ৩ কোটি মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত। তাই আমাদের সর্বাবস্থায় এমন পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হবে। আমরা সদিচ্ছা পোষণ করি যেন ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পারিক সম্পর্ক যতটুকু সম্ভব দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে পারে। উভয় দেশের মুসলমানরা যেন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ইসলামী সঠিক আদর্শের উপর জীবন যাপনে সক্ষম হয়।[৭৩] মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন;

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ পরিহার করে চলবে। বিবাদ করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন[৭৪]।

---

৭৩. মাদানী, খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, বোম্বাই ১৯৪৮।

৭৪. আল কুরআন ৮ : ৪৫-৪৬।

৪র্থ অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

দর্শন

ভূমিকা

শিক্ষাদর্শনে হযরত শায়খুল ইসলাম দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসিমুল উলূমি ওয়াল খায়রাত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবীর অনুসারী ছিলেন। তিনি হযরত নানূতবীকে পাননি। তবে তাঁরই সুযোগ্য শাগিরদ ও স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর মাধ্যমে এ দর্শনে অনুপ্রাণিত হন। হযরত শায়খুল ইসলামের শিক্ষালাভ, শিক্ষকতা ও শিক্ষা বিস্তারের কাজকর্ম নানূতবী শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছিল।

সাতান্নের মহাবিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকারের ক্রমাগত দলন ও নিপীড়নের কারণে ভারতে মুসলিম সমাজ চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।[১] বৃটিশ মুসলমানদেরকে রাজত্ব, নওয়াবী, জায়গীরদারী ও জমিদারী থেকে উচ্ছেদ করায় দীর্ঘ কাল থেকে তাঁদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও অচল হয়ে যায়। শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ায় মুসলিম সর্বসাধারণের জীবনেও শুরু হয় অনিবার্য পরিবর্তন। তাদের মন-মস্তিষ্কে ধর্মীয় উদ্দীপনা হ্রাস পায়, অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি ক্রমে গ্রাস করে। মুসলিম সমাজে যেখানে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর বিধান ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা, সেখানে স্থান নেয় নানা রকমের কুসংস্কার, জাহিলী রুসম-রেওয়াজ, শিরক ও বিদ্আত। এদিকে প্রশাসনিকভাবে ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে সূচিত হয় পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ধ্যানধারণা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। যেটি স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে ঠেলে দিতে থাকে খৃস্টবাদ, নাস্তিক্য, ধর্মদ্রোহিতা, প্রকৃতিবাদিতা ও আত্মসর্বস্বতার দিকে। মাতৃভূমি ভারতের এ অবস্থা লক্ষ্য করে রাজ্যহারা সচেতন মুসলমানদের অন্তর বেদনাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল।[২]

---

১. মুহাম্মদ ইদ্রীস হুশিয়ারপুরী, **খুতবাতে মাদানী** (দেওবন্দ : যম্যম বুক ডিপো, ১৯৯৭), পৃ ৪৬৯-৪৭০।

২. সায়্যিদ মাহবূব রেযবী, **তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ** (দেওবন্দ : ইদারায়ে ইহ্তিমামে দারুল উলূম, ১৯৯২), ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৮-১৪০।

তখনকার পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে পতন-গহ্বর থেকে উদ্ধার করা এবং সামাজিকভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রধানতঃ দু'টি সংস্কার চিন্তাধারার অভ্যুদয় ঘটে। তন্মধ্যে একটি চিন্তাধারা মতে মুসলমানদেরকে ইংরেজের সহিত আপোস করে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণপূর্বক বৈষয়িক উন্নতি লাভে উৎসাহিত করা হয়। আর অপর চিন্তাধারা মতে ইসলামেরই বিশুদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণপূর্বক বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করা হয়।[৩] এ ব্যাপারে মাওলানা আসীর আদরবী বলেন, একদলের অভিমত হল আগে মুসলমান পরে ইসলাম। আর অন্য দলের অভিমত হল এ দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ আগে ইসলাম ও পরে মুসলমান। প্রথমোক্ত দলের নেতৃত্ব দেন আলীগড়ের স্যার সায়্যিদ আহমদ খান। আর শেষোক্ত দলের পথ নির্দেশক ছিলেন দেওবন্দের হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ।[৪]

হযরত নানূতবী ও স্যার সায়্যিদ আহমদ খান দিল্লীর একই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন এবং একই শিক্ষক অর্থাৎ হযরত মাওলানা মামলূক আলীর নিকট অধ্যয়ন করেন।[৫] কিন্তু কর্ম ও চিন্তাধারায় দু'জনের দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়। একজন বিপ্লবের পথ বেছে নেন, অপর জন আপোষকামিতা অবলম্বন করেন। অধ্যয়ন শেষ করে হযরত নানূতবী ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রচার প্রসারের কাজে নিয়োজিত হন। মহাবিদ্রোহের সময় শামেলীতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বিদ্রোহের পর পরিবর্তিত প্রেক্ষিত অনুসারে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা (১৮৬৬ খৃ.) করে নতুন শিক্ষাদর্শন প্রচার করে যান।[৬] অন্য দিকে স্যার সায়্যিদ আহমদ খান অধ্যয়ন শেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজের পক্ষাবলম্বন ও প্রবল আনুগত্য প্রদর্শন করে তাদের জীবন রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তারপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে ইংরেজদের

---

৩. উবায়দুল্লাহ আনওয়ার, "দেওবন্দ আওর আলীগড়", মাসিক আর রশীদ (লাহোর : জামিয়া রশীদিয়্যা সাহিওয়াল, ফেব্রু-মার্চ, ১৯৭৬, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা), পৃ ৬৩৩।

৪. আসীর আদরবী, মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী হায়াত আওর কারনামে (দেওবন্দ : শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ ১১৭।

৫. ড.মুহম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ ৬২।

৬. উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৯), পৃ ৯২-৯৩।

সাথে বিদ্বেষের মনোভাব বর্জনপূর্বক পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বরণ করে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের প্রচারাভিযান চালান। ১৮৭৭ সালে এ লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠা করেন আলীগড় কলেজ।[৭] একই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই দিকপাল চিন্তাধারার অঙ্গনে এভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আলোচনা করে ডক্টর আবূ সালমান শাহ্‌জাহানপুরী বলেন, এটি পরম দুঃখজনক ঘটনা যে, তখন হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র অনুসারীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামনে অস্ত্র-শস্ত্র ও হাতিয়ার ত্যাগ করেন এবং ক্ষমতাসীন ইংরেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুগত্যের সার্টিফিকেট অর্জন করে সুখ সমৃদ্ধির জীবন অবলম্বন করেন। আর অপর দল সত্য ও ন্যায়ের সেই আদর্শকেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন যেটি ভারতীয় মুসলমানদের কর্মসূচী হিসেবে ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ পূর্বেই চিহ্নিত করে গিয়েছিলেন।[৮]

উপমহাদেশে বৃটিশ শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে কেবল তাদের অধীনে চাকরী-বাকরি করার উপযুক্ত বানানো, এর উর্ধ্বে কিছু নয়। কলিকাতা আলীয়া মদ্রাসায় প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলাম থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। শায়খুল ইসলাম সমর্থিত শিক্ষাদর্শনে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীকে ইল্‌মী, আমলী ও আখ্‌লাকী দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন বানানো এবং এদের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা সম্প্রসারিত করা প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। হযরত শায়খুল ইসলামের মতে শিক্ষা শুধু পেশাই নয়, একটি উচ্চমানের ইবাদতও বটে। তিনি মনে করেন শিক্ষার মাধ্যমে এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা আবশ্যক যারা গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে পূর্ণ অংশগ্রহণে সক্ষম হবে এবং নিজ ধর্ম ও নিজ দেশের সেবা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।[৯] বিশেষতঃ ইসলামের উপর যে কোন দিক থেকে আক্রমণ আসুক না কেন সেটি দক্ষতার সাথে প্রতিরোধে সক্ষম হবে। এই নিরিখেই নানূতবী শিক্ষাদর্শনের কারিকুলামে ধর্ম ও নৈতিকতার অধ্যয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

---

৭. উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪; ড.মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ ১৪৪।

৮. মাসিক আর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৩।

৯. ড.সায়্যিদ আবদুল বারী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী : হায়াত ওয়া কারনামে (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ, ২৭১।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

মাওলানা আসীর আদরবী ঐ কারিকুলাম সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে হযরত নানূতবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, হযরত নানূতবী পরিষ্কার বলে দেন যে, বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরকার পরিচালিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কাজেই যারা বৈষয়িক জ্ঞান আহরণ করতে চায় তারা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়া উচিত। আমরা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষয়িক শাস্ত্রসমূহের মিশ্রণ ঘটিয়ে কর্মসূচীকে আধাখেঁচড়া করতে রাযী নই। দু'দিকের মিশ্রিত শাস্ত্র শিক্ষাদানের ফল দাঁড়াবে যে, শিক্ষার্থী কোন দিকেরই পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হবে না। তাদের না বৈষয়িক শাস্ত্র অর্জিত হবে, আর না ধর্মীয় শাস্ত্র। এটি বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণের কারণে নয় বরং ধর্মীয় শিক্ষাকে নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত ও পরিপূর্ণ রাখার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[১০]

হযরত শায়খুল ইসলামের শিক্ষাদর্শনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম যেন কোনভাবে প্রভাবিত কিংবা বাধাগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী কোন কর্তৃত্বের সুযোগ রাখা হয়নি। এমন কি কোন আমীর উমারার কিংবা কোন বিত্তশালীর মোটা অংকের চাঁদা গ্রহণেরও অনুমতি নেই। কারণ এ ধরনের চাঁদা গ্রহণের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উপর চাঁদাদাতার প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার আশংকা থাকে। উসূলে হাশ্‌তেগানা'য় হযরত নানূতবী এ ধরনের চাঁদা পরিহারের কথা বলে গিয়েছেন।[১১] তাঁদের মতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের দরিদ্র ও ধার্মিক লোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদা দ্বারা পরিচালিত হবে। তাহলে মাদ্রাসা তাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ চাপমুক্ত হয়ে আর্থিক সহায়তা লাভ করবে, আর তারা মাদ্রাসা থেকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরামর্শ লাভ করবে। সিলেট ও আসাম অঞ্চলে শায়খুল ইসলাম যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, তার সবগুলো এই নিয়মে আজো পরিচালিত হচ্ছে।

---

১০. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৬; দারুল উলূম দেওবন্দসহ প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসাশিক্ষা সম্পর্কে স্যার সায়্যিদ বলেন, মুসলমানরা জৌনপুর, কানপুর, সাহারানপুর, দেওবন্দ, দিল্লী ও লাহোরে প্রাচীন পদ্ধতির কতগুলো মাদ্রাসা খুলে রেখেছেন। আমি সত্যিকারভাবে বলছি যে, এগুলো অনর্থক ও বৃথা। পুরানো কিতাবসমূহ আমাদের স্বাধীনতা, সততা ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেয় না। উল্টো মিথ্যা প্রশংসা, জীবনকে পরাধীন করে রাখা, অহংকার করা, জাতি ভাইদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করা, কারো প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করা ইত্যাদির সবক দেয়। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৪)

১১. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, আযাদী হিন্দুস্তান কা খামুশ রাহনুমা (দেওবন্দ : দারুল কিতাব, ১৯৮৯), পৃ ৯৬-৯৭।

নানূতবী শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে স্থাপিত প্রথম মাদ্রাসা দারুল উলূম দেওবন্দ। এরপর এ আঙ্গিকে আরো মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এগুলো 'কাওমী মাদ্রাসা' বা 'দেওবন্দী মাদ্রাসা' নামে পরিচিত। নানূতবীর জীবদ্দশায়ই ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করে। তারপর শায়খুল হিন্দের যুগে প্রচারভিযান বিস্তৃতি লাভ করে। শায়খুল হিন্দের শাগিরদগণ নিজ নিজ অঞ্চলে পৌঁছে শত শত মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তারপর হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর যুগে এর প্রচারাভিযান শুধু উপমহাদেশেই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিশাল অংশেও সম্প্রসারিত হয়ে যায়।[১২]

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর এ শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে ছিলেন হযরত নানূতবী, যিনি এর শুভ সূচনা করে গিয়েছেন। তারপর মধ্যবর্তী পর্বে ছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ, যিনি এটিকে পূর্ণ যৌবনে উপনীত করেন এবং সর্বশেষ পর্বে ছিলেন হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী, যিনি এটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন। এভাবে ১৮৫৭ থেকে ১৯৫৭ (এ সনে শায়খুল ইসলাম ইন্তিকাল করেন) পর্যন্ত এক শতাব্দীর মধ্যে নানূতবী শিক্ষাদর্শন একটি পরিপূর্ণ অধ্যায়কে অতিক্রম করে।[১৩]

দুই

দেওবন্দ ও আলীগড়ের শিক্ষাদর্শনে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় হযরত নানূতবী ও স্যার সায়্যিদ আহমদ খানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কখনো অপ্রীতিকর হয়নি। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা কিংবা বৈষয়িক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাকে দেওবন্দী আলিমগণ কখনো হারাম ফত্ওয়া দেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদা ও চিন্তাধারা অক্ষুণ্ন রেখে যে কোন ভাষা শিক্ষা করা কিংবা শরীঅতের দৃষ্টিতে হারাম

১২. মাওলানা মুশতাক আহমদ, তাহরীকে দেওবন্দ, দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, ২য় সং (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ ১৩৭-১৩৮।

১৩. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, "শায়খুল ইসলাম মাদানী : এক জামি শখসিয়্যাত এক আমানতে আসলাফ" আল জমইয়ত পত্রিকা (দিল্লী : জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, ১৫ ফেব্রু, ১৯৫৮, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা), পৃ ১৩।

নয়, এমন বৈষয়িক যে কোন বিদ্যার চর্চা করা জায়িয।[১৪] তাতে কোন আপত্তি নেই।

তবে স্যার সায়্যিদ 'আলীগড় আন্দোলন' শুরু করার পর নানাভাবে বিতর্কিত হন এবং কঠিন সমালোচনার মুখে পড়েন। এ সমালোচনা আলিমগণের পক্ষ থেকে হয়নি, হয়েছে তাঁরই সতীর্থ লোকজনের পক্ষ থেকে। স্যার সায়্যিদের জীবনীকার মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী লিখেছেন, মাদ্রাসাতুল উলূম (আলীগড় কলেজ)-এর সবচেয়ে কট্টর সমালোচক ছিলেন এমন দু'ব্যক্তি, যারা অত্যন্ত সুপরিচিত, প্রভাবশালী ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী। তন্মধ্যে একজন কানপুর জেলার ডেপুটি কালেক্টর মৌলভী ইমদাদ আলী ও অপর জন গোরাখপুর জেলার সাবজজ মৌলভী আলী বখ্‌শ। ইমদাদ আলী ও আলী বখ্‌শ যেহেতু চিন্তা-চেতনার দিক থেকে একজন কট্টরপন্থী ওয়াহ্‌হাবী ও অপর জন কট্টরপন্থী বিদ্‌আতী সেহেতু স্বাভাবিকভাবে তাঁদের দু'জনে কোন কথায় ঐকমত্যে পৌঁছা সুকঠিন হলেও আলীগড়ের বিরোধিতায় উভয়ে এক থাকেন এবং অভিন্ন সুর অবলম্বন করেন। এমনকি আলীগড় কলেজকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিতর্কের যেই ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেটিও ছিল উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের রূঢ় মন্তব্য ও সমালোচনা থেকে সৃষ্ট।[১৫]

দেওবন্দী আলিমগণের মতানুসারে ইংরেজী ভাষাসহ যে কোন অমুসলিম ভাষা শিক্ষা করা জায়িয। একটি ফত্‌ওয়ায় দারুল উলূমের পৃষ্ঠপোষক হযরত গাঙ্গূহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কোন নাজায়িয কার্যে লিপ্ত না হলে ইংরেজী ভাষা শিখতে দোষ নেই। সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকেও এ মর্মে ফত্‌ওয়া বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কোন কোন সাহাবী অমুসলিমদের ভাষা শিক্ষা করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়দ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়াহূদীদের ভাষা শিখতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি কয়েক দিনে তাদের ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। অনুরূপে জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনের সুবিধার্থে বৈষয়িক জ্ঞানচর্চা করতেও শরীঅত নিষেধ করেনি। মুসলিম খলীফাদের

১৪. সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, নক্‌শে হায়াত (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৫৪), ২য় খণ্ড, পৃ ২৫৭।

১৫. আলতাফ হুসাইন হালী, হায়াতে জাবীদ (নয়াদিল্লী : তারাক্কী উর্দু বোর্ড, ১৯৭৯), পৃ ৫৪১-৫৪২।

আমলে সরকারী তত্ত্বাবধানে বৈষয়িক বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ কারণে হযরত নানূতবী কিংবা দেওবন্দ ধারার কোন আলিম কখনো বৈষয়িক জ্ঞানচর্চা কিংবা স্কুল শিক্ষার বিরোধিতা করেননি। তাছাড়া স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির দ্বারা যেহেতু তৎকালীন মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছিল, সেহেতু হযরত নানূতবী স্কুল-কলেজে সন্তানদের শিক্ষাদানের বিষয়টি কখনো নিষেধ করতেন না।[১৬]

স্যার সায়্যিদ নিজের তৎপরতাকে ভাষা শিক্ষা করা ও বৈষয়িক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখলে সকলেরই কাছে প্রশংসার পাত্র থাকতেন। তখন কেউ তাঁর উপর আপত্তি করার সুযোগ পেত না। কিন্তু তিনি এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারাকেও প্রাণ খুলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর সম্পাদিত 'তাহযীবুল আখলাক' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর কঠোর ভাষায় কটাক্ষও করেছেন। এই অতিশয়তা বস্তুত বিরুদ্ধবাদীদেরকে অভিযোগের সুযোগ করে দিয়েছিল।[১৭]

ডেপুটি ইমদাদ আলী ও আলী বখ্‌শ হিজায থেকে স্যার সায়্যিদের উপর কুফ্‌রীর ফত্‌ওয়া সংগ্রহ করে ঐ ফত্‌ওয়ার কপি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিলি করায় স্যার সায়্যিদ মানসিকভাবে ভীষণ বিব্রত হন। দেওবন্দ ধারার আলিমগণ স্যার সায়্যিদের চিন্তা ও দর্শন সমর্থন না করলেও ডেপুটিদ্বয়ের সাথে মিলে ফত্‌ওয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আদৌ পছন্দ করেননি। তাঁরা স্যার সায়্যিদকে দরদের সাথে পরামর্শ দানের মনোভাব পোষণ করেন।

আম্বেটার হযরত পীরজী মুহাম্মদ আরিফ, যিনি স্যার সায়্যিদের বন্ধু ছিলেন এবং হযরত নানূতবীকেও ভালবাসতেন, তিনি হযরত নানূতবীর ঐ মনোভাব লক্ষ্য করে স্যার সায়্যিদ ও হযরত নানূতবীর একটি মতবিনিময় বৈঠকের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু স্যার সায়্যিদ তখন ডেপুটিদ্বয়ের কর্মকাণ্ডে এত মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন যে, কারো সাথে মতবিনিময়ে বসার মত ধৈর্য রাখতে পারেননি। স্যার সায়্যিদ পীরজীকে লিখিত এক চিঠিতে নিজের আকীদা ও চিন্তাধারার বিস্তারিত বর্ণনা লিখে চিঠিখানা হযরত নানূতবীর কাছে পৌঁছানোর কথা বলে দেন এবং বৈঠকে বসতে অসম্মতি জানান। ফলে সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।[১৮]

---

১৬. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।
১৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮-৯৯।
১৮. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭০।

পরবর্তীকালে হযরত শায়খুল হিন্দের আমলে উভয় প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব কমে আসে। শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি লক্ষ্য করলেন যে, আলীগড় কলেজে স্যার .সায়্যিদ নিজের চিন্তাধারাকে শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাছাড়া ইসলামী শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব এমন ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত রেখেছেন যারা প্রধানতঃ শাহ্ ওয়ালি উল্লাহর চিন্তা ও দর্শনে বিশ্বাসী। এমতাবস্থায় তিনি আলীগড়ের সাথে দেওবন্দের একাডেমিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট করতে উদ্যোগী হন। অধ্যাপক এস.এম.ইকরাম বলেন, ১৯০৬ সালে 'জমইয়তুল আনসার' গঠনের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দ এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেন। তাঁর জমইয়তুল আনসারের সভায় সাহেবযাদা আফতাব আহমদ খান উপস্থিত থাকতেন। এই সুবাদে আলীগড় কলেজের সহিত চুক্তি হয় যে, কলেজ থেকে অধ্যয়নোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের যারা দীন প্রচারের আগ্রহ পোষণ করবে তাদেরকে দারুল উলূম দেওবন্দে ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। দারুল উলূম তাদের জন্য বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা করবে। অনুরূপে আলীগড় কলেজে ঐ সকল ছাত্রকে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে, যারা দারুল উলূম থেকে অধ্যয়ন শেষ করে আলীগড়ে ভর্তির আগ্রহ পোষণ করবে।[১৯] এ উদ্যোগের ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়।

শিক্ষকতা

এক

সৌভাগ্যক্রমে শায়খুল ইসলাম এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যেটি ঐতিহ্যগতভাবে শরীঅত ও তরীকতের জ্ঞানচর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ ও বুযর্গ। তাই অতি শৈশব থেকে তিনি শিক্ষা লাভে অনুপ্রাণিত হন। জ্ঞানচর্চায় তাঁর প্রেরণা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ওফাতের কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি দারুল উলূমে হাদীসের পাঠদান অব্যাহত রাখেন। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান চর্চায় নিবিষ্ট থাক'[২০]- এর সফল বাস্তবায়ন শায়খুল ইসলামের জীবনে ছিল দেদীপ্যমান।

---

১৯. এস. এম. ইকরাম, **মওজে কাওসার** (দিল্লী : তাজ কোম্পানী, ১৯৯১), পৃ ২০৩।

২০. মূল হাদীস :

((اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ))

তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল দু'টি। ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ ও মদীনা শরীফের পবিত্র মসজিদে নববী।[২১] মুসলিম বিশ্বে মিসরের আল আযহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর যে প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা কর্মে সর্বাধিক সুখ্যাতি অর্জন করে, সেটি হল ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ। শায়খুল হিন্দ ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানেরই সৃজনশীল ও কীর্তিমান শিক্ষা পরিচালক। তাঁরই যুগে হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, হযরত আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মুফতী কিফায়েত উল্লাহ্ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহু বিদ্বান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিলেন। শায়খুল ইসলাম ১৯০৯ সালে দারুল উলূমে আগমন করলে হযরত শায়খুল হিন্দ তাঁকে নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলতে শুরু করেন। এখানে তিনি সাড়ে ছয় বছরে ১৭ টি সাবজেক্টের ৬৬ খানা পাঠ্য কিতাব অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে ২৪টি কিতাব এককভাবে শায়খুল হিন্দের কাছেই অধ্যয়ন করেছিলেন। ক্লাস টাইমের পরবর্তী সময়গুলোও শায়খুল হিন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত।[২২] হিজরী ১৩২৭ সালে তিনি নিজ পিতামাতার সাথে মদীনা শরীফ চলে যাওয়ার পরে এক বছর পুনরায় দেওবন্দ এসে শায়খুল হিন্দের নিকট সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী অধ্যয়ন করেন। হযরত শায়খুল হিন্দের সাথে মাল্টায় অবস্থানের দীর্ঘ ৩ বছরকাল প্রিয় শিক্ষক থেকে অমূল্য জ্ঞান আহরণের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। প্রিয় শিক্ষকের সান্নিধ্যে দীর্ঘকালীন অবস্থানের সুফল বর্ণনা করে মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী বলেন, এটি শায়খুল ইসলামের এমন এক ব্যতিক্রম মর্যাদা, যেখানে তাঁর সহপাঠি কিংবা সমকালীন কাউকে তাঁর সমমানে জ্ঞান করার অবকাশ নেই। জ্ঞান আহরণ ও চিন্তা-চেতনায় দৃঢ়তা অর্জনের ব্যাপারে শিক্ষকের সাথে দীর্ঘকাল অবস্থান (কাসীবুল মুলাযামাত)-এর গুরুত্ব বিদ্বান মাত্রই অনুমেয়। এই সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা শায়খুল ইসলামকে এমন এক দর্পণে পরিণত করে দিয়েছিল, যেই দর্পণের দিকে তাকালে হযরত শায়খুল হিন্দের চিত্র স্পষ্টত ফুটে উঠত।[২৩]

জ্ঞানচর্চায় হযরত শায়খুল ইসলামের অপর কেন্দ্র পবিত্র মদীনা মুনাওওয়ারা। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর অধ্যাপনার জীবন। তিনি ভারতীয় আলিমগণের প্রথম ব্যক্তি যিনি রওযাতুন্নবীর পাশে উপবেশন করে কৃতিত্বের সাথে ইল্‌মে হাদীসের অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনায় তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করে মাওলানা

---

২১. খালীক আহমদ নিযামী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

২২. মাদানী, নক্শে হায়াত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৪-৪৫।

২৩. হাবীবুর রহমান কাসিমী, ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

আশিক ইলাহী মীরঠী বলেন, মদীনার পবিত্র হরমে মাওলানা হুসাইন আহমদের শিক্ষকতা দ্রুত গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তিও দান করেছেন। শুধু ভারতীয় আলিমগণের মধ্যেই নয়, মিসরী, ইয়ামেনী, সিরীয় এমনকি মদীনার আলিমগণও সেই মর্যাদা লাভে সক্ষম হননি।[২৪]

রওযা শরীফের অতি নিকটে বসে হাদীস অধ্যাপনার দ্বারা তিনি অপরিসীম রূহানী ফয়েয ও বারাকাত লাভ করেন। এটি তাঁকে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবিচল থাকার রূহানী শক্তি দান করেছিল। রওযাতুন্নবীর এ ফয়য ও প্রভাব আলোচনা করে অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী বলেন, হিজাযের পবিত্র ভূমিতে তিনি জীবনের প্রথম প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। ইতোপূর্বে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী ও হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার আন্দোলন এবং হাদীস চর্চার অনুপ্রেরণা এই হিজায ভূমিতেই লালিত হয়েছিল। এ পবিত্র ভূমি থেকে তাঁরা সকলে এমন আত্মিক শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, যা তাঁদের জীবনকে মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন, চিন্তাচেতনাকে দীপ্তিমান এবং উদ্যমকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করে দিয়েছিল।[২৫]

শিক্ষকতায় শায়খুল ইসলামের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দে। দীর্ঘ ৩১ বছর তিনি এখানে হাদীসের অধ্যাপনা করেন। তাঁর আমলে দারুল উলূমের সুখ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও বিদেশী ছাত্ররা অধ্যয়নের জন্য দারুল উলূম আগমন করে। দারুল উলূমে তাঁর শিক্ষা পরিচালনাকে বাগদাদ নিযামিয়্যা মাদ্রাসার শিক্ষা পরিচালক হযরত শায়খ আবূ ইস্হাক সিরাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে তুলনা করা যায়। হযরত শায়খ সিরাজীর দ্বারা নিযামিয়্যা মাদ্রাসার পরিচিতি যেমন আলিমগণের মহল অতিক্রম করে সর্বসাধারণ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল, তেমনি হযরত শায়খুল ইসলামের দ্বারা দারুল উলূমের পরিচিতি উপমহাদেশের নগর বন্দর অতিক্রম করে নিভৃত পল্লীর মুসলমান পর্যন্ত পৌছে যায়।[২৬]

---

২৪. মাওলানা আশিক এলাহী মীরঠী, তাযকিরাতুর রশীদ (সাহারানপুর : মাকতাবায়ে খলীলিয়্যা, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৭।

২৫. ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮।

২৬. আবুল ইরফান নদভী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭।

হযরত শায়খুল ইসলাম সমকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ছিলেন। হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হসহ শরীঅতের বহু বিষয়ে তিনি ছিলেন ব্যুৎপন্ন ও পারদর্শী। তাঁর এ পারদর্শিতার প্রধান ভিত্তি দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা কারিকুলাম। তিনি এ কারিকুলামে এতটুকু ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে, মদীনা শরীফ গিয়ে ভিন্ন কারিকুলামের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হয়নি।

ভারত ও মদীনার শিক্ষা কারিকুলামে পার্থক্য ছিল। মদীনায় সাধারণতঃ মিসর কিংবা ইস্তাম্বুলের কারিকুলাম অনুসরণ করা হত। সেখানকার পাঠ্য কিতাবাদি ভারতের পাঠ্য কিতাবাদি থেকে ভিন্ন ছিল। তাছাড়া ভারতে সাধারণতঃ হানাফী ফিক্‌হের উপর আলোচনা করা যথেষ্ট বিবেচিত হলেও মদীনায় এতটুকু যথেষ্ট ছিল না। মদীনায় শিক্ষার্থীদের বহুসংখ্যক ছিল শাফেয়ী কিংবা মালিকী ফিক্‌হের অনুসারী। তাই শায়খুল ইসলামকে অধ্যাপনার সময়ে অন্যান্য ফিক্‌হের মূলগ্রন্থ, উসূল ও ফাতাওয়া ইত্যাদির উপর গভীর অধ্যয়ন করতে হয়েছিল।[২৭] অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে তাঁর অধ্যবসায় ও রূহানী শক্তিই তাঁকে পথ সহজ করে দেয়। এক মাসআলার সমাধান প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেন, একবার একটি মাসআলা এত জটিল হয়ে গিয়েছিল যে, পার্শ্বস্থ টিকা, ভাষ্যগ্রন্থ ইত্যাদি অধ্যয়নের পর অনেক গবেষণা করেও সমাধান করা যায়নি। অবশেষে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রওযায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। রওযা শরীফে সালাম ও দরূদ পেশ করে কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতেই ইলহামের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান মিলে গিয়েছিল।[২৮]

শিক্ষা জীবনে যদিও যুক্তিবিদ্যা ও গ্রীকদর্শনের প্রতি তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল কিন্তু মদীনার ইল্‌মী পরিবেশে পৌঁছে এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। তিনি ক্রমে ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীসের প্রতি বেশী অনুরাগী হন। মসজিদে নববীতে তাঁর পাঠদান প্রধানতঃ এ তিনটি বিষয়ে ছিল। মদীনার তদানীন্তন প্রধান মুফতী শায়খ আহমদ আল বাসাতী ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তাঁরই অভিমতকে চূড়ান্ত রায় মনে করতেন। এ অধ্যাপনার ফলে মাযহাব চতুষ্টয়ের কিতাবপত্র তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। তিনি শ্রেণীকক্ষে কিংবা পর্যালোচনা বৈঠকে প্রত্যেক মাযহাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

২৭. মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, **হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী**, ৩য় সং (ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬), পৃ ৪৩।

২৮. মাদানী, **নক্‌শে হায়াত**, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১১৫।

মাসআলার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট মাযহাবের ফত্ওয়া গ্রন্থ থেকে বহু উদ্ধৃতি মুখস্থ শুনিয়ে দিয়ে অবাক করে দিতেন। মদীনাস্থ শিক্ষকদের অনেকে পাঠদানের সময় সম্মুখে ভাষ্যগ্রন্থ নিয়ে বসতেন। কিন্তু মাদানী ভারতের 'খায়রাবাদী পদ্ধতি' অনুসারে মূল কিতাব ব্যতীত কোন ভাষ্যগ্রন্থ সম্মুখে রাখতেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের মনে তাঁর পাণ্ডিত্য অস্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।[২৯]

দারুল উলূমে অবস্থানকালেও তাঁর কাছে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বহু স্থান থেকে জটিল মাসাইল সম্পর্কে ফত্ওয়া চেয়ে পাঠানো হত। দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী হযরত মাওলানা সায়্যিদ মাহ্দী হাসান বলেন, আমি দীর্ঘ ১০ বছর যাবত দেখে আসছি যে, দৈনিক তাঁর কাছে বহু ফত্ওয়া চেয়ে চিঠি আসে। অনেক সময় তিনি সব চিঠির জবাব লেখার মত সময় না থাকলে দারুল ইফ্তার সাহায্য নিতেন।[৩০]

তবে হযরত শায়খুল ইসলামের সর্বাধিক পাণ্ডিত্য ছিল হাদীসশাস্ত্রে। হিজাযে অবস্থানকালেই তিনি হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শিতার স্বীকৃতি লাভ করেন। মসজিদে নববীতে তাঁর দর্সে বিপুল শিক্ষার্থীদের যে ভিড় জমেছিল, ইমাম মালিক ইব্ন আনাসের পর এমন দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখা যায়নি। তিনি 'শায়খুল হারাম' নামে প্রসিদ্ধ হন। অধ্যাপক শামস তিবরীয খান বলেন, শায়খুল ইসলাম মাদানী তিনটি দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি খোদাভীরু বিদগ্ধ আলিম, পূর্ণ অন্তরালোক সম্পন্ন পীর ও অনুপম আদর্শের অধিকারী সমাজ নেতা। হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। যারা তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেছেন, তাদের অনুভূতিতে তিনি ছিলেন 'হাফিযুল হাদীস'। শ্রেণীকক্ষে তাঁর হাদীস বিশ্লেষণের মধ্যেও সেই পরিচয় ফুটে উঠত।[৩১]

'মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম' শিরোনামে প্রকাশিত পত্রাবলীর অধ্যয়ন থেকে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার অনুমান করা যায়। চিঠিগুলোতে তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকায়িদ, তাসাওউফ, ইতিহাস ও রাজনীতি সংক্রান্ত গবেষণামূলক বহু বিষয়ের সারনির্যাস তৈরী করে দিয়েছেন। মাওলানা হাবীবুর

২৯. মুহাম্মদ কাসিম আলী বিজনৌরী "চৌধবী সদী কা শায়খুল হাদীস" আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

৩০. সায়্যিদ মাহ্দী হাসান, "শায়খুল ইসলাম আওর ফিক্হ" আল জমইয়ত পত্রিকা, প্রাগুক্ত পৃ ৫২-৫৩।

৩১. ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৯।

রহমান কাসিমী বলেন, এ পত্রাবলী হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পত্রাবলী থেকেও বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।[৩২] অথচ তিনি এগুলোর অধিকাংশ লিখেছেন সফর অবস্থায় কিংবা জেলখানায় বসে, যেখানে প্রয়োজনীয় কিতাবাদি সঙ্গে রাখার সুযোগ ছিল না। ঐতিহাসিক ড.তারা চাঁদ তাঁর 'নক্‌শে হায়াত' গ্রন্থের উপর মন্তব্য করে বলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে শায়খুল ইসলামের জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা অতুলনীয় ছিল। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, তিনি ধর্মতত্ত্বের একজন শিক্ষাবিদ হয়ে কেমন করে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতির ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর সাথে মুসলিম দেশগুলোর আন্তর্জতিক সম্পর্ক বিষয়ক খুঁটিনাটি বহু ব্যাপারে এত ব্যাপক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩৩]

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিশালতা ও গভীরতার নিরিখেই তদানীন্তন বিশ্বের বৃহত্তর ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সদরুল মুদার্‌রিসীন ও শায়খুল হাদীস পদে মনোনীত করেন। 'তারীখে দারুল উলূম' গ্রন্থে মাওলানা সায়্যিদ মাহবূব রেযবী বলেন, হিজরী ১৩৪৬ সালে হযরত আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী যখন দারুল উলূম থেকে ইস্তফা দেন, তখন দেওবন্দ ধারার আলিমগণের মধ্যে তিনি ব্যতীত অপর কোন এমন ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান ছিলেন না, যিনি দারুল উলূমের এহেন গুরুত্বপূর্ণ পদে যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এ কারণে কর্তৃপক্ষের নির্বাচনী দৃষ্টি তাঁরই উপর পড়েছিল।[৩৪]

তিনি শায়খুল হাদীস পদে যোগদানের ফলে দারুল উলূমের দরসে হাদীস পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী জমজমাট হয়। আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী হানাফী ফিক্‌হের বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বাস্তব কথা হল যে, মাদানীর শিক্ষকতা কালে যেভাবে বিভিন্ন পথ ও মতের শিক্ষার্থীদের সমাগম ঘটে, যাদের অনেকে এমনও ছিলেন যে, নিজে কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর শরীঅতের গভীর উপলব্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দারুল উলূম আগমন করেছেন- এমন শিক্ষার্থীদেরকে হাদীস পড়ানোর জন্য শুধু হানাফী ফিক্‌হের পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধতাই যথেষ্ট ছিল না। তার জন্য হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর মত সর্ব বিষয়ে বিদগ্ধ

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৩।
৩৪. তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৯-২১০।

পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই দারুল উলূম কর্তৃপক্ষের ঐ সিদ্ধান্ত পরবর্তী পরিস্থিতির বিচারে অত্যন্ত বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়।[৩৫]

[illegible]

দারুল উলূমের সদরুল মুদাররিসীন পদে হিজরী ১৩৪৬ থেকে ১৩৭৭ সালের ওফাত পর্যন্ত ৩১ বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধ্যাপনায় ছিল ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী (১৯৪/৮১০-২৫৬/৮৭০) সংকলিত 'সহীহ্ বুখারী' ও ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (২০৬/৮২১-২৭৯/১৯২) সংকলিত 'জামি তিরমিযী'। সদরুল মুদার্‌রিসীন হিসেবে সহীহ্ বুখারীর অধ্যাপনা তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্ব হলেও গ্রন্থদ্বয় মনোনীত করার পেছনে তাঁর নিজস্ব কারণও ছিল। এ ব্যাপারে অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী বলেন, অধ্যাপনার জন্য হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থ মনোনীত করেছিলেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, অধ্যাপনার মাধ্যমে ঐ সকল ফিত্‌নার প্রতিরোধ করা, যেগুলো সম্রাট আকবরের যুগে জন্ম নিয়েছিল। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মুআত্তা ইমাম মালিক' গ্রন্থের অধ্যাপনাকে অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ গ্রন্থের সাহায্যে মুসলিম সমাজে ইজ্‌তিহাদ ও গবেষণার চেতনা জাগ্রত করা। যেন ঐ চেতনার দ্বারা তিনি নিজের সংস্কারমূলক চিন্তাধারা সমাজে বাস্তবায়িত করতে পারেন। তাছাড়া যেন গবেষণাকর্ম ধর্মীয় ভাবধারার আলোকে একটি সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। পক্ষান্তরে, হযরত মাওলানা মাদানী সমকালীন মানুষের ধর্মীয় মনোভাব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, মানুষ ফিক্‌হ তথা ইসলামী জীবন বিধানের যথার্থ অনুসরণ করা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই নিজের শিক্ষাদান কর্মসূচীকে তিনি এমন পদ্ধতিতে সাজিয়েছিলেন, যেন হাদীসের আলোকে ফিক্‌হের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ফিক্‌হ যে মূলত হাদীসেরই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত এ কথা প্রতীয়মান হয়। তাঁর দৃষ্টিতে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার এ যুগে তাক্‌লীদ তথা প্রশ্নাতীতভাবে ফিক্‌হের অনুসরণ ব্যতিরেকে ধর্মীয় শৃংখলা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়।

---

৩৫. ড. রশীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৮-৩৩৯।

আর এ লক্ষ্যেই তিনি অধ্যাপনার জন্য সহীহ বুখারীর পাশাপাশি জামি তিরমিযীকেও মনোনীত করেছিলেন।[৩৬]

সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে জামি তিরমিযীর ব্যতিক্রমধর্মী মর্যাদা রয়েছে। তিরমিযী ফিক্হের অধ্যায় বিন্যাসের আলোকে বিন্যস্ত। ইমাম তিরমিযী প্রত্যেক অনুচ্ছেদে যথাসম্ভব সকল ফকীহের মতামত, দলীল, ব্যাখ্যা ও ফত্ওয়া উল্লেখ করেছেন। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে জামি তিরমিযী বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।[৩৭] তিরমিযীর এ বৈশিষ্ট্য হযরত শায়খুল ইসলামের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

প্রত্যেক বছর পাঠদানের শুরুতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিজ পর্যন্ত পূর্ণ সনদ পেশ করতেন।[৩৮] উল্লেখ্য, সনদের উপস্থাপন হাদীস সংকলিত হওয়ার পূর্বে আবশ্যকীয় ছিল। সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের বরাত দেওয়াই যথেষ্ট। ধারাবাহিক সনদের উত্থাপন জরুরী নয়। তবুও হাদীস বিশারদ পণ্ডিতগণ পূর্বেকার নিয়মানুসারে সনদের সংরক্ষণ করাকে বরকতের কারণ মনে করে থাকেন। উপমহাদেশে হাদীসচর্চা 'সুলতান মাহমূদ' গযনবীর ভারত বিজয়ের পর থেকে শুরু হলেও এটি নিয়মতান্ত্রিকতা লাভ করে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর যুগে। উপমহাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম সিহাহ্ সিত্তাহ্র শিক্ষাদান করেন এবং অধ্যাপনার পূর্বে ধারাবাহিক সনদ বর্ণনার নিয়ম প্রবর্তন করেন।[৩৯] শায়খুল ইসলাম এ নীতিই অনুসরণ করেন। ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ পর্যন্ত তাঁর সনদ নিম্নরূপ :

সায়্যিদ হুসাইন আহমদ আল মাদানী→ শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী→ হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী→ শায়খ আবদুল গনী আল মুজাদ্দিদী মুহাজিরে মক্কী→ শায়খ মুহাম্মদ ইস্হাক দেহলবী

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯-৬০।

৩৭. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী (করাচী : মাকতাবায়ে দারুল উলূম, ১৯৮৮), পৃ ১৩৫-১৩৬।

৩৮. কাযী মুহাম্মদ যাহিদ হুসাইনী, চেরাগে মুহাম্মদ (ঢাকা : জামিয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ, ১৯৯৮), পৃ ২৪৮।

৩৯. সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : কুতবখানায়ে রশীদিয়া, হি. ১৪১১), পৃ ১৪৫।

মুহাজিরে মক্কী→ সিরাজুল হিন্দ শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী→ ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।[৪০]

এ সনদ ছিল শায়খুল ইসলামের প্রধান সনদ। তবে তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী, হযরত মাওলানা মাযহার নানূতবী, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী প্রমুখ থেকেও হাদীস বর্ণনার 'ইজাযত' পেয়েছেন। এদের প্রত্যেকের সূত্র সর্বশেষে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত সনদের পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী→ শায়খ আবুত্ তাহির আল মাদানী→ শায়খ ইব্রাহীম আল কুরদী→ শায়খ আল মায্যাহী→ শায়খ শিহাব আহমদ আস সুবকী→ শায়খ নাজ্ম আল গায়তী→ শায়খ যায়ন যাকারিয়্যা→ শায়খ আল ইয্য আবদুর রহীম→ শায়খ উমর আল মুরাগী→ শায়খ ফখ্র ইবনুল বুখারী→ শায়খ উমর ইব্ন তাবারযাদ আল বাগদাদী→ শায়খ আবুল ফাতাহ আবদুল মালিক→ শায়খ আবূ আমির, আবূ নসর ও আবূ বকর→ শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার→ শায়খ আবুল আব্বাস মুহাম্মদ→ শায়খ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্ তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।[৪১]

ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদগুলো প্রত্যেক হাদীসের পূর্বে জামি তিরমিযী গ্রন্থেই উল্লেখ রয়েছে। এভাবে শায়খুল ইসলামের সনদ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সূত্র পরম্পরার দ্বারা 'মুত্তাসিল' (অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত) হয়ে আছে।

পাঠ দানের সময় তিনি উপরোক্ত সনদ, আসমাউর রিজাল (সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের জীবনী বিষয়ক পর্যালোচনা) ও মতনের বিশ্লেষণ করতেন। তিনি মতন থেকে বিভিন্ন মাসাইলের উদ্ভাবন ও প্রমাণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতেন না। বরং আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে সমকালীন প্রেক্ষাপট অনুসারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাত্রার পথনির্দেশ আলোচনা করতেন। তাঁর শ্রেণী কক্ষের বক্তৃতায় মহানবীর

---

৪০. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, সীরতে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ ঃ মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৮৮), পৃ ১৪৪।

৪১. জামি তিরমিযী, (দিল্লী ঃ কুতুবখানা রশীদিয়া) তা. বি. পৃ ২।

প্রতি অপরিসীম ভালবাসার ছাপ লক্ষ্য করা যেত। তিনি শিক্ষার্থীদের মনে সুন্নাত অনুসরণের প্রেরণাদানকে অধ্যাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৪২]

সিহাহ সিত্তাহ সংকলকমণ্ডলীর কেউ হানাফী ফিক্‌হের অনুসারী ছিলেন না। আয়িম্মায়ে হাদীসের প্রত্যেকে নিজ নিজ ফিক্‌হ অনুসারে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তাই প্রধান গ্রন্থগুলোর একটিও হানাফী ফিক্‌হের আলোকে রচিত হয়নি। ফলে আপাত দৃষ্টিতে হানাফী ফিক্‌হকে হাদীস থেকে দূরে বলে ভুল ধারণার উদ্রেক হয়ে থাকে। শায়খুল ইসলাম নিজে হানাফী ফিক্‌হের অনুসারী ছিলেন। তিনি হানাফী ফিক্‌হের প্রত্যেকটি মাসআলা সিহাহ গ্রন্থের হাদীস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণ করতেন যে, শিক্ষার্থীদের মনে হত যেন হানাফী ফিক্‌হই হাদীসের অধিক অনুকূলে অবস্থিত। ফিক্‌হে হানাফীর প্রাধান্য বর্ণনায় কখনো কখনো তাঁর আলোচনা খুব দীর্ঘ হয়ে যেত। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র মাওলানা আবদুল কুদ্দূস বলেন, প্রসিদ্ধ 'হাদীসে কুল্লাতায়ন'-এর আলোচনায় হযরত ইমাম শাফিয়ীর দলীলের খণ্ডনে তিনি ৫১টি আপত্তি তুলে ধরেন। অনুরূপভাবে 'ইমামের পেছনে মুক্তাদীর ফাতিহা পাঠ' প্রসঙ্গে হানাফী ফিক্‌হের সমর্থনে দৈনিক ৩ ঘন্টা করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত বক্তব্য অব্যাহত রাখেন।[৪৩] তাঁর শ্রেণীকক্ষের ঐ সকল বক্তৃতা শিক্ষার্থীরা লিপিবদ্ধ করে। অনেকে সেগুলো 'তাকরীরে মাদানী' শিরোনামে গ্রন্থাকারে মুদ্রন করেছেন। মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদীর নিকট শ্রেণীকক্ষে লিখিত অনুরূপ একটি অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি আজো বিদ্যমান।

'আনফাসুল আরিফীন' গ্রন্থে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ হাদীস অধ্যাপনার তিনটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। এক. কোন ব্যাখ্যা ব্যাতিরেকে শিক্ষার্থীদেরকে সহীহ সনদের মাধ্যমে শুধু মাত্র হাদীসটি শুনিয়ে দেওয়া। দুই. হাদীস শোনানোর সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা। তিন. হাদীসের ভিত্তিতে শরীঅতের বিধি-বিধান বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ নিজে প্রধানতঃ দ্বিতীয় নিয়মে হাদীস পড়াতেন। দেওবন্দে হযরত আল্লামা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী তৃতীয় নিয়মে অধ্যাপনা করেন। শায়খুল ইসলাম মাদানীর

---

৪২. আসীর আদরবী, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও ইসহাক ফরীদী সম্পাদিত, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী জীবন ও সংগ্রাম, ২য় সং (ঢাকা : প্রভাত প্রিন্টার্স প্রেস, ১৯৯৮), পৃ ১২৭।

৪৩. মুহাম্মদ আবদুল কদ্দুস, ''শায়খুল ইসলাম মাদানী কা তরীকে দরস'', মাসিক আল ইরশাদ (পেশাওয়ার,ফেব্রু, ১৯৭৮), পৃ ১৮।

পাঠদানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় নিয়মের অনুসরণ পাওয়া যায়। তিনি মদীনার মসজিদে নববীতে অধ্যাপনা কালে তৃতীয় নিয়মকে বেশী অনুসরণ করেছেন। তবে দেওবন্দে তাঁর নিয়ম ছিল শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছয় মাস পর্যন্ত প্রত্যেক হাদীসের বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করা। পরবর্তী চার মাস চলত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। অবশেষে শিক্ষাবর্ষের শেষ দিনগুলোতে শুধু সামা (শুধু মাত্র হাদীস শুনিয়ে দেওয়া)-এর নিয়মে অধ্যাপনা চালিয়ে কিতাব সমাপ্ত করে দিতেন।[৪৪]

মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস অধ্যয়নের সাধারণ পদ্ধতি দু'টি। কোথাও মুহাদ্দিস নিজে হাদীস পাঠ করেন আর শিক্ষার্থীরা তা শ্রবণ করে। আবার কোথাও শিক্ষার্থীরা হাদীস পাঠ করে আর মুহাদ্দিস তা শ্রবণ করেন। হযরত শায়খুল ইসলামের সবকে উভয় পদ্ধতিই চালু ছিল।[৪৫] তাঁর দরসে বছরের শুরু ভাগে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরাই হাদীস পাঠ করত। কিন্তু বছরের শেষভাগে তিনি নিজেই হাদীস পাঠ করতেন এবং শিক্ষার্থীরা শ্রবণ করত।[৪৬]

---

৪৪. নিমাতুল্লাহ আযমী, দরসে বুখারী (দেওবন্দ : মারকাযুল মাআরিফ, ১৯৯৬), পৃ ২৭-৩১।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

৪৬. রাত্র কালীন সবকে শায়খুল ইসলামের মতন পাঠ সম্পর্কে মাওলানা আবদুল হালীম চিশতী اَلْبِضَاعَةُ الْمُزْجَاةُ لِمَنْ يُطَالِعُ الْمِرْقَاةَ গ্রন্থে লিখেছেন:

كَانَ شَيْخُنَا الْعَالِمُ الرَّبَّانِي وَالْمُجَاهِدُ الْكَبِيْرُ صَاحِبُ الْأَدَبِ السَّنِيَّةِ وَ الْأَخْلَاقِ الْمَرْضِيَّةِ الْبَهِيَّةِ السَّيِّدُ حُسَيْنُ أَحْمَدُ الْمَدَنِي الْمُتَوَفّٰى سَنَةَ ١٣٧٧هـ رَئِيْسُ مَشْيَخَةِ دَارِ الْعُلُوْمِ بِدِيُوْبَنْدٍ وَ شَيْخُ الْحَدِيْثِ بِهَا يَضَعُ الْقَسْطَلَانِي أَمَامَهُ عِنْدَ التَّدْرِيْسِ وَكَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ جَهُوْرِيَّ الصَّوْتِ يَقْرَأُ وَيَسْرُدُ الْحَدِيْثَ بِصَوْتٍ حَسَنٍ فَصِيْحٍ بِالتَّجْوِيْدِ حَيْثُ يَعْلَمُ الطَّلَبَةُ مَا يَقْرَأُهُ وَالْقَسْطَلَانِي فِيْ مَزْجِ الْمَتْنِ بِالشَّرْحِ وَمَعَ ذٰلِكَ حِيْنَ يَقْرَأُ شَيْخُنَا لَا يَتْرُكُ مُتُوْنَ الْحَدِيْثِ لَفْظًا وَلَا حَرْفًا وَلَا يَخْلِطُ بَيْنَ حَرْفٍ مِنَ الشَّرْحِ بِالْمَتْنِ وَحَقَّ وَلَا سَهْوًا وَلَا تَرَكَ التَّصْلِيَةَ وَالتَّرَحُّمَ أَبَدًا وَاللّٰهِ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَهُ فِيْ حُسْنِ قِرَاءَةِ الْحَدِيْثِ مَعَ آدَابِهِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ .

হযরত শায়খুল ইসলাম প্রত্যহ পাঠদানের শুরুতে 'মস্‌নূন খুত্‌বা' তিলাওয়াত করতেন। ফলে দরসের শুরু থেকেই গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব বিরাজ করত। আলোচনায় নবীগণের নামের পর সালাত ও সালাম, সাহাবীগণের নামের পর 'রাযিআল্লাহু আনহু', আর তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন কিংবা আকাবির ও বুযর্গানে দীনের নামের পর 'রহমাতুল্লাহ আলাইহি' উচ্চারণ করা তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম ছিল।[৪৭] তিনি শিক্ষার্থীদেরকেও এ নিয়ম মেনে চলতে বিশেষ তাগিদ করতেন। ফলে গোটা পাঠকক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিগত সকল মনীষীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার মনোভাব বজায় থাকত।[৪৮]

তাঁর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল অবারিত। অনেক সময় সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়েও প্রশ্ন হত। তিনি প্রত্যেক প্রশ্ন গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন এবং সন্তোষজনক জবাব দিতেন। কখনো

---

৪৭. আযীযুর রহমান, আনফাসে কুদসিয়্যা : হযরত শায়খুল ইসলাম কী চান্দ খুসুসিয়্যাত", আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২; তাছাড়া তাঁর সবকের শুরুতে খুত্‌বা পাঠের পর কিতাব শুরুর পূর্বে পড়তে হত :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَيْرُ الْأُمُوْرِ عَوَازِمُهَا وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِيْ النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْجُعْفِيِّ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِعُلُوْمِهِ آمِيْنَ أَنَّهُ قَالَ ....

তবে জামি তিরমিযীর সবকে ইমাম বুখারীর নামের পরিবর্তে ইমাম তিরমিযীর নাম সংযুক্ত করে সবক শুরু হত। এ পদ্ধতি তাঁর শাগিরদের মধ্যেও আজো চালু আছে।

৪৮. ইমাম নববী সহীহ মুসলিম-এর যে ভাষ্য রচনা করেন তার ভূমিকায় লিখেছেন :

يَنْبَغِيْ لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُوْرًا فِيْ الْأَصْلِ الَّذِيْ يَقْرَأُ مِنْهُ وَلَا يَسْأَمُ مِنْ تَكْرَارِ ذٰلِكَ وَمَنْ أَغْفَلَ هٰذَا حُرِمَ خَيْرًا عَظِيْمًا وَفَوَّتَ فَضْلًا جَسِيْمًا .

কখনো ছাত্ররা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও তুলে দিত। তিনি কখনো কোন প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করেননি। হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্ বলেন, কখনো কখনো তিনি ছাত্রদের সাথে কৌতুকও করতেন। এতে দীর্ঘক্ষণ ক্লাস চলার অবসাদ চলে যেত। নতুন উদ্যমে আবার সবক শুরু হত। আলোচনার মাঝে মাঝে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী কবিতা আবৃত্তি করতেন। আবার এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গূহী কবিতা আবৃত্তি করা পছন্দ করতেন না।[৪৯]

তাঁর আমলে দারুল উলূমে 'খতমে বুখারী' উপলক্ষে দুআর অনুষ্ঠান খুব প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।[৫০] ছাত্ররা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে অভিভাবক ও সাধারণ লোকজন দুআর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। দারুল উলূমের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের কোন দিন তারিখ ঘোষণা দেওয়া হত না। তবুও লোকজন খোঁজ খবর নিয়ে ১/২ দিন পূর্ব থেকেই দারুল উলূম এসে অপেক্ষা করতে থাকত। শাবান মাসের শেষ দিকে শায়খুল ইসলাম বুখারী শরীফের অধ্যাপনা শেষ করতেন এবং ঐ রাতেই সিলেটে রমযান যাপনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যেতেন। খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে তিনি অধ্যয়নোত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনার 'ইজাযত' প্রদান করতেন। ছাত্রদের যারা সূলূক ও তরীকতের দীক্ষায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হত, তাদেরকে তিনি ঐ অনুষ্ঠানে 'খেলাফত' দান করতেন। তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়নকারীদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৪৪৮৩। এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ইতোপূর্বে কোন সদরুল মুদাররিসীন-এর আমলে তৈরী হয়নি।[৫১]

সংস্কার ও সম্প্রসারণ

এক

সদরুল মুদার্‌রিসীন হিসেবে হযরত শায়খুল ইসলামের উপর দারুল উলূমের শিক্ষা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শিক্ষা বিভাগের মৌলিক নীতিমালা হযরত নানূতবী নিজেই স্থির করে গিয়েছিলেন। শায়খুল ইসলামের

---

৪৯. সায়্যিদ আনযার শাহ্ কাশ্মীরী, "এক কুদসিউল আসল কী কুচ বাতেঁ" আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

৫০. আবদুর রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান (লাহোর : মাকতাবায়ে রশীদিয়্যা, তা.বি.), পৃ ৪৭৫।

৫১. ইবনুল মুবারক জলীল রাগিবী, "শায়খুল ইসলাম আওর দরসে বুখারী শরীফ কা খতম", আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৮।

আমলে ঐ নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন ঘটে। ফলে শিক্ষা বিভাগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও আশাতীত বৃদ্ধি পায়। শায়খুল ইসলামের বিশ্বাস ছিল, শুধু সার্টিফিকেট ও সনদ প্রদানের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য শেষ হয় না। বরং শিক্ষার্থীকে সকল দিক থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন আলিম বানানোর প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য। এক ভাষণে তিনি শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করা বর্তমানে সবচেয়ে জরুরী বিষয়। আমাদের সকল শ্রম সাধনা ও পূর্ণ মনোযোগ জ্ঞান অন্বেষণেই ব্যয় করা প্রয়োজন। জ্ঞানের দিক থেকে আমরা যেন এতটুকু যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারি যে, সর্বসাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্র আমাদের থেকে সাহায্য নিতে পারে এবং আমাদের যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য হয়।[৫২]

এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি দারুল উলূমের শিক্ষা কারিকুলামেরও সংস্কার করেন। দারুল উলূমের কারিকুলামে 'তাফসীর' শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাফসীরের বিভিন্ন বুনিয়াদী গ্রন্থ কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করেন। দাওরা হাদীস শ্রেণীতে ভর্তির পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি তাফসীরে জালালায়ন ও তাফসীরে বায়যাবীর অধ্যয়ন আবশ্যকীয় করে দেন। তা ছাড়া দাওরা হাদীসের পর 'দাওরা তাফসীর'-নামে একটি নতুন বিভাগ খোলেন। এ বিভাগে তাফসীর ও উসূলে তাফসীর সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।[৫৩]

ইতোপূর্বে দারুল উলূমে উচ্চ পর্যায়ের ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজদর্শন ইত্যাদি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। এ বিষয়গুলো সরাসরি ধর্মীয় বিষয় না হলেও ধর্মীয় বিষয়াদির সঙ্গে এগুলোর অনেক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রয়োজন উপলব্ধি করে সপ্তাহে একদিন এ সকল বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। আলোচক হিসেবে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫৪]

দারুল উলূমে প্রধানত উর্দু ও আরবী ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়। তিনি ছাত্রদেরকে নিজ নিজ মাতৃভাষাসহ অন্যান্য ভাষা শিক্ষার প্রতি অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর আমলে হিন্দী ভাষা ও ইংরেজী ভাষার অধ্যয়ন এবং শরীরচর্চার জন্য নতুন

---

৫২. খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, বোম্বাই, ১৯৪৮।

৫৩. মাওলানা আবিদ আল ওয়াজিদী 'শায়খুল ইসলাম কে ইল্মী কামালাত', আল জমইয়ত প্রত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৫৪. প্রাগুক্ত।

৩টি বিভাগ খোলা হয়েছিল। প্রত্যেক বিভাগের জন্য তিনি প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শরীরচর্চা বিভাগের প্রতি তাঁর সবিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঐ বিভাগ পরিদর্শনে যেতেন। তাঁর নিজের প্রাত্যহিক কর্মসূচীর মধ্যেও ব্যায়াম করা শেষ বয়স পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৫৫]

হযরত শায়খুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর উদ্যোগে দারুল উলূম থেকে দাওরা হাদীসের সনদ প্রাপ্তির জন্য ইল্‌মে কিরাআতের পারদর্শিতা ও পরীক্ষা শর্ত হিসেবে গৃহীত হয়। এ উদ্যোগ দেওবন্দ ধারার আলিমদেরকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের ব্যতিক্রম মর্যাদা দান করে এবং সামাজিকভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উন্নীত করে দেয়।[৫৬]

দুই

হযরত নানূতবীর জীবদ্দশায় সাহারানপুর, মুযাফ্‌ফরনগর, বুলন্দ শহর প্রভৃতি স্থানে ৫/৬টি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। মাদ্রাসাগুলো প্রথম দিকে দারুল উলূমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত।[৫৭] শায়খুল হিন্দের আমলে চতুর্দিকে এ প্রক্রিয়ার মাদ্রাসার সংখ্যা শতাধিকে পৌঁছে যায়। শিক্ষা অভিযানে শায়খুল ইসলাম মাদানী ছিলেন সবিশেষ মনোযোগী। মদীনা শরীফ থাকাকালে,[৫৮] তাঁর প্রেরণা পেয়েই আলজেরিয়া মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা শায়খ ইব্‌ন বাদিস হিজরতের নিয়্যত পরিত্যাগ করে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০ বছর পর্যন্ত মাদ্রাসা স্থাপন ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের অভিযান চালান।[৫৯] শায়খুল ইসলামের ঐ প্রেরণাদানের কথা উল্লেখ করে শায়খ ইব্‌ন বাদিস বলেন, তাঁরই নির্দেশে আমি আলজেরিয়ায় পূর্ণ ১০ বছর ধর্মীয় শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির কাজ

---

৫৫. সায়্যিদ মুখতার আহমদ, "তাদাবীরে সিহ্‌হাত আওর মাওলানা মাদানী", আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।

৫৬. প্রাগুক্ত।

৫৭. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩-১৬০।

৫৮. মদীনা অবস্থানকালে তিনি ও তাঁর ভ্রাতা সায়্যিদ মাহমূদ আহমদ মাদানীর উদ্যোগে মসজিদে নববীর সন্নিকটে 'মাদ্রাসাতুল উলূমিশ্ শারইয়্যা' নামে হিন্দুস্তানী নেসাবের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা এই মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। (ইসহাক খান কাশ্মীরী, দেওবন্দ কা ফয়য মুলকু মুলকুঁ, মাসিক আর রশীদ, দারুল উলূম দেওবন্দ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫২)।

৫৯. হাবীবুর রহমান কাসিমী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯।

চালিয়ে যাই। এ দশ বছর আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও যোগ্যতা সম্পন্ন আলিম তৈরী করা। আল্লাহর শোকর যে, আমরা এ কর্মসূচীর উত্তম ফলাফল লাভ করেছি।[৬০]

বাংলাদেশের সিলেটে অবস্থানকালে তাঁর প্রধান কর্মসূচী ছিল গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে মকতব, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। শায়খুল ইসলামের অভিযানের ফলে অদ্যাবধি সিলেট ও আসাম অঞ্চলে মাদ্রাসার সংখ্যা অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশী। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আসীর আদরবী বলেন, সিলেটে আজ থেকে ৬০ বছর পূর্বে হযরত শায়খুল ইসলাম মাদ্রাসা শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করেন। তাঁর প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ থেকে ক্রমে আরো প্রদীপ জ্বলতে থাকে। তাই সিলেটের ভূখণ্ড আজ ইসলামী চেতনা, শিক্ষাদীক্ষা, দীনদারী, খোদাভীতি ও ধার্মিকতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য সকল অঞ্চলের তুলনায় বহু গুণ এগিয়ে আছে।[৬১]

ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রতি শায়খুল ইসলামের আগ্রহ এতখানি প্রবল ছিল যে, অতি দূর-দূরান্তে অবস্থিত মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণকেও তিনি প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করতেন। অনেক স্থানে রেলযোগে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর ২০/৩০ মাইল কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে গমন করতেও কষ্ট বোধ করতেন না। তিনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে তালীমের জন্য উৎসাহিত করতেন। তাদের সহযোগিতার লক্ষ্যে চাঁদার ব্যবস্থা করে দিতেন। অনেক মাদ্রাসায় নিজের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়েও সুপারিশ করেছেন। কোথাও কোন মাদ্রাসায় কলহ কিংবা মতবিরোধ দেখা দিলে কিংবা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক কলহ বা সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তিনি দ্রুত সেখানে পৌঁছে নিরসনের উদ্যোগ নিতেন। মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী

---

৬০. মাওলানা সায়্যিদ আসআদ আল মাদানী বলেন, ১৯৫০ সালে একদিন আমি মাদ্রাসাতুল উলূমিশ শরইয়্যায় চাচাজানের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ এসে চাচাজানের সাথে সালাম মুসাফাহা ও মুআনাকা করলেন এবং বললেন, আমার শায়খ কোথায় আছেন এবং তিনি কেমন আছেন। চাচাজান বললেন, তিনি ভারতে আছেন এবং ভাল আছেন। তারপর আমার দিকে ইশারা করে বললেন, ইনি তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। কথাটি শুনেই বৃদ্ধ আমাকে বুকে জড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি মুহাম্মদ আল বাশীর আল ইবরাহীমী আল জাযায়িরী। আপনার পিতার একজন নগন্য ছাত্র। তিনি আমাকে স্বাধীনতা জিহাদের আদেশ দিয়ে আল জাযায়ির পাঠিয়েছিলেন। (হাবীবুর রহমান কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩)

৬১. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৮৭), পৃ ১৯৫।

বলেন, হযরত মাদানীর এ তৎপরতায় সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলো বহুলাংশে বিরোধমুক্ত থাকে।[৬২]

বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় পূর্বে কোন মাদ্রাসা ছিল না। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোন আলিম পাওয়া কঠিন ছিল। শায়খুল ইসলাম পূর্ণিয়ার এক ধর্মীয় সভায় গমন করেন। তিনি তাঁর স্বাভাবিক কর্মসূচী মোতাবেক মাদ্রাসা ও মকতব স্থাপনের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে সেখানে মাদ্রাসা বিস্তারের অভিযান শুরু হয়। বর্তমানে পূর্ণিয়া জেলায় এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে একাধিক আলিম-উলামা, হাফিয, কারী পাওয়া যায় না।[৬৩] তাই শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যার রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা মাওলানা মুনাওওয়ার হুসাইন বিহারী প্রায়ই সেখানকার লোকদের বলতেন, এ জেলায় তোমরা ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও তাবলীগের যে ক্রমোন্নতি দেখতে পাচ্ছো তার সবটুকুই হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর অবদান। তাঁর দুআ এবং পদার্পণের ফলে পূর্ণিয়ার পরিবেশ আজ এতখানি সুন্দর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।[৬৪]

শিশুশিক্ষা ও স্কুলশিক্ষা

এক

আজকের শিশু আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত শিশুদের গড়ে তোলার উপর নির্ভরশীল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। শিশুদেরকে তাদের জীবনের শুরুতে ধর্মীয় তালীম প্রদানের নিয়ম উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে পূর্ব থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্য রূপে চলে আসছিল। ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানরা সামাজিকভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত হয়ে পড়লে ঐ ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। হযরত শায়খুল ইসলাম সেই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি শিশুশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ১৯৫৫ সালে কলিকাতায় জমইয়তে উলামার অধিবেশনে বলেন, মুসলিম শিশুরা যেন একদিকে জাগতিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দেশের উত্তম নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে

৬২. হাবীবুর রহমান আযমী, 'হযরত শায়খুল ইসলাম কী হায়াতে মুবারক কে তীন দাওর", আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।

৬৩. আকমল ইয়াযদানী জামিঈ, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৮।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৫।

পারে এবং অন্যদিকে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা লাভ করে তৌহিদের ঝাণ্ডাবাহী ও আল্লাহ্‌র প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দারূপে জনগণের যথার্থ সেবক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা বর্তমানে মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।[৬৫]

তিনি মনে করেন, ভারতের মত দেশে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের উপর ফেলে রাখা ভুল হবে। মুসলমানদের নিজেদেরকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে এবং নিজেরাই ব্যবস্থা করতে হবে। তার বক্তব্য, কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাছে এমন আশা পোষণ করা যায় না যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সরকারের উপর নির্ভর করে বসে থাকা আমাদের অদূরদর্শিতা ব্যতিরেকে কিছুই হবে না। তাই ধর্মীয় শিক্ষাদানের এ দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই বহন করতে হবে। একটি স্বাধীন ও সচেতন জাতি হিসেবে আমাদেরকে ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখা কর্তব্য। ইসলাম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করাকে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছে।[৬৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের যিনি কর্তা তার উপর পরিবারস্থ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু আর্থিক অসচ্ছলতা ও অন্যান্য কারণে ভারতীয় অনেক পরিবারের পক্ষেই সেই কর্তব্য পালন সম্ভব হয় না। তাই তিনি মসজিদভিত্তিক মক্তব শিক্ষা চালু করতে উদ্যোগী হন। জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে আমরা অন্তত প্রত্যেক মসজিদকে প্রশিক্ষানাগার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আপনারা মসজিদের ইমামগণের পৃষ্ঠপোষকতা করুন, আর ইমাম সাহেবান আপনাদের শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দিবেন। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতি গঠনের বস্তুনিষ্ঠ সমাধান দিতে পারে।[৬৭]

শিশুশিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। বস্তুত এ শিক্ষকই শিশুর জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে দেন। শিশুর স্বভাব চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও মন-মানসিকতায় শিক্ষকের প্রভাব পড়ে এবং ঐ আদলেই শিশু গড়ে উঠে। হযরত শায়খুল ইসলাম এ দিকে মনোযোগ দেন। শিক্ষকদের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেন। ১৯৫৫ সালে জমইয়তে উলামার

---

৬৫. খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, কলিকাতা, ১৯৫৫।
৬৬. খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫১।
৬৭. খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, কলিকাতা, ১৯৫৫।

কলিকাতা অধিবেশনে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে তিনি বলেন, শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাঁদের মধ্যে এমন প্রেরণার উদ্রেক করা জরুরী যেন তাঁরা সর্বদা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ 'আল্লাহর রং; এই রং সকল রংয়ের চেয়ে উত্তম'[৬৮] মোতাবেক আমল করতে সচেষ্ট থাকেন এবং এই রংয়ে শিশুদেরকে গড়ে তোলা নিজেদের জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।[৬৯]

তিনি মসজিদের ইমাম সাহেবানের জন্যও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মসজিদ মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলিম বসতিতে একটি জামি মসজিদ কিংবা অন্তত পাঁচ বেলা নামায আদায়ের প্রয়োজনে পাঞ্জেগানা মসজিদ অবশ্যই বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবেই এ মসজিদগুলোতে একজন ইমাম থাকেন, যিনি মুসল্লীদের ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। শায়খুল ইসলামের মতে, ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ব্যাপক ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের কাজ সহজে সম্পাদন করা যেতে পারে। এক বক্তৃতায় তিনি ইমাম প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে বলেন, এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল, এমন একদল যোগ্য ইমাম তৈরী করা যারা দেশের বিভিন্ন শহর, নগর ও গ্রামে গিয়ে বিশেষতঃ পল্লীগাঁয়ের অনুন্নত অঞ্চলে গিয়ে শিশুদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবে এবং বয়স্কদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা ও পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হবে।[৭০]

তাঁর দৃষ্টিতে মুসলিম শিশুদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বৈষয়িক বিষয়ের শিক্ষাদানও জরুরী। ধর্মীয় শিক্ষার নামে জাগতিক অন্যান্য শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ও বিমুখ করে রাখা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী। তিনি বলেন, আমাদের উচিত আমাদের নিয়ন্ত্রিত প্রাইভেট ইসলামী মক্তব ও মাদ্রাসার জাল ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে তাদের বৈষয়িক শিক্ষা দেওয়াও জরুরী। ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য এটি

---

৬৮. মহান আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾

আল কুরআন (২ ঃ ১৩৮)

৬৯. খুতবায়ে সাদারত, কলিকাতা, ১৯৫৫।

৭০. ফরীদুল ওয়াহীদী, **শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী** (নয়াদিল্লী ঃ কাওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২), পৃ ৭৬৮।

প্রয়োজন। বৈষয়িক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে আমাদের সন্তানদের এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যেন বৈষয়িক উন্নতির প্রতিযোগিতায় তারা নিজ দেশীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কারো পেছনে না থাকতে হয়।[৭১]

মকতব শিক্ষাকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে 'দীনী তালীমী কনভেনশন' নামে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। তিনি এ বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করার জন্য ভারতের সকল মত ও পথের অনুসারী মুসলমানদের আহবান জানান। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বাইতে এ বোর্ড গঠিত হয়। এ মর্মে কলিকাতার ভাষণে তিনি বলেন, শিক্ষা বোর্ড গঠিত হওয়া যে কোন জাতির জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের একটি শুভ লক্ষণ। আপনাদের কতর্ব্য হবে, আপনারা যে যেই মত ও পথের সমর্থক হোন না কেন, বোর্ডকে সাহায্য করা এবং 'দীনী তালীমী কনভেনশন' নামে সকলের যে অভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেটিকে পারস্পরিক মতানৈক্য পরিহার করে দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।[৭২] প্রকাশ থাকে যে, তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে গোটা ভারতে মক্তব শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

দুই

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের ভাষা কিংবা অমুসলিমদের উদ্ভাবিত বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা করতে কোন দোষ নেই। বরং মানবতার কল্যাণ সাধনের সদিচ্ছা নিয়ে এ সকল জ্ঞান আহরণ সওয়াবের কাজ বলেও স্বীকৃত। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে ইয়াহূদীদের ভাষা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য বৈষয়িক জ্ঞান আহরণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা পাওয়া গিয়েছে। তবে অমুসলিমদের ভাষা আর অমুসলিমদের চিন্তাধারা ও সভ্যতা এক জিনিস নয়। উপরোক্ত ভিন্নতার কারণে এ সম্পর্কে ইসলামের বিধানও ভিন্ন ভিন্ন। উপমহাদেশের আলিমগণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চিন্তাধারা ও সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণের নিন্দা করেছেন।[৭৩] তবে তাদের ভাষা কিংবা

---

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫৮।

৭২. খুতবায়ে সাদারত, জমইয়তে 'উলামায়ে হিন্দ, কলিকাতা, ১৯৫৫।

৭৩. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, ইসলামী তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন (দেওবন্দ : দারুল কিতাব, ১৯৮৯), পৃ ৫২-৬০।

তাদের উদ্ভাবিত বৈষয়িক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করতে নিষেধ করেননি। এ ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বসূরিদেরই অনুরূপ ছিল। তিনি এশিয়ার মানবতাবাদী সভ্যতার সমর্থন করে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় জড়বাদী সভ্যতা অপছন্দ করেছেন। তবে ইউরোপের ভাষা কিংবা তাদের উদ্ভাবিত বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে কখনো আপত্তি করেননি।[৭৪] তাঁর মতে, ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা 'ফর্যে কিফায়া' আর বৈষয়িক জ্ঞান শিক্ষা করা জায়িয।

ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত স্কুল কলেজের শিক্ষা ইংরেজ আমল থেকে শুরু হয়। কোন জাতি উন্নত চিন্তাধারা, মানসিকতা ও চরিত্রে উপনীত হওয়ার জন্য ঐ জাতির শিক্ষা কারিকুলাম উন্নতমানের হওয়া আবশ্যক। উপমহাদেশের শিক্ষা কারিকুলাম ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক রচিত ও প্রবর্তিত হওয়ায় সর্বত্র ঐ মান রক্ষিত হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বেশী।

উপমহাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার ইংরেজদের ঐ কারিকুলাম বহাল রেখেছিল বলে হযরত শায়খুল ইসলাম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তক সংস্কারপূর্বক জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেন। ১৯৫১ সালে জমইয়তে উলামার হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে তিনি বলেন, জাতির ইতিহাস ও শিক্ষা কারিকুলামের প্রতি সরকার ও জনগণের সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। এটি পরিকল্পিত জাতীয় জীবন গড়ে তোলার পূর্বশর্ত ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিক্ষা কারিকুলামের দ্বারা দেশ যেমন উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি এরই কারণে গোটা দেশ অবনতি, বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিকে চলে যেতে পারে। স্কুলগুলোর বর্তমান কারিকুলামের দিকে তাকালে দুঃখ হয়। কেননা এখন পর্যন্ত দেশের সুন্দর ভবিষ্যত রচনার উপযোগী কোন বীজ বপন করা হয়নি। শিক্ষাদানের জন্য যে সকল বই শিক্ষা কোর্সের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই মানগতভাবে পরাধীন যুগের পুস্তকমান অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের। অনুরূপে আমাদের জাতীয় ইতিহাস এখন পর্যন্ত সেটিই রয়ে গিয়েছে, যেটি স্যার হেনরী এ্যালিট, মি.কিমসন ও অন্যান্য ইংরেজের মস্তিষ্ক নির্গত। এই ইতিহাসে প্রকৃত ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে এমন ঘটনাবলী আনা হয়েছে, যেগুলো তাদের শাসন পরিচালনার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের সহায়ক বিবেচিত হয়েছিল। এটিকে ইতিহাস বলা জাতির প্রকৃত ইতিহাসকে বিদ্রূপ করার নামান্তর। তাই ইতিহাস গ্রন্থে আলোচিত ঘটনাবলী পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক পুনরায় বিন্যস্ত করা

৭৪. মাদানী, নকশে হায়াত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭।

এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকে সত্যতা ও বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাবধানতার সাথে পুনরায় রচনা করা আবশ্যক।[৭৫]

জমইয়তে উলামার লখনৌ অধিবেশনে বক্তৃতা কালেও তিনি প্রচলিত ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা করেন। বিকৃত ইতিহাস জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। জাতি স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। তিনি ইতিহাসের সংস্কার সাধন করার জোর দাবী উত্থাপন করে বলেন, সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি হল সেই মন্ত্র, যেটিকে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে, যেটি বর্তমানে স্কুল কলেজের কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করে যুবকদের গিলানো হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাস নয়। এটি 'ডিভাইড এন্ড রুল নীতি'-কে সফল করার লক্ষ্যে বৃটিশের মস্তিষ্ক প্রসূত ষড়যন্ত্র মাত্র। ইতিহাসের সঠিক উপাত্ত থেকে এটি রচিত নয় বরং রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য তৈরী। বর্তমানে আমরা এক নতুন ভারত নির্মাণ করতে যাচ্ছি। আমরা মানসিক স্বচ্ছতা, নৈতিক দৃঢ়তা ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে জাতিকে গড়ে তুলতে আগ্রহী। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য বিকৃত ইতিহাসের সংশোধন করে জাতির কাছে পেশ করা একান্ত কর্তব্য।[৭৬]

ভারত উপমহাদেশে উর্দু ভাষার প্রচলন বহু পূর্ব থেকে চলে আসে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের চেষ্টার ফলে উর্দু ভাষা অন্যতম সাহিত্যমান লাভে সক্ষম হয়। ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন হল উর্দু। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর উর্দুর সাথে শুরু হয় বিমাতাসুলভ আচরণ। উর্দুর স্থলে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা চালু করা হয়। ফলে মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায় এবং মন-মানসিকতার দিক থেকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত হয়। শায়খুল ইসলাম ভারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দুকে জীবন্ত রাখার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জমইয়তে উলামার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে উর্দুকে প্রাদেশিক সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবী জানান। কলিকাতা অধিবেশনের ভাষণে তিনি বলেন, উর্দু ভাষা কোন বিশেষ দল কিংবা সম্প্রদায়ের ভাষা নয়। এটি লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টানের মুখের ভাষা। 'আঞ্জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দু' সংগঠনের পরিচালিত স্বাক্ষরাভিযানের কপি থেকে এ দাবীর সত্যতা সুস্পষ্ট। জমইয়তে উলামা ঐ সংগঠনের দাবীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ভারত সরকারের কাছে

৭৫. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭১৪।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯৫।

দাবী জানায় যে, অবিলম্বে উর্দুকে প্রাদেশিক সরকারী ভাষার মর্যাদা দান করে ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে।[৭৭]

বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, কেবল সরকারের কাছে দাবী জানানোর দ্বারাই ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার কাজ শেষ হয় না। ভাষাভাষী লোকদেরকে উদ্যোগী হয়ে মাতৃভাষার উন্নতি সাধন ও ব্যাপক বিকাশের ব্যবস্থা করা জরুরী। তাই হায়দ্রাবাদের ভাষণে তিনি আরো বলেন, শুধু সমালোচনা করে কিংবা দুঃখ প্রকাশ করে ভাষাকে জীবন্ত রাখা সম্ভব নয়। এর জন্য আমাদের নিজেদের সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। যে কোন ভাষার মৌলভিত্তি হল ঐ ভাষার পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, পাঠাগার, লাইব্রেরী, সাহিত্যচর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনামূলক প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম। আমরা বাস্তবিকভাবে আমাদের মাতৃভাষা উর্দুর (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার) অস্তিত্বের প্রতি সদয় হলে এ সকল কাজে আমাদের অগ্রণী হওয়া প্রথম কর্তব্য।[৭৮]

১৯৫৭ সালের ২৭-২৮-২৯ অক্টোবর হযরত শায়খুল ইসলাম জীবনের সর্বশেষ সভাপতির ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি প্রাইমারী শিক্ষা কোর্সে মুসলমানসহ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ও পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রাখার সুপারিশ করেন।[৭৯] ভাষণে তিনি বলেন, ইতিহাস, ভূগোল ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কীয় যেসব লেখা প্রাইমারী শিক্ষাকোর্সে অন্তর্ভুক্ত আছে, সেগুলোকে সঠিক সেক্যুলারিজমের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিন্যস্ত করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের (হিন্দুদের) ধর্মগুরু, ঐতিহাসিক স্থান ও সভ্যতার আলোচনা স্থান পেলেও মুসলমান, ফার্সী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু কিংবা পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা স্থান পায়নি। এই সংকীর্ণতা ও একদিকদর্শিতা ভারতে পুনরায় সম্প্রদায়িকতার উদ্রেক ঘটাতে পারে। শিক্ষা কোর্সের এ ক্রটি দূর করা জরুরী। এদিকে সরকার, শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্তব্য।[৮০]

---

৭৭. **খুতবায়ে সাদারত**, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, কলিকাতা, ১৯৫৫।
৭৮. **খুতবায়ে সাদারত**, জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫১।
৭৯. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬৪।
৮০. **খুতবায়ে সাদারত**, জমইয়তে ' উলামায়ে হিন্দ, সুরাট, ১৯৫৬।

৫ম অধ্যায়
আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব

এক

হযরত শায়খুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যারা লিখেছেন কিংবা গবেষণা করেছেন, তাদের অনেকে তাঁকে একজন উচ্চমানের আলিম ও মুহাদ্দিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ তাকে রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ নেতা হিসেবে আবার কেউ শায়খে তরীকত তথা আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তাঁর প্রধান বৈশিষ্ঠ্য ছিল আধ্যাত্মিকতা।[১] এটিই তাঁর মূল পরিচয়। তবে তিনি স্বভাবগতভাবে ছিলেন অতিশয় প্রচারবিমুখ। হযরত কাসিম নানূতবীর ন্যায় তিনি নিজের রূহানী কামালাত সর্বদা লুকিয়ে রাখতে ভালবাসতেন।[২]

রূহানিয়্যাত চর্চায় তাঁর প্রথম ও প্রধান উৎস নিজ পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেননা তিনি বংশগত ও শিক্ষাগতভাবে আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। টাণ্ডায় অবস্থিত তাঁর পূর্বপুরুষের সকলেই ছিলেন খান্দানী পীর। অবশ্য তাঁরা বর্তমান প্রচলিত বংশানুক্রমিক পীরদের মত 'গদীসর্বস্ব' ছিলেন না। এ বংশের উর্ধ্বতন মৌরিস হযরত শাহ্ নূরুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রূহানী কামালাত তৎকালীন বড় বড় মনীষীরও প্রশংসা কুড়িয়েছিল।[৩] দেওবন্দ আগমনের পর তিনি যে সকল শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করেন, তাঁরাও সমকালীন শ্রেষ্ঠ

---

১. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, "শায়খুল আরব ওয়াল আযম কে রূহানী কামালাত" আল জমইয়ত পত্রিকা (দিল্লী : জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা), পৃ ৪৪।

২. আবদুর রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান (লাহোর : মাকতাবায়ে রশীদিয়্যা, তা. বি.), পৃ ৪৮৫-৪৮৬।

৩. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৮৭), পৃ ১৮-১৯।

মাশায়িখ ছিলেন। পরিবারের মুরুব্বীগণের প্রভাব ও শিক্ষকমণ্ডলীর সান্নিধ্য তাঁকে আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে অবগাহনের পথ করে দিয়েছিল।[৪]

খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকে উচ্চমানসমৃদ্ধ দু'জন বুযর্গের রূহানী ফয়য ভারত উপমহাদেশের দূর দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করে। উপমহাদেশে ঐ শতকে পরিচালিত শিক্ষা ও ধর্মীয় আন্দোলনগুলোর অধিকাংশই ছিল এ বুযর্গদ্বয়ের সূত্রে সৃষ্ট। তাঁদের একজন হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আর অপরজন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারূকী মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সৌভাগ্যক্রমে শায়খুল ইসলাম উভয় বুযর্গের নিস্‌বত থেকে ফয়য ও বরকত লাভ করেন।[৫] তাঁর পিতা সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ ছিলেন হযরত গাঞ্জে মুরাদাবাদীর বিশিষ্ট খলীফা। হিজরী ১৩২৭ সালে তিনি নিজ পিতা থেকে ইযাযত ও খেলাফত লাভ করলে পিতার মাধ্যমে হযরত গাঞ্জে মুরাদাবাদীর সাথে তার রূহানী সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

অন্যদিকে তিনি হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারূকী মুহাজিরে মক্কীর রূহানী ফয়য অর্জনের জন্য হাজী সাহেবেরই বিশিষ্ট খলীফা কুতবুল ইর্‌শাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে মুরীদ হন। শায়খুল ইসলাম তখন হিজাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে যাচ্ছিলেন বলে গাঙ্গূহের খানকায় অবস্থান করার সুযোগ হয়নি। তাই মক্কা মুকাররমায় পৌছে হযরত হাজী সাহেবের সান্নিধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন।[৬] সময়ের দিক থেকে এ অবস্থানকাল অতি অল্প হলেও তাতে বরকত পাওয়া গিয়েছিল অনেক বেশী। হাজী সাহেব তখন শায়খুল ইসলামকে যিক্‌রের তালীম দেন। এ যিক্‌রের অনুশীলন এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আলোচনা করে তিনি বলেন, যিক্‌রের ফলে আমার সমস্ত শরীরে প্রবল কম্পন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি অন্যরা জেনে ফেলতে পারে এ আশংকায় আমি মসজিদে নববী থেকে সরে গিয়ে দূরে মসজিদুল ইজাবা কিংবা আরো দূরে কোন ঘন খেজুর বাগানে ঢুকে নির্জনে যিক্‌র করি। এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ে আমার যে সকল সুস্বপ্ন ও রূহানী 'হাল'-এর উদ্রেক হয়েছিল,

---

৪. খালীক আহমদ নিযামী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী হায়াত ওয়া কারনামে (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.) পৃ ৭১-৭৩।

৫. খালীক আহমদ নিযামী, প্রাগুক্ত।

৬. সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, নক্‌শে হায়াত (করাচী : দারুল ইশাআত তা. বি.) ১ম খণ্ড, পৃ ৯৫।

সেগুলো আমি চিঠিপত্রের মাধ্যমে হযরত গাঙ্গূহীকে অবগত করাই। হযরত হাজী সাহেব তখন ইন্তিকাল করে গিয়েছিলেন। হযরত গাঙ্গূহী প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও পথনির্দেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন।[৭] ঐ সময় একবার স্বপ্নে দেখি যে, বিশিষ্ট ওলীগণের ১১ জন তাশরীফ আনেন। তাঁরা আমাকে বললেন, আমরা তোমাকে ইজাযত প্রদান করলাম। একবার স্বপ্নে দেখি যে, হযরত খাজা ইবরাহীম ইবন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। আমি তাঁর সেবার জন্য সামনে দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে একটি খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করে বললেন, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ তোমাকে তরীকতের অন্যান্য মাশায়িখের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।[৮]

মদীনা শরীফ অবস্থানকালে শায়খুল ইসলাম এক বছর পর্যন্ত 'পাছ আনফাছ' যিক্‌রের অনুশীলন করেন। সাথে সাথে নিজের রূহানী হাল, উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে হযরত গাঙ্গূহীকে অবহিত রাখেন। হিজরী ১৩১৮ সালে এক চিঠিতে হযরত গাঙ্গূহী তাঁকে গাঙ্গূহের খানকায় উপস্থিতির নির্দেশ দেন। মদীনা থেকে গাঙ্গূহ পর্যন্ত পৌঁছতে ৫ মাস সময় অতিবাহিত হয়। পথিমধ্যের সময়গুলোতে যিক্‌র ও ফিক্‌রের প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আরো বেড়ে যায়। ফলে রূহানিয়্যাতের বিভিন্ন মাকাম অতিক্রম ও সুস্বপ্ন দর্শনের সিলসিলা বৃদ্ধি পায়।[৯] একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি হযরত হাজী সাহেবের দরবারে বেশ কিছু খেজুর হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছেন। তারপর নিজেই দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। হাজী সাহেব তাঁকে বললেন, তুমি নিজে এসে এগুলো বণ্টন করে দাও। শায়খুল ইসলাম বললেন, হযরত! এগুলো তো আমি আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছি। আমার কাছে খেজুরের দোকানই আছে। হাজী সাহেব বললেন, না, তা হয় না। আমার জানা আছে যে, কত কষ্টের পরে খেজুরগুলো অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এটি ছিল একটি স্বপ্ন মাত্র। গাঙ্গূহের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে তিনি এ স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্নের ঘটনা হযরত গাঙ্গূহীকে শোনানোর পর হযরত গাঙ্গূহী বললেন, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবার থেকে তোমাকে 'ইজাযত' প্রদান করা হয়েছে।[১০]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।
৮. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৭।
৯. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭-৭০।
১০. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৮।

১৯০১/১৩১৯ সালের রবীউল আওওয়ালে তিনি গাঙ্গূহে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা সিদ্দীক আহমদও ছিলেন। হযরত গাঙ্গূহী ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজের কাছে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাঁদেরকে 'যাতে ইলাহ'-এর মুরাকাবার তালীম দেন। এই আগমনের মাত্র আড়াই মাস পরেই উভয় ভ্রাতাকে হযরত গাঙ্গূহী 'খেলাফত' প্রদানে ভূষিত করেন।[১১] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী বলেন, হযরত গাঙ্গূহীর খানকায় যদিও আড়াই মাসের বেশী অবস্থানের সুযোগ হয়নি তবুও এ আড়াই মাস অবস্থানের প্রকৃতি ছিল হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সাহরোওয়ার্দীর দরবারে শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়্যা মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর অবস্থানের ন্যায়। অর্থাৎ অবস্থানকাল অল্প কয়েক দিনের কিন্তু অর্জন অনেক কিছুর। লোকেরা তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলে শায়খ সাহরোওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর দিয়েছিলেন যে, মৌলবী বাহাউদ্দীন একটি শুষ্ক ঠনঠনে কাষ্ঠের ন্যায় পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে এখানে এসেছে। ফলে এক ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাতে মারিফাতের আগুন ধরে গিয়েছে।[১২]

হযরত গাঙ্গূহী তাঁকে মাশায়িখের প্রসিদ্ধ সিলসিলা চতুষ্টয় অর্থাৎ চিশতিয়্যা, কাদিরিয়্যা, নকশবন্দিয়্যা ও সাহরোওয়ার্দীয়্যা তরীকার খেলাফত দেন এবং এ সিলসিলা চতুষ্টয়ের উপর মুরীদ করানোর নির্দেশ দেন। তিনি কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, সকল সিলসিলার বুযর্গগণই সমান শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। মানুষকে বিশেষ কোন সিলসিলায় মুরীদ করানো হলে অনেক সময় ভিন্ন সিলসিলার বুযর্গগণের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব বজায় রাখা কঠিন হয়। অথচ এটি রূহানী অগ্রগতির জন্য ক্ষতিকর বিষয়। অনেক সময় সাধারণ লোকেরা তাতে বাড়াবাড়িও করে ফেলে। তাই ৪ তরীকার উপর মুরীদ করানো হলে এ আশংকা থাকে না।[১৩]

আধ্যাত্মিকতা ও তাসাওউফ বস্তুত কতগুলো প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের নাম। এগুলো মানব জীবনের প্রধান মকসূদ নয়, মকসূদ অর্জনের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ মাত্র। ইল্‌মে তাসাওউফ মতে, এ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের প্রধান লক্ষবস্তু হল তিনটি। এক. ইবাদত, ইত্তিবায়ে সুন্নত ও তাক্‌ওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন। দুই. আখলাকের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন। তিন. রূহানিয়্যাত অর্জন।[১৪] ইবাদত,

১১. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

১২. ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

১৩. খালীক আহমদ নিযামী, ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

১৪. মুহাম্মদ মনযূর নুমানী, তাসাওউফ কাহাকে বলে (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ ১৪-২৬।

ইত্তিবায়ে সুন্নত ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনের অর্থ হল, ব্যক্তি নিজের আকীদা ও আমলে সার্বিক বিশুদ্ধতা অর্জনসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর হুকুম পালন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত-এর অনুসরণ করাকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করা। কাজেই যে সব মানুষের জীবনে আকীদা ও আমলের ত্রুটি আছে কিংবা যারা ঐ সব ত্রুটি সংশোধনে উদাসীন তাদেরকে তাসাওউফের পরিভাষা মতে 'সূফী' তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ আখ্লাকের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জনের অর্থ হল প্রিয়নবী ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনাদর্শ অনুসারে ব্যক্তি নিজ জীবন থেকে নৈতিক অসৎ দোষত্রুটির বর্জন ও সৎ গুণাবলীর অর্জন দ্বারা নিজেকে পরিপূর্ণ মানবে পরিণত করা। ইমাম গাযালী ও হযরত থানবীসহ বহু পণ্ডিত এ কারণে ইল্মুত তাসাওউফকে 'ইলমুল আখ্লাক' নামে অভিহিত করেছেন। তৃতীয়তঃ রূহানিয়্যাত অর্জন করার অর্থ হল, ব্যক্তি নিজের আত্মশক্তিকে পরিশুদ্ধ ও পূর্ণ বিকশিত করে মহান 'ইলাহ' সত্তার গভীর মারিফাত ও উপলব্ধি অর্জন করা। এ তিনটিই হল তাসাওউফ চর্চার সারকথা। তাই কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সফলতা বিচারের প্রধান মানদণ্ড হল এ তিনটি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা উপরোক্ত ত্রিবিধ মানদণ্ডের নিরিখে হযরত শায়খুল ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনার প্রয়াস পাব।

দুই

শরীঅতের দৃষ্টিতে 'কামিল' ব্যক্তির পরিচয় হল, যিনি মহান আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে তাঁরই ইবাদত করেন, তাঁর রাসূলের সুন্নত যথার্থ অনুসরণ করেন এবং নিজেকে পূর্ণ তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।'[১৫]

---

১৫. আল কুরআন ২ ঃ ২১।

সূরা যারিয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ﴾

আমি জিন্ন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমারই ইবাদত করে।[১৬]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য আমার ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য। তোমরা এ সুন্নাতকে মাড়ির দাঁতের দ্বারা কামড় দিয়ে ধরার ন্যায় শক্তভাবে ধরে রাখ। সাবধান! বিদ্‌আত থেকে বেঁচে থাক। সকল বিদআতের পরিণাম বিভ্রান্তি।[১৭] অন্যত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের নিকট আমি দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতদিন এ জিনিসদ্বয়কে শক্তভাবে ধরে রাখবে, ততদিন পর্যন্ত বিভ্রান্ত হবে না। জিনিসদ্বয়ের একটি আল্লাহ্‌র কিতাব আর অপরটি তাঁর নবীর সুন্নত।[১৮]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। একটি আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার।[১৯] মদীনায় হিজরতের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম জুমুআর প্রথম খুত্‌বায় বলেন, আমি তোমাদেরকে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা উপদেশ প্রদানের জন্য তাক্‌ওয়ার চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নেই। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত

---

১৬. আল কুরআন ৫১ ঃ ৫৬।

১৭. মূল হাদীস ঃ

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ الخ))

১৮. মূল হাদীস ঃ

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ))

১৯. আল কুরআন ৪৯ ঃ ১৩।

নিদের্শগুলোর কারণে সূফীগণ ইবাদত, ইত্তিবায়ে সুন্নত ও তাক্ওয়াকে 'কামিল' ব্যক্তির প্রধান পরিচয় হিসেবে গণ্য করেছেন।[২০]

হযরত শায়খুল ইসলামের জীবনে এ গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি শুধু ফরয কিংবা ওয়াজিবই নয়, এক একটি সুন্নত ও মুস্তাহাবও পরিত্যাগ করতেন না। নামাযের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন মনে হত যেন আয়াতগুলো এখনই নাযিল হচ্ছে। সফরের কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে বাড়ী পৌঁছে হয়ত তক্ষণই আবার বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, এমন ভীষণ ব্যস্ততা ও ক্লান্তির মধ্যেও তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন মনে হত তাঁর শরীরে কোনই ক্লান্তি নেই, কোনই ব্যস্ততা নেই। পরম তৃপ্তি ও আনন্দের আস্বাদন নিয়ে নামায আদায় করে চলছেন।[২১] মহানবীর প্রতি ভালবাসা ও সুন্নত পালনে তিনি ছিলেন পরম অনুরাগী। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্নতের সাজে সজ্জিত করার প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ব্যক্তি বিবেচিত হওয়ার জন্য মানদণ্ড ছিল এই সুন্নত। তাঁর দরবারে মুরীদ ও ভক্তদের যে যত বেশী সুন্নত মোতাবেক চলতেন, তিনি-ই তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয়পাত্র বিবেচিত হতেন। সামাজিক রুসম-রেওয়াজ কিংবা বিদ্আত তো নয়ই কোন জায়িয কর্ম বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য হযরত শায়খুল ইসলামের শর্ত ছিল, ঐ কাজটি সম্পূর্ণ সুন্নতের আদলে সজ্জিত থাকা। তিনি বিবাহ্-শাদীর অনুষ্ঠানে যেতেন কিন্তু সেখানে তাঁর অংশ গ্রহণের জন্য শর্ত ছিল যে, অনুষ্ঠানটি অপব্যয়মুক্ত, অনাড়ম্বর ও সম্পূর্ণ সুন্নত তরীকায় সজ্জিত হতে হবে। অনেকে তাঁকে বিবাহ পড়ানোর অনুরোধ করতেন। সেখানে শর্ত ছিল মহর 'ফাতেমী মহর' সাব্যস্ত হতে হবে। এভাবে জীবনের সকল কাজকর্ম তিনি সুন্নত মোতাবেক সম্পাদন করতেন।[২২] এ প্রসঙ্গে মুফতী মাহ্দী হাসান বলেন, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাঁর প্রেরণা ছিল এমন যে, কঠিন রোগাক্রান্ত থাকার সময়েও তিনি প্রত্যূষে ফজর নামাযে 'তিওয়ালে মুফাস্সাল'-এর সুদীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করতেন।

তিনি সুন্নতকে গভীর ভালবাসতেন। তাই যে সকল কাজের সাথে মহানবীর সামান্যতম সম্পর্কও ছিল সে কাজগুলোকেও নিজ আমলের অন্তর্ভুক্ত রাখতে চেষ্টা করতেন। জগৎ বিস্মৃত হবে যে, তিনি দারুল উলূমের ফুল বাগানে

---

২০. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ **ইত্তিবায়ে শরীঅত কী রওশনী মেঁ** (সাহারানপুর ঃ কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, হি. ১৩৯৯), পৃ ২৪-২৬।

২১. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯০।

'বাবলা' বৃক্ষ রোপণ করেন। লোকেরা মনে করল, এই বৃক্ষ রোপণে তাঁর কী উদ্দেশ্য? এতে ফুল হয় না, ফল হয় না, এর দ্বারা যে বাগানের সৌন্দর্য বাড়ে, তাও নয়। তবুও কেন তিনি এত চেষ্টা করে বৃক্ষটি লালন করে যাচ্ছেন। পরে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, যেহেতু বায়আতে রিদওয়ানের সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বৃক্ষটির নিচে বসে সাহাবীগণ থেকে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, সেই বৃক্ষটি ছিল বাবলা বৃক্ষ। তাই ঐ বৃক্ষের স্মৃতি দর্শনের জন্য তিনি দারুল উলূমের ফুল বাগানে এটি রোপণ ও লালন করেছিলেন।[২৩]

প্রতিটি কাজে তাক্ওয়া, পরহেযগারী ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রতি ছিল তাঁর গভীর দৃষ্টি। তিনি বিভিন্ন স্থানের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সভা সম্মেলনে যোগ দিতেন। অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমন্ত্রিত করে গাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের টাকা দিয়ে পাঠাত। কিন্তু তিনি কখনো প্রথম শ্রেণীতে চড়ে আসতেন না। সাধারণ লোকজনের সাথে তৃতীয় শ্রেণীতে সফর করতেন। সম্মেলনে পৌঁছে প্রথমেই পথখরচের যাবতীয় হিসাব একটি কাগজে লিখে অবশিষ্ট টাকাসহ ফেরত দিতেন। অনেক সময় সম্মেলন কর্তৃপক্ষ তাঁকে খরচের অতিরিক্ত পয়সা নিজের কাছে রেখে দিতে পীড়াপীড়ি করত। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি বলতেন, জনগণ আপনাদেরকে এ চাঁদার টাকা প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য প্রদান করেছে। কাজেই আপনাদের বল্গাহীনভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করার অধিকার নেই।[২৪] একবার তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক টাকা ঋণী হয়ে গিয়েছিলেন। ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন বন্ধুদের কয়েকজনের চেষ্টায় হায়দ্রাবাদ নিযাম সরকারের দপ্তর থেকে মোটা অংকের টাকায় চাকুরী গ্রহণের প্রস্তাব আসে। তিনি প্রথমে বৃত্তান্ত জানলেন। তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের কথা উল্লেখ করে উত্তর দেন যে, অপমানের সাথে মোটা অংকের টাকায় চাকুরী গ্রহণে আমি সম্মত নই।[২৫]

---

২৩. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২-৩৩; বাবলা বৃক্ষ সম্পর্কীয় আয়াতটি হল :

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল কুরআন ৪৮ : ১৮।

২৪. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, **ওয়াকিআত ওয়া কারামাত** (মুরাদাবাদঃ মাকতাবায়ে নেদায়ে শাহী, ১৯৯৫), পৃ ২৬।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭;

হযরত শায়খুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শুধু একজন পীরই ছিলেন না, দারুল উলূম দেওবন্দের মত সুবিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদ্‌রুল মুদাররিসীন এবং জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের মত বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও ছিলেন। ফলে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কাজের ব্যস্ততা থাকত প্রচুর। এ ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের ইবাদত-বন্দেগীর কোথাও কোন বিচ্যুতি ঘটত না। ইবাদত-বন্দেগী ও অধ্যাপনাসহ সকল কাজ শৃংখলার সাথে সম্পাদন করতেন।

তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর একটি তালিকা দিয়ে মাওলানা আবদুর রশীদ আরশাদ বলেন, তিনি প্রত্যহ রাত ৩ টার সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন এবং ফজ্‌রের নামায পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও ওয়াযীফা আদায় করতেন। বাদ ফজ্‌র এক ঘন্টা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর কিতাব মুতালাআ করতেন, তারপর উপস্থিত মেহ্‌মানদের নিয়ে নাশ্‌তা করে অধ্যাপনার জন্য দারুল হাদীসে চলে যেতেন। দুপুর ১২টা পর্যন্ত হাদীসের অধ্যাপনা ও দারুল উলূমের বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। ১২ টার পর বাসায় ফিরে মেহ্‌মানদের নিয়ে আহার করতেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। তারপর যুহ্‌রের নামাযের পর শুরু হত আরেক ব্যস্ততা। আগন্তুকদের সাথে কথা বলা, তাদের কাউকে সুলূকের তালীম প্রদান, কারো জাগতিক কোন সমস্যা নিরসনের জন্য উর্ধ্বতন মহলের কাছে সুপারিশ করে দেওয়া, কারো বিভিন্ন প্রশ্ন কিংবা ফত্‌ওয়ার জবাব প্রদান ইত্যাদি কাজে আস্‌রের সময় হয়ে যেত। আস্‌রের পর চলে যেতেন দারুল হাদীসে। সেখানে মাগরিব পর্যন্ত ছাত্রদের পাঠদান করতেন। মাগরিব নামাযের পর ১ ঘন্টা বরাদ্দ ছিল নফল নামাযের জন্য। তিনি ঐ নামাযে দৈনিক সোয়া ১ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নামায শেষ করে মেহ্‌মানদের নিয়ে খানা খেতে বসতেন। এ সময় ইশার আযান হয়ে যেত। বাদ ইশা পুনরায় দারুল হাদীস চলে যেতেন এবং এক নাগাড়ে ৩ ঘন্টা বুখারী শরীফের পাঠদান করতেন। সবক শেষ করে প্রথমেই আসতেন মেহ্‌মানখানায়। সেখানে তাদের বিশ্রাম ও আরামের খোঁজখবর নিয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মেহমানদের কেউ অসুস্থ কিংবা ক্লান্ত থাকলে তিনি চুপে চুপে নিজেই তাঁর কাছে গিয়ে হাত-পা টিপে দিতেন। এভাবে পূর্ব রাতের ৩ টা থেকে পরবর্তী রাতের ১২ টা পর্যন্ত তাঁকে কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হত। এ সকল কাজ শেষ করার পর নিজে শুইতে যেতেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :
﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ﴾
(৬৫ : ৩)

পারিবারিক গ্রন্থাগার

তবে যুহ্‌র থেকে আসর পর্যন্ত সময়টিই ছিল অধিকতর ব্যস্ততার সময়। এ সময় তাঁর কাছে বিভিন্ন শ্রেণীর মেহ্‌মান ও আগন্তুকদের ভিড় লেগে থাকত। তাছাড়া এ সময়ে তিনি চিঠিপত্রের জবাব লিখতেন। চিঠিও আসত অনেক। কখনো কখনো চিঠির সংখ্যা ৪০/৫০-এ পৌঁছে যেত। দৈনন্দিন জীবনের এ দীর্ঘ কর্মসূচী যা কোন যুবকের পক্ষেও সম্পাদন করা ছিল সুকঠিন, শায়খুল ইসলাম সেটি পীড়িত ও বার্ধক্যক্রান্ত সময়েও বছরের পর বছর একই গতিতে চালিয়ে গিয়েছেন। বস্তুত এটি তাঁর স্পষ্ট কারামত বৈ কিছু ছিল না।[২৬]

তাঁর পবিত্র রমযান মাস অতিবাহিত হত বাংলাদেশের সিলেটে কিংবা আসামের করিমগঞ্জে। তখন হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব না থাকায় ইবাদতের মধ্যে সময় বেশী দিতেন। রমযানে তাঁর দৈনিকের কর্মসূচীও ভিন্ন রকমের ছিল। মাওলানা আসীর আদরবী রমযান শরীফে তাঁর দৈনিক কর্মসূচীর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ

প্রত্যহ যুহ্‌রের নামায তিনি আস্তানা শরীফ থেকে দুই ফার্লং দূরে অবস্থিত মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করতেন। তাঁর জায়নামাযের পাশে শিশি বোতলে পানি রক্ষিত থাকত। নামায শেষ করে তিনি সেগুলোতে দম করে দিতেন। যারা ব্যক্তিগত কোন কাজে পরামর্শের জন্য আসত নামাযের পর তাদের সাথে আলাপ করতেন। এরপর যারা মুরীদ হতে ইচ্ছুক তাদের মুরীদ করতেন। তারপর নতুন মুরীদদের লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ নসীহত করে আস্তানা শরীফে ফিরে আসতেন। পরিচিতদের কেউ পীড়িত বা অসুস্থ থাকলে তার শুশ্রূষায় যেতেন। নতুবা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে হাফিযদের নিয়ে পবিত্র কুরআনের 'দাওর'-এ শরীক হতেন। তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ পড়তেন হাফিযগণ তা শুনতেন আবার হাফিযগণ মুখস্থ পড়তেন তিনি তা শুনতেন। এভাবেই ইফ্‌তারের সময় হয়ে যেত। তিনি সামান্য ইফ্‌তারী গ্রহণের পরই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। মাগরিবের ফরয ও পরবর্তী দু'রাকআত সুন্নত পড়ে দু'রাকাআত দীর্ঘ নফল আদায় করতেন। এ দু'রাকাআতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় অতিবাহিত হত। এরপর আস্তানা শরীফে ফিরে এসে সাথীদের নিয়ে আহার করতেন। আহারের পরেও মজলিস অব্যাহত থাকত। লোকেরা কথাবার্তা বলত। তিনি কখনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আবার কখনো নীরবে তাদের কথাবার্তা শুনতেন কিংবা হুজরায় গিয়ে সামান্য বিশ্রাম নিতেন। ততক্ষণে ইশার আযান হয়ে যেত। তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে এসে নিজেই ইশা ও তারাবীহের নামায পড়াতেন। প্রায় দুই থেকে

২৬.আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯২।

আড়াই ঘন্টায় তারাবীহ্ শেষ হত। এরপর এক ঘন্টা চলত ওয়ায ও নসীহত। অতঃপর আস্তানায় গিয়ে চা ও হালকা নাশ্তা করতেন। চায়ের মাহফিলে সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কেও কথাবার্তা হত। আধা ঘন্টা কিংবা পৌনে এক ঘন্টা পর শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। অল্প কিছুক্ষণ পরই আবার নীরবে উঠে অযু ইস্তিঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। ভক্ত ও মুরীদদের যারা তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তারাও কোন প্রকার ডাকাডাকি ব্যতিরেকে নিজ নিজ উদ্যোগে গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁর পেছনে তাহাজ্জুদের ইক্তিদা করে দাঁড়িয়ে যেতেন। এ নামায চলত সুব্হে সাদিকের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। নামায শেষে সাহ্রী খেতেন। ততক্ষণে ফজ্রের আযান হয়ে গেলে মসজিদে চলে আসতেন। ফজ্রের পর বিদায় প্রার্থী মেহ্মানদের শেষ মুসাফাহা ও দুআ করে ফিরতেন আস্তানায়। তখন একনাগাড়ে ২ঘন্টা নিদ্রা যাপনের পর আবার শুরু হত পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত। এ তিলাওয়াত থেমে থেমে যুহ্র নামায পর্যন্ত অব্যাহত থাকত।[২৭]

সিলেট ও আসামে হযরত শায়খুল ইসলামের এই কর্মসূচী ছিল দৈনন্দিনের মামূল। তখন তাঁর বয়স ৭০-এর কোটাও অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং বার্ধক্যজনিত কারণে এতটুকু দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, পথ চলার সময় পা পূর্ণ উত্তোলনে সক্ষম ছিলেন না। তাহাজ্জুদ নামাযের পর রমযানের গভীর রাতে তিনি যখন দুআর জন্য হাত তুলতেন তখন এক অভাবনীয় দৃশ্যের উদ্রেক হত। নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে পরম বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র মহান দরবারে তাঁর করুণ কণ্ঠের রোনাজারী আকাশ-বাতাসকে ভারি করে দিত। আবছা আলোর ভিতর উপস্থিত লোকেরা যেন ঐ করুণ কান্নার মধ্যে নিজের মৃত্যু, কবর, হাশর ও আখিরাতের সকল মনযিল দিব্যি চোখে দেখতে পেত। তাই তাদের হৃদয় বিগলিত কান্না, অবিরাম অশ্রুবর্ষণ ও আমীন আমীন ধ্বনি এক বিস্ময়কর পরিবেশের সৃষ্টি

---

২৭. মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৮-১৯৯। রমযান মাসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে মহানবীর আমলের বর্ণনা দিয়ে হযরত ইমাম বুখারী বলেন ঃ

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ))

সহীহুল বুখারী, বাবুল ওয়াহী।

করত।[২৮] প্রত্যক্ষদর্শীরা আজো সেই পরিস্থিতি স্মৃতি থেকে ব্যক্ত করতে পরম আনন্দ বোধ করেন।

তিন

ঈমান পরিপূর্ণ হয় আখলাকের দ্বারা। যে ব্যক্তির আখলাক ভাল নয় ইসলামের দৃষ্টিতে সে অসম্পূর্ণ মুমিন। প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী ঐ সকল মানুষ, যাদের আখলাক অধিকতর সুন্দর।[২৯] এই আখলাকেরই পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতে প্রেরিত হন। তিনি বলেন: আমি প্রেরিত হয়েছি সুন্দরতম আখলাক ও নৈতিকতার পূর্ণতা বিধানের জন্য।[৩০] প্রিয়নবীর চারিত্রিক সৌন্দর্যের স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[৩১] বস্তুত মানব জীবনে অনুকরণের জন্য প্রিয় নবীর আখলাকের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। এটি এক শাশ্বত নীতি। আল কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের চরিত্রে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৩২] ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে উত্তম আখলাক মানুষের অন্যতম নেক আমল হিসেবে পরিগণিত। এর সওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে হযরত নবীজী বলেন, বিচার দিবসে মুমিন বান্দার নেক আমলের

---

২৮. আবদুল হামীদ আযমী, সিলেটে হযরত মদনী (সিলেট: রহমানিয়া কিতাব প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ ৬৮-৬৯।

২৯. মূল হাদীস:

«قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»

সুনান লিল ইমাম আবূ দাউদ।

৩০. মূল হাদীস:

«قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

মিশকাত, বাবু হুসনিল খুলুক।

৩১. আল কুরআন ৬৮ : ৪।

৩২. আল কুরআন ৩৩ : ২১।

পাল্লায় যেই আমলটি অধিকতর ভারী হবে সেটি হল তার সুন্দর চরিত্রগুণ।[৩৩] আখলাকই হল রূহানী উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের প্রধান ভিত্তি। আখলাকের বুনিয়াদ ব্যতিরেকে রূহানিয়্যাত চর্চা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সব নবীকে নবুওয়াত প্রদানের পূর্বে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাজের শ্রেষ্ঠতম আখলাকের অধিকারী ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

আখলাকের উপর ইসলাম এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে বিধায় সূফীগণ আখলাকের পরিপূর্ণতা অর্জনকে রিয়াযত ও সাধনার অন্যতম লক্ষ্য নির্ণয় করেছেন। কুতবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে তাসাওউফ মানেই হল আখলাকের সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধন। মানবীয় নৈতিকতাকে যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন করার এবং সৎ গুণাবলীর দ্বারা সজ্জিত করার মাধ্যমে আত্মিক বিশুদ্ধতা অর্জনের নাম ইল্‌মে তাসাওউফ।[৩৪]

---

৩৩. মূল হাদীস:

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِن أَثْقَلَ شَيْءٍ
يُوْضَعُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ))

জামি তিরমিযী।

৩৪. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৬: কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গূহী বলেন :

عِلْمُ الصُّوْفِيَّةِ عِلْمُ الدِّيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قُوَّةُ الْيَقِيْنِ وَهُوَ الْعِلْمُ الْأَعْلٰى ، وَحَاصِلُهُمْ إِصْلَاحُ الْأَخْلَاقِ وَدَوَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقِيْقَةُ التَّصَوُّفِ اَلتَّخَلُّقُ بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَلْبُ الْإِرَادَةِ وَكَوْنُ الْعَبْدِ فِيْ رِضَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَأَخْلَاقُ الصُّوْفِيَّةِ مَا هُوَ خُلُقُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِقَوْلِهِ ﴿ إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ وَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيْثُ ، وَتَفْصِيْلُ أَخْلَاقِهِمْ هٰكَذَا اَلتَّوَاضُعُ ضِدُّهُ الْكِبْرُ ، اَلْمُدَارَاةُ ، وَاِحْتِمَالُ الْأَذٰى عَنِ الْخَلْقِ ، اَلْمُعَامَلَةُ بِرِفْقٍ وَخُلُقٍ حَسَنٍ وَتَرْكُ غَضَبٍ وَغَيْظٍ ، اَلْمُوَاسَاةُ ، وَالْإِيْثَارُ بِفَرْطِ الشَّفْقَةِ عَلَى الْخَلْقِ وَتَقَدُّمُ حُقُوْقِ الْخَلْقِ عَلٰى حُظُوْظِهِ ، اَلسَّخَاوَةُ ، اَلتَّجَاوُزُ وَالْعَفْوُ ، طَلَاقَةُ الْوَجْهِ وَالْبَشْرَةِ ، اَلسُّهُوْلَةُ وَلِيْنُ الْجَانِبِ ، تَرْكُ التَّعَسُّفِ وَالتَّكَلُّفِ ، إِنْفَاقٌ بِلَا إِقْتَارٍ وَتَرْكُ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শরীয়ত ও তরীকত' গ্রন্থে আখলাকের বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় অর্জনের পদ্ধতি নির্দেশ করে দেন। তাঁর মতে, আখ্লাকের অর্জনীয় বিষয় হল ২২টি। যথা ঃ নিয়্যতের বিশুদ্ধতা, ইখ্লাস, উন্স ও মুহাব্বত, তাবলীগ, ফিক্র (আল্লাহর সৃষ্ট জগত সম্পর্কে ধ্যান করা), তাফবীয (আল্লাহর উপর নিজের যাবতীয় বিষয়কে ন্যস্ত করা), তাকওয়া, বিনয়, তওবা, তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, খুশূ (স্থিরতা), ভয়, দুআ, আশা, রিযা, যুহ্দ (দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ), শোকর, শওক, সবর, সততা ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসা। অনুরূপে আখলাকের বর্জনীয় বিষয় ১২টি। যথাঃ জিহ্বা সংক্রান্ত আপদ (মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি), অপব্যয়, কৃপণতা, বিদ্বেষ, অহংকার, প্রতিপত্তি মোহ, দুনিয়ার ভালবাসা, লোভ, হিংসা, রিয়া (লোক দেখানো কাজ), নফসানী খাহেশ, আত্মগর্ব ও ক্রোধ।[৩৫]

মুতাকাদ্দিম সুফীগণ মুরীদদেরকে প্রথমতঃ আখলাকের উপরোক্ত গুণাবলীর তালীম দিতেন। আখলাকের ক্ষেত্রে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর পর্যায়ক্রমে মহান ইলাহ্ সত্তার সাথে সম্পর্কিত করতেন। কিন্তু এ পদ্ধতিতে প্রকৃত মকসূদ পর্যন্ত পৌছতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হত। অনেকের ক্ষেত্রে ১৫/২০ বছরেও আখলাকের অধ্যায় সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। এ কারণেই মুতাকাদ্দিম সূফীগণের কাছে খেলাফত প্রাপ্তদের সংখ্যা হত মাত্র গুটি কতেক। মুতাআখ্খির সূফীগণ সেই পদ্ধতির সংস্কার করেন। তাঁরা মুরীদদের সাধনাকাল সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে একই সাথে আখ্লাকের উৎকর্ষ সাধন ও ইলাহ সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দীক্ষা দেন।

الإدخار ، التوكل ، القناعة بيسير من الدنيا ، الورع ، ترك
المراء والجدال والعتب إلا بحق ، ترك الغل والحقد والحسد ،
ترك المال والجاه ، وفاء الوعد ، الحلم ، الإنائة ، التودد
والتوافق مع الإخوان والعزلة عن الأغيار وشكر المنعم بذل
الجاه للمسلمين ، الصوفي يهذب الظاهر والباطن في
الأخلاق والتصوف أدب كله ، أدب الحضرة الإلهية ، الإعراض
عما سواه حياء وإجلالا وهيبة .

(মুহাম্মদ আশিক ইলাহী, তাযকিরাতুর রশীদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ১১)

৩৫. শরীয়ত ও তরীকত, ২য় সং (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭), পৃ ৭০, ১৫৪।

তাঁদের যুগপৎ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মকসূদ অর্জনকারীদের সংখ্যা পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং স্বল্প সময়ে ইলাহ্ সত্তা পর্যন্ত পৌঁছার পথ উন্মুক্ত হয়।[৩৬] হযরত গাঙ্গূহী তাঁর পীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর দরবার থেকে মাত্র ৪০ দিনে খেলাফত লাভ করেছিলেন।[৩৭] মোদ্দা কথা, পদ্ধতি যাই হোক, আধ্যাত্মিক সফলতার জন্য আখ্‌লাকের পূর্ণতা অর্জন আবশ্যক। এ পূর্ণতার নিরিখেই সফলতা ও ব্যর্থতার বিচার হয়ে থাকে।

আখ্‌লাকের দিক থেকে হযরত শায়খুল ইসলাম বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রগুণের প্রশংসা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের মুখে উচ্চারিত ছিল। কর্মজীবনে উপমহাদেশের বহু বড় বড় ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক দর্শনে মতবিরোধ ছিল। অনেক সময় এ বিরোধ চরম পর্যায়ে গিয়েও উপনীত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও স্বপক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর উত্তম আখলাকের সাক্ষ্য দিয়ে গিয়েছেন।[৩৮] হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর আখলাকের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে বলেন, দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর চরিত্রে খোদা প্রদত্ত দু'টি বিশেষ গুণ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি হল 'হিম্মত' তথা সৎ সাহস আর অপরটি হল 'বিনয়'।[৩৯]

নীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিনয়-এর বিপরীত হল অহংকার। এই অহংকার যেমন মানুষের নৈতিক যাবতীয় দোষ ত্রুটির উৎস (উম্মুল আমরায) তেমনি বিনয় হল সকল সৎ গুণের জননী। বিনয়ের পরিপূর্ণতা ব্যক্তিকে সকল গুণের ধারক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। অনুরূপভাবে হিম্মত কথাটির বিপরীত হল ভীরুতা ও কাপুরুষতা। উল্লেখ্য, নৈতিক দোষত্রুটি থেকে নিজকে মুক্ত করার দুরূহ সংগ্রামে সফলতা অর্জন কখনো কাপুরুষদের দ্বারা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড হিম্মতের। হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তি নিজ মনন শক্তি অনুসারে আখলাকের দোষত্রুটি থেকে নিজকে মুক্তি প্রদান করে থাকেন। কাজেই পরিপূর্ণ হিম্মতের

---

৩৬. মুহাম্মদ ইদ্‌রীস হুশিয়ারপুরী, খুতবাতে মাদানী (দেওবন্দ : যমযম বুক ডিপো, ১৯৯৭), পৃ ১০৪।

৩৭. আসীর আদরবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী হায়াত আওর কারনামে (দেওবন্দ : শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ ৪০।

৩৮. সীতারাম,"মাওলানা মাদানী আওর উনকী আখলাক",আল জমঈয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত,পৃ ৭৬।

৩৯. আখলাক হুসাইন কাসিমী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৬।

অধিকারী হওয়ার মানে হল দোষ-ত্রুটি থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে হযরত থানবীর মন্তব্য প্রমাণ করে যে, তিনি আখলাক অধ্যায়ের অর্জন ও বর্জন উভয় দিক থেকে ছিলেন পরিপূর্ণ। উপরোক্ত মন্তব্যকে মাওলানা আখলাক হুসাইন কাসেমী আরো বিশ্লেষণ করে বলেন, হিম্মতওয়ালা ব্যক্তির চরিত্রে গর্ব ও অহংকার থাকা স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে বিনয়ী ও নরম মনের মানুষের চরিত্র কর্মের দুর্বলতা ও অলসতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এমন ব্যক্তি যার চরিত্রে হিম্মত আছে কিন্তু অহংকার নেই এবং বিনয় আছে কিন্তু দুর্বলতা ও অলসতা নেই, তিনি চরিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত। এমন ব্যক্তিগণ জগতে কোন মহৎ কাজ সম্পাদনের জন্য 'আল্লাহর দান' হিসেবে জন্ম নিয়ে থাকেন। হযরত থানবী উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা শায়খুল ইসলামের ঐ শ্রেষ্ঠত্বের দিকেই ইশারা করেছেন।[৪০]

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী শায়খুল ইসলামের আখলাক সম্পর্কে বলেন, আমি ভারতবর্ষের এবং বহির্বিশ্বের বহু উলামা, মাশায়িখ এবং তাঁদের বিভিন্ন অবস্থা ও জীবনচরিত সম্পর্কে অবগত। তাঁদের অনেকে এমনও রয়েছেন, যাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বর্তমান যুগে আখলাক ও নৈতিক গুণাবলীর বিচারে যদি কোন ব্যক্তিত্বকে আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু হিসেবে বরণ করতে হয় তা হলে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, সেই ব্যক্তিত্ব হবেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী। আমি মাওলানা মাদানীর মুরীদ নই কিংবা তাঁর ছাত্রও নই। কাজেই আমি যা রিপোর্ট করছি সেটি অন্ধ ভক্তির ফলশ্রুতি জ্ঞান করা ঠিক হবে না। কোন সন্দেহ নেই যে, যুগের ইমাম মাওলানা মাদানী ঐসব মনীষীর একজন যারা পূর্ণাঙ্গতার নিরিখে শুধু ব্যক্তিই নয়, বরং এক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। তিনি কালের দিক থেকে যদিও এসেছেন পরে কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে রয়েছেন অনেক আগে।[৪১]

ভারত উপমহাদেশের অন্যতম সুপরিচিত গবেষক ও চিন্তাবিদ আলিম হযরত মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী শায়খুল ইসলামকে দেখেছেন আরো নিকট থেকে। মাওলানা দরিয়াবাদী হযরত থানবীর মুরীদ ছিলেন। তাছাড়া

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৭।

৪১. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম (গাওজরনাওয়ালা : মাদানী কুতুবখানা, তা. বি), ভূমিকার অংশ, পৃ ৪৭।

রাজনৈতিকভাবে তিনি হযরত মাদানীর বিপরীত মতাদর্শ পোষণ করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি হযরত শায়খুল ইসলামের আখলাক সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা আমার কাছে মাওলানা মাদানীর একটি গুণই বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আমার মতে তাঁর এ গুণটি অতুলনীয় ও অন্যতম কারামত হিসেবে বিবেচিত। তাঁর ঐ গুণটি হল নিঃস্বার্থপরায়ণতা, সরলতা, বিনয়, নম্রতা ও সৃষ্টির সেবা করার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। আমি বলছি এবং আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ন্যায় পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে, তিনি একজন উত্তম বন্ধু, একজন উত্তম সহযাত্রী। আপনি তাঁর অতিথি হলে আপনার আতিথেয়তায় তিনি নিজ মামূলাত (দৈনন্দিন নফল আমল)কেও ত্যাগ করে দিবেন। আপনার টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে তিনি ঋণী হয়েও আপনার প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবেন। আল্লাহ না করুন, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনার সেবায় তাঁর রাত দিন একাকার হয়ে যাবে। কোন চাকুরীর প্রয়োজন, কোন মামলায় ফেঁসে গিয়েছেন, কোন জটিলতায় ভুগছেন-তাহলে আপনার জন্য তিনি সুপারিশ লিখেই নয়,বরং নিজেও ছোটাছুটি শুরু করে দিবেন। বড়দের সাথে সদাচার তো আছেই, ছোটদের সাথে এমনকি নিজ ছাত্র ও মুরীদের সাথে তাঁর আচরণ হল যে, সেবাকারীকেও সেবায়িতে পরিণত করে দেন। আমি শুনেছি, এ চরিত্র ছিল উস্তাযুল কুল হযরত শায়খুল হিন্দের। যদি তাই হয়, তাহলে শায়খুল হিন্দের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিজকে তৈরী করার এ কাজ তাঁর চেয়ে বেশী আর কেউ করে দেখাতে সক্ষম হয়নি।[৪২]

চার

হযরত শায়খুল ইসলামকে অনুধাবনের অন্যতম দিক হল তাঁর বেলায়েত ও রূহানিয়্যাতের পর্যালোচনা ও মূল্য অনুধাবন। এ ব্যাপারে সমকালীন শীর্ষস্থানীয় বুযর্গগণের মতামত বিচার করা যায়। তিনি একজন কামিল ওলী ছিলেন। সমকালের অন্যান্য আধ্যাত্মিক মনীষীর দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'কুত্‌বুল আলম'।[৪৩] বেলায়েত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ

৪২. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৭-৪৮৮।

৪৩. শামস তিবরীয খান, ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪।

الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

জেনে রাখ, আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিত হবে না। (ওলী সেসব মানুষ) যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে। আল্লাহ্‌র বাণীর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। ইহা মহাসাফল্য।[৪৪]

বেলায়েতের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে কুদ্‌সীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেই।[৪৫]

বস্তুত 'ওলী' শব্দটি তাসাওউফ শাস্ত্রের একটি বিশেষ পরিভাষা। অজ্ঞ লোকেরা এ শব্দটি নিজেদের খেয়াল খুশি মত অনেক অযোগ্য ও অপাত্রে ব্যবহার করায় শব্দটির মর্যাদা অনেক স্থানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমনকি কোথাও কোথাও শিরক ও বিদ্‌আতে আক্রান্ত ভণ্ডদেরকেও ওলী অভিহিত করা হয়েছে। তাই প্রথমে ওলীর সংজ্ঞা আলোচনা প্রয়োজন। পরিভাষা মোতাবেক ওলীর সংজ্ঞা দিয়ে আল্লামা তাফ্‌তাযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'ওলী মানুষের মধ্যে এমন গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলে, যিনি আল্লাহর পবিত্র যাত ও সিফাত সম্পর্কে যথাসাধ্য অবহিত, যিনি সর্বপ্রকারের নেক আমল নিয়মিত সম্পাদনকারী, সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে মুক্ত এবং জাগতিক আমোদ-ফুর্তি ও ভোগ বিলাসে মগ্নতা থেকে বিরত'।[৪৬] এ সংজ্ঞা মতে যারা আল্লাহর সম্যক পরিচয় পায়নি, যাদের নেক আমলে দৃঢ়তা নেই, যারা বদআমল থেকে বিরত নয় কিংবা যারা জাগতিক ভোগ বিলাসে মত্ত তাদেরকে ওলী বলা যায় না। মোটকথা ওলী বিবেচিত হওয়ার জন্য নিজের ঈমান, আমল ও তাক্‌ওয়ার উপর দৃঢ়তা অর্জন এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা ও দুনিয়ার

---

৪৪. আল কুরআন ১০ : ৬২-৬৪।

৪৫. মূল হাদীস :

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ))

সহীহ আল বুখারী।

৪৬. সাদুদ্দীন তাফ্‌তাযানী, **শারহুল আকায়িদ আন নাসাফিয়্যা** (চট্টগ্রাম : কুতুবখানা যমীরিয়্যা, তা. বি.) ,পৃ ১৩২।

প্রতি নিরাসক্ত হওয়া আবশ্যক। উপরোক্ত মানদণ্ডের আলোকে শায়খুল ইসলামের বেলায়েত পর্যালোচনা করা যায়।

হযরত শায়খুল ইসলামের ঈমানী প্রেরণা, ইবাদত ও বন্দেগী, আখলাক ও নৈতিকতা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি নিজে শুধু দৃঢ় ও পরিপক্ক ছিলেন তা-ই নয় বরং শত শত মানুষকেও পরিপক্ক বানানোর দীক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বেলায়েতের মর্যাদা নির্দেশ করে তৎকালীন বিজ্ঞ মনীষী হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আমার মৃত্যুপরবর্তী কালের ব্যাপারে শংকিত ছিলাম যে, বাতিনী জগতের নেতৃত্ব কে সম্পাদন করবে। কিন্তু মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে দেখে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। কেননা জগত তাঁর দ্বারা আরো কিছুকাল জীবিত থাকবে।[৪৭]

সিন্ধু প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ বুযর্গ হযরত পীর গোলাম মুজাদ্দিদ যার লক্ষ লক্ষ মুরীদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছেন, যিনি হযরত শায়খুল ইসলামের সাথে একই সঙ্গে সাবেরমতি জেলে বন্দী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে শাহাদাত বরণ করেন, তিনি বলেন, আমার হাতে পবিত্র কুরআন বিদ্যমান (তিনি তখন তিলাওয়াত করছিলেন), আমি শপথ করে বলতে পারি যে, কারাগারে শায়খুল ইসলামের ইবাদত ও বন্দেগীর যে চিত্র আমার নজরে পড়েছে তাতে আমার সিদ্ধান্ত যে, বর্তমান ভূপৃষ্ঠে ইবাদত-বন্দেগী ও সুন্নতের অনুসরণ করার ব্যাপারে হযরত মাওলানা মাদানীর কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৪৮]

তাসাওউফ মতে বেলায়েতের পদমর্যাদা হিসেবেই নির্ণীত হয়ে থাকে ব্যক্তির রূহানী শক্তির পরিমাণ। নবীগণ ওলীদের চেয়ে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তাই নবীগণের রূহানী শক্তি ওলীদের চেয়ে বেশী। আবার ওলীগণের মধ্যে যিনি যত বড় তাঁর রূহানিয়্যাত ঠিক ততখানি শক্তিশালী ও উন্নত। তবে রূহানিয়্যাতের এ মান ও মর্তবা নিরূপণের জন্য রূহানিয়্যাত চর্চায় অভিজ্ঞ হওয়া জরুরী। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর যাচাই সম্ভব নয়। মুক্তার মূল্য একজন জাওহারী বোঝেন, অন্যরা তা কেমন করে বুঝতে সক্ষম হবে? রায়পুর খানকার বিশিষ্ট বুযর্গ হযরত শাহ্ আবদুল কাদির রায়পুরী কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত শায়খুল ইসলামের রূহানী শক্তির বর্ণনা দিয়ে একবার তিনি বলে ফেলেন,

---

৪৭. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭০।

৪৮. আহমদ হুসাইন লাহেরপুরী "হায়াতে শায়খুল ইসলাম কী চান্দ নুকূস" আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

মাওলানা মাদানীর বিষয়ে তোমরা আমার কাছে কি জানতে চাও? প্রথম দিকে আমরা তাঁকে সাধারণই মনে করেছিলাম। কিন্তু পরে সময়ের নাজুকতা ও নানাবিধ জটিলতার মুহূর্তে আমরা যখন এই মর্দে মুজাহিদের দিকে গভীর বাতিনী দৃষ্টিতে তাকালাম তখন দেখলাম, যেখানে আমাদের মাথা গিয়ে ঠেকেছে সেখানে শায়খ মাদানীর কদম স্থাপিত। বর্তমানে তিনি উভয় মসনদ (কুতবে তাশরীয়ী ও কুতবে তাকবীনী)-এ অধিষ্ঠিত। দেশ ও জাতির স্বার্থে বাতিলের মোকাবেলায় সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বীরত্বের সাথে তিনি যে অটল অবিচল ত্যাগ ও তিতিক্ষা পেশ করে যাচ্ছেন, সেটি তাঁর 'হুসাইনী শান' লাভেরই বহিঃপ্রকাশ।[৪৯]

তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইল্‌য়াস কান্দলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রূহানিয়্যত চর্চার অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব জুড়ে দাওয়াত ও তাবলীগের শিরোনামে যে ইসলাহী কাজ চলছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজের জান মাল ও সময় ব্যয় করে কাজ করছে সেটি বস্তুত মাওলানা ইল্‌য়াসের ঐ রূহানিয়্যাতেরই ফলশ্রুতি। এ মহান বুযর্গ শায়খুল ইসলামের রূহানিয়্যাত সম্পর্কে একবার হাল তাড়িত হয়ে বলে ফেলেন, যে সমুদ্রের এক পেয়ালা জিনিসও সামাল দেওয়া কঠিন, হযরত মাদানী নিজের মধ্যে ঐ জিনিসের সাত সমুদ্র ধারণ করে আছেন অথচ সম্পূর্ণ সুস্থির। কি সাধ্য আছে যে, পাত্র প্লাবিত হতে পারে?[৫০]

হযরত মাওলানা ইল্‌য়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, লোকেরা মাওলানা মাদানীকে চিনতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহর শপথ! তাঁর রূহানী শক্তি এতখানি প্রবল যে, তিনি চাইলে ঐ শক্তি প্রয়োগে ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু এটি দুনিয়া। এটি বস্তু ও আস্‌বাবের জগৎ। তাই তাঁকে এমন অস্বাভাবিক কিছু ঘটাতে নিষেধ করা হয়েছে। জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাঁকে সেই পথই অবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে, যা এখানে প্রচলিত।[৫১]

---

৪৯. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

৫০. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা (দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬), পৃ ২৮০।

৫১. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, হায়াতে আসীর ওয়াকিআত (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৭৫), পৃ ২২৮।

হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কামিল ওলীগণ প্রচারবিমুখ হয়ে থাকেন। দুনিয়াদার লোকেরা সামান্য কোন যোগ্যতা অর্জন করলে তা প্রদর্শন করতে অস্থির হয়ে উঠে। প্রকৃত ওলীদের মধ্যে সেই অস্থিরতা নেই। বরং তাঁরা যত উঁচু মাকামে আরোহণ করেন ততই তাঁদের মনে বিনয় ও প্রচারবিমুখতা বৃদ্ধি পায়। নিজের কোন কামাল ইচ্ছাকৃতভাবে তো নয়ই, অনিচ্ছায় প্রকাশিত হয়ে যাওয়াও আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী মনে করেন। আর এ কারণে অনেক বুযর্গ নিজের বুযর্গীকে জাগতিক কোন আবরণের দ্বারা আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। মাওলানা আসীর আদরবীর মতে হযরত শায়খুল ইসলাম ছিলেন সেই প্রকৃতির। তাই নিজের বেলায়েত ও কুত্‌বিয়্যতকে তিনি রাজনীতির পোষাক দ্বারা আড়াল করে রেখেছেন। এ পোষাকের ভিতর কি অমূল্য সম্পদ লুকিয়েছিল তা আল্লাহ ছাড়া কাউকে জানতে দেননি। এ কারণেই শায়খুল ইসলামের চরিত্র অপরাপর সকল রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মাওলানা আদরবী বলেন, তাঁর চিঠিপত্রের অধিকাংশ তিনি জেলখানায় বসে লিখেছেন। যদি রাজনৈতিক উচ্চাসন প্রাপ্তির লক্ষ্যে তিনি রাজনীতি করতেন তাহলে ঐ সকল চিঠির প্রত্যেকটিতে রাজনৈতিক কর্মসূচীর বিবরণ, পরবর্তী নির্দেশ, সরকার ও বিরোধী দলের যুদ্ধচিত্র, জেল থেকে মুক্তির তদ্‌বীর, মুক্তির পর সংবর্ধনা গ্রহণ ইত্যাদির অবশ্যই উল্লেখ থাকত। রাজনৈতিক নেতাদের এটিই চিরাচরিত নিয়ম। অথচ এখানে ঐ সবের কিছুই নেই। তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করলেন তো যেখানে পৌছার সেখানে কোন সংবাদ না দিয়েই পৌছে গেলেন। কেউ সংবর্ধনার জন্য পীড়াপীড়ি করলে পরিষ্কার ভাষায় অসম্মতি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কারগার কষ্ট ক্লেশের জায়গা। শারীরিক ও মানসিক সকল দিক থেকে সেখানে নির্যাতন চলে। অথচ শায়খুল ইসলাম যাচ্ছেন তো নির্যাতনকেও প্রশান্তি, অপমানকেও ইজ্জত এবং শৃংখলকেও আযাদী বলে বরণ করছেন। এর প্রকৃত রহস্য এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তিনি নিজ বুযর্গীকে প্রচ্ছন্ন ও আড়াল করার লক্ষ্যে রাজনীতির ঐ পোষাক পরিধান করেছেন।[৫২]

---

৫২. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৩-৩৭৪; তাঁর জনৈক ভক্তের কণ্ঠে;

به دیں مصطفی دیوانه بودی

فدائے ملت جانانه بودی

سیاست را نقاب چهره کردی

وگرنه عاشق مستانه بودی

তাসাওউফ সম্পর্কীয় দৃষ্টিকোণ

তাসাওউফ সম্পর্কে হযরত শায়খুল ইসলামের দৃষ্টিকোণ আলোচনার পূর্বে ইল্‌মে তাসাউফের বিশেষ কয়েকটি পরিভাষা তথা শরীঅত, তরীকত, হাকীকত, মারিফাত ইত্যাদি শব্দের সঠিক অর্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কেননা এক শ্রেণীর মূর্খ সূফী এ শব্দগুলোকে নিজেদের খেয়াল খুশি মোতাবেক অর্থ করে ব্যবহার করায় তাসাওউফের মূল বিষয়ের অনুধাবন অনেক ক্ষেত্রে জটিল হয়ে পড়েছে। ইসলামের যে সকল আহ্‌কাম ও বিধিবিধান আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর আরোপ করেছেন, সেগুলোকে বলা হয় শরীঅত। এই শরীঅতের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا
تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ --- هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ
وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴾

তারপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের এক বিশেষ বিধান তথা শরীআতের উপর; সুতরাং তুমি শরীঅত অনুসরণ করে চল। অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। এটি মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।[৫৩]

শরীঅতের এ হুকুমগুলো দুই প্রকারের। বাহ্যিক ও আত্মিক। শরীঅতের যে বিধানগুলো বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক সেগুলোকে আহকামে যাহিরী বা ফিক্‌হ বলা হয়। আর যে বিধানগুলো আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সেগুলোকে বলা হয় আহকামে বাতিনী বা তাসাওউফ। পবিত্র কুরআনে এই তাসাওউফকে 'তাযকিয়্যা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

﴿ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ﴾

সেই ব্যক্তি সফলকাম হবে যে নিজকে তাযকিয়্যা তথা পবিত্র করবে, আর সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।[৫৪]

---

৫৩. আল কুরআন ৪৫ : ১৮-২০।
৫৪. আল কুরআন ৯১ : ৯-১০।

উপরোক্ত বাহ্যিক ও আত্মিক বিধানাবলী মানব জীবনে খুব হজেই প্রতিফলিত করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনার। শরীঅতকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদ্ধতি ও কৌশলকে বলা হয় তরীকত। পবিত্র কুরআনে এটিকে 'মুজাহাদা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَ جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ -- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যেন সফলকাম হতে পার। এবং জিহাদ (মুজাহাদা) কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। --- যারা আমার উদ্দেশ্যে মুজাহাদা (রিয়াযত ও সাধনা) করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।[৫৫]

এভাবে সুষ্ঠ পদ্ধতির মাধ্যমে শরীঅতের সার্বিক বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা হলে মানব হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে। মানব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় 'ইলাহ সত্তার'-বহু তত্ত্ব ও রহস্য। এ রহস্যগুলোকে বলা হয় হাকীকত। আর যিনি অধ্যাত্ম জগতের এই মাকামে পৌছেন তাঁকে বলা হয় মুহাক্কিক। এ সকল তত্ত্ব ও রহস্য জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটনকে বলা হয় মারিফাত। মারিফাতের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হয় আরিফ।[৫৬] উল্লেখ্য, আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী চিরন্তন ও অসীম। পক্ষান্তরে মানুষের সত্তা হল নশ্বর ও সসীম। তাই সসীম সত্তার পক্ষে অসীম সত্তার তত্ত্ব ও রহস্য জেনে শেষ করা কোন কালেই সম্ভব নয়। এ জন্যই একখানা হাদীসে মহানবী অসীম সত্তার দরবারে নিজের ব্যর্থতা প্রকাশ করে বলেন, হে আল্লাহ!

---

৫৫. আল কুরআন ২২ ঃ ৭৭-৭৮, ২৯ ঃ ৬৯।

৫৬. আবুল ফাতাহ ইয়াহ্‌য়া, ইসলামের দৃষ্টিতে পীর মুরীদী (ঢাকা ঃ ফত্‌ওয়া ও গবেষণা বিভাগ, জামিয়া দীনিয়া, ১৯৮৮), পৃ ৫-৬।

তোমার মারিফাত যথার্থভাবে অর্জন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তোমার ইবাদত যথার্থভাবে পালন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৫৭]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্ট যে, শরীঅত তরীকত ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক কোন সংঘাত নেই। বরং একটি অপরটির পরিপূরক। পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য সবগুলোরই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সীমানা ও পরিমিতি রক্ষা করে সবগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে থাকে। কিন্তু বিগত কালে অনেক ক্ষেত্রে এ পরিমিতি রক্ষা করা যায়নি। ফলে মুসলিম সমাজে দেখা দেয় দু'টি প্রান্তিক মতাদর্শ। উদ্ভব হয় দু'টি দলের। তন্মধ্যে একদল লোক তরীকতকে অতিশয় অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক শরীঅতের উর্ধ্বে অবস্থিত ভিন্ন রকমের কোন জিনিসে পরিণত করে ফেলে। এরা তরীকতের নামে শরীঅত অসমর্থিত বহু কাজকর্মের সাথেও জড়িয়ে পড়ে। এদেরই উত্তরসূরিরা পরবর্তী সময়ে শির্ক, বিদ্‌আত, রুসম-রেওয়াজ, এমনকি নামায-রোযা বাদ দিয়ে মদ, গাজা, ভাং, আফিম ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন করা এবং নাচ-গান ও বাদ্য যন্ত্র নিয়ে মত্ত থাকাকে তরীকতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতে থাকে। সাধারণতঃ শরীঅত বর্জনকারী ফকীররা এ দলটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।[৫৮] কতিপয় মূর্খ তরীকতপন্থীর এহেন বাড়াবাড়ির দরুন তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায় কট্টরপন্থী অপর একটি দল। এরা তরীকতের মধ্যে শির্ক ও বিদ্‌আতের মিশ্রণ দেখে গোটা তরীকতকেই বিদ্‌আত ও ইসলাম বহির্ভূত বলে মত প্রকাশ করে। বস্তুত দ্বিতীয় দলের এ সিদ্ধান্তও সঠিক নয়। কেননা এখানে মাথা ব্যথা নিবারণের জন্য গোটা মাথাই কেটে ফেলা হয়েছে। মুতাকাদ্দিম আলিমগণের মধ্যে হযরত ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যা, হযরত ইমাম ইবনুল জাওযী প্রমুখের বক্তব্য থেকে দ্বিতীয় দলটির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়।[৫৯]

মুহাক্কিক আলিমগণের মতে উপরোক্ত উভয় দলের বক্তব্যেই অতিশয়তা আছে। প্রকৃত সত্য হল মধ্যপন্থা অবলম্বনের মধ্যে। অর্থাৎ তরীকতের নামে যেমন

---

৫৭. মূল হাদীস :

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ))

৫৮. আবুল ফাতাহ ইয়াহয়া, প্রাগুক্ত, পৃ ১১।

৫৯. আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৮০), পৃ ২২৫।

কোন প্রকার শিরক ও বিদ্‌আতকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না তদ্রূপ তরীকতকে বিদ্‌আত আখ্যা দিয়ে ধর্মকে রস-তসহীন করে তোলাও উচিত নয়। পরিভাষায় আলিমগণের এ দলটিকে 'ইতিদালপন্থী' বলা হয়। এ দলের মতানুসারে তরীকত বিদ্‌আত নয় বরং শরীআত সমর্থিত। তরীকত শরীঅতের উর্ধ্বে নয় বরং শরীঅতের সেবক ও খাদিম।[৬০]

হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী এই শেষোক্ত মতেরই সমর্থক ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি একই সাথে তরীকতের দীক্ষা দিতেন, আবার অন্যদিকে শিরক ও বিদ্‌অতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতেন। তরীকত ও বায়আত সম্পর্কে তিনি এক বক্তব্যে বলেন, আজকাল কিছু লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, তরীকত শরীঅতের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তরীকতের কোন প্রমাণ নেই। তাদের এ মন্তব্য সত্য নয়। তরীকত ও বায়আত মূলতঃ শরীঅতেরই হুকুম পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার নাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু স্থানে এ ধরনের বায়আত করেছেন। যথা হুদায়বিয়্যার সন্ধিকালে প্রিয়নবী যে বায়আত করেছিলেন সেটি পবিত্র কুরআনের সূরা ফাত্‌হে উল্লেখ আছে। অনুরূপে সূরা মুম্‌তাহানায় মহিলাদেরকে বায়আত করার ঘটনা বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিতসহ ১২ জন সাহাবী মহানবীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছেন। বস্তুত শরীঅতের যাবতীয় হুকুম যেন সুন্দরভাবে পালন করা যায় সে লক্ষ্যেই বায়আত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের যিক্‌র করা, শরীঅতের উপর জীবন পরিচালনা করা ইত্যাদিকেই বলা হয় বায়আত ও তরীকত। কাজেই এই তরীকত বিদ্‌আত কিংবা শরীঅত পরিপন্থী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।[৬১]

হযরত শায়খুল ইসলামের মতে সঠিক ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে রিয়াযত ও মুজাহাদা করার মাধ্যমে মানুষ ওলী হতে পারে। কিন্তু ওলী কখনো নবীর মাকামে পৌছতে পারেন না। এমনকি সাহাবা যুগের পরবর্তীকালীন ওলীগণ মুজাহাদার মাধ্যমে কোন সাধারণ সাহাবীর মাকাম পর্যন্ত পৌছেন না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহানিয়্যাত ছিল সূর্যের ন্যায় প্রখর তেজসম্পন্ন। সাহাবীগণ হিদায়েতের ঐ সূর্য দ্বারা আলোকিত হয়েছেন। এ কারণে

---

৬০. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনী রোখ আওর মাসলকী মিজায (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে মিল্লাত, তা. বি.), পৃ ১২৭-১৩৫।

৬১. মুহাম্মদ ইদরীস হুশিয়ারপুরী, খুতবাতে মাদানী (দেওবন্দ : যমযম বুক ডিপো, ১৯৯৭), পৃ ৫৪--৫৭।

আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যিনি মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কয়েক মুহূর্ত অবস্থান করার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন তিনিই সাহাবী। তাঁর মর্যাদা পরবর্তীকালীন বড় বড় মুত্তাকী, ওলী ও বুযর্গদের চেয়েও উর্ধ্বে।[৬২] তাঁর মতে তরীকত শরীঅতের উর্ধ্বে নয়। তরীকতের দ্বারা মানুষ এমন কোন মাকামে পৌছে না, যেখানে পৌছলে তার থেকে শরীঅতের আদেশ-নিষেধ রহিত হতে পারে। বরং তরীকত হল শরীঅতেরই সেবক ও সাহায্যকারী। মানুষকে শরীঅতের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের একান্ত সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দেওয়াই হল তরীকতের লক্ষ্য।

এ মর্মে হযরত শায়খুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তরীকত বিদ্‌আত নয়, শরীঅত থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। তরীকত হল শরীঅতেরই খাদিম ও সেবক। এটি শরীঅতের বিধিবিধান পূর্ণাঙ্গ পালনে সাহায্যকারী শক্তি। হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী, হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী ও হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ বুযর্গ এ সকল পদ্ধতি চালু করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এ সকল পদ্ধতির মাধ্যমে লোকেরা যেন সহজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাঁদের ঐ তরীকাগুলোর কোথাও বিন্দু পরিমাণেও শরীঅত পরিপন্থী কিছু নেই। আল্লাহর নৈকট্য ও পরকালের সফলতা লাভে মানুষকে সাহায্য করাই ছিল তাঁদের তরীকাগুলো সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য।[৬৩]

কোন কোন সূফী মনে করেন যে, কাশ্‌ফ, কারামত, নূর, লতীফা, ফানা ও বাকা- এগুলো অর্জনই হল তাসাওউফের মকসূদ তথা কাম্য বিষয়। অনেকে এগুলো অর্জনের জন্যই নিরন্তর সাধনা করে থাকেন। শায়খুল ইসলামের মতে এগুলো তাসাওউফ ও তরীকতের কাম্য বিষয় নয়। তরীকতের কাম্য বিষয় হল মহানবীর সুন্নত অনুসরণ ও শরীঅতের যাবতীয় আহকাম পালনে দৃঢ় অভ্যাস গড়ে তোলা, নিজের মনে আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা পয়দা করা এবং ইবাদতের ও বন্দেগীর ক্ষেত্রে ইহ্‌সানের মাকাম অর্জন করা। মুরীদদের কাছে লিখিত চিঠিপত্র ও উপদেশ বাণীতে তাই তিনি এগুলোর উপরই বেশী জোর দিতেন।[৬৪] এক চিঠিতে

---

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬২।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮-৬৯।

৬৪. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, **শরীঅত ওয়া তরীকত কা তালাযুম** (সাহারানপুর : কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, ১৯৭৮), পৃ ১০৮।

তিনি লিখেছেন, সুলূক ও তরীকতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ইহ্সানের মাকাম অর্জন করা। অর্থাৎ এমন মানসিকতা নিয়ে ইবাদতের অভ্যাস তৈরী করা যেন আল্লাহ পাক তার সম্মুখে উপস্থিত আছেন আর তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন। উল্লেখ্য, এটি সুলূকের সূচনাপর্ব। চূড়ান্ত পর্ব হল আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি (মাকামে রিযা) অর্জন করা। তাছাড়া নিজের মনের ভিতর যেন আল্লাহর খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারে এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা এবং চেষ্টা করা যেন এ ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর ভালবাসা হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন,স্বপ্ন, নূর দর্শন, ইল্হাম প্রভৃতি সালিকের মনন শক্তি বৃদ্ধির কাজ করে। এগুলো কাম্য বিষয় নয়।[৬৫] ইবাদত বন্দেগী ও যিক্‌রের অভ্যাস গড়ে তোলা, সুন্নত ও শরীঅতের উপর নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই হল প্রধান কাম্য বিষয়। আমরা এগুলো পালনেই আদিষ্ট। এ কাজে দৃঢ়তা লাভ তথা ইহ্সানের মাকাম অর্জনের দ্বারা ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও তাঁর রহমতের আশা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঈমান পরিপূর্ণতার লক্ষণ।[৬৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাকের রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। নতুবা মনের ভিতর কোন প্রকার সাধ অনুভব করা, হৃদয়ের স্বচ্ছতা অর্জন, কাশ্‌ফ ও কারামত লাভ, নূর ও বরকতের সৃষ্টি, ফানা ও বাকা, কুত্ব বা গাউস হওয়া ইত্যাদি কোন কিছুই কাম্য বিষয় নয়। কাজেই এদিকে দৃষ্টিদান ভয়ানক ক্ষতির কারণ হবে। এগুলো হল মাধ্যম ও উপকরণ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য মাওলার সন্তুষ্টি অর্জন, বান্দার দায়িত্ব হল পরিপূর্ণভাবে বন্দেগী করা, বন্দেগীর জন্য অবিরাম চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাওয়া এবং কর্মে ইখ্লাস অর্জন করা।[৬৭]

মোদ্দা কথা হযরত শায়খুল ইসলাম তরীকতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর তরীকত শরীঅত বিরোধী বে-শরা ফকির দরবেশদের মত ছিল না। তরীকতকে তিনি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গ্রহণ করেছেন এবং কাজকর্মে পরিমিতি ও ইতিদাল বজায় রেখেছেন। তাঁর মতে তরীকত রূহানী চিকিৎসার উপকরণ, আফিম নয়। শরীঅত সমর্থিত বিষয়, ডাক ঢোল পিটিয়ে মঞ্চ থেকে প্রচারের বিষয় নয়। তিনি বিগত ওলী বুযর্গদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে তাঁদেরকে রুবুবিয়্যতের

---

৬৫. সূফীদের বক্তব্য হল ;

تِلْكَ خَيَالَاتٌ تُرَبِّيْ بِهَا أَطْفَالُ الطَّرِيْقَةِ

৬৬. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮।

৬৭. প্রাগুক্ত, ১২৯।

মর্যাদা দেন না। তাঁদের কবর যিয়ারতকে রূহানী ফয়য লাভের উপায় মনে করেন, তবে হাজতরওয়া বা মুশকিলকুশা (সমস্যার সমাধানকারী বা বিপদ থেকে উদ্ধারকারী) মনে করেন না। তরীকতের মাধ্যমে তিনি রূহানিয়্যতের ক্রম উন্নতি বিধান চান, খাহেশ ও কুপ্রবৃত্তির পূরণ কামনা করেন না। তিনি তরীকতকে হেদায়েত লাভের উসিলা জ্ঞান করেন, নাজাত লাভের নিশ্চিত কারণ নয়। তাঁর মতে বুযর্গানে দীনের স্মৃতিচিহ্ন বরকতের বিষয় কিন্তু সেজদার উপযুক্ত নয়। তরীকতকে এভাবে পরিমিতি বজায় রাখার মাধ্যমে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি।

দুই

পাশ্চাত্য অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে ভেজী, ব্রাউন, এম.হার্টস, নিকলসন ও ভনক্রেমার প্রমুখ তাসাওউফকে বৌদ্ধ দর্শন, নিউ প্লেটোনিক দর্শন ও পারসিক দর্শনের প্রভাবজাত বলে মন্তব্য করেছেন।[৬৮] তাদের এ মন্তব্য সঠিক নয়। বস্তুত তারা তাসাওউফ ও সন্ন্যাসবাদকে অহেতুকভাবে গুলিয়ে ফেলেছেন বলেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাসাওউফ আর সন্ন্যাসবাদ এক নয়। দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। ইসলামের দৃষ্টিতে তাসাওউফ জায়িয ও প্রশংসিত বিষয়। পক্ষান্তরে সন্ন্যাসবাদ তথা রাহ্বানিয়্যাত ও বৈরাগ্যবাদ নাজায়িয ও অসমর্থিত। মহানবী পরিষ্কার বলে গিয়েছেন, ইসলামে রাহবানিয়্যাত নেই। তাই তাসাউফকে সন্ন্যাসবাদের সাথে মিশানো অযৌক্তিক। কাজেই বৌদ্ধ দর্শন, নিউ প্লেটোনিক দর্শন ইত্যাদি সন্ন্যাসবাদ ও বৈরাগ্যবাদের উৎস হতে পারে কিন্তু ইসলামের মহান তাসাওউফের উৎস হতে পারে না।

হযরত শায়খুল ইসলামের মতে তাসাওউফ ও তরীকতের উৎস পবিত্র আল কুরআন। কুরআন পাকে অবতীর্ণ আয়াতের ভিত্তিতে প্রিয়নবী সর্বপ্রথম তাসাওউফ ও তায্কিয়্যার প্রচলন করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

---

৬৮. নাজির আহমদ ও মুহাম্মদ রূহুল আমীন, **মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস** (ঢাকা ঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯), পৃ ২৯১; মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, "ইসলামে সূফী দর্শন" **ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা** (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৭), পৃ ২২-৩৩।

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে, যেন তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে তাযকিয়্যা তথা পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত। যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে।[৬৯]

তাঁর মতে ইসলামের আকায়িদ, ফিক্‌হ, কালাম ও হাদীস প্রভৃতি যেমন নবীযুগ থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী কালে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি তাসাওউফ ও তরীকতও নবীযুগ থেকেই শুরু হয়। তারপর প্রয়োজন ও প্রেক্ষিত অনুসারে এ ইলম ক্রমান্বয়ে বিকশিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ফিক্‌হের মাযহাব চতুষ্টয়ের ন্যায় এখানেও ৪টি সিলসিলা ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ফিক্‌হের ক্ষেত্রে যেমন উত্তরকালীন লোকদের জন্য পূর্বকালীন মুজ্‌তাহিদ ইমামগণের তাকলীদ ব্যতীত কোন উপায় নেই ; তদ্রূপ তাসাওউফের ক্ষেত্রেও স্বীকৃত বুযর্গানে দীনের ঐ তরীকত অনুকরণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই ; যদিও ন্যূনতম শুদ্ধি ও সংশোধন যা আখিরাতে মুক্তির উপায়, সেটি তরীকতের মাশায়িখ ও বুযর্গদের অনুসরণ ব্যতিরেকেও অর্জিত হতে পারে। কিন্তু একজন পূর্ণ মুমিন হিসেবে মানুষের কাছ থেকে যে বিষয়টি কাম্য এবং যে গুণাবলীকে ঈমানের পরিপূর্ণতা বলা হয়েছে, সেটি কামিল বুযর্গগণের সাহচর্য ব্যতীত অর্জিত হয় না।[৭০]

তাসাওউফ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হলেও উত্তরকালে অজ্ঞ সূফীদের মাধ্যমে বহু বিদ্‌আত মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। প্রচলিত বিদ্‌আত ও রুসম-রেওয়াজের অধিকাংশ তাসাওউফের এ পথ দিয়েই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত গাঙ্গূহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এক সময় পর্যন্ত তরীকত গায়রে মাকসূদ অর্থাৎ কাম্য বিষয় নয় বরং কাম্য বিষয় লাভের উপকরণ হিসেবেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যুগ যতই নবীযুগ থেকে দূরে যেতে থাকে ততই গায়রে মকসূদ বিষয়গুলো মকসূদ বিষয়ে পরিণত হতে থাকে। পরিণামে ইল্‌মী, আমলী ও আকীদাগত বহু বিদ্‌আত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

---

৬৯. আল কুরআন ৬২ : ২।

৭০. মুহাম্মদ ইদরীস হুশিয়ারপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯, ৬২-৬৫।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকরিয়্যা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উত্তরকালীন এই সূফীগণ তিন ধরনের ছিলেন; মুহাক্কিক সূফী, সাধারণ সূফী ও নামসর্বস্ব সূফী।[৭১] তন্মধ্যে মুহাক্কিক সূফীগণ তাসাওউফের সঠিক নীতির উপর অটল থাকেন। তাঁরা জীবন দিয়ে তাসাওউফ শাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশের কাজ করে যান। আর সাধারণ সূফী বলতে ঐ সকল সূফীদের বোঝানো হয়েছে, যারা বস্তুত তাসাওউফের হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হননি। তবে নিজেরা যথাসম্ভব শরীঅতের বিধানাবলী মেনে চলেছেন। এ সূফীদের দ্বারা তাসাওউফ শাস্ত্রের অগ্রগতি না হলেও ক্ষতি সাধিত হয়নি। তারা নিজেদের খানকাগুলো আবাদ রেখে পরবর্তীদের কাছে সিলসিলা পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নামসর্বস্ব সূফীদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা তারা আসলে ছিল অজ্ঞ ও মূর্খ। সূফীর পোষাক পরিধান করে পেটপূজা ও অর্থ রোজগারে নানা ফন্দি-ফিক্‌র করা এবং নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অজ্ঞ সূফীদের এ দলটি যুগে যুগে বহু বিদ্‌আত ও রুসম-রেওয়াজের প্রচলন ঘটায়। পোষাক-পরিচ্ছদ ও লোক দেখানো কিছু আমলের কারণে সাধারণ লোকেরা তাদেরকে সূফী মনে করে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরা দীন সম্পর্কে অজ্ঞ, প্রতারক ও ভণ্ড। হযরত গাঙ্গুহী বলেন, অবশ্য সংস্কারপন্থী সূফীগণ প্রত্যেক যুগে তরীকতকে ঐ সকল বিদ্‌আত থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ সংস্কার কারীগণের মধ্যে হযরত পীরানে পীর শায়খ আব্‌দুল কাদির জিলানী, হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী, হযরত শায়খ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মনীষীগণ তরীকতকে সাধ্যানুসারে পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করেন। তবে সমূলে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।[৭২]

শায়খুল ইসলাম মাদানী নীতিগতভাবে ছিলেন বিদ্‌আতের ঘোর বিরোধী। তাঁর চরিত্রে সুন্নতের প্রতি যেমন ছিল প্রবল ভালবাসা, তেমনি বিদ্‌আতের প্রতি ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ। নিজের আওতায় কোথাও বিদআতের ছায়া নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করতেন। প্রতিটি আমলকে তিনি বার বার পরীক্ষা করে সুন্নতের আদলে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাঁর নিজ বংশে বংশানুক্রমিক পীরগিরির প্রথা চালু হলে তিনি এটি বন্ধ করে দেন। পরিবারে শীআদের ন্যায় তাযিয়া পালনের নিয়ম ঢুকে পড়লে সেটিও তিনি শক্ত হাতে রোধ করেন। চতুর্দিকে বিদআতের সয়লাব দেখে

---

৭১. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

তিনি মুরীদদের প্রথম শপথ বাক্যের মধ্যেই 'বিদ্আত করব না' কথাটি যুক্ত করে বিদ্আত প্রতিরোধের উদ্যোগ নেন। বেরেলবী আলিমদের নেতা মাওলানা আহমদ রিযা খান আরব দেশে গিয়ে বিদআতের সমর্থনে অসত্য ফত্ওয়া সংগ্রহের চেষ্টাকালে তিনি তাকে আরব থেকে তাড়া করেন। এক পর্যায়ে তাকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আশ শিহাবুস সাকিব' এ মর্মেই রচিত হয়।[৭৩]

---

৭৩. আসীর আদরবী, মাআছিরে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫১-৪৫৪; বিদআতের ব্যাপারে মহানবীর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে সাহাবী হযরত ইরবায ইব্ন সারিয়া বলেন,

((وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواه أبو داود) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) (متفق عليه) قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيْ أي مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ مَا لَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِيْ شَيْءٍ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُوْلِهِ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ الْجَلِيْلَةِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ وَاشْتِهَارُهُ فِيْ إِبْطَالِ الْمُحْدَثَاتِ وَالْبِدَعِ .

(ইমাম নববী, রিয়াযুস সালিহীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালীন, নয়াদিল্লী, সলীম বুক ডিপো, পৃ ৮৬, ৯২)

তিন

বায়আত শব্দের অর্থ অঙ্গীকার। তাসাওউফের পরিভাষায় কোন পীর-মুর্শিদের হাত ধরে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে তওবা করা এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করাকে বায়আত বলা হয়। কোন কোন আহ্‌লে যাহির আলিমের মতে পীর-মাশায়িখের প্রচলিত বায়আত বিদ্‌আত। তাদের মতে ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিহাদ ব্যতীত অন্য বিষয়ে বায়আত করা বা হওয়া হাদীস বহির্ভূত। মুহাক্কিক আলিমগণের মতে পীর-মাশায়িখের প্রচলিত বায়আত বিদ্‌আত নয়। বায়আত করা বা হওয়ার বিষয়টি হাদীসে প্রমাণিত আছে। যেমন সহীহ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত একখানা হাদীসে সাহাবী হযরত আউফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা ৯ কিংবা ৮ জন লোক মহানবীর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের হাতে বায়আত হবে না? তখন আমরা নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত হব? মহানবী বললেন, এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং যাবতীয় আহ্‌কাম শুনবে ও মান্য করবে। উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, শুধু ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিহাদই নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও বায়আত করার প্রমাণ হাদীসে রয়েছে।[৭৪]

বায়আত প্রসঙ্গে হযরত শায়খুল ইসলাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন মানুষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বায়আত গ্রহণ করেছেন। হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ মর্মে বায়আত করেছিলেন যে, আমি মুসলমানদের কল্যাণকামী হব, তাদের স্বার্থরক্ষা করব এবং নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করে চলব। সাহাবী হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া রাযিআল্লাহু আনহুকেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের একটি বিষয়ে বায়আত করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পূর্ণ শরীঅত পালনের উপর আবার কখনো শরীঅতের কোন বিশেষ বিধান পালনের উপর বায়আত করেন। কাজেই এ বায়আত কোন নতুন জিনিস নয়, কোন বিদ্‌আত নয়।[৭৫]

---

৭৪. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

৭৫. মুহাম্মদ ইদ্‌রীস হুশিয়ারপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬-৫৭। তাসাওউফে হযরত শায়খুল ইসলামের সিলসিলায়ে সনদ নিম্নরূপ : শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (হি ১২৯৬-১৩৭৭).→ কুতবুল ইরশাদ ফকীহুন নাফ্‌স হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী

আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে কারো কাছে বায়আত হওয়ার মধ্যে অনেক উপকারিতা আছে। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এই বায়আতকে সুন্নত বলেছেন। বায়আতের উপকারিতা ব্যাখ্যা করে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী বলেন, মানুষের নফ্সের মধ্যে কতিপয় এমন ব্যাধি আছে যা স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হয়ত নিরসনের উপায় জানা থাকে না। অনেক সময় জানা থাকার পরেও নিজ নফ্সের উপর চাপ দিয়ে তা প্রয়োগ করা কঠিন হয়। কামিল শায়খ ও অভিজ্ঞ আরিফের হাতে বায়আত হওয়ার দ্বারা ঐ সকল দুর্বলতার নিরসনে অনেক উপকার পাওয়া যায়। কেননা পীর তখন নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যাগুলোর সম্যক উপলব্ধিপূর্বক সেগুলো নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেন।[৭৬]

(১২৪৪-১৩২৩). ⇒ সায়্যিদুত্ তায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারূকী মুহাজির মক্কী (মৃ ১৩১৭). ⇒ হযরত শাহ্ নূর মুহাম্মদ ঝান্ঝানবী (মৃ ১৩০৫). ⇒ হযরত শাহ্ আবদুর রহীম শহীদ (১২৪৬). ⇒ হযরত শাহ্ আবদুল বারী আমরূহী (মৃ ১২২৬). ⇒ হযরত শাহ্ আবদুল হাদী আমরূহী (১১৯০). ⇒ হযরত শাহ্ আযদুদ্দীন আমরূহী (১২৭১). ⇒ হযরত শায়খ শাহ্ মুহাম্মদ আল মাক্কী (১২৭২). ⇒ হযরত শাহ মুহাম্মদী (১২৭২). ⇒ হযরত শাহ্ মুহিব্বুল্লাহ এলাহাবাদী (১১৮৫). ⇒ হযরত শাহ্ আবূ সাঈদ গাঙ্গূহী (১১৪০). ⇒ হযরত শাহ্ নিযামুদ্দীন আল বলখী (১০৩৫). ⇒ হযরত শাহ্ জালালুদ্দীন থানেশ্বরী (৯৮৯). ⇒ কুতবুল আলম হযরত শাহ্ আবদুল কুদ্দূস গাঙ্গূহী (৯২৫/৯৪০). ⇒ হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আর রূদলী (৮৯৮). ⇒ হযরত শাহ্ আহমদ আল আরিফ আর রূদলী (৮৭২). ⇒ হযরত শাহ্ আবদুল হক আর রূদলী (৮৩৭). ⇒ হযরত শাহ্ জালালুদ্দীন কাবীরুল আউলিয়া আল পানীপতী (৭৬৫). ⇒ হযরত শাহ্ শামসুদ্দীন আল পানীপতী (৭১৬). ⇒ হযরত শাহ্ আলাউদ্দীন আলী আহমদ আস সাবির (৬৯০). ⇒ হযরত শাহ্ ফরীদুদ্দীন শকরগন্জ (৬৬৮). ⇒ হযরত শাহ্ কুতবুদ্দীন বখতিয়ার আল কাকী (৬৬৩). ⇒ মারকাযুত তরীকা হযরত শাহ্ মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী আস সান্জারী (৬৩৬). ⇒ হযরত শায়খ শাহ্ উসমান আল হারূনী (৬৩৩). ⇒ হযরত শাহ্ আস সায়্যিদ আশ শরীফ যিনদানী (৬২১). ⇒ হযরত শাহ্ মওদূদ আল চিশতী (৫২৭/৫৭৭). ⇒ হযরত শাহ্ আবূ ইউসুফ আল চিশতী (৪০০). ⇒ হযরত শাহ্ আবূ মুহাম্মদ আল চিশতী (৪১১). ⇒ হযরত শাহ্ আবূ আহমদ আল আব্দাল আল চিশতী (৩৫৫). ⇒ হযরত শাহ্ আবূ ইসহাক আশ্ শামী (৩২৯). ⇒ হযরত শাহ্ মম্শাদ আদ দীনূরী (২৯৯). ⇒ হযরত শাহ্ আবূ হুবাইরা আল বসরী (২৭৫). ⇒ হযরত শাহ্ হুযাইফা আল মার্আশী (২৫২). ⇒ সুলতান হযরত শাহ্ ইবরাহীম ইবন আদ্হাম আল বলখী (১৭৭). ⇒ হযরত শাহ্ আবদুর ওয়াহিদ ইবন যায়দ (১৭৬/১৭৮). ⇒ ইমামুল আওলিয়া হযরত হাসান আল বসরী (১১০). ⇒ বাবু মদীনাতিল ইল্ম সায়্যিদুনা আলী ইব্ন আবী তালিব রাযিআল্লাহু আনহু (৪০). ⇒ সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়াসাল্লাম।

৭৬. শাহ্ মুহাম্মদ আশরাফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

হযরত শায়খুল ইসলাম মুরীদ হওয়াকে রূহানী বরকত লাভের দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহর কোন প্রিয় বুযর্গের হাতে বায়আত হওয়ার দ্বারা দু'টি উপকার পাওয়া যায়। এক. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। দুই. নিজের রূহানী শক্তি বৃদ্ধি হয়। কেননা পীর যদি উচ্চ মাকাম সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হন, তাহলে আল্লাহ পাক তাঁকে মুরীদের রূহানী অবস্থা সম্পর্কে কোন ভাবে জানিয়ে দেন। ফলে তিনি ঐ মুরীদের সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় এমনও হয় যে, তার কাছে ফেরেশ্তা পাঠিয়ে কিংবা রূহানী কোন উপায়ে তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা হয়। যুলায়খার ঘটনায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভেতর এ পদ্ধতিতেই গুনাহ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। তাছাড়া মুরীদ হওয়ার দ্বারা বুযর্গানে দীনের সিলসিলায় অবস্থিত নেক বান্দাদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। বুযর্গগনের সুমহান জামাআতে অন্তর্ভুক্তি ও তাঁদের রূহানী তাওয়াজ্জুহ লাভের দ্বারা মুরীদ মননচর্চায় দ্রুত উন্নতি অর্জন করে এবং সহজে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।[৭৭]

বস্তুত মুরীদ হওয়ার মূল কথা হলো শরীঅতের বিধানাবলী পালনে পীরের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। এ অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যেই হাতে হাত রাখা হয়। নতুবা 'হস্ত ধারণ' তরীকতের অনিবার্য কিছু নয়। হস্ত ধারণ ছাড়াও যেমন চিঠিপত্রের মাধ্যমে কিংবা আড়ালে বসেও মুরীদ হওয়া যায়। অঙ্গীকার পালনে সচেষ্ট হওয়া এবং ক্রমান্বয়ে নিজকে ইখ্‌লাস ও ইহ্‌সান-এর দিকে অগ্রসর করা হল আসল দায়িত্ব।

হযরত শায়খুল ইসলাম কাউকে মুরীদ করার সময় সাধারণভাবে যে সকল বিষয়ে অঙ্গীকার নিতেন সেগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের নেতা আমাদের অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি ঈমান গ্রহণ করলাম আল্লাহর উপর, তাঁর যথার্থ সত্তা, গুণাবলী ও কাজকর্মের প্রতি পূর্ণ আস্থাসহ। তিনি একক, কেউ তাঁর সমকক্ষ কিংবা শরীক নয়। আমি ঈমান গ্রহণ করলাম এ মর্মে যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। তিনি যা বলে গিয়েছেন তার

৭৭. মুহাম্মদ ইদ্‌রীস হুশিয়ারপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭-৬৮।

সবই সত্য ও বাস্তব। আমি ঈমান গ্রহণ করলাম আল্লাহর সকল ফেরেশতার উপর, তাঁর সকল পয়গাম্বরের উপর, তাঁর সকল (আসমানী) কিতাবের উপর এবং কিয়ামত দিবস ও তাক্দীরের উপর। আমি স্বচ্ছ মনে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিলাম। আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি সিলসিলার মাধ্যমে তাঁরই হাতে বায়আত তথা অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি এবং ওয়াদা করছি যে, আমি শির্ক করব না, অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, কারো উপর অপবাদ আরোপ করব না। আমার পক্ষে যতটুকু সাধ্য আছে সর্বদা মহান আল্লাহ জাল্লাশানুহু ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত বিধানাবলী পালন করে যাব। নিজের সকল শক্তি দিয়ে গুনাহ্ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকব। একান্ত কখনো কোন গুনাহ্ করে ফেললে অবিলম্বে তওবা করে নেব। আমি আমার সকল গুনাহ্ তথা পূর্বের, পরের, ছোট, বড়, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, জানা ও অজানা সবগুলো থেকে তওবা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাক্ষী। তুমি আমার সব কিছুই শুনছ, সবই দেখছ। তুমি সবই জান। আমার কোন কিছুই তোমার অজানা বা দৃষ্টি থেকে লুক্কায়িত নয়। তুমি গুনাহ্ মার্জনাকারী ও দয়ালু। তুমি বরাবরই তওবা কবুলকারী ও দয়াবান। হে আল্লাহ্! তুমি আমার এই তওবা কবূল করে নাও।[৭৮]

---

৭৮. মুফতী নূরুল্লাহ, মাশায়েখে চিশত (বি.বাড়িয়া : আযীয প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ ৩৭১-৩৭২। মুরীদ করার পূর্বে শায়খুল ইসলাম নিজে মাস্নূন খুত্বা ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন। খুত্বা ও আয়াতগুলো ছিল :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ
وَبَارَكَ وَسَلَّمْ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا
إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ ﴿ إِنَّ
الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ

উপরোক্ত বাক্যগুলোর কোন শব্দ শরীঅত বিরুদ্ধ নয়। সবগুলো কথাই ব্যক্তির জন্য উপকারী প্রতিজ্ঞা। হযরত শায়খুল ইসলাম এ প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারণ করিয়ে মানুষকে মুরীদে পরিণত করতেন। তিনি তরীকতের সিলসিলা চতুষ্টয়ের ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন বলে চার তরীকার উপরই বায়আত করতেন। এ কারণে অঙ্গীকার বাক্যে আরো বলতেন যে, আমি চিশতিয়্যা (সাবিরিয়্যা ও নিযামিয়্যা), নকশ্‌বন্দিয়্যা, কাদিরিয়্যা ও সোহরাওয়ার্দিয়্যা তরীকার উপর বায়আত হলাম। হে আল্লাহ! আমার এই বায়আত কবূল করুন। আমাকে সকল সিলসিলার বুযর্গগণের উসিলায় আপনার প্রকৃত ভালবাসা ও পূর্ণ ঈমান দান করুন। যেন আমি ঈমান নিয়ে শেষ বিদায় (মৃত্যু) গ্রহণ করতে পারি। হে আল্লাহ! পরকালে আমাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান করার সুযোগ এবং তাঁর সুপারিশ ও জান্নাত লাভের তওফীক দিন।[৭৯]

হযরত শায়খুল ইসলামের মতে মুরীদের জন্য পীর হলেন একজন শিক্ষক, চিকিৎসক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। কাজেই কোন ব্যক্তি পীর হওয়ার জন্য তার মধ্যে মুরীদের সে সব কাজ সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি শরীঅতের যাহিরী ও বাতিনী আহ্‌কাম সম্পর্কে জানে না, আত্মিক রোগ ব্যাধির স্বরূপ ও প্রতিকার সম্পর্কে যার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই, যে ঐশী ইঙ্গিতাবলী ও রাব্বানী ইশারাত সম্পর্কে অনবহিত-এমন ব্যক্তি পীর হওয়ার উপযুক্ত নয়। পীর হওয়ার জন্য তাকে শরীঅত ও সুন্নাতের পূর্ণ পাবন্দ থাকা, নিজে দীর্ঘকাল যাবত রিয়াযত ও সাধনায় অভ্যস্ত হওয়া এবং কোন কামিল পীরের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অবস্থানপূর্বক এ সব কাজ রপ্ত করে নেওয়া আবশ্যক।

কারো কাছে মুরীদ হওয়ার পূর্বে তাকে উত্তমভাবে যাচাই করে নেওয়া অবশ্যক। কেননা ভ্রান্ত চিকিৎসা বস্তুত চিকিৎসাহীনতার চেয়েও জঘন্য। এ মর্মে তিনি বলেন, যেভাবে সকল দলের মধ্যে ভাল-মন্দ, আসল-নকল উভয় শ্রেণীর লোকই থাকে সেভাবে পীরদের মধ্যেও এমন কিছু মানুষ ঢুকে পড়েছে, যাদেরকে প্রকৃত অর্থে পীর বলা যায় না। এমন লোকেরা ধর্মকে ব্যবহার করে দুনিয়া রোজগারের ধাঁন্ধায় লিপ্ত থাকে। তারা সামান্য দু'পয়সা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মানুষের

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

(নাজমুদ্দীন ইসলাহী, মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম সুলূক ওয়া তরীকত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৭)

৭৯. মুফতী নূরুল্লাহ, প্রাগুক্ত।

অমূল্য সম্পদ দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে দেয়। এ জন্য পীর নির্বাচনের বিষয়টি খুব চিন্তাভাবনা করে সম্পাদন করতে হয়।[৮০]

পবিত্র কুরআন ও মহানবীর সুন্নতই হল ইসলামের মূল নিয়ামক। কাজেই যে পীর নিজে শরীঅত মোতাবেক চলে না, যার আকীদা ও আমলে শরীঅত বিরোধিতা রয়েছে, সে নিজেই রূহানীভাবে অসুস্থ। হযরত শায়খুল ইসলামের মতে এমন ব্যক্তি অপর লোকের শিক্ষক ও নির্দেশদাতা তথা পীর হতে পারে না। আল্লাহর বিধান লংঘন করে কোন মানুষের অনুসরণ ইসলামে জায়িয নয়। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলামের মতামত হল পীর যে কোন লোকই হতে পারে না। এমন ব্যক্তি পীর হওয়ার উপযুক্ত, যিনি সর্বপ্রকার গুনাহ্ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকেন। যিনি কোন মুহাক্কিক শায়খের সুহবতে অবস্থানপূর্বক কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আত্মশুদ্ধি লাভ ও নিজ মুর্শিদের সাথে বাতিনী নিস্‌বত অর্জন করেছেন। যে ব্যক্তি শরীঅতের বিধান মত চলে না কিংবা যে ব্যক্তি সুন্নতের পাবন্দ নয় তার কাউকে মুরীদ করানোর অধিকার নেই।[৮১]

অজ্ঞ লোকদের ধারণা যে মুরীদ হওয়ার দ্বারা আখিরাতের নাজাতপ্রাপ্তি নিশ্চিত। পীর সাহেব কিয়ামতের দিন মুরীদের হাত ধরে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন। হযরত শায়খুল ইসলামের মতে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা কিয়ামতে দিবসে 'নাজাত' প্রাপ্তির মানদণ্ড ঈমান ও আমল। নিজের আমলনামায় ঈমান ও আমল বিদ্যমান না থাকলে শুধু মুরীদ হওয়ার দ্বারা নাজাত লাভ সম্ভব নয়। পীর সাহেব মুরীদকে আত্মশুদ্ধির পথ বলে দিয়ে থাকেন। এর অতিরিক্ত কিয়ামত দিবসে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾

সেদিন কেউ কারো দায়িত্ব বহন করবে না। সকল কিছুর মালিকানা থাকবে একমাত্র আল্লাহর।[৮২]

---

৮০. মুহাম্মদ ইদ্‌রীস, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭-৫৮।
৮২. আল কুরআন ৮২ ঃ ১৯।

ইস্‌লাহ্ ও তরবিয়্যত নীতি

এক

ইসলাহ্ মানে সংশোধন। তাসাওউফের পরিভাষায় ইসলাহ্ অর্থ হল যাহিরী ও বাতিনী দোষত্রুটি থেকে আত্মার সংশোধন করা। তরবিয়্যত মানে গড়ে তোলা। আল্লামা কাযী বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তরবিয়্যতের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, কোন জিনিসকে ক্রমে ক্রমে সজ্জিত করে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়ার নাম তরবিয়্যত।[৮৩] পীর ও মাশায়িখ তাঁদের মুরীদদের ক্রমান্নয়ে সজ্জিত করে তরবিয়্যত দিয়ে থাকেন বলে তাদেরকে 'রাব্বানিয়্যুন' বলা হয়। রব্বানী শব্দটি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, বরং সে বলে তোমরা রাব্বানী হয়ে যাও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করে থাক।[৮৪]

মুরীদের ইসলাহ ও তরবিয়্যতের ক্ষেত্রে সূফীগণ সাধারণতঃ ৪টি অধ্যায়ে কাজ করে থাকেন। যথা আখলাক, মুজাহাদা, শোগ্‌ল ও হাল। তাঁরা প্রথম অধ্যায়ে মুরীদদের আখলাক গঠনের কাজ করেন। মানব চরিত্রের এমন কিছু দিক আছে যেগুলো ভাল ও প্রশংসনীয়। আবার কিছু কিছু দিক আছে যেগুলো মন্দ ও গর্হিত। আখলাক গঠনের জন্য চরিত্রের প্রশংসনীয় দিকগুলো অর্জন করা এবং গর্হিত দিকগুলো বর্জন করাকে বোঝায়। ইল্‌মে তাসাওউফের পরিভাষায় প্রথমোক্ত কাজকে বলা হয় 'তাহ্‌লিয়্যা' আর শেষোক্ত কাজকে বলা হয় 'তাখ্‌লিয়্যা'। তাহলিয়্যা ও তাখলিয়্যা এ দু'টির মধ্যে মুরীদ কোন্ কাজটি আগে আর কোন্ কাজটি পরে সম্পাদন করবে সে প্রসঙ্গে হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাহলিয়্যা ও তাখলিয়্যা উভয়ই প্রয়োজনীয়, তাতে কোন দ্বিমত নেই। দ্বিমত হল এ ক্ষেত্রে যে, কোন্‌টি আগে সম্পাদন করা হবে আর কোন্‌টি পরে। মাশায়িখের মধ্যে দু'রকমের পদ্ধতিই চালু আছে। কেউ তাহলিয়্যা আগে সম্পাদন করে থাকেন আবার কেউ তাখলিয়্যা আগে সম্পাদন করে থাকেন। উভয় পদ্ধতির মধ্যেই সফলতা রয়েছে। শারীরিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাক্ষেত্রেও এ দ্বিমত

---

৮৩. কাযী আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল বায়যাবী, আনওয়ারুন্ তানযীল ওয়া আসরারুত্ তাবীল, পরিভাষায় তারবিয়্যাতের সংজ্ঞা হল;

هُوَ تَبْلِيغُ الشَّيْءِ إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ شَيْئًا فَشَيْئًا

(দেওবন্দ : আসাহ্হুল মাতাবি, তা. বি), পৃ ৬।

৮৪. আল কুরআন ৩ : ৭৯।

বিদ্যমান। যেমন ইউনানী চিকিৎসকগণ আগে তাখলিয়্যা করেন অর্থাৎ প্রথমেই রোগ নিরাময় ও জীবাণু ধ্বংসের চেষ্টা করেন এবং পরে দেহকে সবল করার প্রতি মনোযোগ দেন। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় পদ্ধতির চিকিৎসায় প্রথমেই রোগীর দৈহিক শক্তি অক্ষুন্ন রাখা ও দেহকে সবল করার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। অর্থাৎ তারা তাহলিয়্যাকে অগ্রবর্তী মনে করেন।[৮৫]

মুরীদদের আখলাক গঠনের এ অধ্যায়টি বস্তুত বীজ বপনের পূর্বে ভূমি পরিচর্যা করার ন্যায়। পরিচর্যাহীন ভূমিতে বীজ বপন করে যেমন ভাল ফলন আশা করা যায় না তদ্রূপ আখ্‌লাকবিহীন জীবন থেকেও রূহানী তালীমের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায় না। আখলাক গঠিত হওয়ার পর সালিকদেরকে প্রদান করা হয় 'মুজাহাদা'-এর তালীম। মুজাহাদা মানে সাধনা ও অধ্যবসায়। এ মুজাহাদা দু'রকমের। হাকীকী ও হুক্‌মী। হাকীকী মুজাহাদার অর্থ হল সর্বদা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আর হুক্‌মী মুজাহাদা বলতে বোঝায় প্রধানতঃ চারটি কাজ করা। যথা কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথা বলা ও লোকের সাথে কম মেলামেশা করা। হুক্‌মী মুজাহাদার বিশ্লেষণ করে হযরত থানবী বলেন, এখানে 'কম করা' কথাটির অর্থ হল কোন মুহাক্কিক শায়খের নির্দেশ অনুসারে উপরোক্ত চারটি বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলার অভ্যাস গড়ে তোলা। কাজেই এগুলো এত বেশী পরিমাণে করা যাবে না যার দ্বারা সালিকের অন্তরে উদাসীনতা বা কঠোরতার উদ্রেক হয়। আবার এতখানি কমও করা যাবে না যার ফলে সালিকের স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি বিনষ্ট হয়।[৮৬]

সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক মুজাহাদার সুফল অপরিসীম। মুজাহাদার ফলে মানুষের বড় শত্রু নফ্‌স পরাস্ত হয়। মানুষ নির্বিঘ্নে প্রকৃত গন্তব্যে পৌছতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, সে-ই সফলকাম, যে নফ্‌সকে পবিত্র করবে। আর সে-ই ব্যর্থ যে নফ্‌সকে কলুষিত করবে।[৮৭]

মুজাহাদা ও সাধনার উপায় উপকরণ হিসেবে সূফীগণ কিছু আমলের তালীম দিয়ে থাকেন। পরিভাষায় এ আমলগুলোকে বলা হয় শোগ্‌ল। শোগ্‌ল অনেকটা ব্যায়ামের মত। ব্যায়াম করার দ্বারা যেমন শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি অর্জিত হয়, তেমনি শোগল দ্বারা আল্লাহর দিকে মনের একাগ্রতা, ইখ্‌লাস ও মুহাব্বত লাভ করা যায়, যা ক্রমে ক্রমে সালিককে ইহ্‌সানের উর্ধ্ব মাকামে

---

৮৫. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১-৬২।
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭।
৮৭. আল কুরআন ৯১ : ৯-১০।

পৌছিয়ে দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলায় বিভিন্ন রকমের শোগ্ল চালু আছে। হযরত থানবীর মতে এ শোগলগুলো প্রধানতঃ দুই প্রকারের। ক্ষতির আশংকামুক্ত শোগল ও ক্ষতির আশংকাযুক্ত শোগল। ক্ষতির আশংকামুক্ত শোগলের মধ্যে আছে যিক্র, তাসবীহ, ইস্তিগফার, দরূদ, তিলাওয়াত, মোরাকাবা ইত্যাদি। আর ক্ষতির আশংক যুক্ত শোগল যেমন শায়খের কল্পনা (তাসাববুরে শায়খ) ইশ্কে মাজাযী, সামা ইত্যাদি।

এসব শোগ্লের তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত থানবী বলেন, শোগলের প্রধান উদ্দেশ্য হল মনের স্থিরতা ও একাগ্রতার যোগ্যতা অর্জন করা। কেননা মনের মধ্যে নানাবিধ চিন্তাভাবনা ও খেয়ালের গমনাগমনের কারণে কোন চিন্তাই স্থির হয় না। বরং চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে বলে মনে একগ্রতা আসতে পারে না। অনুশীলনের মাধ্যমে কোন ওযীফা বা শোগলকে অভ্যাসে পরিণত করার দ্বারা এ বিক্ষিপ্ততা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোযোগ স্থাপন সহজ হয়ে যায়। খোলা ময়দানে নামাযের সময় মুসল্লীর সম্মুখে ছোতরা স্থাপনের মধ্যেও এই একই রহস্য বিদ্যমান। হযরত আল্লামা ইব্ন হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, নামাযের ছোতরা হল একাগ্রতা অর্জনের জন্য একটি সহযোগী আমল।[৮৮]

ঔষধ ও পথ্য সেবনের দ্বারা রোগীর শারীরিক অবস্থায় যেমন বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি শোগল ও মুজাহাদার কারণে সালিকের মননজগতেও নানা রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সকল পরিবর্তনকে বলা হয় 'হাল'। এ হালগুলো দু'প্রকারের। প্রশংসনীয় ও দূষণীয়। যে সকল পরিবর্তন সালিককে গুনাহের দিকে তাড়িত করে সেগুলো দূষণীয় হাল। আর যেগুলো সালিককে নেক আমল ও ইবাদত বন্দেগীর প্রেরণা যোগায় সেগুলো প্রশংসনীয় হাল। প্রশংসনীয় হাল আবার দু'প্রকারের। ক্ষতির আশংকামুক্ত হাল ও ক্ষতির আশংকাযুক্ত হাল। আশংকামুক্ত হালের মধ্যে রয়েছে দুআ কবূল হওয়া, ইল্হাম, সুস্বপ্ন দর্শন, ফানা, বাকা ইত্যাদি। আর ক্ষতির আশংকাযুক্ত হালের মধ্যে আছে নিমগ্নতা, তাসার্রুফ, তাছীর, চৈতন্যহীনতা, কব্য, বস্ত, কারামাত, কাশ্ফ ইত্যাদি। এ সকল হালের হাকীকত ও রহস্য সম্পর্কে হযরত হাকীমুল উম্মত বলেন, হাল বস্তুত সড়কের দুই পার্শ্বে অবস্থিত পুষ্প প্রস্ফুটিত বৃক্ষরাজির ন্যায়। পথিকের জন্য এগুলো দৃষ্টিগোচর হওয়া কিংবা না হওয়ার মধ্যে কোন কিছু নির্ভরশীল নয়। আসল মকসূদ হল পথ অতিক্রম করে মনযিলে মকসূদে পৌছা। তাই এগুলো কোন সালিকের নজরে পড়ে আবার কারো নজরে পড়ে না। দৃষ্টিকে নিম্ন দিকে নিবদ্ধ রেখে পথ চললে রাস্তা কি

৮৮. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬২।

অতিক্রম হয় না? রাস্তা তো সর্বাবস্থায়ই অতিক্রান্ত হবে। পার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি নজরে পড়ুক কিংবা না-ই পড়ুক।[৮৯]

সূফীগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে সালিকদের রূহানী চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন শোগলের তালীম দেন। তারপর শোগল থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন হাল নিরীক্ষা করে পরবর্তী দীক্ষা দিয়ে থাকেন। এভাবে শোগল ও নিরীক্ষা চালিয়ে ক্রমান্বয়ে সালিককে আসল মকসূদ তথা 'মাকামে ইহ্সান' পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়া হয়। হযরত হাসান আল বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল মুহাক্কিক সূফীগণের এটাই ছিল দীক্ষা ও তরবিয়্যত পদ্ধতি। অবশ্য স্থান-কাল পাত্রভেদে শারীরিক রোগব্যাধির চিকিৎসায় যেমন পদ্ধতির রদবদল হয়ে থাকে এখানেও তদ্রূপ। এ জন্য বিভিন্ন সিলসিলা ও উপ-সিলসিলার তরবিয়্যত পদ্ধতির মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও গোড়া ও মূলনীতির মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। শায়খুল ইসলাম মাদানী ভারত উপমহাদেশের বাসিন্দা। উপমহাদেশীয় মানুষের প্রকৃতি আরব দেশীয় মানুষ থেকে ভিন্ন। তাই শায়খুল ইসলামের দীক্ষানীতির মধ্যেও কিছুটা ভিন্নতা ও পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তী আলোচনায় আমরা শায়খুল ইসলামের সেই দীক্ষানীতিই আলোচনার প্রয়াস পাব।

[illegible]

ইসলাহ্ ও তরবিয়্যতের ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল ইসলামের প্রধান নীতি ছিল সালিকের মনে আল্লাহর প্রচণ্ড ভালবাসার উদ্রেক করে দেওয়া। এটি চিশতিয়্যা তরীকার অন্যতম মূলনীতিও বটে। মনের ভিতর প্রেম ও ভালবাসা বিদ্যমান থাকলে কঠিন থেকে কঠিন কাজও সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তিনি মুতাকাদ্দিম সূফীগণের মত প্রথমেই আখ্লাক গঠনের ব্যাপারে মনোযোগ না দিয়ে মুতাআখ্খির সূফীগণের অনুসরণে প্রথমে শোগ্লের তালীম দেন। তাঁর এ নীতিতে আখলাকের গঠন অস্বীকার কিংবা খাটো করে দেখা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, বিন্যাসের ক্ষেত্রে শোগলকে অগ্রবর্তী করে দেওয়া। কেননা শোগলের দ্বারা সালিকের মনে আল্লাহর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এ ভালবাসা ক্রমে সালিকের আখ্লাক ও নৈতিকতাকেও সংশোধিত করে দেয়। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে শায়খুল ইসলাম এক চিঠিতে লিখেছেন, মুতাকাদ্দিম সূফীগণ আখলাকের গঠনকে অগ্রবর্তী

---

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৮।

বিষয় মনে করতেন। এটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি হলেও তাতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। ফলে অনেক সালিকের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েও আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার ভাগ্য জুটে না। মুতাআখ্খির সূফীগণ তাতে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেন। তাঁরা বিন্যাসের ক্ষেত্রে শোগলকে অগ্রবর্তী করে দেন। সালিককে শোগলের মধ্যে নিবিষ্ট করার দ্বারা মনের ভিতর আল্লাহ পাককে সার্বক্ষণিক উপস্থিত জ্ঞান করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, আর এ যোগ্যতাই আবার তার চরিত্রের মন্দ দিকগুলোকে এক এক করে দূরীভূত করতে সাহায্য করে।[৯০]

জনৈক সালিকের জবাবে অন্যত্র তিনি লিখেছেন, সুলূকের দ্বারা আসল উদ্দেশ্য হল ইহ্সানের মাকাম অর্জন করা। অর্থাৎ এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগীর যোগ্যতা অর্জন করা, যেন ইবাদতকারী স্বয়ং আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করছে। কাজেই আপনার চেষ্টা থাকবে যেন অন্তরে আল্লাহ্র বিশুদ্ধ ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং এ ভালবাসা যেন বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছতে পারে যে, গায়রুল্লাহর সকল সম্পর্ক মন থেকে ছিন্ন হয়ে যায়।[৯১]

আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সালিকের তিনটি বিষয়কে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করার প্রতি বেশী জোর দেন। বিষয়গুলো হল ইল্ম, আমল ও ইখ্লাস। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নীতিও ছিল এরূপ। বস্তুত এ তিনটি জিনিস সালিককে সহজেই 'যাতে ইলাহ' পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী বলেন, হযরত মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইল্ম, আমল ও ইখ্লাস-এ তিনটি স্তম্ভের উপর নিজ তালীম তরবিয়্যতের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। হযরত মাদানীর রূহানী তালীম তরবিয়্যতের কেন্দ্রীয় স্তম্ভও ছিল সেই তিনটি। তিনি মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানবীকে লিখিত এক চিঠিতে বলেন, আমি সুলূকের দীক্ষা পদ্ধতিকে সহজ করার লক্ষ্যে এমন কিছু তালীমের ব্যবস্থা করেছি, যা গ্রহণ করে কোন দুর্বল কিংবা শক্তিহীন লোকও মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত সহজে পৌছতে সক্ষম হবে।[৯২]

তরবিয়্যতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন শায়খুল ইসলামের আরেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেহেতু যুগে যুগে নানা রকমের বিদ্আত এই তাসাওউফের পথ দিয়েই মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। তাই তিনি সালিকদের জন্য এমন কোন শোগল অনুশীলনের জন্য দিতেন না যেটি উত্তরকালে বিদ্আতের দিকে

---

৯০. মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, মাকতূব নং ৬৬।

৯১. প্রাগুক্ত, মাকতূব নং ৬৭।

৯২. ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

মোড় নিতে পারে। সূফীদের ব্যবহৃত শোগলসমূহের মধ্যে যেগুলো কোন প্রকার ক্ষতির আশংকাযুক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তিনি সেগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন। সামা, কাওয়ালী, ইশ্কে মাজাযী প্রভৃতি অনুশীলনের জন্য কোন সালিক অনুমতি প্রার্থনা করলেও তিনি অনুমতি দিতেন না। তবে তাসাব্বুরে শায়খ (শায়খের কল্পনা করা) সম্পর্কে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। অবশ্য হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ, হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ সূফীগণ তাসাববুরে শায়খও নিষেধ করেছেন।

হযরত শায়খুল ইসলামের মতে তাসাববুরে শায়খ ভিত্তিগতভাবে নাজায়িয নয়। তবে শায়খকে হাযির নাযির জ্ঞান করা কিংবা সালিকের অন্তরে তিনি অদৃশ্য থেকে কোন তাসার্রুফ করেন মনে করা নাজায়িয। তিনি বলেন, তাসাববুরে শায়খ মনের ওয়াস্ওয়াসা ও চিন্তার বিক্ষিপ্ততা দূর করে। তা ছাড়া তাসাববুর দ্বারা বহু অদ্ভুত হালের উদ্রেক হয়ে থাকে। তবে জেনে রাখতে হবে যে, সালিকের এ সব হাল ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শায়খের কোন অবগতি থাকে না। শায়খ অদৃশ্য থেকে মুরীদের কোন উপকার করছেন কিংবা তার প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিয়ে রেখেছেন এমনও নয়। এটি তাসাববুরের একটি স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া মাত্র। আল্লাহ পাক এ তাসাববুর দ্বারা সালিককে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে রক্ষা করেন এবং তার মনে অদৃশ্য রহমত অবতীর্ণ করে থাকেন। যেহেতু সাধারণ মানুষ এ ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বিভ্রান্ত হয়, তাই সতর্কতা অবলম্বনকারী সূফীগণ এটি পরিহার করে গিয়েছেন। নতুবা শরীঅতের সাধারণ বিচারে তাসাববুরে শায়খ জায়িয এবং হাদীসের দ্বারা সমর্থিত।[৯৩]

সালিকদেরকে তিনি যে সব শোগলের মাধ্যমে তালীম দিতেন সেগুলো ছিল যথা ৬ তাসবীহ, ১২ তাসবীহ, পাস আনফাস যিক্র, যিক্রে কলবী ও মোরাকাবা। পূর্ববর্তীদের মধ্যে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারূকী মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত গাঙ্গূহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ সূফীও এ নীতিতে দীক্ষা দেন। হযরত শায়খুল ইসলামের নির্ধারিত কোন 'খানকা' ছিল না। সালিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র। হযরত মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ন্যায় চিঠিপত্রের দ্বারা তিনি সুলূকের কাজ পরিচালনা করে যান। প্রত্যহ তাঁর কাছে মুরীদদের লেখা বহু চিঠি আসত। তিনি চিঠি থেকে তাদের রূহানী অবস্থা জেনে জবাব দিতেন।[৯৪] তাছাড়া প্রতি রমযানে তিনি

৯৩. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪।
৯৪. আবূ সালমান শাহ্জাহানপুরী, ড.রশীদুল ওয়াহীদী সম্পা, পৃ ৮৫।

ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফে তাঁর সঙ্গে ভক্ত ও মুরীদের অনেকেই অংশগ্রহণ করে দীক্ষা লাভ করত।

মাকতূবাতে তিনি যিক্র সম্পর্কে লিখেছেন, মানুষের যেই শ্বাস ও যেই মুহূর্তটি যিক্রের সাথে অতিক্রান্ত হয় সেটিই তার জীবনের প্রকৃত অংশ। অবশিষ্টগুলো হল অহেতুক কথাবার্তা। যিক্র সর্বদা জারী রাখুন। এটিই প্রকৃত উদ্দেশ্য। যিক্রকে নিজের স্বভাবে পরিণত করে নিন। যিক্র করার সময় যথাসাধ্য বাইরের কোন চিন্তা বা কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় সুফল পাবেন। যিক্র করার সময় মাঝে মাঝে (এক তাসবীহ পরিমাণ সময়) মনের কাকুতি মিনতিসহ দুআ করা চাই যে, হে আল্লাহ! তুমিই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি সকল কিছু ছেড়ে এসেছি। তুমি আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। আমাকে তোমার অসীম সত্তা পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি দাও। আমাকে তোমার সন্তুষ্টি প্রদান কর। সুস্থতা ও অসুস্থতা সর্বাবস্থায় যিক্র অব্যাহত রাখুন, মৌখিকভাবে হোক কিংবা আত্মিকভাবে, যেভাবেই হোক, যিক্র থেকে যেন কখনো উদাসীনতা না ঘটে। যিক্রের অনুশীলন শুরু করার পর তা ত্যাগ করা হলে মনে এমন কাঠিন্যের সৃষ্টি হয় যা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরতে বেশ সময়ের দরকার হয়। তবে যদি বাতেনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যিক্রের রঙে সম্পূর্ণ রঙ্গীন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যিক্র স্থগিত করায় ক্ষতি হয় না।[৯৫]

তিনি বলেন, সশব্দে যিক্র করার চেয়ে নিঃশব্দে যিক্র করা মাশায়িখ অধিক পছন্দ করেন। তবে সশব্দে যিক্রের উপকারিতা দ্রুত লাভ করা যায়। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সশব্দে যিক্র (যিক্রে জলী) করা ভাল। তবে শর্ত হল যেন অপরের কোন ক্ষতি না হয়। সশব্দে যিক্র করা কষ্টকর মনে হলে নিঃশব্দে যিক্র করুন। আপনি যিক্র করা অব্যাহত রাখুন। যদিও সশব্দে যিকর করা কলবী যিক্র থেকে দুর্বল। আবার কলবী যিক্র রূহী যিক্র অপেক্ষা দুর্বল।[৯৬]

---

৯৫. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, মলফূযাতে শায়খুল ইসলাম (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে ইল্‌ম ওয়া আদব, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ ১১-২৯ ; তিনি যিক্র ও তাস্‌বীহ পাঠের ফাঁকে ফাঁকে নিম্নোক্ত দুআ পড়তেও নির্দেশ দেন ;

يَا رَبِّ أَنْتَ مَقْصُوْدِيْ تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لَكَ أَتْمِمْ عَلَيَّ
نِعْمَتَكَ وَارْزُقْنِيْ وُصُوْلَكَ التَّامَّ وَرِضَاءً لَا سَخَطَ بَعْدَهُ أَبَدًا

(নাজমুদ্দীন ইসলাহী, মাকতূবাতে সুলূক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১)

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬০-৬৩।

'পাস আনফাস' যিক্‌র সম্পর্কে তিনি বলেন, পাস আনফাস যিক্‌রের উদ্দেশ্য হল শরীরের ভিতর শ্বাসের প্রবেশ ও নির্গমণ যেন যিক্‌রের সাথে হয়। সাথে সাথে এ যিক্‌র যেন কলবের সাথে সংযুক্ত থাকে। পাস আনফাস যিকরের মধ্যে জিহবা ও ঠোঁটের নাড়াচাড়া হয় না। উচ্চারণের সময়েও কোন শব্দ শোনা যায় না। শ্বাস ভিতর প্রবেশের সময় আল্লা' আর ভিতের থেকে বেরিয়ে আসার সময় 'হু' উচ্চারিত হবে। আর ঐ যিক্‌রের মধ্যে মনের ধ্যান থাকবে যে, তিনিই ব্যক্ত আর তিনিই গুপ্ত (আল কুরআন ৫৭ ঃ ৩)। তাছাড়া নিজের চলাফেরা, উঠা বসা সর্বাবস্থায় যিক্‌র চালু থাকবে, যেন এটি নিজের পূর্ণ স্বভাবে পরিণত হতে পারে।[৯৭]

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়া যিক্‌রের আরো বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সূফীগণ সালিকের প্রয়োজন অনুসারে ঐ সকল পদ্ধতি অনুশীলন করতে দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, এ সকল যিক্‌রের ফলে সালিকের মধ্যে শরীর কম্পন, নূর দর্শন ও লতীফা জারী হওয়া ইত্যাকার বিভিন্ন হালের সৃষ্টি হয়। সেগুলো সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম বলেন, শরীর কম্পন কিংবা স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি হল হালের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো যথাযোগ্য পাত্র ব্যতিরেকে অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে অনিচ্ছায় প্রকাশিত হয়ে গেলে ক্ষতি হয় না।

জনৈক সালিকের চিঠির জবাবে তিনি লিখেছেন, আপনার শরীরে যে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে কিংবা অদৃশ্য যে ধ্বনি শ্রবণ করছেন বা হৃদয়ে যে ব্যথা অনুভব করছেন সেটি বস্তুত ঐ যিক্‌রেরই প্রতিক্রিয়া তথা হাল। যিক্‌র চলাকালে আপনি যেই ভূকম্পন অনুভব করেন তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটি যিক্‌রের ইতিবাচক প্রভাব, তবে সেদিকে মনোযোগ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। মনোযোগ থাকবে শুধু প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহ পাকের দিকে। যিক্‌র চলাকালে কিংবা অন্যান্য সময়ে কান্না ও রোনাজারী বৃদ্ধি পাওয়া চিশতিয়্যা সিলসিলার প্রভাব...... কলবের মধ্যে ব্যথার উদ্রেক হওয়ার বিষয়টিও মঙ্গলজনক। কখনো অস্থিরতা অধিক পরিমাণে বেড়ে গেলে সামান্য পানির উপর সূরা ফাতিহা দম করে পান করে নিন। ইন্‌শাআল্লাহ স্থিরতা ফিরে আসবে। রোনাজারী নিজ থেকে এসে পড়লে ভাল। তবে এর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। একখানা হাদীসে যদিও কান্নার ভঙ্গিমা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। তবে প্রকৃত মকসূদ কান্না নয়। প্রকৃত মকসূদ হল যাতে ইলাহ। কল্‌বের লতীফা জারী হওয়া আসল মকসূদ নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে যেতেও পারে। এ সকল লতীফা জারী হওয়া আসল মকসূদ

---

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

নয়। এগুলো উসিলা ও মাধ্যম মাত্র। হৃদয়ের ভিতর নূরের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়াও মকসূদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যিকরের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ পাকের ধ্যান মনের মধ্যে সদা সর্বদা জাগ্রত এবং তাঁর রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। কাজেই এ লক্ষ্যেই যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যেতে হবে।[৯৮]

সূফীগণের মতে ইসলাহে বাতিনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত একটি মহৌষধ। এর পদ্ধতি হল, যখন তিলাওয়াতের ইচ্ছা করা হবে তখন কিছুক্ষণ ধ্যান করে নিবে যে, আমি আল্লাহ পাকের সম্মুখে উপবিষ্ট আছি। একজন ছাত্র তার শিক্ষককে যেমন পবিত্র কুরআন সম্মুখে নিয়ে সবক শুনিয়ে থাকে তদ্রূপ আমিও মহান আল্লাহকে আমার তিলাওয়াত শোনাচ্ছি। মনের মধ্যে এ ধ্যান প্রতিষ্ঠিত করে তিলাওয়াত শুরু করতে হয়।[৯৯] এ মর্মে হযরত শায়খুল ইসলাম বলেন, দৈনিক অন্তত এক পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা চাই। কুরআনের অর্থ না জেনে তিলাওয়াত করার মধ্যেও উপকারিতা আছে। ঔষধের গুণাগুণ রোগীর জানা থাকুক আর না থাকুক সেবনের কারণে উপকার পাওয়া যাবেই। সুলূক ও ইসলাহের নানাবিধ পদ্ধতির মধ্যে তিলাওয়াত খুবই শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সময় একটু বেশী লাগে। তবে পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভেজাল। এখানে কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা নেই। সাহাবীগণ এ পদ্ধতিই প্রধানত অনুশীলন করেছেন। পক্ষান্তরে যিক্‌র দ্বারা মনযিলে মকসূদে দ্রুত পৌঁছা সম্ভব হলেও তাতে ঝুঁকি থাকে।[১০০]

সালিকদেরকে হযরত শায়খুল ইসলাম শোগলের অনুশীলন করতে দিতেন। সাথে সাথে নফ্‌স ও শয়তানের আনুগত্য, সম্পদ ও সম্মানের মোহ ইত্যাকার বাতেনী রোগব্যাধি থেকে তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করে যেতেন। মাকতূবাতে তিনি লিখেছেন, মনের ভিতর কুমন্ত্রণা পরিবেশনের জন্য নফ্‌স ও শয়তানের কাছে হাজার হাজার পদ্ধতি আছে। মোহ প্রবণতা, স্বার্থপরতা ও আমিত্ব রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ্যতঃ কিছু নিরাপত্তা পাওয়া গেলেও দেখা যায় যে, অতিশয় কোন সূক্ষ্ম পথে এ রোগ পুনরায় ঢুকে পড়েছে। আত্মসম্মানের মোহ এমন এক ব্যাধি যে, সূফীগণ বলেন, অন্যান্য সকল ব্যাধি হৃদয় থেকে বের হওয়ার সর্বশেষে এটি সিদ্দীকীনের হৃদয় ত্যাগ করে। আত্মিক রোগব্যাধি দূর করায় সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। তবে সর্বাগ্রে

---

৯৮. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ১৮-২৯।

৯৯. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৭।

১০০. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬।

করণীয় কাজ হল যিক্‌র ও মোরাকাবার মধ্যে নিবিষ্ট থাকা। সালিককে এ দু'টির প্রতি প্রধানত মনোযোগ রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হলে ধীরে ধীরে আখলাকের অন্যান্য দোষক্রটিও সংশোধিত হয়ে যায়।

তিনি বলেন, বাতিনী রোগব্যাধি প্রতিকারের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হল বেশী পরিমাণে যিক্‌র, পবিত্র কুরআনের মোরাকাবা ও বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করা। আর বিস্তারিত পদ্ধতি হল প্রত্যেকটি রোগব্যাধি নিরাময়ে প্রিয়নবী যে সকল উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, হাদীস থেকে সেগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা এবং সে মোতাবেক নিজকে নিরীক্ষণ পূর্বক সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা। তাসাওউফের (নির্ভরযোগ্য) গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন দ্বারাও আত্মিক ব্যাধি থেকে উপশম পাওয়া যায়। বিশেষতঃ হযরত ইমাম গাযালী রচিত কিমিয়ায়ে সাআদাত, মিনহাজুল আবেদীন প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ ফলপ্রসূ। এ সকল ব্যাপারে নফ্‌সের উপর কঠোরতা আরোপ করতে হয়। তবে এত বেশী কঠোরতা আরোপ উচিত নয় যার কারণে নিজেকে অসুস্থ হতে হয়।[১০১]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইখ্‌লাস ইত্তিবায়ে সুন্নত ও ইবাদত হল আধ্যাত্মিকতার আসল বিষয়। হযরত শায়খুল ইসলাম তাই প্রত্যেক চিঠিতে এবং সালিকদের দেওয়া প্রত্যেক উপদেশের শেষে এই কথাটির ইঙ্গিত দিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দিয়ে বলেন, নিজের কাজকর্ম, কথাবার্তা, উঠাবসা সকল ক্ষেত্রে ইখ্‌লাস বজায় রাখুন। সুলূকের অধ্যায়ে এটি প্রধান বিষয়। এটি অর্জন করা সুকঠিন। আল্লাহ জাল্লাশানুহুর অশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত বছরের পর বছর ধারাবাহিক মুজাহাদার পরেও এটি অর্জন করা যায় না। এ কারণেই সূরা ফাতিহার মধ্যে আজীবন প্রার্থনা করার জন্য 'তোমারই ইবাদত করি' কথাটির পর 'তোমারই সাহায্য চাই' কথাটি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সুন্নত অনুসরণের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। শ্রেষ্ঠত্বের এটিই মানদণ্ড। এটিই আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়। আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাহাজ্জুদ নামাযের অভ্যাস করুন। যদি অতি ভোরে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই তাহাজ্জুদের নিয়্যতে যতটুকু সম্ভব নফল আদায় করে নিন। পাঁচ বেলা নামায জামাআতের সহিত আদায় করুন। আশেপাশের লোকজনকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।[১০২]

---

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯, ২০, ২২, ২৬।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৯, ২১। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

ইসলাহী চিঠিপত্র ও বক্তব্যে তিনি বিদ্‌আত থেকে বিরত থাকতে কঠিনভাবে নির্দেশ দেন। এগুলো নিয়ে সমাজে কোন ঝগড়া বা কলহ সৃষ্টি করা তাঁর পছন্দ ছিল না। উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে মীলাদ, কিয়াম, উরস ইত্যাদি কুপ্রথা চালু আছে। এগুলো বিদ্‌আত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। এ সকল বিদ্‌আত সম্পর্কে শায়খুল ইসলামের বক্তব্য, যেখানে মীলাদ, উরস ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়, যেহেতু এ সকল কাজ শরীঅত বিরোধী ও বিদ্‌আত, তাই প্রথমতঃ এগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট লোকজনের আমল সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া চাই। যদি সংশোধন সম্ভব না হয় তাহলে ঐ সকল বিদ্‌আতী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে নিজে বিরত থাকা চাই। মীলাদকে কেন্দ্র করে কোথাও যদি ঝগড়া ফাসাদ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জের হিসেবে আরো বেশী গুনাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে কিংবা মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়, সেখানে অনিচ্ছা নিয়ে অংশগ্রহণে আপত্তি নেই। নিজের সকল কাজকর্মে ইখ্‌লাস, মানবতার প্রতি দরদ, সমবেদনা ও কল্যাণকামিতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। যথাসাধ্য ঝগড়া ফাসাদ ও অহেতুক বিতর্ক থেকে নিজকে দূরে রাখা আবশ্যক। বর্তমানে কোথাও সঠিক অর্থে 'মুনাযারা' কিংবা সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে খাহেশ পূজা ও আত্মপ্রচারই থাকে প্রধান লক্ষ্য।[১০৩]

وأما القيام في آخر الليل فاجتهد في ذلك فإن لم يتيسر لأجل المشاغل العلمية فلا ضير فإن النية لذلك لا تخلو عن ثمراتها ، نعم قبل النوم لو أتيت بركعتين بأواخر البقرة تكفيان إن شاء الله عن القيام حسب ما ورد في الأحاديث الصحيحة ثم الصلاة بالليل بعد العشاء الآخرة في أي وقت كانت هي التهجد فإن فيها تترك الهجود فبعد الفراغ عن المطالعة قبل النوم لو صليت كانت هي من قيام الليل وأما حبس النفس فلا تعجل في ذلك ومرن نفسك بالذكر النفسي الآن حتى يتجري عسى الله أن ينجح بذلك أيضا .

(নাজমুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১-৮২)

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪, ৯১।

হযরত শায়খুল ইসলামের দৃষ্টিতে তাসাওউফ মানে বৈরাগ্যবাদ নয়। জাগতিক জীবনকে সুগঠিত করার মাধ্যমেই আখিরাত অর্জন করতে হয়। তাই তিনি চিঠিপত্রে সালিকদের জাগতিক জীবন যাপনের দিকগুলোর আলোচনা করেন এবং সংশোধনের উদ্যোগ নেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বজায় রেখে সব দিক বিচার-বিবেচনাপূর্বক নিজের জন্য জীবিকার কোন বৈধ উপায় করে নেওয়া এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না হওয়া উভয়ই জরুরী। কেউ কেউ বলে থাকে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রেখে ইসলাহে নফ্‌সের সাধনা করা অসম্ভব। আমি এ মত সমর্থন করি না। কেননা শরীঅত মোতাবেক নিজ স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হওয়ার বিষয়টিও মানুষের কল্‌ব ও রূহকে শক্তিদান করে থাকে। মহিলারা শারীরিক দিক থেকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল। পারিবারিক কাজের চাপে অনেক সময় তাদের পক্ষে বেশী পরিমাণ যিক্‌র করা সম্ভব হয় না। তাই তাদের জন্য যবানী যিক্‌রই যথেষ্ট বিবেচনা করুন। পিতামাতার সেবা ও সন্তুষ্টি সালিকের জন্য সৌভাগ্য বহন করে আনে। নিজ আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর না নেওয়া এবং দুর্বল ও কমজোরদের উপর জুলুম করা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক আযাবের কারণ হয়। এ সব থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী। লেনদেন ও কাজ কারবারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। দীন ও দীনদার লোকদের মহব্বত করা অত্যন্ত ভাল কাজ। তবে অন্যদেরকে ঘৃণা করা কিংবা অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং নিজের দোষত্রুটির হিসাব না করার চেয়ে বড় ভুল আর কিছু নেই। লোকজনের সাথে বিশেষতঃ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা এবং সন্তোষজনক আচরণ করা আবশ্যক। বান্দার হক নষ্ট করা জঘন্য অপরাধ। আল্লাহর হক নষ্ট হলে তওবার দ্বারা মাফ হয়। কিন্তু বান্দার হক তওবার দ্বারাও মাফ হয় না। কখনো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হতে নেই। তিনি দয়ালু, মেহেরবান ও গুনাহ মার্জনাকরী। তিনি ওয়াদা করেছেন এবং তার ওয়াদার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই যে, আসমান, যমিন ভর্তি গুনাহ নিয়ে এসেও যদি কেউ স্বচ্ছ মনে তওবা করে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।[১০৪]

[illegible]

প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্তকে পরিভাষায় খলীফা বলা হয়। পীর-মাশায়িখের নিয়ম হল যে, তাঁদের রূহানী শিক্ষার ফয়য ও বরকত মানুষের মধ্যে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সিলসিলাকে চলমান রাখার জন্য নিজের জীবদ্দশায় নিজের কাছে

---

১০৪. প্রাগুক্ত।

দীক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে এক বা একাধিক লোককে খলীফা তথা স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন। এ ধরনের খলীফা বানানোর স্বীকৃতি মহানবীর হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত একখানা হাদীসে আছে যে, জনৈকা মহিলা প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি বিষয় জানতে চাইল। প্রিয়নবী ঐ মহিলাকে বললেন, তুমি পরে এসো। মহিলা বলল, তখন যদি আপনাকে না পাই ? উদ্দেশ্য হল তখন যদি আপনি বেঁচে না থাকেন তাহলে কি করব? নবীজী বললেন, যদি আমাকে না পাও তাহলে আবূ বকরের নিকট যেও। এ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু-কে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতীয়মান করেছেন। তাছাড়া এভাবে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে নির্ধারণ করা বা নাম ঘোষণা করার বৈধতাও উপরোক্ত হাদীস থেকে পাওয়া যাচ্ছে।[১০৫]

তবে যাকে খলীফা বানানো হয় তাকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনে যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। দীনের কোন ব্যাপারে জেনে শুনে অযোগ্য লোকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা খিয়ানতের শামিল। হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারূক রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি খেলাফতের দায়িত্ব এমন কোন লোকের উপর অর্পণ করব না, যে এ দায়িত্বের উপযুক্ত নয়। বরং এমন লোকের উপরই অর্পণ করব যিনি মুসলমানদের মানসম্মান ও ইজ্জত রক্ষার কাজে যত্নবান থাকবেন এবং আগ্রহের সাথে পালন করবেন। বর্ণিত এ হাদীস থেকে অনুপযুক্ত লোককে খলীফা বানানোর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত পীর মাশায়িখ হলেন উম্মতের রূহানী বিষয়ের চিকিৎসক ও শিক্ষক। চিকিৎসা ও শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন ব্যতিরেকে কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। পিতা চিকিৎসক হলে তার পুত্রও চিকিৎসক হবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষকের ছেলে মূর্খও হতে পারে। এ কারণেই আলিমগণ যোগ্যতাবিহীন বংশানুক্রমিক পীর প্রথাকে নাজায়িয বলেছেন। মুহাক্কিক সূফীগণ এটিকে ভয়ানক খিয়ানত বলে অভিহিত করে গিয়েছেন। যিনি খেলাফত প্রাপ্ত পীর নন তিনি কাউকে বায়আত তথা মুরীদ করতে পারেন না।[১০৬]

এ ব্যাপারে হযরত শায়খুল ইসলাম বলেন, বায়আত দু'প্রকারের। বায়আতে তওবা ও বায়আতে ইরশাদ। উভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য আছে। বায়আতে তওবার অর্থ হল, কোন মানুষকে তওবার শব্দমালা ও বাক্যের তালীম

---

১০৫. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১২।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৩।

দিয়ে তাকে শরীঅতের অনুশাসন মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা। এ পর্যায়ের বায়আত যে কোন পরহেযগার আলিম করতে পারেন। এ বায়আতের জন্য কোন পীরের খলীফা হওয়া আবশ্যক নয়। অপরটি হল বায়আতে ইরশাদ। অর্থাৎ সুলূকের আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রদান করা। এ পর্যায়ের বায়আতের জন্য অবশ্যই কোন মুহাক্কিক শায়খের মুরীদ হয়ে সুলূকের পথ অতিক্রমপূর্বক ইজাযত ও খেলাফত প্রাপ্ত হতে হবে।[১০৭]

খেলাফত প্রদানের পূর্বে সালিকের রূহানী অগ্রগতি ও যোগ্যতা যাচাই হয়। এ যাচাইয়ের মানদণ্ড সকলের কাছে এক রকমের নয়। শায়খ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সেটি নিরূপণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের নীতি আলোচনা করে শায়খুল ইসলাম বলেন, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ও হযরত আশরাফ আলী থানবীর নিয়ম ছিল সালিকের মনে সদা সর্বদা যিক্‌র চালু হয়ে গেলে তাকে ইজাযত প্রদান করা। কিন্তু হযরত গাঙ্গূহীর নিয়ম ছিল আরেকটু কঠিন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে ইজাযত প্রদান করতেন, না যতক্ষণ সালিকের ঐ যোগ্যতা একটি বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত না হত। সালিকের মধ্যে এটি পূর্ণ স্বভাবে পরিণত হওয়া এবং আপনা থেকেই মনে আল্লাহ পাকের ধ্যান ও যিক্‌র জারী হওয়া তিনি শর্ত মনে করতেন।[১০৮]

কারো থেকে খেলাফত পাওয়া খলীফার জন্য বেহেশতের সার্টিফিকেট কিংবা নিষ্পাপতার দলীল নয়। এটি তাঁর প্রতি পীরের একটি সুধারণা মাত্র। এ সুধারণার পরিবর্তন আসাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই কোন কোন শায়খ কাউকে খেলাফত প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। খেলাফত প্রাপ্তির পর সালিক রিয়াযত ও মুজাহাদার উর্ধ্বে চলে যায় না। শায়খুল ইসলাম নিজের কয়েকজন সালিককে খেলাফত প্রদানের মজলিসে স্পষ্ট বলে দেন, ইজাযত লাভের অর্থ এই নয় যে, তোমরা সুলূকের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে গিয়েছ, তোমাদের জন্য আর যিক্‌র-আয্‌কার অনুশীলনের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হল, তোমাদেরকে আধ্যাত্মিকতার একটি পাকা সড়কের গোড়ায় পৌছিয়ে দেওয়া হল মাত্র। তারপরে তোমাদের জন্য রয়েছে সুবিশাল রাজপথ, যে রাজ পথ অতিক্রম করে শেষ করা

---

১০৭. মুহাম্মদ ইদ্‌রীস হুশিয়ারপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫-১০০।
১০৮. মুহাম্মদ ইদ্‌রীস, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।

যায় না। মানুষ এ পথে যত বেশী অগ্রসর হবে ততই সে আল্লাহ পাকের নিকটে গিয়ে পৌছবে। আর এ ইজাযতের কারণে গর্বিত হওয়ারও কিছু নেই।[১০৯]

হযরত শায়খুল ইসলাম নিজে ১৬৭ লোককে খেলাফত দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হয়েছে। খলীফাগণের অধিক সংখ্যক বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসী। মায়ানমার ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও তাঁর খলীফা রয়েছেন।[১১০]

---

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

১১০. ফরীদুল ওয়াহীদী, **শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী** (নয়াদিল্লী : কাওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২), পৃ ৮২৬-৮৩৪।

তাঁর খলীফাগণের নাম যথা **বাংলাদেশে** ১. হযরত মাওলানা তালখীস হুসাইন সিলেট ২. হাজী আবদুল বারী ৩. হাজী ইরু মিয়া ৪. মাওলানা বশীর আহমদ ৫. হযরত মাওলানা মুকাদ্দস আলী ৬. সায়্যিদ আবদুল খালিক ৭. ডাঃ আলী আসগর নূরী ৮. হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ৯. হযরত মাওলানা সোলাইমান খান ১০. হযরত মাওলানা আবদুর রহীম ১১. হযরত মাওলানা মুজাহিদ আলী ১২. হযরত মাওলানা আবদুল মতীন চৌধুরী ১৩. হযরত মাওলানা আবদুর রহমান ১৪. হযরত মাওলানা তাযাম্মুল আলী ১৫. হযরত মাওলানা সালাহ উদ্দীন ১৬. হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান ১৭. হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ ১৮. হযরত মাওলানা সিরাজুল হক ১৯. হযরত মাওলানা আবদুল হক ২০. হযরত মাওলানা আবদুল মুমিন ২১. হযরত মাওলানা ইউনুস আলী ২২. হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান ২৩. হযরত মাওলানা আবদুল গাফফার ২৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী ২৫. হযরত মাওলানা রিয়াযুর রব ২৬. হযরত মাওলানা ইসমাঈল ২৭. হযরত মাওলানা হাসান আলী ২৮. হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান ২৯. হযরত মাওলানা হাফিয আবদুল করীম ৩০. হযরত মাওলানা বদরে আলম ৩১. হযরত মাওলানা মাসউদুল হক ৩২. হযরত মাওলানা মুফতী আহমদুল হক ৩৩. হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার ৩৪. হযরত মাওলানা আহমদ শফী ৩৫. হযরত মাওলানা উবায়দুর রহমান ৩৬. হযরত মাওলানা আবদুর রহমান ৩৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নুমান ৩৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস ৩৯. হযরত মাওলানা আবদুল হালীম ৪০. হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন ৪১. হযরত মাওলানা আবদুল গনী ৪২. হযরত মাওলানা রেহানুদ্দীন ৪৩. হযরত মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন ৪৪. হযরত মাওলানা আযীযুল হক ৪৫. হযরত মাওলানা কালীমুল্লাহ ৪৬. হযরত মাওলানা মুহিব্বুর রহমান ৪৭. হযরত মাওলানা আলী আশরাফ ৪৮. হযরত মাওলানা আমীনুল হক ৪৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস ৫০. হযরত মাওলানা হাফিয তায়্যিব আলী। আসামে ৫১ .হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ ৫২. হযরত মাওলানা সাঈদ আলী ৫৩. হযরত মাওলানা মুকাদ্দাস আলী ৫৪. হযরত মাওলানা আবদুল জলীল ৫৫. হযরত মাওলানা মুসাদ্দির আলী ৫৬. হযরত মাওলানা বাশারত আলী ৫৭. হযরত মাওলানা আহমদ আলী ৫৮. হযরত মাওলানা মাকবূল আলী ৫৯.মাস্টার গোলাম আহমদ ৬০. হযরত মাওলানা মুঈনুদ্দীন ৬১. হযরত মাওলানা জাওয়াদ আলী

৬২. হযরত মাওলানা হরমুয আলী ৬৩. হযরত মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ মুত্তাকীম ৬৪. হযরত মাওলানা মুকাররম আলী ৬৫. হযরত মাওলানা ইসমাঈল ৬৬. হযরত মাওলানা শফীকুর রহমান ৬৭. হযরত মাওলানা কারী আবদুল মুতাহহির ৬৮. হযরত মাওলানা কারী আবদুস সামাদ ৬৯. হযরত মাওলানা আবদুল মুসাব্বির ৭০. হযরত মাওলানা মুতাসিম আলী ৭১. হযরত মাওলানা মুযাফফর আলী ৭২. হযরত মাওলানা আবদুল হক ৭৩. হযরত মাওলানা আবদুল হক ৭৪. হযরত মাওলানা আবদুন নূর ৭৫. হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন ৭৬.হাফিয আবদুর রহীম ৭৭. হযরত মাওলানা নাজাবত আলী ৭৮.হাজী আবদুল মালিক ৭৯.হাজী শামসুল হক ৮০.হাজী মুহাব্বত আলী ৮১. হযরত মাওলানা রাহীমুদ্দীন ৮২. হযরত মাওলানা মুহসীন আলী ৮৩. হযরত মাওলানা ফরমান আলী ৮৪. হযরত মাওলানা মুসাদ্দির আলী ৮৫. হযরত মাওলানা আবদুর রাযযাক ৮৬. হযরত মাওলানা মুনযির আলী ৮৭. হযরত মাওলানা আমানুল্লাহ ৮৮. হযরত মাওলানা কারীমুদ্দীন ৮৯. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ ৯০. হযরত মাওলানা আবদুল বারী ৯১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ৯২ .হযরত মাওলানা যমীরুদ্দীন। বিহারে ৯৩ .হযরত মাওলানা হাফিয আবদুর রহমান ৯৪. হযরত মাওলানা আতহার হুসাইন ৯৫.হাজী মুহাম্মদ আইয়ূব ৯৬. হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান ৯৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব ৯৮. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ৯৯. হযরত মাওলানা আবদুর রহমান ১০০. হযরত মাওলানা হাজী মাযহারুল হক ১০১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার ১০২. হযরত মাওলানা হাকীম ফিদা হুসাইন ১০১ .হযরত মাওলানা আবদুস সালাম ১০৪. হযরত মাওলানা হাজী আহমদ হাসান ১০৫. হযরত মাওলানা কারী ফখরুদ্দীন ১০৬. হযরত মাওলানা নাবী হাসান ১০৭. হযরত মাওলানা মিনহাজ উদ্দীন ১০৮. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ ১০৯. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আকিল ১১০. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযহার ১১১. হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ১১২. হযরত মাওলানা মাহদী বুখারী ১১৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস ১১৪. হযরত মাওলানা আযহার। উত্তর প্রদেশে ১১৫ .হযরত মাওলানা নাঈমুল্লাহ ১১৬. হযরত মাওলানা আবদুল জাব্বার ১১৭. হযরত মাওলানা হাফিয মুহাম্মদ তায়্যিব ১১৮. হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ ১১৯. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী ১২০. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ায়িস ১২১. হযরত মাওলানা ইউনুস ১২২. হযরত মাওলানা হাফিয আবদুল লতীফ ১২৩. হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ সুলাইমান ১২৪. হযরত মাওলানা কারী আসগর আলী ১২৫. হযরত মাওলানা সায়্যিদ মাহমূদ হাসান ১২৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হিদায়াত আলী ১২৭. হযরত মাওলানা কুতুবুল্লাহ ১২৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আহমদ ১২৯. হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান ১৩০. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ শাহ ১৩১. হযরত মাওলানা আবদুল হাই ১৩২. হযরত মাওলানা সিফাতুল্লাহ ১৩৩. হযরত মাওলানা মুশতাক আহমদ ১৩৪. হযরত মাওলানা হাজী মুহাম্মদ আহমদ ১৩৫. হযরত মাওলানা কারীম বখশ ১৩৬. হযরত মাওলানা ইসমাঈল ১৩৭. হযরত মাওলানা মাহমূদ আহমদ। মধ্যপ্রদেশে ১৩৮. হযরত মাওলানা হাফিয আবদুল লতীফ। মাদরাজে ১৩৯.হযরত মাওলানা মুন্সী বশীর আহমদ ১৪০. হযরত মাওলানা শাইখ হাসান। পশ্চিম বাংলায় ১৪১.হযরত মাওলানা আহমাদ উল্লাহ ১৪২. হযরত মাওলানা আবদুল খালিক ১৪৩.

এ খলীফাগণের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মানবতা ও নৈতিকতার দীক্ষাদান, নামায ও ইসলামী অনুশাসন বলবৎকরণ, সুন্নতের প্রতি আহ্বান ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের সুমহান কাজ বিশেষভাবে সম্পাদন করেন। তিনি সমকালীন মুসলিম সমাজের জন্য আশু করণীয় কর্তব্য হিসেবে তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, বর্তমানে মুসলিম সর্বসাধারণের মধ্যে অজ্ঞতা ও জাহালত অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। মুসলমানরা নিজেদের ঈমানের ভিত্তি ও ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কেও পরম উদাসীন হয়ে বসে আছে। নামায ও জামাআতের প্রতি যত্নশীলতা শতকরা একজনের মধ্যেও নেই। অনেকে এই নামাযের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কেও অনবহিত। যারা সমাজের আরো নিম্নস্তরে বাস করে তাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যারা আল্লাহ ও রাসূলের নামটুকুও জানে না। কালেমা কাকে বলে, তাওহীদ ও রিসালতের অর্থ কি, ইসলামের মূলনীতি, আকীদা ও বিশ্বাস, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ইত্যাদি অনেকেরই জানা নেই। মুসলিম সমাজের এ অবহেলা খুবই দুঃখজনক। কাজেই ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এবং প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে সকলের হেদায়েত করা ও শিক্ষাদানের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা জরুরী। সমাজে বিতর্কিত মাসা'ইলের সূত্র ধরে বিরুদ্ধবাদী লোকেরা নানা অপপ্রচার চালিয়ে সরলমনা মানুষকে হাক্কানী উলামা ও মাশায়িখের প্রতি বিদ্বিষ্ট

হযরত মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দীন ১৪৪. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ ১৪৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তাহির। পূর্ব পাঞ্জাবে ১৪৬ .হযরত মাওলানা নিয়ায মুহাম্মদ ১৪৭. হযরত মাওলানা জামিল আহমদ। উত্তর প্রদেশে ১৪৮.হযরত মাওলানা নিয়াযী মুহাম্মদ রামযান। দিল্লীতে ১৪৯ .হযরত মাওলানা মুন্সী আল্লাহ দাতা ১৫০. হযরত মাওলানা কারী আবদুশ শাকূর। পাকিস্তানে ১৫১ .হযরত মাওলানা খোরশেদ আহমদ ১৫২. হযরত মাওলানা হামীদ মিয়া ১৫৩. হযরত মাওলানা হাকীম আবদুল হাকীম ১৫৪. হযরত মাওলানা মোযাহির হোসাইন ১৫৫. হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ। ১৫৬. হযরত মাওলানা আবদুল হক। বোম্বাই /করাচীতে ১৫৮ .হযরত মাওলানা আহমদ বুযর্গ১৫৮. হযরত মাওলানা আবদুস সামাদ ১৫৯. হযরত মাওলানা আবদুস সামাদ ১৬০. হযরত মাওলানা আবদুল গফূর ১৬১. হযরত মাওলানা সায়্যিদ সুলাইমান শাহ কাদিরী ১৬২. হযরত মাওলানা বদীউযযামান ১৬৩. হযরত মাওলানা আবদুল হাকীম ১৬৪. হযরত মাওলানা সায়্যিদ তালিব আলী ১৬৫. হযরত মাওলানা আবদুস সামাদ। বার্মায় ১৬৬ .হযরত মাওলানা মুযাফফর আহমদ। দক্ষিন আফ্রিকায় ১৬৭ .হযরত মাওলানা ইয়াযিদ ।

করে রেখেছে। ফলে ঐ মানুষরা ঈমান ও আমালের জরুরী বিষয় জানা থেকেও বঞ্চিত হয়ে আছে। কোথাও কোথাও শরীঅতের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার করার সুযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ জন্য বর্তমানে বেশী জরুরী হল লোকজনকে নামাযী বানানো এবং তাদেরকে ইসলামের মূলনীতি ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা ও বিশ্বাসের তালীম দেওয়া।

তিনি বলেন, মানুষকে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে সংশোধনের কাজ মিষ্টি ভাষা ও মিষ্টি আচরণের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। এ মহৎ কাজে নিজের যতটুকু শক্তি আছে তা ব্যয় করুন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, আজকাল আলিমগণ ধর্মের দাওয়াত নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া ও তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের ইসলাহ করার কাজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষিত মুসলিম যুবক শ্রেণীর খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে না। এটি এ সমাজের অপর একটি মারাত্মক ভুল। পূর্বকালে কুফ্র ও নিফাকের কথা জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে এতটুকুই যথেষ্ট নয়। সুন্নতের অনুসরণ ও শরীঅতের অনুশাসন জীবিত করুন। মুসলমানদের যারা নামায পড়ে না প্রোগ্রাম করে তাদের অন্তত ১০ জনকে নামাযী বানানোর চেষ্টা করুন। নিজের আশেপাশে অবস্থিত লোকজনের মধ্যেও এ স্কীম চালু করুন। যারা এ স্কীমের সদস্য হবে তাদেরও প্রত্যেকের একই দায়িত্ব থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে অন্তত দশজন পুরুষ কিংবা দশজন মহিলাকে নামাযী বানাবে।

শরীঅত বহির্ভূত রুসম-রেওয়াজ ও বিদ্আত থেকে নিজে বিরত থাকুন এবং অপরকে রাখুন। সর্বদা যথাসম্ভব ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট থাকুন। গ্রামে গ্রামে ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করুন। এ সকল মকতবে পবিত্র কুরআনসহ ধর্মীয় বইপত্র, মাতৃভাষা ও অংক শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। হযরত মুফ্তী কিফায়েত উল্লাহ রচিত 'তালীমুল ইসলাম' চার খণ্ড শিশু শিক্ষার জন্য খুবই উপযোগী। মক্তবে শিশুদের ধর্মীয় পূর্ণ শিক্ষাদানের লক্ষ্যেই-এ বইগুলো রচনা করা হয়েছে। যে শিশুরা ক্ষেতে খামারে কাজ করার কারণে দিনের বেলা ধর্মীয় তালীম গ্রহণের সুযোগ পায় না। তাদেরকে বাদ মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়। দরিদ্র অভাবী মুসলমানদের শিক্ষা প্রদানের দিকেও মনোযোগ দেওয়া জরুরী। সম্ভব হলে এ স্কীম আশেপাশের মানুষের মধ্যেও চালু করুন।[১১১]

১১১. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫, ৮৫, ৯২, ৯৯, ১৬৫।

কারামত

হযরত শায়খুল ইসলাম বহু কারামতের জন্য খ্যাত ছিলেন। ইসলামী শরীঅতে কারামতের সত্যতা স্বীকৃত। শরহে আকায়িদ আন্ নাসাফী গ্রন্থে আল্লামা তাফতাযানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ওলীগণের কারামত সত্য।[১১২] পবিত্র কুরআনে হযরত মারয়াম থেকে প্রকাশিত একটি কারামতের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

﴿يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾

হে মারয়াম! এটি (ফল) তোমার নিকট কোথা থেকে আসল? তিনি উত্তর করলেন, আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।[১১৩]

হযরত মারয়ামের হাতে অমৌসুমে তালাবদ্ধ হুজরার ভিতর তাজা ফল প্রাপ্তির ঘটনাটি তাঁর অন্যতম কারামত হিসেবেই আলোচিত হয়েছে।[১১৪] মহানবীর হাদীসেও এ ধরনের বহু কারামতের স্বীকৃতি বিদ্যমান।

সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে সাহাবী হযরত খুবায়ব রাযিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মক্কার কাফিরদের হাতে বন্দী হন এবং তাঁকে শৃংখলিত অবস্থায় একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হয়, তখন তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে গৃহকর্তা হারিসের জনৈকা কন্যা বলেছিল, আমি খুবায়বকে প্রকোষ্ঠের ভিতর আঙুরের ছড়া থেকে হাত দিয়ে আঙুর ছিড়ে খেতে দেখেছি। অথচ ঐ সময় মক্কার কোথাও আঙুর ফলের নামগন্ধও ছিল না। তাছাড়া খুবায়ব নিজেও ছিলেন ঘরের ভিতর শক্ত লৌহ শৃংখল দ্বারা আবদ্ধ। সাহাবী হযরত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একখানা হাদীসে আছে যে, হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র রাযিআল্লাহু আনহু ও হযরত আব্বাদ ইব্ন বিশ্র রাযিআল্লাহু আনহু একদা অন্ধকার রাতে মহানবীর দরবারে ছিলেন। উভয়ে যখন মহানবীর দরবার থেকে প্রস্থান করলেন, তখন দু'টি আলোকবর্তিকা তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হল এবং তাঁদের সাথে পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর রাস্তার মোড়ে পৌছে তাঁরা যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আলোকবর্তিকাগুলোও পৃথক হয়ে তাঁদের দু'জনের সাথে চলে গেল। কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীসে বর্ণিত এ সব ঘটনা ছিল বস্তুত সাহাবীদেরই কারামত।[১১৫]

---

১১২. সাদুদ্দীন তাফ্তাযানী, শারহুল আকায়িদ আন্ নাসাফিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২।

১১৩. আল কুরআন ৩ ঃ ৩৭।

১১৪. মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে ইসলামী আকীদা (ঢাকা ঃ আল আকাবা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ ১৯২-১৯৩।

১১৫. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭-৩১৮।

এই কারামত আল্লাহর নিকট ওলীদের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে বলেই এগুলোকে পরিভাষায় কারামত (সম্মান) বলা হয়।

কারামত হিসেবে প্রকাশিত ঘটনা সাধারণত বিস্ময়কর হয়ে থাকে। তবে যে কোন লোক থেকে প্রকাশিত বিস্ময়কর ঘটনাকেই কারামত বলা যায় না। বিশিষ্ট বুযর্গ শায়খ বায়যীদ বুস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কোন লোককে যদি বাতাসের উপর ভর করে পাখির মত উড়তে দেখ কিংবা পানির উপর দিয়ে পায়ে হেটে চলতে দেখ অথচ তারা শরীঅতের পাক্কা অনুসারী নয় এমন লোককে ওলী বলে বিশ্বাস করো না, তার ঐ কাজ কোন কারামত নয় বরং সে ভণ্ড, সে কিছুই নয়। শরীঅতের পূর্ণ অনুসরণ বিহীন বিস্ময়কর ঘটনার কোন মূল্য নেই। এ কারণেই সূফীগণ কারামতের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, এমন কোন অস্বাভাবিক কাজকে পরিভাষায় কারামত বলে যেগুলো কোন মুসলমান পরহেযগার ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হয়। কাজেই যে অস্বাভাবিক কাজ কোন যোগী, ঋষি, যাদুকর কিংবা বে-শরা ফকির ও বিদ্‌আতীদের থেকে প্রকাশিত হয় সেগুলো কারামত নয়।[১১৬] ঐ গুলোকে পরিভাষায় ইর্‌হাছ ও ইস্তিদরাজ বলে।

কারামত প্রধানতঃ দুই প্রকারের। বাহ্যিক কারামত ও আভ্যন্তরীণ কারামাত। বাহ্যিক কারামত বলতে লোকচোখে দৃশ্যত অস্বাভাবিক কার্যাবলীকে বোঝায়। আর আভ্যন্তরীণ কারামত হল সদা সর্বদা নিজেকে শরীঅত ও সুন্নতের উপর এমনভাবে সুদৃঢ় রাখা যে, কখনোই কোন বিচ্যুতি স্পর্শ করতে পারে না।

---

১১৬. মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, আহকামে যিন্দেগী (ঢাকা : মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ ৫৫।

قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْحَكِيْمِ فِي حَاشِيَةِ الْخَيَالِي اَلْخَوَارِقُ سِتَّةٌ وَوَجْهُ الضَّبْطِ أَنَّ الْخَارِقَ إِمَّا ظَاهِرٌ عَنِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْكَافِرِ وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ مَقْرُوْنًا بِكَمَالِ الْعِرْفَانِ وَهُوَ الْمَعُوْنَةُ أَوْ يَكُوْنَ وَحِيْنَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَقْرُوْنًا بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ فَهُوَ الْمُعْجِزَةُ أَوْ لَا وَحِيْنَئِذٍ لَا يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ دَعْوَاهُ فَهُوَ الْإِرْهَاصُ أَوْ لَا فَهُوَ الْكَرَامَةُ وَالثَّانِي أَعْنِي الظَّاهِرُ عَلَى يَدِ الْكَافِرِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا لِدَعْوَاهُ فَهُوَ الْاِسْتِدْرَاجُ وَإِلَّا فَهُوَ الْإِهَانَةُ.

মুহাক্কিক আরিফগণের মতে বাহ্যিক কারামত অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ কারামত অধিকতর মানসমৃদ্ধ। কেননা বাহ্যিক কারামতে ইর্হাছ কিংবা ইস্তিদ্রাজের আশংকা থাকে অথচ আভ্যন্তরীণ কারামতের মধ্যে এ ধরনের কোন আশংকা নেই। আভ্যন্তরীণ কারামত বাহ্যিক কারামত অপেক্ষা সহস্র গুণ বেশী শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই হাক্কানী বুযর্গগণ আভ্যন্তরীণ কারামতের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

বাহ্যিক কারামতের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওলীর নিজস্ব ইচ্ছা ও অবগতির সংযুক্তি থাকা আবশ্যক নয়। কারামতের সাথে ওলীর ইচ্ছা ও অবগতি সংযুক্ত থাকতেও পারে আবার সংযুক্তি নাও থাকতে পারে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাহ্যিক কারামত আবার তিন প্রকারের। এক. সেই সকল কারামত যেখানে ওলীর ইচ্ছা ও অবগতি উভয়ের সম্পৃক্ততা আছে, যেমন হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে নীলনদে জোয়ারের সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা। এটি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমরের একটি কারামত ছিল। এ ঘটনার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা ও অবগতি উভয়ের সম্পৃক্ততা ছিল। দুই. ঐ সকল কারামত যেখানে ওলীর অবগতি সংযুক্ত আছে কিন্তু ঘটনাটি তাঁর ইচ্ছাক্রমে সংঘটিত হয়নি। যেমন, হযরত মারয়ামের হাতে অমৌসুমে ফল প্রাপ্তির ঘটনা। এখানে হযরত মারয়াম ঘটনাটি জানেন তবে তাঁর নিজ ইচ্ছাক্রমে ঘটনাটি সম্পাদিত হয়নি। তিন. ঐ সকল কারামত যেখানে ওলীর ইচ্ছা ও অবগতি কোন কিছুরই সম্পৃক্ততা নেই। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহু-এর আহার বৃদ্ধির ঘটনা। একবার তিনি মেহমানদের নিয়ে আহার করছিলেন। আহারের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল যে, খাদ্যদ্রব্য দ্বিগুণ এমনকি তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত আবূ বকর নিজেই বিস্মিত হন।[১১৭]

কোন ব্যক্তি ওলী বিবেচিত হওয়ার জন্য তার বাহ্যিক কারামত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়। বিগত কালে উচ্চমানের এমন বহু ওলী গিয়েছেন, যাদের জীবনে বাহ্যিক একটি কারামতও দেখা যায়নি। আর এ কারণে তাঁদের বেলায়েতকে খাটো নজরে দেখার অবকাশ নেই। বরং আরিফগণ বলেছেন, ওলীদের ঐ দলটি শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ। আবার বাহ্যিক যে সকল কারামত পাওয়া যায়, ওলীর জন্য সেগুলো নিজে প্রকাশ করা কিংবা প্রচার করা নাজায়িয। নিজের কারামত গোপন রাখা ওয়াজিব। তবে অনিচ্ছায় প্রকাশিত হয়ে গেলে কিংবা শরীঅতের বিশেষ কোন প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে প্রকাশ করতে বাধ্য হলে তাতে ক্ষতি নেই। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী বলেন, বিভিন্ন রকমের কলাকৌশল ও

১১৭. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৯।

সাধনার দ্বারা সম্মোহন সৃষ্টি, জিন্ন হাযির করা, জিন্ন বশীভূত করা, তিলিসমাৎ, ধাঁধাবাজি ও নজরবন্দী ইত্যাদি করা যেমন কারামত নয় তেমনি ওলীদের প্রকৃত কারামতকে মানবীয় কলাকৌশলের প্রতিক্রিয়া প্রসূত বলে একই লাঠিতে সবকিছু হাঁকানো অনুচিত। বরং শরীঅতের আলোকে উভয়ের পার্থক্য বজায় রেখে বিচার করা আবশ্যক।[১১৮]

কারামতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ওলীদের সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন। হযরত শায়খুল ইসলামের জীবনে আভ্যন্তরীণ কারামত অর্থাৎ শরীঅত ও সুন্নতের উপর দৃঢ়তা ও ইস্তিকামাতই ছিল প্রধান। এই কারামতই তাঁকে অবিসংবাদিত বুযর্গের মাকামে পৌছিয়ে দেয়।[১১৯] তবে তাঁর বহু বাহ্যিক কারামতও ছিল। পরবর্তী আলোচনায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামত বর্ণনা করা হল।

দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষক মাওলানা আবদুস্ সমী বলেন, একবার আমি হযরত শায়খুল ইসলামকে তাঁর সাথীদেরসহ আহারের জন্য আমন্ত্রণ করলাম। আমি যখন আমন্ত্রণ করি তখন তাঁর সাথে সাথীদের সংখ্যা তেমন ছিল না। কাজেই সেই অনুসারেই আমি আহার তৈরী করি। কিন্তু ঠিক আহারের সময় আরো অতিরিক্ত বহু সাথী জমায়েত হয়ে যায়। শায়খুল ইসলাম সকলকে নিয়েই হাযির হন। মেহমানদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী দেখে আমি বিচলিত হই এবং শায়খুল ইসলামের কাছে আরয করি যে, একটু সময় বিলম্ব করা হলে আমার পক্ষে নতুনদের জন্য আহার তৈরীর কাজ সহজ হবে। তিনি তাতে সম্মত হলেন না। তিনি আমাদের তৈরী রুটি ও গোশ্তের উপর একটি চাদর ফেলে আহারগুলো ঢেকে দেন এবং নিজে পাশে বসে স্বহস্তে পরিবেশন শুরু করেন। মাওলানা আবদুস্ সমী বলেন, আমরা সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম যে, তিনি আহার তুলে দিচ্ছেন আর মেহ্মানদের সকলে তৃপ্তি ভরে আহার করছেন। মেহ্মান সংখ্যা কয়েকগুণ হওয়া সত্ত্বেও আহারের কোন স্বল্পতা দেখা যায়নি। অধিকন্তু পাত্রে বেশ কিছু আহার অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তিনি অবশিষ্ট আহার বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দেন।[১২০]

ভারত বিভক্তির পর হযরত শায়খুল ইসলাম ধর্মীয় ওয়ায মাহফিল উপলক্ষে ভাগলপুরের এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময়ে জনৈক

---

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২১।

১১৯. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, **সীরতে শায়খুল ইসলাম** (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৮৮), ১ম খণ্ড, পৃ ২৩৩-২৪০।

১২০. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, **ওয়াকিআত ওয়া কারামাত**, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

অন্ধলোক এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তিনি অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, হযরত! দেশ বিভক্তির সময় আপনি ভাগলপুর এক জনসভায় আগমন করেছিলেন। তখন আমি আপনাকে শক্ত ভাষায় গালিগালাজ করি এবং আপনাকে একটি কালো পতাকা দেখিয়ে অপমান করি। এরই প্রায়শ্চিত্ত রূপে সভাশেষে বাড়ী ফেরার পথে আমার চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে যায়। লোকটি আরয করে আরো বলল, হযরত! আমার ইহজগত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আমি আমার পরকাল সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় আছি। আমি খালিস অন্তরে তওবা করছি এবং আমার পরকাল যেন নষ্ট না হয় সে জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি। লোকটির কথা শুনে শায়খুল ইসলাম তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন, তাকে আদর করলেন এবং সকলকে নিয়ে তার মাগফিরাত ও নাজাতের দুআ করলেন।[১২১]

বোম্বাই সেন্ট্রাল মসজিদের খতীব মাওলানা শওকত আলী হযরত শায়খুল ইসলামের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। তিনি পানিভর্তি একটি বোতলে চাপা ফুল সাজিয়ে শায়খুল ইসলামকে হাদিয়া দেন। শায়খুল ইসলাম ঐ হাদিয়া গ্রহণ করেন এবং এটিকে তারই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখার কথা বলে ফেরত দেন। বোতলের পানিতে চাপা ফুল এ প্রক্রিয়ায় সাজানোর দ্বারা সাধারণতঃ ৩/৪ মাস অবিকৃত থাকে। কিন্তু শায়খুল ইসলামের কারামত ছিল যে, ঐ ফুল ৩/৪ মাসের জায়গায় ৩ বছর ৩ মাস কাল একই অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ১৯৫৭ সালের ৫ ডিসেম্বর যখন শায়খুল ইসলামের ওফাত হয় তখন ফুলটিও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। ফুলটি তখন এত কালো বর্ণে রূপান্তরিত হয় যে, বোতলে অবস্থিত পানির রং পর্যন্ত কাল হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা শওকত এ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যান।[১২২]

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা হামীদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একবার ফয়যাবাদ নিবাসী খান রিয়াসত আলী, মাওলানা বশীরুদ্দীন ও হযরত শায়খুল ইসলাম এই ৩ জনের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা ঘোড়ায় আরোহণ করে আযমগড়ের কাত্তালপুর যাচ্ছিলেন। যাত্রার শুরুতে রাস্তায় প্রখর রোদ ছিল। প্রচণ্ড গরমে সাথীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এমন সময় দেখা গেল, এক খণ্ড মেঘ কাফেলাকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। অনেক দূর পর্যন্ত এ ভাবে পথ অতিক্রমের পর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। সাথীরা বৃষ্টির কারণে বিচলিত হয়ে

---

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫-৬৬।

১২২. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, হায়রত আঙ্গীয ওয়াকিআত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

পড়েন। কিন্তু দেখা গেল আশেপাশে বৃষ্টি পড়ছে অথচ তাদের শরীরে বৃষ্টি পড়ে না। ঘোড়াগুলো পানিতে ভেজা পথ দিয়েই হেটে চলছে অথচ পিঠের উপর কোন বৃষ্টি নেই। এ অবস্থা লক্ষ্য করে কাফেলার সকলেই বুঝতে সক্ষম হন যে, এটি শায়খুল ইসলামের কারামত।[১২৩]

বিজনৌর জেলার সাহসপুরে হযরত শায়খুল ইসলামের আগমন উপলক্ষে বিশাল রাজনৈতিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তখন ছিল জুন মাস। তিনি পূর্বদিন রাতেই ঐ স্থানে পৌছেন। পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার। ফলে সমাবেশের আয়োজনকারীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। তারা শায়খুল ইসলামের নিকট বৃষ্টি না হওয়ার দুআ করতে আবেদন জানান। তিনি বললেন, বৃষ্টির দ্বারা দেশের কৃষকরা উপকৃত হয়ে থাকে। আপনারা কি একটি সমাবেশের স্বার্থে কৃষকদের এই অতি প্রয়োজনীয় বৃষ্টি স্থগিত করতে চাচ্ছেন? এ কথা বলে তিনি খিমায় চলে গেলেন। এমন সময় অপরিচিত ও নাঙ্গামস্তক বিশিষ্ট জনৈক মজযূব এসে বলল, মাওলানা হুসাইন আহমদকে গিয়ে বল, আমি এ অঞ্চলের সেবক। বৃষ্টি স্থগিত করতে হলে আমার মাধ্যমে করতে হবে। সমাবেশে কর্মীরা ঐ প্রস্তাব শায়খুল ইসলামের নিকট নিয়ে গেল। তিনি তখন খিমার ভিতর বিশ্রাম করছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি শুনে উঠে বসলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধের সাথে বললেন, যাও বলে আস যে, বৃষ্টি হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, শায়খুল ইসলামের এ কথা বলার পর বাইরে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মজযূব লোকটিকে আর পাওয়া যায়নি। বিকেলে নির্বিঘ্নে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়।[১২৪]

একবার তিনি গুজরাট গেলেন। স্থানীয় লোকজন একটি কূপ সম্পর্কে আবেদন করে বললেন যে, কূপটি জনচলাচালে অবস্থিত। অথচ এটির পানি অতিশয় লোনা বলে কেউ উপকৃত হতে পারে না। তাদের বক্তব্য শুনে শায়খুল ইসলাম এক গ্লাস পানিতে দম করে দিলেন এবং এই পানি কূপটির ভিতর ফেলে আসতে বললেন। তখন থেকে কূপটির পানি পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। পানি পান উপযোগী হয়। লোকেরা আজ অবধি এই কূপের পানি দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।[১২৫]

হযরত শায়খুল ইসলাম সাবেরমতি জেলে অবস্থানকালে তাঁর সাথে মুনশী মুহাম্মদ ইয়ামীন বন্দী ছিলেন। মুন্‌শী ইয়ামীন বলেন, জেলের ভিতর জনৈক

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।
১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

হত্যা মামলার আসামী আমাদের সাথে পরিচিত হয়। তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়ে যায়। লোকটি উপায়ান্তর না দেখে শায়খুল ইসলামের দ্বারস্থ হয় এবং দুআর আবেদন জানায়। শায়খুল ইসলাম প্রথমতঃ তার কথায় কান দেননি। কিন্তু লোকটির বারংবার অনুরোধের কারণে এক পর্যায়ে তিনি আবেগ আপ্লুত হঁয়ে পড়েন। তিনি বললেন, যাও লোকটিকে শান্ত হতে বল এবং জানিয়ে দাও যে, ফাঁসি হবে না। কিন্তু সে ততক্ষণ পর্যন্ত খালাস প্রাপ্তির কোন নিদর্শন দেখতে পায়নি। এদিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মাত্র দুই দিন বাকি। লোকটি তখন আবারো তার কাছে আসে। তিনি তার জন্য দুআ করলেন এবং বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি খালাস পেয়ে যাবে। সে ফিরে গিয়ে দেখল, ঠিকই তার আদেশ রহিত হয়ে গিয়েছে এবং সে খালাস পেয়ে গিয়েছে।[১২৬]

হযরত শায়খুল ইসলামের জনৈক মুরীদ বলেন, বায়আত হওয়ার পর প্রথম দিকে আমার উপর নিদ্রার প্রাবল্য ছিল। ফজ্‌র ও যুহ্‌র নামায নিদ্রার কারণে ছুটে যেত। শায়খুল ইসলামকে আমার এ অবস্থা জানানোর পর তিনি আমার জন্য দুআ করেন। ফলে অবস্থা দাঁড়াল যে, প্রত্যহ ফজ্‌র ও যুহ্‌রের পূর্বক্ষণে স্বপ্নে দেখতাম যে, স্বয়ং শায়খুল ইসলাম আমাকে নামাযের জন্য শাসাচ্ছেন। প্রায় দেড় মাস এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। অবশেষে আমি যথাসময়ে গাত্রোত্থানে অভ্যস্ত হলে এ স্বপ্ন দর্শন বন্ধ হয়ে যায়।[১২৭]

একবার তিনি মীরাঠ রেল স্টেশনের ভিতর মাগরিবের নামায আদায়ের জামাআত শুরু করলেন। ইত্যবসরে গাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সংকেত দিয়ে বাঁশি বেজে উঠল। লোকজন বাঁশির আওয়ায শুনে নিয়্যত ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তিনি খুব স্থিরতার সাথে নামায আদায় করে চললেন। তিনি নামাযে ছিলেন বলে তাঁর সাথীরাও নামাযে থাকেন। অবশেষে সালাম ও দুআ সব শেষ করার পর তিনি যখন গাড়ীতে গিয়ে বসলেন, তখন গাড়ী ছেড়ে যায়। খাদিমদের একজন বললেন, হযরত! বাঁশির আওয়ায শুনে আমাদের মনেও প্রচণ্ড অস্থিরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। গাড়ী তৎক্ষণাৎ ছেড়ে যায়নি বলেই রক্ষা পেলাম। তিনি বললেন, ভাই! আমি তো বাঁশির আওয়াযই শুনতে পাইনি। নতুবা আমার ভিতরেও অস্থিরতা এসে যেত। নামাযে মনোযোগ দানের পর অন্য কিছুই আর কানে শোনা যায় না।[১২৮]

---

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩।
১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৮।
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭১।

হযরত হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দেওবন্দের এক বাড়ীতে আমরা কয়েকজন আমন্ত্রিত হলাম। সন্ধ্যায় আহারের পর আমন্ত্রণকারী আমাদেরকে চা পানের অনুরোধ জানান। শায়খুল ইসলামের তখন সবক পড়ানোর সময়। তিনি পড়ানোর কথা বলে বিদায় নিয়ে আসতে চাইলেন। আমন্ত্রণকারী বললেন, আপনার সবক পড়ানোর এখনো ১৫ মিনিট দেরী আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে এই ১৫ মিনিট আমি ঘুমিয়ে নিই। এ কথা বলেই তিনি শুয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে গেলেন। আপাত নজরে বোঝা গিয়েছিল যে, নিদ্রা শেষ হতে বেশ সময় লাগবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঠিক ১৫ মিনিটের সময় তিনি নিজ থেকেই উঠে গেলেন। নিদ্রার উপর তাঁর অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ শক্তি দেখে আমরা সকলে অবাক হয়ে গেলাম।[১২৯]

কীরানা প্রদেশের মৌলভী আহমদ উল্লাহ্ বলেন, একবার আমরা তাঁকে আহারের আমন্ত্রণ করি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত সাথী ছিলেন ১২ জন। আমরা ঐ ভাবেই আহার প্রস্তুত করি। কিন্তু যথাসময়ে সাথীদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ১৫০ জনে পরিণত হয়। আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিনি ঐ আহারের উপর একটি চাদর ফেলে দিয়ে নিজেই খানা পরিবেশন করেন। ফলে ১২ জনের জন্য প্রস্তুতকৃত আহার দেড়শত মানুষকে তৃপ্তি ভরে খাওয়ানোর পরেও পর্যাপ্ত আহার অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। হযরত শায়খুল ইসলামের এ ধরনের আরো বহু কারামত রয়েছে।[১৩০] তাঁর জীবনী রচয়িতাগণ ঐ সকল কারামত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থে কেবল অনুমানের জন্য কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হল।

মুকাশাফাত

কারামতের ন্যায় হযরত শায়খুল ইসলামের বহু কাশ্ফ বর্ণিত আছে। মুকাশাফা ও কাশ্ফের অর্থ কোন কিছু উন্মুক্ত হওয়া। শরীঅতের পরিভাষায় কাশ্ফের অর্থ হল আল্লাহর ওলীদের কাছে অদৃশ্য কিংবা অজ্ঞাত কোন জিনিস আল্লাহর ইচ্ছায় উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া।[১৩১] পবিত্র কুরআনে হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫।

১৩০. আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৭-১৫৭।

১৩১. ড.মুহাম্মদ আবদুল হাই, বাসাইরে হাকীমুল উম্মত (করাচী : সাঈদ কোম্পানী, ১৯৮৯), পৃ ২১৫-২১৬।

শরীরের গন্ধ অনুভব করার ঘটনা বর্ণিত আছে।[১৩২] আলিমগণ এ ঘটনাকে হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর কাশ্‌ফ বলে অভিহিত করেছেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বহু কবরবাসীর অবস্থা কাশ্‌ফ হয়েছিল। তিনি কবরবাসী অনেককে আল্লাহর আযাবে আক্রান্ত অবস্থায় দেখেছেন এবং নিজ কানে তাদের কান্নাকাটি শুনেছেন। এভাবে মিরাজের ঘটনায় মহানবীর হাতের তালুতে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র ফুটে উঠা, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননকালে সানআ ও মাদায়েন নগরদ্বয় দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হওয়া, মদীনায় বসে হাবশার সম্রাট নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ লাভ করা প্রভৃতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাশ্‌ফেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৩৩] সাহাবায়ে কিরাম থেকেও বহু কাশফ বর্ণিত আছে। যেমন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু মসজিদে নববীর মিম্বর থেকে ইরানে অবস্থিত নেহাওয়ান্দ যুদ্ধের সেনাপতি হযরত সারিয়া রাযিআল্লাহু আনহু-কে ডেকে সতর্ক করা, হযরত উসমান রাযিআল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারী আশ্‌তার নাখয়ী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ইত্যাকার ঘটনা সাহাবীদের কাশ্‌ফ হিসেবে পরিগণিত।[১৩৪]

কাশ্‌ফের হাকীকত আলোচনা করে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা বলেন, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দ্বারা বান্দার অভ্যন্তরে একটি নূরের সৃষ্টি হয়। এই নূরকে হাদীসের ভাষায় 'ফিরাসাত' ও অন্তর্দৃষ্টি বলে।[১৩৫] একখানা হাদীসে কুদ্‌সীতে কাশ্‌ফের এই হাকীকত আলোচনা করে আল্লাহ পাক বলেন, আমার বান্দা ফরয ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার যতখানি নৈকট্য লাভ করে অন্য কোন উপায়ে ততখানি নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। এই নৈকট্যের ফলে আমি তাকে আমার প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে বরণ করে নেই। তখন আমি তার কানে পরিণত হই, যেই কান দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার চোখে পরিণত হই, যেই

---

১৩২. আল কুরআন ১২ : ৯৪।

১৩৩. মহানবীর মুজিযা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে 'মুজিযার স্বরূপ ও মুজিযা', 'মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, ঢাকা, ইসলামিক রিচার্স ইনিস্টিটিউট, ১৯৯৯।

১৩৪. সাদুদ্দীন তাফ্‌তাযানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩।

১৩৫. মূল হাদীস :

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ))

চোখ দিয়ে সে দর্শন করে। আমি তার হাতে পরিণত হই, যেই হাত দিয়ে সে কোন কিছু ধারণ করে। বান্দা সঠিক রিয়াযত ও মুজাহাদার এ পর্যায়ে উপনীত হলে তার হৃদয়পট একটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আয়নায় পরিণত হয় এবং ঐ আয়নায় বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাই তার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত কোন ফিরাসত সাধারণতঃ অবাস্তব হয় না। তাছাড়া বান্দা যখন আল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে দেখে এবং আল্লাহকে সঙ্গে নিয়েই শুনে, তখন তার দেখা ও শোনা সবকিছু বাস্তবসম্মত হওয়াই স্বাভাবিক।[১৩৬]

উল্লেখ্য এটি 'আলিমুল গায়ব' হওয়া কিংবা অদৃশ্য সম্পর্কে জানার নাম নয়। আলিমুল গায়ব একমাত্র আল্লাহ তাআলা। বান্দা আলিমুল গায়ব হতে পারে না।[১৩৭] তবে কাশ্‌ফের মাধ্যমে বান্দা যা জানতে পারে সেটি বস্তুত আল্লাহ পাক তার অন্তরে বিষয়টি ঢেলে দেওয়ার কারণেই জেনে থাকে। এখানে বান্দার নিজস্ব কোন ইখ্‌তিয়ার নেই। এক্ষেত্রে মূর্খ লোকেরা অনেক সময় ভুল করে। এ জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী বলেন, শরীঅতের হুকুম বহির্ভূত কোন কাশ্‌ফ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া কাশ্‌ফের দ্বারা শরীঅতের কোন হুকুমকে রদবদল করা যায় না। কাজেই কারো কাশ্‌ফ শরীঅতের হুকুম বহির্ভূত হলে ঐ কাশ্‌ফ বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৩৮]

কারামতের ন্যায় মানুষ ওলী বিবেচিত হওয়ার জন্য মুকাশাফাত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়। ওলীর মুকাশাফাত হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। বহু সাহাবী এমন ছিলেন যাঁদের জীবনে একটি কাশ্‌ফও হয়নি। এতদসত্ত্বেও তাঁদের মর্যাদাহানি ঘটেনি। উম্মতের সকলে একমত যে, সাহাবীগণের মধ্যে যিনি সর্বনিম্ন তিনিও পরবর্তীকালীন সকল ওলী বুযর্গের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ।[১৩৯]

হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন যেসব বুযর্গের কাশ্‌ফ হয়ে থাকে, তাঁদের মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। তাঁদের কারো কাশফ খুব বেশী হয়ে থাকে, আবার কারো কাশ্‌ফ খুব কম হয়। থানবী স্পষ্ট বলেন, আমি হযরত শায়খুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত খলীল আহ্‌মদ সাহারানপুরী

---

১৩৬. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, শরীঅত ওয়া তরিকত কা তালাযুম, প্রাগুক্ত, ১৯৯।

১৩৭. মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোছাইন, মুজিযার স্বরূপ ও মুজিযা, প্রাগুক্ত, পৃ ২১২।

১৩৮. শাহ্ আশরাফ আলী থানবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৪-৩২৫।

১৩৯. মাওলানা মুশতাক আহমদ, 'আসহাবে রাসূলের মর্যাদা'' ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টো-ডিসে, ১৯৯৫,৩৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা), পৃ ১০০।

রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত অবিসংবাদিত বুযর্গদের কোলে বসতেও ভয় পাই না। কিন্তু হযরত শাহ্ আবদুর রহীম রায়পুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে বসতেও ভয় হয়। কেননা হযরত রায়পুরীর মুকাশাফাত খুব বেশী হয়। তাই ভয় হয় যে, কোন মুহূর্তে আমার সম্পর্কে কি কথা তাঁর কাছে কাশ্ফ হয়ে বসে?[১৪০]

মুকাশাফাত সাধারণতঃ দু'প্রকারের। মুকাশাফাতে কাওনী ও মুকাশাফাতে ইলাহী। মুকাশাফাতে কাওনীর অর্থ হল বস্তু ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে কোন কিছু কাশ্ফ হওয়া। মুকাশাফাতে ইলাহীর অর্থ হল মহান আল্লাহর মারিফাত ও গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে কাশ্ফ হওয়া। মুকাশাফাতে কাওনীর সাহায্যে বান্দা দূরে কিংবা নিকটে অবস্থিত কোন জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কিন্তু মুকাশাফাতে ইলাহীর সাহায্যে সে মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, আলমে বারযখ, আলমে মিছাল ইত্যাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। এই অবগতির দ্বারা আরিফের মনে যওক, শওক ও মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। মানগত দিক থেকে মুকাশাফাতে কাওনীর তুলনায় মুকাশাফাতে ইলাহী বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা মুকাশাফাতে ইলাহীর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধি পায় এবং আরিফের মর্যাদা বাড়ে। কিন্তু মুকাশাফাতে কাওনীর মধ্যে এ ধরনের কোন উপকারিতা নেই।[১৪১]

হযরত শায়খুল ইসলামের জীবনে অসংখ্য মুকাশাফাতে ইলাহী বিদ্যমান ছিল। বলতে গেলে তিনি মহান আল্লাহর যাত ও সিফাতের কাশ্ফের মধ্যেই সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন। তবে কিছু কিছু মুকাশাফাতে কাওনীর বর্ণনাও পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর মুকাশাফাতে কাওনীর কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

কলিকাতার মাওলানা রশীদ আহমদ সিদ্দীকী বলেন, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে হযরত শায়খুল ইসলাম মুসলিম লীগের বিপরীতে পার্লামেন্টারী বোর্ড মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার অভিযানে গোটা ভারতবর্ষ সফর করেন। বঙ্গ প্রদেশের নির্বাচন ছিল সবার শেষে। তিনি ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে নোয়াখালী গমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মাওলানা আবদুল হালীম সিদ্দীকী, মাওলানা নাফেগুল ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। তিনি ৩ মার্চ গোপালপুর জেলায় বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়ে রাতে চৌধুরী রাফিকুল হায়দারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। ঐ রাত ঠিক ২টার সময় তিনি চৌধুরী মুহাম্মদ মুস্তফাসহ অন্যান্য নেতাদের ডেকে বললেন, রুহানী জগতের দায়িত্বশীল মহল ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। একই সাথে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যাপারেও বণ্টনের সিদ্ধান্ত গৃহীত

১৪০. মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৩।

১৪১. ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৪-২১৫।

হয়েছে। সঙ্গীরা বললেন, হযরত! আমরা যারা এতদিন যাবত বন্টনের বিরোধিতা করে আসছি বর্তমানে তাদের করণীয় কি? তিনি বললেন, আমরা বাহ্য বিষয়ের মুকাল্লাফ এবং বাহ্যিক বিষয়ের উপরেই আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই বাহ্যিকভাবে আমরা যেই পথকে সঠিক ও মানুষের জন্য কল্যাণকর বলে মনে করি, সেই পথের উপরই আমাদেরকে অটল থাকতে হবে। সেই পথের জন্যই আমাদের চেষ্টা ও সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। উল্লেখ্য, ঐ রাতে কুতুবদের বৈঠকের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও পরদিন গোপালপুরের আরেক জনসভায় তিনি ভারত বিভক্তির বিরুদ্ধে জোরদার বক্তব্য রাখেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন গভর্ণর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে তাঁর উপরোক্ত কাশফ বাস্তবতা লাভ করে।[১৪২]

মাওলানা হাবীবুর রহমান বিজনৌরী বলেন, আমার মেধা ছিল ভীষণ দুর্বল। ফলে আমি পর পর কয়েক বছর যাবত বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করি। বিষয়টি আমি হযরত শায়খুল ইসলামকে চিঠি লিখে জানালে তিনি আমার জন্য দুআ করলেন এবং আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আগামীতে আর ফেল করবে না। দেখা গেল ঐ বছর বার্ষিক পরীক্ষায় আমিই সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করি। এ অবস্থা পরবর্তী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকে।[১৪৩]

মাওলানা আবদুল হালীম বলেন, হযরত শায়খুল ইসলাম হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আমি দুআ নেওয়ার জন্য তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে দেখা মাত্রই বললেন যে, আপনি হজ্জের জন্য তৈরী হয়ে আসেননি কেন? আমি তো অবাক যে, আমার হজ্জ করার কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। তাছাড়া হজ্জ করার মত প্রস্তুতি ও সক্ষমতাও আমার ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি আমাকে বাড়ী গিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসতে বললেন। আমি বাড়ী আসলাম। বাড়ী পৌছে দেখলাম, আল্লাহর অনুগ্রহে আমার হজ্জের ব্যবস্থা হয়ে আছে। শায়খুল ইসলাম তখনো বোম্বাই বন্দরে অবস্থানরত ছিলেন। আমি বাড়ী থেকে হজ্জের প্রস্তুতি নিয়ে বোম্বাই গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হই।[১৪৪]

দেশ বিভক্তির পূর্বে তিনি প্রত্যেক বছর রমযানের মাস সিলেটে অতিবাহিত করেন। আগমনের পূর্বে শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তাঁর

---

১৪২. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪-৯৫।
১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩; আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২।
১৪৪. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৩।

জন্য পথ খরচের টাকা পাঠিয়ে দিত। এক বছর জনৈক দোকানীর নিকট থেকে কিছু চাঁদা নেওয়া হয়েছিল। দোকানী ঐ চাঁদা অসন্তুষ্টমনে প্রদান করেছিল। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তার কাছে চাঁদার জন্য গেলে সে ১২ টাকা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলঃ নিয়ে যান, এটি হল আপনাদের বাৎসরিক ট্যাক্স। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা হয়নি। কিন্তু সমুদয় টাকা হযরত শায়খুল ইসলামের নিকট পাঠানো হলে তিনি সব টাকা রেখে ১২ টাকা ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, এই ১২ টাকা দোকানীকে ফেরত প্রদান করা হোক। শায়খুল ইসলামের এ কাশ্‌ফ দেখে শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবাক হয়ে যায়।[১৪৫]

মাওলানা মুশতাক আহমদ আম্বেটবী বলেন, আমরা হজ্জের কাজ শেষ করে মদীনা গেলাম। সেখানে পৌছার পর একটি সংবাদ আমাদেরকে অভিভূত করে দেয়। সংবাদটি ছিল যে, এ বছর রওযা আকদাসে জনৈক ভারতীয় যুবক যখন নবীজীকে সালাম করে ছিল। তখন রওযা শরীফ থেকে 'ওয়ালাইকুমুস সালামু ইয়া ওয়ালাদী' বলে একটি জবাব শোনা গিয়েছে। এটি জেনে আমি বিস্মিত হই। বিশেষ করে যুবকটি একজন ভারতীয় বিধায় আমার কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। আমি গোপনে যুবকের সন্ধান নিতে থাকি। অবশেষে জানলাম যে, এই যুবক হলেন ফয়যাবাদের সায়্যিদ হাবীবুল্লাহ মুহাজিরে মদনীর পুত্র সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী। তিনি তখন মসজিদে নববীতে অধ্যাপনা করছেন। আমি তার সাথে একান্ত সাক্ষাতে ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।[১৪৬]

মসজিদে নববীর কিব্‌লা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। পূর্বদিকে রয়েছে মহানবীর পবিত্র রওযা শরীফ। এই রওযা শরীফের ঠিক বিপরীতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে বাবুর রহমত সংলগ্ন স্থানে বসে হযরত শায়খুল ইসলাম হাদীসের অধ্যাপনা করতেন। একদিন তিনি হাদীস পড়াচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে রওযা শরীফ যা দেয়াল ঘেরা অবস্থায় আছে। পাঠদানের বিষয়বস্তু ছিল মহানবীর 'হায়াতুন্নবী' হওয়া প্রসঙ্গ। শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে প্রসঙ্গটি আলোচনা করে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের একজন তাঁকে বার বার প্রশ্ন করছিল। তিনি সবিস্তারে উত্তর দিচ্ছিলেন। কোন উত্তর দ্বারা ঐ শিক্ষার্থীর তৃপ্তি হচ্ছিল না। এমন সময়ে তিনি তাঁকে হাতের ইশারায় রওযা শরীফের দিকে তাকাতে বললেন। শিক্ষার্থী ঐ দিকে

---

১৪৫. মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক, শায়খুল ইসলাম মাদানীর মলফূযাত কারামাত ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭, পৃ ৭৪।

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৭২-৭৩।

তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। কেননা সে দেখল যে, রওযা শরীফের প্রাচীর, গ্রীল, দেওয়াল কিংবা সবুজ গম্বুজের কিছুই এখানে নেই। বরং একটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত স্থানে উপবেশন করে আছেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ছাত্রটি ঐ দৃশ্য অন্যদেরকেও দেখাতে চাইলে শায়খুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিষেধ করলেন। সে চোখ ফিরিয়ে আনে এবং পুনরায় ঐ দিকে তাকিয়ে দেখে পূর্ববৎ এখানে মাযার ও গম্বুজই অবস্থিত। এক পলকের জন্যই সেটি দৃশ্যমান হয়েছিল।[১৪৭] শায়খুল ইসলামের জীবনে এ ধরনের আরো বহু মুকাশাফাত রয়েছে। এখানে কেবল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

মানুষের মৌলিক গুণাবলী যাচাই করার সর্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ড হল তাঁর জীবনের ছোট ছোট ঘটনা। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ এরই আলোকে ব্যক্তির মৌলিক গুণাগুণ সহজে পরীক্ষা করা যায়। জীবনের এসব ঘটনার নিরিখেই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় নিরূপিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় হলেও কথা সত্য যে, শায়খুল ইসলাম দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও ইসলামের আদর্শিকতা ও আযীমত রক্ষা করে গিয়েছেন।[১৪৮] তার প্রত্যেকটি কাজ অপরের জন্য শিক্ষণীয় ছিল। বস্তুত একজন আলিমে দীনের জীবনযাত্রা এ ধরনেরই হওয়া উচিত। কেননা আলিমগণ মুসলিম সমাজের মুক্তাদা। সাধারণ মানুষ তাঁদের অনুসরণ করে চলে। সাধারণ মুসলমানেরা কুরআন হাদীসের গভীর জ্ঞান রাখে না। ধর্মের পালন বলতে আলিমগণের কথা, কাজ ও জীবনাচার অনুসরণ করাই বুঝে। হাদীসের মর্মানুসারে আলিমগণ সমাজের হৃদপিণ্ড। হৃদয়ের স্থিরতা ও অস্থিরতা যেমন গোটা দেহকে প্রভাবিত করে তদ্রূপ আলিমগণের সত্যতা ও বিভ্রান্তি গোটা সমাজে ভাল ও মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই ইসলামী শরীঅতে একজন সাধারণ মুসলমানের চেয়েও একজন আলিমকে অধিক সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত শায়খুল ইসলামের জীবনে এ নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনের অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা এখনো লোকমুখে প্রসিদ্ধ। কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ জীবনচরিত সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল ঃ

---

১৪৭. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।
১৪৮. নাজমুদ্দীন ইসলাহী, সীরতে শায়খুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৪।

লাহোরের মাওলানা আব্দুল্লাহ ফারুকী ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ বুযর্গ। তিনি হযরত শায়খুল হিন্দের ছাত্র এবং হযরত শাহ আবদুল কাদির রায়পুরীর মুরীদ ছিলেন। এ সূত্রে শায়খুল ইসলামের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল। একবার তিনি শায়খুল ইসলামসহ মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে হযরত শায়খুল ইসলামের জুতা হাতে উঠিয়ে নেন। শায়খুল ইসলাম তাকে তৎক্ষণাৎ কিছুই বললেন না। কিন্তু অপর একদিন তিনি নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় শায়খুল ইসলাম হঠাৎ মাওলানা আবদুল্লাহর জুতা হাতে তুলে ঠিক মাথার উপর রেখে দ্রুত হেটে চললেন। মাওলানা আবদুল্লাহ এ অবস্থা দেখে পেছনে পেছনে ছুটলেন এবং জুতা কেড়ে নিতে চাইলেন কিন্তু শায়খুল ইসলাম এত দ্রুত হেটে চললেন যে, জুতা মাথা থেকে নামানো সম্ভব হল না। অবশেষে মাওলানা আবদুল্লাহ চীৎকার করে বললেন, হযরত! আল্লাহর ওয়াস্তে অন্তত জুতাগুলো আপনার মাথার উপর থেকে নামিয়ে ফেলুন। তিনি বললেন, আগে আমার সাথে ওয়াদা কর যে, আগামীতে আর কখনো হুসাইন আহমদের জুতা হাতে তুলতে চেষ্টা করবে না। মাওলানা আবদুল্লাহ ঐ অঙ্গীকার ব্যক্ত করলে তিনি জুতাগুলো মাথার উপর থেকে নামিয়ে নিচে রাখেন।[১৪৯]

আহার করার সময় হযরত শায়খুল ইসলামের নিয়ম ছিল বড় প্লেটে কয়েকজন মেহ্মান সঙ্গে নিয়ে একত্রে আহার করতেন। একবার জীর্ণশীর্ণ পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি নিজেকে ছোট মনে করে আহারের মজলিসে সবার পেছনে বসেছিল। তিনি লোকটিকে ডেকে সম্মুখে আনলেন। ঘটনাচক্রে লোকটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এমন একজনের পাশে বসেছিল যিনি ছিলেন সুন্দর পরিপাটি পোষাক পরিহিত। জীর্ণ পোশাকের লোকটি সঙ্গে বসার দরুন তার অস্বস্তি বোধ হল। শায়খুল ইসলাম ব্যাপারটি টের পেলেন এবং ডেকে এনে ঠিক নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে বসালেন। তারপর বললেন, লোকেরা কি জানে যে, জরাজীর্ণ মানুষের মর্যাদা আল্লাহ পাকের নিকট কত বেশী? কথাটি শুনে পরিপাটি পোষাকের লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে লোকটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।[১৫০]

মাওলানা কারী ফাইয়ায আহমদ বলেন, হযরত শায়খুল ইসলামের দরসে হাদীস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ছাত্ররা জবাবের জন্য ছোট চিরকুটে প্রশ্ন লিখে পাঠাত। তিনি প্রশ্নগুলো জোরে জোরে পড়ে শোনাতেন এবং সন্তোষজনক উত্তর দিতেন। একবার এক ছাত্র লিখে পাঠাল যে, হযরত আপনার পাজামা

---

১৪৯. আবদুর রশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৬।

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৮।

টাখনুর নিচে পড়ে আছে। শরীঅতের দৃষ্টিতে এটি হারাম। তিনি চিরকুট পড়ে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, দেখুন, আমার পাজামা কোথায় টাখনুর নিচে পড়ে আছে? এটি হারাম। হ্যাঁ, খেয়ালের ত্রুটির কারণে কখনো এমনটি ঘটে গিয়ে থাকলে অন্য কথা। নতুবা যে কাজ হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে সেটি করার দুঃসাহস আমি কিভাবে করতে পারি।[১৫১]

মাওলানা আহমদ উল্লাহ সারহদী বলেন, দিল্লী জমইয়তে উলামার অফিসে হযরত শায়খুল ইসলাম উপস্থিত। আসরের নামায পড়তে তিনি কক্ষ থেকে বের হলেন। নামাযের জন্য সুন্দর নতুন চাটাই বিছানো ছিল। তিনি বেশ খুশী হয়ে বললেন, নাযিম সাহেব! আজ একটি চমৎকার কাজ করেছেন। ইত্যবসরে তিনি জানতে পারলেন যে, চাটাইটি কেনা হয়নি। বরং অফিসের সংলগ্নে জনৈক চাটাই বিক্রেতা নামাযের সুবিধার্থে এবং শায়খুল ইসলামের প্রতি ভালবাসার কারণে এটি বিছিয়ে দিয়েছেন। কথাটি শুনে তাঁর চেহারা থেকে প্রফুল্লতা চলে যায়। তিনি বললেন, এগুলো সরিয়ে ফেলুন। কারণ বিক্রেতা লোকটি এ চাটাইগুলো অব্যবহৃত বলে বিক্রয় করবে। অথচ নামাযের মাধ্যমে এগুলো ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক হবে না। পরিশেষে তিনি অফিসের পুরাতন চাটাইয়ের উপরই নামায আদায় করেন।[১৫২]

জমইয়ত অফিসে উন্নত মানের সুন্দর কাগজে ঠিকানা মুদ্রিত লেটারপ্যাড রাখা থাকত। এগুলো মূলতঃ শায়খুল ইসলামের ব্যক্তিগত টাকা দিয়েই তৈরী করা হয়েছিল। অফিসের জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য তিনি এগুলো মুদ্রণ করে দেন। অথচ তিনি কখনো এ প্যাডগুলো ব্যক্তিগত কাজে কিংবা ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে ব্যবহার করেন না। একবার তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি বললেন, জমইয়ত অফিসের কোন কাগজ কলম আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা পছন্দ করি না।[১৫৩]

হাফিয সুলতানুদ্দীন সাম্ভুলী বলেন, হযরত শায়খুল ইসলামের সাথে সাহারানপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক হাকীম মুহাম্মদ ইয়ামীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একবার তিনি নিজের চিকিৎসার কাজে ঐ হাকীমের চেম্বারে যান। হাকীম সাহেব তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ান এবং কাছে এসে বসতে পীড়াপীড়ি করেন। শায়খুল ইসলাম বললেন, আজ আমি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি। কাজেই

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ৫২০।
১৫২. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।
১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৭০।

আমি রোগীদের ওয়েটিং রুমেই অপেক্ষা করব। হাকীম সাহেবের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি রোগীদের সিরিয়াল ভঙ্গ করে আগে নিজের চিকিৎসা করাতে সম্মত হননি।[১৫৪]

একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাকীম মুহাম্মদ ইয়ামীন তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। হযরত শায়খুল ইসলামের ব্যাধি পরীক্ষা করে হাকীম সাহেব পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বাইরে যাতায়াত কমিয়ে দিন এবং দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে না থেকে কিছুদিন হালকা নামায পড়ুন। অসুস্থতার কারণে মুস্তাহাব কিংবা সুন্নত আমলের পরিমাণ হ্রাস করতে বাধা নেই। তিনি উত্তর দিলেন, বাধা নেই বটে তবে আমি সুন্নতের খেলাফ নামায পড়ে তৃপ্তি পাই না। বরং মনের ভিতর আরো বেশী অশান্তি বোধ করি। জবাব শুনে হাকীম নিরুত্তর হয়ে যান।[১৫৫]

তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইল্‌য়াস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে শায়খুল ইসলামের গভীর আন্তরিকতা ছিল। একবার তিনি শায়খুল ইসলামকে বললেন, মুসলমানদের জন্য দুআ করুন। শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত দরদী কণ্ঠে জবাব দিলেন, কেন ভাই, অমুসলিম লোকেরা কি আল্লাহ্ পাকের বান্দা নয়?[১৫৬]

মুযাফ্ফরনগর জেলার কাথুলী নামক স্থানে তাবলীগের ইজ্‌তিমা হচ্ছিল। হযরত মাওলানা ইল্‌য়াস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই ইজতিমার যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। স্টেশনে অবতরণ করে শুনলেন নিকটেই কংগ্রেসের এক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হযরত শায়খুল ইসলাম ঐ সভায় উপস্থিত আছেন। এ কথা শুনে তিনি তাবলীগের ইজতিমা মুলতবী করে দেন এবং নিজের সঙ্গীদের নিয়ে সভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন শায়খুল ইসলাম নিজেও লোকজন নিয়ে ইজ্‌তিমায় শরীক হওয়ার জন্য এদিকে আসছেন। কেননা শায়খুল ইসলাম ইজতিমার কথা জেনে নিজের সভা মুলতবী করে সাথীদেরকে ইজতিমায় শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হল। সভা এখানেও হয়নি, আর সেখানেও হয়নি।[১৫৭]

---

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

১৫৫. মুহাম্মদ আবদুর রায্‌যাক, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪।

১৫৬. ইহ্‌তিশামুল হাসান কান্ধলবী, "রাহনুমায়ে ইন্‌সানিয়্যাত" **আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা**, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

১৫৭. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, **আসীরানে মাল্টা**, প্রাগুক্ত, ২৮৩।

একবার তিনি আমরূহা জামি মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন। নামায শেষে কিছু ওয়ায নসীহতের কর্মসূচী ছিল। কর্তৃপক্ষ একটি চৌকির উপর চেয়ার সাজিয়ে তার উপর একটি দামী গালিচা বিছিয়ে দেয়। আসনটি তখন ভারী জাঁকজমকপূর্ণ দেখাচ্ছিল। শায়খুল ইসলাম স্বভাবগতভাবেই জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তিনি নিজে হাত বাড়িয়ে গালিচা সরিয়ে ফেলেন। তারপর অতি সাধারণভাবে খালি চেয়ারে বসে মূল্যবান নসীহত প্রদান করেন।[১৫৮]

এক সফরে মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী ও মাওলানা আবুল ওয়াফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা তাঁর সাথে পাঞ্জাব থেকে দেওবন্দ আসছিলেন। চলতি গাড়ীতে নিদ্রাগ্রস্ত অবস্থায় মাওলানা আবুল ওয়াফা হঠাৎ অনুভব করলেন যে, কোন লোক তার শরীর টিপে দিচ্ছে। শারীরিক আরাম অনুভব করে তার সুখনিদ্রা গাঢ় হয়ে উঠে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে যাওয়ার পর নিদ্রা কিছুটা হালকা হল। তিনি চাদর থেকে মুখ বের করে লোকটিকে দেখতে চাইলেন। দৃষ্টি পড়তেই তার শরীর শিহরিয়ে উঠে। তিনি বিচলিত হন। দেখলেন স্বয়ং হযরত শায়খুল ইসলাম তার শরীর টিপে দিচ্ছেন। তার পাশে আরাম করছিলেন মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ্ বুখারী। তিনি বললেন, শায়খুল ইসলাম আমাকেও এভাবে লজ্জিত করেছেন। শায়খুল ইসলাম অবশেষে বললেন, আপনাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে রাখা আছে, অযু করে আসুন। এ কথা বলে নিজে ফজ্‌র নামাযের সুন্নত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।[১৫৯]

শায়খুল ইসলামের জীবন সঙ্গীনী (ফিদায়ে মিল্লাত সায়্যিদ আসআদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুম -এর জননী) ইন্তিকালের পর তার দাফন শেষে লোকজন বাড়ীতে একত্রিত হল। শায়খুল ইসলাম ভারাক্রান্ত মনে কিছুক্ষণ লোকজনের সাথে অবস্থান করেন। মনের ভীষণ যাতনা তাঁকে গম্ভীর করে রেখেছিল। অবশেষে তিনি দারুল হাদীসের দিকে যান এবং সবক শুরু করে দেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বারণ করতে চাইলেও তিনি বিরত হলেন না। সদ্‌রে মুহতামিম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে গিয়ে বোঝাতে চাইলে তিনি বললেন, অস্থিরতা কাটানোর জন্যই নবীজীর হাদীসচর্চার শরণাপন্ন হলাম। প্রিয় নবী ও তাঁর হাদীস আলোচনার মধ্যেই স্থিরতা খুঁজে পাই।[১৬০]

---

১৫৮. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯।

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫-১২৬।

১৬০. আসীর আদরবী, **মাআছিরে শায়খুল ইসলাম**, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩০।

একবার খুব গরমের মৌসুমে দুপুর ২টার সময় তিনি লাহেরপুর পৌছলেন। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করেই আহারের আয়োজন করতে বললেন। তাতে মনে হল তিনি খুব ক্ষুধার্ত। অথচ তাঁর হাতে একটি টিফিন ক্যারিয়ার ছিল। এটি বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়ে দেন। মাওলানা কাসিম শাহ্‌জাহানপুরী বলেন, ঐ ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে দেখা গেল খুব ভারী। এখানে প্রচুর আহার রয়েছে। শায়খুল ইসলামকে জিজ্ঞাস করা হল যে, হযরত! আহার তো বিদ্যমান ছিল অথচ আপনি পথিমধ্যে আহার গ্রহণ করেননি কেন? তিনি বললেন, লখ্‌নৌ থেকে এ পর্যন্ত একজন মুসলমান কুলিও পাইনি যাকে সঙ্গে নিয়ে আহার করতে পারি। ফলে খানা এ ভাবেই রয়ে গিয়েছে। একাকী আহার করা আমার মোটেও মন চায় না।[১৬১]

করাচী জেলে হযরত শায়খুল ইসলামের সাথে বন্দীদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ছিলেন। মাওলানা জাওহারের প্রস্রাবজনিত রোগ ছিল। তাই কামরার ভিতরে প্রস্রাবের ভাণ্ডে পেশাব করতে হত। শায়খুল ইসলাম প্রত্যহ জ্‌রের নামাযের পূর্বে এ ভাণ্ড ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন। ওলানা জাওহার মনে মনে বিস্ময় ও কৌতূহল বোধ করছিলেন। কিন্তু কে গবে পরিষ্কার করে দেয় তা জানতে পারেননি। এক রাতে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে য়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, পার্শ্বে অবস্থিত শায়খুল ইসলাম নিজে এ কাজ সম্পাদন করছেন। মাওলানা জাওহার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হন।[১৬২]

ভারত বিভক্তির কিছু দিন পূর্বে হযরত শায়খুল ইসলাম পূর্ব বঙ্গ (বাংলাদেশ) সফর করেন। তখন লীগপন্থী লোকেরা বিভিন্ন স্থানে তাঁর সাথে বেআদবী ও ন্যক্কারজনক আচরণ করে। চৌধুরী মকবুলুর রহমান তাতে ভীষণ মনক্ষুণ্ন হন। তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে এ সকল বেআদবীর উপযুক্ত জবাব লিখে মুদ্রণের জন্য 'মদীনা বিজনৌর' পত্রিকার অফিসে পাঠান। ঘটনাক্রমে কবিতাটি শায়খুল ইসলামের নজরে পড়ে। তিনি সেটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেণ। কারন জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ক্ষমা করার পর কারো বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। যারা আমার সাথে কদর্য আচরণ করেছে এবং যারা এখনো করে যাচ্ছে তাদের কারো বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই। তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, তাদের বদ্‌দুআ দিও না।[১৬৩]

---

১৬১. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১।

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮।

১৬৩. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭।

এক ব্যক্তি হযরত শায়খুল ইসলামকে হাদিয়া দানের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর রুমাল তৈরী করে। রুমালটি ছিল বড়ই চিত্তাকর্ষক। এটি শায়খুল ইসলামকে প্রদান করা হলে তিনি বললেন, এ রুমালের সুতা ইংরেজদের মেশিনে বানানো। আমি এমন জিনিস ব্যবহার করি না। আমি কেবল ঐ সকল দেশী খদ্দর কাপড় ব্যবহার করি যেগুলোর দু'দিকের সুতা দেশী লোকের হাতে তৈয়ার হয়ে থাকে। বিদেশী কাপড় কিংবা বিদেশীদের মেশিনে তৈরী সুতার কাপড় ব্যবহার করতে আমি পছন্দ করি না।[১৬৪]

ওফাতের একদিন পূর্বে তিনি মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, আজ কয়েকদিন যাবত নামায বসে বসে তায়াম্মুম দ্বারা আদায় করছি। নিজের অনেক ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। মনে ভয়ানক কষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে, আল্লাহর দরবারে গিয়ে কি জবাব দিব? এ কথা বলে তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন বলেন, আমি হযরত শায়খুল ইসলামকে এত কান্নাকাটি করতে ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি।[১৬৫]

একবার দারুল উলূমে মাগরিবের জামাআত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শায়খুল ইসলাম দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে কয়েকজন শাগিরদসহ অন্য লোকেরাও ছিল। মসজিদের দরজায় তিনি জুতা খুলে হাতে নেওয়ার সময় জনৈক ছাত্র অগ্রসর হয়ে তাঁর জুতা হাতে তুলতে চেষ্টা করে। তিনি পা থেকে জুতা খোলার পূর্বেই ছাত্রটি হাত দিয়েছিল বলে অসাবধানতাবশতঃ তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে দ্রুত জামাআতে শরীক হন। ছাত্রটি ভীষণ লজ্জা পেল। তিনি তাকে কিছুই বলেননি। এমনকি এভাবে যে পড়ে গেলেন সে দিকেও কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি।[১৬৬]

মানবিকতা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে রয়েছে বহুগুণের অফুরন্ত সম্ভাবনাময় শক্তি। এ গুণাবলীর স্ফুরণ ও বিকাশের দ্বারা মানুষ 'ইনসানে কামিল'-এর মর্যাদায় উপনীত হয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মৌলিকভাবে মানবতার এ গুণাবলীর বিকাশ ও লালনের কাজই করে গিয়েছেন। এ কাজের পূর্ণতা প্রদানের জন্যই

---

১৬৪. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭।
১৬৫. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।
১৬৬. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২।

আগমন করেছিলেন শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একখানা হাদীসে তাই তিনি বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি মানবিক গুণাবলীর পূর্ণতা বিধানের জন্য।[১৬৭] পবিত্র কুরআনে মুমিনদেরকে মানবিক গুণাবলী অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বস্তুত ঈমানী জিন্দেগীর সফলতা ও অসফলতা এ সকল গুণ অর্জনের মধ্যেই নিহিত।

মানবিক গুণাবলীর উপর গুরুত্বারোপ ও বিশদ বিবরণ দিয়ে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ জাল্লাশানুহু বলেন ঃ

﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ --- وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ﴾

﴿ وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا وَّ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴾

﴿ وَ الَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ-- وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴾

---

১৬৭. মূল হাদীস ঃ

((قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ))

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ যারা বিনয় নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে.,........ যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে । দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করলে উত্তরে বলে 'সালাম', যারা রাত্রি অতিবাহিত করে প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়ানো অবস্থায়, ... যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্কে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না......... যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, যারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে তা পরিহার করে চলে, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না, যারা প্রার্থনার মধ্যে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের নয়ন প্রীতিকর বলে বিবেচিত হবে, আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণের উপযুক্ত ব্যক্তিতে পরিণত কর ।[১৬৮]

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় মানবিক গুণাবলীর আরো বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

﴿ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴾

কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করলে, আল্লাহ প্রেমের ভিত্তিতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং

---

১৬৮. আল কুরআন ২৩ঃ১-৯, ২৫ঃ৬৩-৭৪।

দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ সংকট, দুঃখ ক্লেশ ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এই বিশেষণের অধিকারী লোকেরাই বস্তুত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।[১৬৯]

মহানবী ইসলামের সূচনাকাল থেকেই মানুষকে এই গুণাবলী অর্জনের দাওয়াত দেন। মদীনায় হিজরতের পূর্বে সাহাবীগণ মক্কাস্থ মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশা দেশে হিজরত করেছিলেন। তখন হাবশা সম্রাটের এক প্রশ্নের জবাবে সাহাবী হযরত জাউর তায়য়ার রাযিআল্লাহু আনহু মহানবীর কার্যক্রম সম্পর্কে বলেছিলেন, ওহে মহামতি সম্রাট! আমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায় ছিলাম। আমরা বহু দেব-দেবীর পূজা করতাম, মৃত জীবজন্তু আহার করতাম, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতাম, ভাই ভাইয়ের উপর জুলুম করতাম, পরস্পরে ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকতাম। এমন সময় আমাদের মধ্যে এক নবী আগমন করেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন যে, ইট পাথরের পূজা করো না, সত্য কথা বল, খুন-খারাবি থেকে বিরত থাক, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করো না, প্রতিবেশীকে শান্তিতে থাকতে দাও, সতী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করো না।[১৭০]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে বোঝা যায় যে, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। মুসলমান হিসেবে সে-ই বেশী সফলকাম, যার মধ্যে এ গুণাবলী বেশী পরিমানে বিদ্যমান। এ সকল গুণের দিক থেকে শায়খুল ইসলাম মাদানীকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলা যায়। কেননা তাঁর চরিত্রে এত বেশী মানবিক গুণ বিদ্যমান ছিল যে, সমকালীন কিংবা পরবর্তীকালীন মানুষের খুব কম সংখ্যককেই তাঁর মানে গণ্য করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে মাওলানা দরিয়াবাদী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিনয়, নম্রতা, অমায়িকতা, আত্মত্যাগ ও মানব সেবায় হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে তুলনা করতে হলে তাঁরই শিক্ষক হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী কিংবা তাঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমদ ব্যতীত অন্য কাউকে চিন্তা করা যায় না।[১৭১]

মুসলিম ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক ও সুপণ্ডিত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর গুণাবলীর অকপট স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি হযরত

---

১৬৯. আল কুরআন ২ঃ১৭৭।

১৭০. শিবলী নুমানী, সীরাতুন্নবী (করাচী ঃ দারুল ইশাআত, ১৯৭৫), ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৪।

১৭১. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, ড. রশীদুল ওয়াহীদী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৪।

শায়খুল ইসলামের মানবিক বৈশিষ্ট্য চিত্রায়িত করে বলেন, যে কথাটি সকল দ্বিধা সংকোচ মুক্ত, যেটি সকল তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে, সেটি হল তাঁর সুমহান জীবনচরিত, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, নিঃস্বার্থপরায়ণতা, নিষ্কলুষ যিন্দেগী ও উত্তম চরিত্র মাধুরী। মানবীয় এ গুণগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে খাটি সোনা ও স্বচ্ছ মুক্তাতে পরিণত করে দিয়েছে। এগুলো তাঁকে পৌছিয়ে দিয়েছে নৈতিক ও মানবিক উচ্চাসনের সর্বোচ্চ শিখরে।[১৭২]

মানবিক এ গুণাবলী নিজ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে শায়খুল ইসলামের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীস ও ইতিহাসে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তিনি সেটি হুবহু অনুসরণে সচেষ্ট ছিলেন। নিম্নে তাঁর মানবীয় গুণাবলীর কয়েকটি দিক আলোচনা করা হল।

ইসলামী শরীঅতের অন্যতম প্রধান বিষয় হল, আল্লাহর হকের পাশাপাশি বান্দার হক আদায় করা। পরিভাষায় এটিকে খিদমতে খাল্ক (সৃষ্টির সেবা) বলা হয়। এই খিদমতে খালক-এর আমলকে তিনি শুধু ইবাদতই নয় বরং সুলূক ও তরীকতের উচ্চাসন লাভের অন্যতম সোপান হিসেবেও গ্রহণ করেন।[১৭৩] মহানবীর হাদীস 'শ্রেষ্ঠ মানুষ ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের সেবা করে'-এর আলোকে তাঁর জীবন মানুষের সেবা ও উপকারে নিবেদিত ছিল।

কোন মানুষের অধিকার নষ্ট করা কিংবা কারো মনে আঘাত দেওয়া তার দৃষ্টিতে ছিল জঘন্য পাপ। অপরের মনতুষ্টি, সহানুভূতি প্রদর্শন ও উপকার সাধনের চেষ্টা তাঁর মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কাউকে কোন কাজে অস্থির দেখলে তিনি নিজে কেঁপে উঠতেন। যে ভাবে সম্ভব তার অস্থিরতা দূর করতে তিনি চেষ্টা করে যেতেন। মানুষের উপকার করে, তাদের সমস্যার সমাধান করে, তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি লাভ করতেন স্বস্তি ও তৃপ্তি। মানুষের প্রতি প্রবল দরদ ও কল্যাণকামিতার দরুন দেখা গিয়েছে বহু সময় তিনি এক সফর

---

১৭২. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী "এক বুলন্দ মরতবা ইনসান" আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

১৭৩. সূফীদের ভাষায় বলতে গেলে;

طریقت بجز خدمت خلق نیست

بتسبیح وسجاده ودلق نیست

শেষ করে ফিরে এসে কোন বিশ্রাম গ্রহণের পূর্বেই ক্লান্ত শ্রান্ত বদনে আবার যাত্রা করেছেন অন্য সফরের উদ্দেশ্যে। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, রোগ-পীড়া, শীত-গ্রীষ্মের প্রতিকূলতা কোন কিছুই তাঁকে সৃষ্টিসেবার মহৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ দরদী হয়ে তাঁকে বারণ করতে চাইলে বলতেন, আল্লাহর বান্দারা আমাকে কোন উপকার পাওয়ার আশা নিয়ে ডাকলে আমি না গিয়ে পারি না। তোমরা আমাকে কেন বাধা দিচ্ছ? আমি কোন ছার? আমার কি দাম আছে? এটি তো মাটিরই শরীর মাত্র। যতক্ষণ চলতে পারে ততক্ষণ তার দ্বারা কাজ নেওয়াই উত্তম।[১৭৪]

ক্লান্ত শরীরের সফরেও নিজ সফরসঙ্গীদের প্রতি থাকত তাঁর দয়ার্দ্র কোমল দৃষ্টি। সঙ্গীদের যাতে কোন কষ্ট না হয় তার জন্য নিজেই তাদের সেবায় লেগে যেতেন। ছোট বড়, শাগিরদ-মুরীদ, এমনকি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সেবায় তিনি থাকতেন উদার। কেউ বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার পা টিপে দিতেও দ্বিধা করতেন না। যে কাজ করতে সাধারণত লোকেরা নিজেকে হেয় বোধ করে তিনি সঙ্গীর উপকারার্থে সেটিও অম্লান বদনে সম্পাদন করে যেতেন, যা দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকত না। একবার রেলযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। যাত্রীদের একজন বাথরুমে গিয়ে আবর্জনা দেখে ফিরে আসে। তিনি ব্যাপারটি উপলব্ধি করে নীরবে উঠে গেলেন। সকলের অগোচরে ঐ বাথরুম তিনি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলেন। তারপর সিটে এসে লোকটিকে বললেন, টয়লেটের প্রয়োজন থাকলে পূরণ করে আসতে পারেন। লোকটির খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে টয়লেটে গিয়ে সম্পূর্ণ অবাক হয়ে গেল।[১৭৫] এ ধরনের কাজ হযরত শায়খুল ইসলামের জীবনে বহু পাওয়া যায়।

একবার মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। মাওলানা দরিয়াবাদীর কাজেই তিনি সুপারিশের জন্য যাচ্ছিলেন। সেই সফরের বর্ণনায় দরিয়াবাদী লিখেছেন, মানুষের কাছ থেকে সেবা পেয়ে তিনি ঐ আনন্দ অনুভব করেন না, যতটুকু আনন্দ অনুভব করেন অন্যকে সেবা করার মধ্যে। আপনি তাঁর বাড়ী গিয়ে সাক্ষাৎ করুন, তাহলে দেখবেন আপনার জন্য খানাপিনা তিনি নিজ হাতে বহন করে নিয়ে আনছেন। তিনিই আপনার বিছানা বিছিয়ে দিচ্ছেন। সফরে তাঁর সঙ্গে থাকলে তিনিই ছুটে গিয়ে আপনার টিকেট নিয়ে আসছেন। তাঙ্গা গাড়ীর ভাড়া পরিশোধে আপনার হাত

---

১৭৪. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৬।

১৭৫. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১।

পকেট থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তিনি শোধ করে দিচ্ছেন। রেলগাড়ীতে আপনার বিছানা খুলে বিছিয়ে দেওয়া, আপনার জন্য লোটা পানির ব্যবস্থা করা, আপনার মালামাল গোছানো সব কাজ আপনার পূর্বে তিনিই করে ফেলছেন। কি অদ্ভুত চরিত্র! দেওবন্দে আমার ৩ দিবসের অবস্থান তাঁর সম্পর্কে লোকমুখে শ্রুত কথাগুলোর যথার্থ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল।[১৭৬]

দরিয়াবাদী ঐ সফরে হযরত শায়খুল ইসলামকে নিয়ে হযরত থানবীর খানকায় গিয়েছিলেন। খানকায় পৌছার পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন, তাঙ্গা গাড়ী খানকায় ইমদাদিয়্যার গেটে পৌছলে আমার আগেই তিনি ভাড়া দিয়ে দেন। সাহারানপুর স্টেশন থেকে যাত্রার পূর্বেও তিনি আমাকে একটি মুসলিম হোটেলে নিয়ে আপ্যায়ন করান। স্টেশনে পৌছলে তিনিই দ্রুত গিয়ে টিকেট নিয়ে আসেন। তাঁর সাথে আমরা সফরসঙ্গী দু'জন বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট। যেখানে সেবা করার কথা আমাদের সেখানে আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম যে, সফরে ছোট-বড়োর তারতম্য না করে সেবার কি আদর্শ তিনি স্থাপন করে যাচ্ছেন।[১৭৭]

যাত্রীদের সেবাকর্মে নিযুক্ত পরিচারকদের বখ্শিশ দিতে তাঁর ভাল লাগত। এমনকি দুর্ব্যবহারকারী পরিচারকদেরকেও তিনি মোটা অংকের বখ্শিশ দিতেন। মাওলানা মনযূর নু'মানী বলেন, রেঙ্গুন সফরে জাহাজের পরিচারক তাঁর সঙ্গীদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এতদসত্ত্বেও বিদায় কালে তিনি তাকে ৪ টাকা বখ্শিশ দেন। ঐ আমলে বড় বড় ইংরেজ কর্মকর্তা কিংবা নওয়াব বাহাদুরদের বখ্শিশও ১ টাকার বেশী হত না। সঙ্গীরা আপত্তি করতে চাইলে তিনি বললেন, লোকটি ভেবেছিল, আমাদের মত মৌলভীর কাছ থেকে কোন বখ্শিশ পাওয়া যাবে না। তাই সে এই ব্যবহার করেছে। এখন তার বোধোদয় হবে যে, আমাদের মত লোকেরা ইংরেজদের চেয়েও বেশী বখ্শিশ দিতে পারে।[১৭৮]

দরিয়াবাদীর পূর্বোক্ত বর্ণনায় হযরত শায়খুল ইসলামের আতিথেয়তা সম্পর্কেও ধারণা মেলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে তাঁর বাড়ীটি ছিল রীতিমত একটি সরাইখানা। দৈনিক গড়ে ৪০/৫০ জন অতিথি এখানে উপস্থিত থাকতেন। কোন কোন দিন মেহ্মান সংখ্যা আরো বেড়ে যেত। কিন্তু তাঁর চেহারায় বিরূপ বা বিচলিত ভাব দেখা যেত না। অতিথিদের পেয়ে তাঁর মনের আনন্দ বৃদ্ধি পেত।

---

১৭৬. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৭।

১৭৭. প্রাগুক্ত।

১৭৮. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০-৬১।

তাদের সমাদর ও আপ্যায়নে তৃপ্তি বোধ করতেন।[১৭৯] এই অতিথিদের মধ্যে শুধু ছাত্র কিংবা মুরীদই নয়, দুআ প্রার্থী কিংবা তা'বীজ প্রার্থীদের অনেকেও থাকত। এমনও অনেক লোক থাকত যারা নিজস্ব প্রয়োজনে হয়ত শহরে বা বাজারে এসেছে, কিন্তু আহারের সময় অতিথিদের সাথে নিজেরাও দস্তরখানে বসে গিয়েছে। এ ধরনের অযাচিত লোকদের অনেককে তিনি চিনতেন কিন্তু কিছুই বলতেন না। অধিকন্তু অন্যান্য অতিথির ন্যায় কোন তারতম্য না করে তাদেরকেও আপ্যায়িত করতেন। বাড়ীতে অতিথিদের সেবাযত্নের কাজে যারা নিযুক্ত ছিল, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, অযাচিতদের যারা অতিথিদের সাথে ঢুকে যায় তাদের সেবাযত্নেও যেন কোন ত্রুটি না ঘটে। তাঁর এ উদার অতিথিপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে কোন কোন লোককে মাসের পর মাস অতিথি হয়ে বাড়ীতে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাতেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। একবার এক লোক তাঁর বাড়ীতে কয়েক মাস অতিথি হিসেবে অবস্থান করে। তখন জনৈক খাদিম তাকে বলেছিল, আপনি অকারণে এখানে বসে আছেন কেন? আপনাকে কোন কাজ করতেও দেখি না। পরদিন সকাল বেলা লোকটি চলে গেল। সন্ধ্যায় শায়খুল ইসলাম তাকে উপস্থিত না পেয়ে অসন্তুষ্ট হন। খাদিমকে ডেকে খুব শাসালেন এবং বললেন, আমার মেহমান যে চরিত্রেরই হোক, তার সাথে এমন আচরণের অনুমতি তোমাদের কে দিয়েছে?[১৮০] তিনি যথাসম্ভব নিজেই অতিথিদের খোঁজ খবর নিতেন। সেবার কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মেহমানখানা ও আতিথেয়তার সুন্দর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, হযরত শায়খুল ইসলামের মেহমানখানা ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম মেহমানখানা। তাঁর দস্তরখানা ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম দস্তরখানা। বস্তুতঃ তাঁর দেহের ভিতর যে হৃদয় ছিল সেটি ছিল এর চেয়েও বেশী প্রশস্ত। কারো কারো মতে দৈনিক গড়ে ৫০ জন অতিথি তাঁর বাড়ীতে থাকত। তাদের মধ্যে (আলিম ও সাধারণ লোক নির্বিশেষে) সব ধরনের লোকেরাই ছিলেন। শায়খুল ইসলামের চেহারার প্রফুল্লতা এবং আপ্যায়ন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সুষ্ঠুতা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিত যে, এই অতিথিদের পেয়ে তিনি কতটা রূহানী প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করেছেন। মানুষকে আমন্ত্রণ

---

১৭৯. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৫।

১৮০. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৯।

করা, সমাদর ও আপ্যায়ন করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি নিজের রূহানী শক্তির অগ্রগতি লাভ করতেন।[১৮১]

আপ্যায়নের সময় অতিথিদের সাথে নিজেও আহারে শরীক থাকতেন। কখনো অসুস্থতার কারণে কিংবা কোন অপারগতার দরুন নিজে শরীক থাকা সম্ভব না হলে পুত্র (ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা) সায়্যিদ আসআদ মাদানীকে ডেকে তাদের সাথে শরীক থাকার নির্দেশ দিতেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় একবার মওলানা আসআদ মাদানী তাঁরই চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে অতিথিদের সাথে শরীক হতে পারেননি। ফলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমার আহার বাইরে পাঠিয়ে দিও। আমি নিজেই, আমার অতিথিদের সাথে বসবো। প্রিয় পুত্র অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা চাইল। শায়খুল ইসলামের সহধর্মিণী নিজেও পুত্রের পক্ষ হয়ে সুপারিশ করলে তাঁর রাগ প্রশমিত হয়।

আপ্যায়নে মেহমানদের মধ্যে কোন তারতম্য করা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। সকলের জন্য একই আহার পরিবেশিত হত। তাঁর দস্তরখানে রকমারি তরকারীর স্থলে সাধারণত একটি তরকারীই হত। তবে সকলের জন্য। কখনো বিশেষ কোন কারণে উন্নত খাদ্যের ব্যবস্থা করা হলে সেটিও করা হত সকলের জন্য। মুজাহিদে আ'যম আমীর আবদুল করীমের সহোদর মুস্তফা রশীদ রাসূলী ভারত ভ্রমণকালে দেওবন্দ আগমন করেন। শায়খুল ইসলাম তাঁর আতিথেয়তায় উন্নত আহারের ব্যবস্থা করেন। ঐ আপ্যায়ন শুধু একা আমীরের জন্যই ছিল না। উপস্থিত অতিথিদের ছোট বড় সকলেই শরীক করেন।

অতিথিদের অভ্যর্থনা করে আনা, আবার বিদায় বেলা স্টেশন পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে টিকেট সংগ্রহ ও মালামাল সহ গাড়ীতে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি নিজে খুব যত্নসহ করে দিতেন। বছরের সব সময়ই থাকত তাঁর বাড়ীতে অতিথিদের ভিড়। পবিত্র রমযানে এ ভিড় আরো বেড়ে যেত। রমযানে সাধারণতঃ সবক পড়ানোর দায়িত্ব থাকত না বলে তিনি অতিথিদের জন্য প্রচুর সময় দিতেন।[১৮২]

হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের অভাবী, বিপদগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষের সাহায্য করার জন্য নিবেদিত প্রাণ

---

১৮১. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, পুরানে চেরাগ, (লক্ষ্ণৌ : মাকতাবা ফেরদাউস), ১৯৯৫, পৃ ১১৩।

১৮২. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১০।

ছিলেন। নবীজীর এ আদর্শ হযরত শায়খুল ইসলামকে অনুপ্রাণিত করে। তাই কোন মানুষের দুঃখ ও যাতনা নজরে পড়লে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। তিনি মানুষকে গোপনে সাহায্য করতে ভালবাসতেন। দারুল উলূম দেওবন্দে এমন বহু ছাত্র ছিল যাদের আর্থিক সংস্থান ছিল না। মাদ্রাসা থেকেও বৃত্তির ব্যবস্থা হয়নি। শায়খুল ইসলাম এমন বহু ছাত্রের অভিভাবক হিসেবে নিজেই তাদের ভরণ-পোষণ চালাতেন।[১৮৩] প্রত্যেক বছর 'মাদানী টিকেট'-এর শিরোনামে শতাধিক শিক্ষার্থী তাঁরই পকেটের পয়সায় লেখাপড়া করত। অনেক নিঃস্ব এতীম বিধবা ও অভাবী লোকেরা পত্র মারফত তাঁকে নিজেদের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিত। তাঁর নীতি ছিল কোন প্রকার ঢাকঢোল পেটানো নেই, চিঠিখানা পড়ে ঐ ঠিকানায় যতটুকু সম্ভব অর্থ মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিতেন। নিকট কিংবা দূর আত্মীয়ের সম্পর্কে নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়েও বেশী খোঁজখবর রাখতেন।[১৮৪]

তিনি কোন অঙ্গীকার করলে তা পাথরে খোদাই করে লেখার ন্যায় দৃঢ় হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বলতেন, অঙ্গীকার পালন করাই মুমিনের পরিচয়। যত বাধা বিপত্তি থাকুক না কেন অঙ্গীকার যথার্থ ভাবে পূরণ করবেনই। বিজনৌরের এক সভায় তিনি যোগদানের ওয়াদা দেন। কিন্তু যাত্রা করার মুহূর্তে শুরু হল ভয়ানক ঝড় তুফান। এদিকে গাড়ী স্টেশনে পৌছতে মাত্র ১৫/২০ মিনিট বাকী। কারী আসগর আলীসহ শুভাকাঙ্খীদের কেউ এমন ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে বের হওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন না। সকলের বক্তব্য, ঝড়ের ভিতর ঘর থেকে বের হলে নির্ঘাত অসুস্থ হতে হবে। সবাই টেলিগ্রাম করে অপারগতা প্রকাশের অনুরোধ করলেন। শায়খুল ইসলাম বললেন, সেখানে তো ঝড় তুফান নেই। হাজার হাজার মানুষ আমার অপেক্ষা করছে। আমি তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অধিকন্তু তাদের মনঃকষ্ট হবে। এসব বলে মর্দে মুজাহিদ প্রবল ঝড় মাথায় করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।[১৮৫]

একবার তিনি 'বাস্তী' নামক স্থানে গেলেন। সেখান থেকে টান্ডার নিকটবর্তী এক গ্রামের কোন অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা দেন। ওয়াদা রক্ষার্থে তিনি রাতে কনকনে শীত অতিক্রম করেও সেখানে পৌছেন। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ পক্ষ চলছিল। শীতের প্রকটতায় চতুর্দিকে বরফ জমে যাচ্ছিল। রাত ৩ টা পর্যন্ত প্রচণ্ড শীত ও বাতাসের মধ্যে তিনি মাওলানা আহমদ হুসাইন লাহেরপুরীসহ

---

১৮৩. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩।

১৮৪. আর রশীদ পত্রিকা, মাদানী ও ইকবাল সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃ ১৭৭।

১৮৫. আল জমইয়ত পত্রিকা, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭-১৫৮।

শাহগঞ্জ রেল স্টেশনে বসা। মাওলানা লাহেরপুরী একবার বলেই ফেললেন যে, হযরত আপনার কর্মসূচীর সাথে আমাদের চলা দুষ্কর। শায়খুল ইসলাম বললেন, তাদেরকে তো কথা দিয়েছি। যে করেই হোক আমাকে পৌছতে হবেই। তিনি আরো বললেন যে, একবার ইংরেজী শিক্ষিত জনৈক যুবক আমার সাথে সফর করতে আগ্রহী হল। যুবকটি ১৫ দিন আমার সঙ্গে ছিল, অবশেষে অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গেল। পরে পুনরায় শরীক হওয়ার হিম্মত করতে পারেনি। হযরত শায়খুল ইসলাম নিজের রোগব্যাধি, সুস্থতা-অসুস্থতা সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার অটুট রাখতেন। ভীষণ অসুস্থতা নিয়ে হলেও জলসায় হাযির হতেন। এ সকল ব্যাপারে তাঁর একটিই জবাব ছিল, মুমিন বান্দা ওয়াদা দেওয়ার পর তার অন্যথা করতে পারে না।[১৮৬]

হযরত শায়খুল ইসলামের মানবিক গুণাবলীর একটি বিশেষ দিক ছিল অল্পে তুষ্টি ও স্বাবলম্বিতা। তিনি ইচ্ছা করলে মোটা অংকের সরকারী বা বেসরকারী চাকুরী গ্রহণ কিংবা উচ্চপদ অর্জন করতে পারতেন। জীবনে তাঁর এমন সুযোগ বহু বার এসেছে। তাঁকে বহু পীড়াপীড়িও করা হয়েছে। কিন্তু তিনি দারুল উলূমের স্বল্প বেতনের চাকুরী ছেড়ে যেতে সম্মত হননি। পূর্বসূরী বুযর্গদের রেখে যাওয়া এই স্মৃতি ও আমানতের সেবাকে তিনি সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে মনে করতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি মিসর আল আযহারের শায়খুল হাদীস পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। মিসর সরকার গাড়ী বাড়ীর আশ্বাস দিয়েও তাঁকে অল্পে তুষ্টির চরিত্র থেকে সরাতে পারেনি।[১৮৭]

সভা সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ তাঁর দৈনিকই থাকত। লোকেরা তাঁর নিজের জন্য এবং সঙ্গে অন্তত একজন খাদিমের জন্য গাড়ীর ১ম শ্রেণীর ভাড়া পাঠিয়ে দিত। কিন্তু তিনি চলাফেরা করতেন ৩য় শ্রেণীতে সাধারণ মানুষের সাথে বসে। অবশিষ্ট টাকা কাগজে হিসাবসহ ফেরত দিয়ে দিতেন।

দারুল উলূমে তাঁর জন্য বেতন নির্ধারিত ছিল। চাকুরী গ্রহণের সময় তিনি সফর করার এবং সফরের কারণে বেতন কর্তন না করার শর্ত করে নিয়েছিলেন। অথচ কখনো তিনি সফরকালীন সময়ের বেতন গ্রহণ করতেন করেননি। সফরের দিনগুলো হিসাব করে ঐ পরিমাণের টাকা বেতন থেকে ফেরত দিতেন। এমনকি

১৮৬. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১২।
১৮৭. ফরীদুল ওয়াহীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৫।

অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিত দিনগুলোর জন্যও তিনি বেতন নিতেন না। ঐ বেতন গ্রহণের জন্য কৃর্তৃপক্ষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ফেরত দেন।[১৮৮]

হযরত শায়খুল ইসলামের অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ এতখানি ছিল যে, কেউ তাঁকে সামান্য কোন কাজেও কৃতার্থ করুক সেই সুযোগ তিনি দিতেন না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে আলোচনা করে মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ লিখেছেন, 'নিচের হাত অপেক্ষা উপরের হাত উত্তম' হাদীসের এ আদর্শের উপর তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সাধনা করেন আজীবন। নিজে কারো দ্বারা কৃতার্থ হতেন না। তবে জগতকে কৃতার্থ করতে তৎপর থাকতেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল যেন তাঁরই হাত থাকে উপরে। নিজে উপকার গ্রহণের পরিবর্তে অপরকে উপকার করার পথ খুঁজতেন। জীবনে কেউ তাঁর কোন উপকার করলে তিনি এটিকে ঋণ মনে করতেন। যে কোন উপায়ে এ ঋণ তিনি শোধ করবেনই।[১৮৯]

তাঁর শিষ্য শাগিরদরা তাঁর মুখ থেকে অনেক সময় শুধু এ জন্য ধমক সহ্য করতে হয়েছে যে, তারা তাঁর সাধারণ ও ছোট ছোট কাজগুলো নিজেরা আগে বেড়ে করে দিতে চাইত। অথচ তিনি এগুলো নিজেই করতে বেশী পছন্দ করতেন। একবার মাওলানা নাজমুদ্দীন ইসলাহীর আমন্ত্রণে তিনি আযমগড় যান। পথিমধ্যে সারায়মীর মাদ্রাসাতুল ইসলাহ-এর ছাত্রদের অনুরোধে যাত্রা বিরতি করেন। ভীষণ গরমের দিন ছিল। ছাত্ররা তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করতে চাইল। তিনি কিছুতেই রাযী হলেন না। নিজ হাতেই পাখা দিয়ে বাতাস করেন। এভাবে মাদ্রাসা থেকে বাড়ীতে প্রবেশের সময় ছাত্রদের কেউ আগে বেড়ে দরজা খুলে দিলে কিংবা কোন কাজে সহযোগিতা করতে চাইলে তিনি পছন্দ করতেন না। বস্তুত তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ তাঁকে নিজের কোন বিশেষত্বের প্রকাশ হওয়া যেমন পছন্দ করতে দিত না তদ্রূপ কারো কাছে কোন ধরনের কৃতার্থ থাকতেও অনুমতি দিত না।

সৌজন্যবোধ ও সদাচারের জন্য হযরত শায়খুল ইসলাম ছিলেন উত্তম উদাহরণ। শুভাকাঙ্খী, শত্রুমিত্র, স্বপক্ষ-বিপক্ষ, আপন-পর, শীআ-সুন্নী এমনকি মুসলিম-অমুসলিম কেউই তাঁর সদাচার ও সৌজন্য আচরণ থেকে বঞ্চিত হত না। এমন অনেক লোক যাদের তিনি ভাল করেই চিনেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণে এবং তাঁকে কষ্ট দিতে সম্ভাব্য কোন সুযোগ হাতছাড়া করেনি, তাঁদের প্রতিও তাঁর পূর্ণমাত্রার সদাচার বলবত ছিল। তাদের বিপদ কালে তিনি ছুটে গিয়েছেন, পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে সেবা ও উপকার করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির

---

১৮৮. সায়্যিদ রশীদুদ্দীন হামীদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬।

১৮৯. সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, আসীরানে মাল্টা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৬।

পূর্বকালে তার বিরুদ্ধে যে বিষোদগার চলছিল এবং বিভিন্ন স্থানে লোকেরা তাঁর সাথে যে কদর্য আচরণ করেছিল সেটি চিন্তা করলে লজ্জায় মাথা নুইয়ে আসে। কিন্তু কি অদ্ভুত! তিনি কারো ব্যাপারে না কোন অভিযোগ করেছেন, না কোন অনুযোগ করেছেন। কদর্য আচরণকারীরা বিভক্তির পর নিজেদের নানা প্রয়োজনে তাঁর কাছে সুপারিশের জন্য আসলে তিনি প্রফুল্ল বদনে তাদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান। কেউ তাঁকে ঐ সব ব্যাপারে কোন কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তার উপর উল্টা বিরক্ত হতেন।[১৯০]

মহানবীর মহান আদর্শ শত্রুকে ক্ষমা করা, অপরাধীর অপরাধ এড়িয়ে যাওয়া বরং অপরাধীর প্রতি করুণার হস্ত প্রসারিত করাকে তিনি আত্মস্থ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কিছু লোক যারা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করেছিল, যারা তাঁর বিরুদ্ধে কদর্য বাক্যে স্লোগান তুলে, হ্যান্ডবিল প্রচার করে, সভা ভণ্ডুল করে, এমনকি সুযোগমত যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত বলে ঘোষণা দিয়েছিল, তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করে কল্যাণের দুআ করেন।[১৯১] এসব ক্ষেত্রে তিনি নিজ চরিত্রে পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত নির্দেশ প্রতিষ্ঠিত করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾

যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটিই উত্তম। তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য আল্লাহরই সাহার্যে। তাদের দরুন দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।

---

১৯০. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৫।
১৯১. আবুল হাসান বারাবাংকুবী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

হযরত শায়খুল ইসলাম ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র। তাঁর কথা ও আচার-আচরণে কোন আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা ছিল না। যার সাথে মিশতেন গভীর আন্তরিকতার সাথে মিশতেন। সঙ্গী-সাথীকে মনের প্রফুল্লতা ও সুন্দর কথাবার্তার দ্বারা অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিতেন। তাঁর সাথে যারা চলত তাদের মধ্যে নিজের কোন বিশেষ মর্যাদার বহি:প্রকাশ তাঁর আচরণে ছিল না। তাঁকে আসতে দেখে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে তিনি থেমে যেতেন। যতক্ষণ না ঐ দাঁড়ানো লোকটি বসবে এবং স্বাভাবিক হবে ততক্ষণ তিনি সামনে অগ্রসরই হতেন না। নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদের বাড়ীতে স্বেচ্ছায় মেহমান হতেন কিন্তু স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনার বাইরে অতিরিক্ত কোন আড়ম্বরের অনুমতি দিতেন না। ভারত বিভক্তির পূর্বক্ষণে যখন রাজনৈতিক ব্যস্ততা খুব বেড়ে গিয়েছিল, তখন তাঁকে বেশ যাতায়াত করতে হয়েছিল ইউপির রাজধানী লখনৌতে। ঐ সকল সভা সমাবেশ ও মিটিংয়ে যোগদানকারী নেতারা দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে রাত্রি যাপন করতেন বড় বড় হোটেলে কিংবা সরকারী রেস্ট হাউজে। শায়খুল ইসলামের জন্যও এগুলো বরাদ্দ ছিল। কিন্তু তিনি অবস্থান করতেন নিজের জনৈক মুরীদ মাওলানা সায়্যিদ আবদুল আলীর একটি অতি সাধারণ বাড়ীতে। এ বাড়ীর সংলগ্ন মসজিদ ছিল বিধায় তাঁর দৈনিকের মামূলাত আদায় সহজ হত। শায়খুল ইসলামের রাজনৈতিক পদমর্যাদার কথা ভেবে মাওলানা আবদুল আলী একদিন সামান্য আড়ম্বরতার চেষ্টা করলে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, অনাড়ম্বরতার কারণেই এ বাড়ীটি পছন্দ করা হয়েছে। কাজেই আড়ম্বরতার শুরু হলে আতিথ্য গ্রহণ সম্ভব হবে না।

তিনি নিজ নামের পূর্বে বা পরে কোন উপাধি ব্যবহার করতেন না। বংশগতভাবে তিনি সায়্যিদ হওয়া সত্ত্বেও কখনো সেটি উল্লেখ করতেন না। নামের পূর্বে শুধু লিখতেন 'নঙ্গে আস্‌লাফ' যার অর্থ হল পূর্বসূরীদের কলংক। এ শব্দটি ব্যবহারের মধ্যেও কোন লৌকিকতা ছিল না। বরং বাস্তবিকভাবেও নিজ আকাবির ও আসলাফের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদেরকে এত বড় বলে ভাবতেন যে, তাঁদের তুলনায় নিজকে কলংক বলেই জ্ঞান করতেন। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী শৈশবে একদিন তাঁর হাত ধুইয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার অর্থ হল, সেই মনীষীগণ চলে গিয়েছেন, যাদের ছায়াতলে নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করা যেত। বর্তমানে আমরা অবশিষ্ট আছি যাদের জীবনের কোন মূল্যই নেই।[১৯২] মাওলানা নদভী বলেন, এই কবিতাটি ছিল শায়খুল

---

১৯২. তাঁর প্রিয় সেই কবিতাটি হল :

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِيْ أَكْنَافِهِمْ

ইসলামের অন্যতম প্রিয় কবিতা। তিনি মাঝে মাঝেই এটি আবৃত্তি করতেন। বিশেষতঃ কেউ যখন তার কাছে মুরীদ হওয়ার আবেদন করত, তখন এই কবিতাই ছিল তাঁর জবাবের প্রথম বাক্য।

বিনয়, নম্রতা ও নিরহংকারী আচরণ তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নিজের নামযশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা, ধোঁকা বা লৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করার চিন্তা কখনো তাঁর মাথায় ঢোকেনি। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, আলিম ও আলিম নন, এমন লোক নির্বিশেষে সকলের সাথে একই ভাবে মিশতেন। লোকেরা কোন কাজে আহবান করলে তাঁর পক্ষে 'না' উচ্চারণ করা কঠিন হত। তাঁকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখানো যায় এমন পরিস্থিতি তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। মাওলানা মনযুর নুমানীর গ্রামের বাড়ী সাম্বুলে একবার দেওবন্দের উলামায়ে কিরামকে আমন্ত্রণ করা হল। তন্মধ্যে মুফতী আযীযুর রহমান, হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ উচ্চপদস্থ সকলে ছিলেন। স্থানীয় জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদেরকে আপ্যায়নের জন্য নিজ বাড়ীতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সওয়ারী প্রস্তুত করে পাঠালে সকলে সওয়ারীতে আরোহণ করে তার বাড়ী যান। কিন্তু হযরত শায়খুল ইসলাম রোদের মধ্যে প্রায় এক মাইল পথ পায়ে হেটে যান। তবুও আড়ম্বর সওয়ারী গ্রহণ করেননি।[১৯৩]

মানুষ নিজের প্রশংসা পেতে চায়, প্রশংসার পরিবেশ তৈরী করে, প্রশংসা পেয়ে গর্বিত হয়। হযরত শায়খুল ইসলাম ছিলেন এর বিপরীত। আত্মপ্রশংসার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি তো নয়-ই, কেউ তাঁর প্রশংসা করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারণ করে দিতেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর উদ্দেশ্যে অনেক জায়গায় অভিনন্দন পত্র লিখেছিল তাঁকে শোনানোর জন্য। কিন্তু তিনি তাতে রাযী হননি।

শায়খুল ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল নিঃস্বার্থপরতা। সকল কাজে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। জাগতিক হীন উদ্দেশ্য, চরিতার্থ করা, মতলব উদ্ধারের চেষ্টা বা বাহবা কুড়ানোর আকাঙ্খা কখনো তাকে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যতের উচ্চ মাকাম থেকে চ্যুত করতে পারেনি। যে সকল লোক তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত ছিলেন না কিংবা যারা তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গিকে 'খাতায়ে ইজতিহাদী' বলে জানতেন তারাও তাঁর গভীর ইখলাস ও পরম নিঃস্বার্থপরায়ণতার জোরালো স্বীকারোক্তি প্রদান করে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের

بَقِىَ الَّذِيْنَ حَيَاتُهُمْ لَا تَنْفَعُ

১৯৩. যিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৮।

স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামের কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি স্বাধীনতার জন্য সীমাহীন কষ্ট দুর্ভোগ ও যাতনা সহ্য করে গিয়েছেন। এসব ত্যাগ-তিতিক্ষার কোথাও কোন স্বার্থচিন্তা তাঁর কার্যক্রমকে কলুষিত করতে পারেনি। স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর তিনি নিজের মূল কর্মক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা, তালীম ও তরবিয়্যতের কাজে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন এবং রাজনীতি থেকে এমনভাবে সরে দাঁড়ান যেন রাজনীতির কাজ তাঁর সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি নিজের বিগত ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ থেকে বিরত থাকেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানজনক খেতাব প্রদান করা হলে তিনি নিজের অপারগতা পেশ করে তা প্রত্যর্পণ করে দেন। অপারগতার কারণ হিসেবে বাহ্যিকভাবে যদিও বলেছিলেন যে, খেতাব গ্রহণ করা আমার পূর্বসূরিদের নিয়ম পরিপন্থী, তবুও যারা জানেন তারা ভাল করেই জানেন যে, বস্তুত তিনি নিজ কর্মের ইখ্লাসকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং এই ইখলাসের উপর স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন দাগ বসতে না দেওয়ার জন্যই এ কাজটি করেছেন। এই নিঃস্বার্থপরায়ণতার কারণেই তাঁর চরিত্রে যেমন কখনো দ্বিমুখী নীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারেনি তদ্রূপ কোন প্রকারের শঠতা, ধোঁকাদান, মোহপ্রবণতা ইত্যাদি যা সাধারণভাবে রাজনীতিকদের চরিত্রে থাকে, তার কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।[১৯৪]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। কাউকে তোয়াক্কা করে সত্য ভাষণ থেকে বিরত থাকা কিংবা কোন কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা তাঁর চরিত্রে ছিল না। রাজনীতির অঙ্গনে বহু সময় তাঁকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা বক্তব্যে ধর্মের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে জবাব দেন। যেটি সত্য সেটির বিপক্ষে কোন সমঝোতা বা নমনীয়তা অবলম্বন করা তাঁর দৃষ্টিতে ছিল খিয়ানত ও মহাপাপ। সত্যকে তিনি নির্দ্বিধায় বলে গিয়েছেন। তাতে কারো তিরস্কার, কারো অসন্তুষ্টি কোন কিছুরই পরোয়া করেননি। তিনি ভারতবর্ষের অবিভক্তির সমর্থক ছিলেন। ভারতের অখণ্ডতাকে মুসলমান ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করতেন। অন্যান্য মুসলিম নেতা তাঁর সাথে একমত হতে পারেননি। সূক্ষ্ম উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের ঢল বয়ে চলে বিভক্তির পক্ষে। এ পরিস্থিতি দেখে বড় বড় বহু নেতা স্রোতের সাথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শায়খুল

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৯।

ইসলাম কঠিন পাথরের ন্যায় সত্যের উপর শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর উপর নেমে আসে সামাজিক ঝড়-তুফান, ঝঞ্ঝা ও আক্রমণ। এতদসত্ত্বেও সত্য ভাষণ থেকে তাঁকে এক চুল নড়ানো যায়নি।[১৯৫]

পর্বতের মত ছিল তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। কোন কাজে তাঁর বিবেচ্য বিষয় ছিল কাজটি আল্লাহর পছন্দনীয় কিনা। তারপর এ কাজে যত বাধাই আসুক না কেন তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে যেতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অজ্ঞ লোকেরা তাঁকে গালিগালাজ করছে, তিনি নিজ কানে তা শোনেন ও সহ্য করে যান। ইংরেজ তাঁকে দীর্ঘকাল জেলখানার ভিতর আবদ্ধ করে রেখেছে, তিনি হাসিমুখে কারাগারের যাতনা সহ্য করেন, তবুও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কম্পন সূচিত হতে দেননি।[১৯৬] শায়খুল ইসলামের অসীম ব্যক্তিত্বের চিত্রায়ন করে তাঁর ভক্ত কবিগণ বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর শোকসভা উপলক্ষে ঐ কবিতাগুলোর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এ সব কবিতায় কবিগণ তাঁর গুণাবলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। নিম্নে তম্মধ্যে একটি কবিতার নমুনা পেশ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। কবিতাটি হল ঃ

وہ جسکی روح قدسی سے جہاں میں انقلاب آیا

کہ جسکے در سے دشمن بھی ہمیشہ کامیاب آیا

مدینہ کے در و دیوار اسکو یاد کرتے ہیں

حرم سے لیکر فرمان نبی جو بے حجاب آیا

وہ جسکی ذات امداد ورشیدی سنگم

وہ جسکی روپ میں محمود وقاسم بے نقاب آیا

ملایا ہند کے بچھڑے ہوؤں کو جسکی نغموں نے

১৯৫. আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৭।
১৯৬. আবদুর রশীদ আরশাদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯১।

جو شیخ الہند محمود حسن کے ہم رکاب آیا

مجدد ہے جو ہندوستاں میں قومی تخیل کا

دلائل میں جو لیکر شاھد ام الکتاب آیا

زمانہ نہ موافق أهل دوراں سب کے سب دشمن

نہ قدموں میں تزلزل نہ لب ہر کچھ عتاب آیا

محدث اور مدرس مرشد کامل سیاستداں

وہ دورہ ملک کا گردون بھی جس سے حجاب آیا

کہ جسکی فیض سے جاہل بہ عارف بن گیا یکدم

نگاہ مست سے مخمور ہر ہر شیخ وشاب آیا

উপসংহার

হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী ১৯ শাওওয়াল ১২৯৬/১৮৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২ জুমাদাল উলা ১৩৭৭/১৫ ডিসেম্ব ১৯৫৭ সালে ৮১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তার এই ৮১ বছরের মধ্যে ২ বছর অতিবাহিত হয় শৈশব যাপন, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে। আর ৭ বছর ৯ মা অতিবাহিত হয় ইংরেজ সরকারের জেলখানায়। বাকি ৫৩ বছর থেকে ব্যক্তিগত আহার নিদ্রা ও মানবীয় অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে যদি অন্তত ১০ বছরও বিয়োগ করা হয় তাহলে মূল কর্মকালের অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৪৩ বছর। এই ৪৩ বছরের সীমিত সময়কে সম্মুখে রেখেই তাঁর জীবন ও কর্মের ফলাফল চিন্তা করা যায়।

তাতে দেখা যায় যে, তিনি প্রায় ২ যুগ মদীনা শরীফের মসজিদে নববী, কলিকাতা ও সিলেটে হাদীসের যে অধ্যাপনা করেছেন সেটির ফলাফল গননা করা না গেলেও দারুল উলূম দেওবন্দে ৩২ বছর অধ্যাপনা (১৩৪৫/১৯২৫-১৩৭৭/১৯৫৭)-এর ফলে তাঁর কাছে যারা সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী অধ্যয়ন করেছেন তাদের সংখ্যা ৪৪৮৩। বর্তমানে পাক-ভারত-বাংলাদেশের যে সব প্রবীণ আলিম ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন তাঁদের অনেকে তারই প্রত্যক্ষ শাগিরদ।

ঐ সময়ে যারা তাঁর মুরীদ হয়ে আকীদা, আমল ও আখলাকের তাল্‌কীন লাভ করেছেন তাদের সংখ্যা ১ লক্ষের অধিক। তন্মধ্যে ১৬৭ ব্যক্তি এমন রয়েছেন যাঁরা সুলূক ও ইহ্‌সানের অনুশীলন পরিপূর্ণ করে খেলাফত প্রাপ্ত হন। এভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে, সমাজ ও সভ্যতার সংশোধনে ভারত উপমহাদেশের মত বিশাল ভূখণ্ডের গ্রামগঞ্জ সফর করে তিনি যে সব ওয়ায ও বক্তৃতা প্রদান করেন সেগুলির সংখ্যা কয়েক সহস্র।

তা ছাড়া দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য শ্রম দেওয়া, তদানীন্তন কালের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজের মোকাবেলায় ব্যুহ গঠন করা এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে কয়েক হাজার মক্তব ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও

পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন তো আছেই। এ সব জরুরী ব্যস্ততার ভিতরেও রয়েছে আবার ধর্মদর্শন, শিক্ষা, রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থ প্রণয়ন, পুস্তিকা রচনা, বিশেষতঃ ৪ খণ্ডে প্রায় ২ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত ঐ সব চিঠি পত্র (মাকতূবাত) রচনা যেখানে রয়েছে বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর, বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যা, ঈমান ও আকীদা সম্পর্কীয় বহু জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ ও সমাধান, ফাতাওয়া ও ফিক্‌হী মাসাইলের বর্ণনা, তাসাওউফ ও ইহ্‌সানের তাল্‌কীন এবং ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কীয় অনেক দুর্লভ তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ।

হযরত শায়খুল ইসলাম এ রচনাবলীর অধিকাংশ সফরে চলাকালে কিংবা জলের চার দেওয়ালে আবদ্ধ অবস্থায় লিখেছিলেন। এ থেকে তাঁর উপস্থিত ইল্‌মের প্রসারতা ও গভীরতার অনুমান মেলে। তাছাড়া আল্লাহর সাথে নিজের আত্মিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার সাধনায় সর্বদা শেষার্ধ রাতের তাহাজ্জুদ ও তিলাওয়াত, দয়াময় আল্লাহর সমীপে দীর্ঘ রোনাজারী প্রভৃতি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত ছিল। অনেক সময় দিনভর ট্রেনে, টমটমে কিংবা গরুর গাড়ীতে ভ্রমণের কষ্ট করে প্রথমার্ধ রাতের দীর্ঘক্ষণ সভা সমাবেশে কাটিয়েও শেষার্ধ রাতের ঐ প্রিয় মামূল থেকে এক বিন্দু বিচ্যুত হতে দেখা যেত না। মোটকথা তাঁর জীবনটি ছিল (رُهْبَانٌ فِى اللَّيْلِ فُرْسَانٌ فِى النَّهَارِ) রজনীর সাধক আর দিবসের যোদ্ধা-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এহেন বিস্তৃত পরিধি সম্পন্ন ব্যক্তিও বিশেষতঃ যাদের জীবনে বিপরীতধর্মী বহু সৎগুনের সমাবেশ থাকে তাঁদেও প্রধান গুণ কোন্‌টি সেটি চিহ্নিত করা গবেষকদেও জন্য জটিল হয়। শায়খুল ইসলামকে নিয়ে গবেষকরা এ সমস্যায় আবর্তিত হয়েছেন বেশী। তাই কেউ তাঁকে আলিম ও হাদীস বিশারদ হিসাবে, কেউ শায়খে তরীকত ও আধ্যাত্মিক রাহ্‌বার হিসাবে আবার কেউ রাজনৈতিক নেতা ও মুজাহিদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিনয় ও সৎসাহসের কথা বর্ণনা করেছেন। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর মতে তিনি ছিলেন আযীমত ও হামিয়্যতের শ্রেষ্ঠ ধারক। হযরত্‌জী মাওলানা ইহ্‌তিশামুল হক কান্ধলবী তাঁকে ইন্‌সানিয়্যত ও মানবতাবোধের প্রতীক হিসাবে ব্যক্ত করেন। আমাদের মতে তাঁর চরিত্রে উপরোক্ত গুণগুলির সবই ছিল পুর্ন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। এহেন ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি নিরূপণে গবেষক ও সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

তিনি তদানীন্তন যুগের ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মোকাবেলা করেন। এটিকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'

হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ আধিপত্যবাদের বিতাড়ন ও নির্মূল করার কাজে নিজের সর্বময় শক্তি ও মেধা নিয়োজিত করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করলে তাঁর ঐ স্বপ্ন বাস্তবতা লাভ করে।

ইংরেজ শাসনের সূচনা লগ্ন থেকে মুসলমানরা স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কিছুকাল পর পর্যন্ত এ সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইংরেজ মুসলমানদের ঐ বিপ্লবী চেতনাকে মূলধারা থেকে সরিয়ে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানদের একটি মহলকে নিজেদের অনুগত অনুচর হিসাবে খাড়া করতেও সক্ষম হয়। এমনকি তখন সংগ্রামী আলিমদের কাতার থেকেও বহু লোক সরে গিয়ে ইংরেজ শিবিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এহেন সংকটময় মুহূর্তে তিনি বহু ত্যাগের বিনিময়ে আসলাফ ও আকাবিরে উম্মাহ্‌র জিহাদকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বজন-পরজন নির্বিশেষে সকলের শত্রুতা ও তিরস্কার উপেক্ষা করে জিহাদ অব্যাহত রাখেন এবং জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মুখেও শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকেন। তাঁর চারিত্রিক এ দৃঢ়তা, অবিচলতা ও ইস্তিকামাত মুজাহিদীনে ইসলামের জন্য যুগযুগ পর্যন্ত অনুপম আদর্শ হয়ে থাকবে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তাই লীগের ইসলামী হুকুমত স্লোগানে যেমন প্রতারিত হননি তেমনি তিনি পূর্বেই আঁচ করেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলিম বিপ্লবী শক্তির দ্বি-খণ্ডন বরং ত্রি-খণ্ডন করতে বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় ভারতে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এবং পরবর্তী সময়ে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন যাপনের স্বার্থে তাদেরকে সকল সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে স্বাধীনতার সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাওয়া আবশ্যক। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই বিভক্তির পর ভারতের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সাম্যের নীতি অবলম্বনে বাধ্য করে। হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য উগ্রপন্থী দলগুলি পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম স্লোগানের বিপরীতে ভারতে হিন্দু ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছিল। কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতার ধারক বিপ্লবী আলিমদের চেষ্টায় তখন ভারত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলামের সফলতা অতুলনীয় বলা চলে।

হযরত শায়খুল ইসলাম জাগতিক ব্যাপারে ছিলেন পরম উদার আর ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। তিনি ইংরেজ বিরোধী রাজনীতিতে স্বদেশী হিন্দুদের সাথে আপোস করলেও ইসলামের উপর কোন সাধারণ হস্তক্ষেপের সময়ে

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভূমিকা গ্রহণে কোন কালেই পিছিয়ে থাকেননি। বস্তুত বিংশ শতকের শুরু দিকে ভারত উপমহাদেশে ইসলামী রাজনীতির স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা অনেকটা অস্পষ্ট ছিল। কেউ তো ইসলাম' ও 'মুসলিম' নামের ব্যবহারকেই ইসলামী রাজনীতির জন্য যথেষ্ট জ্ঞান করেন, আবার কেউ ইসলামের নাম হাঁকিয়ে সর্বপ্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে ইসলাম বলে চালিয়ে দিতে মেতে উঠেন। শায়খুল ইসলাম জাগতিক ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ আমানতদারী ও রক্ষণশীলতা অবলম্বন করে প্রকৃত ইসলামী রাজনীতির স্বরূপ প্রদর্শন করে গিয়েছেন। কোন সন্দেহ নেই, এই প্রকৃতির রাজনীতি শুধু রাজনীতিই নয় বরং মর্যাদাসম্পন্ন জিহাদও বটে।

তিনি বুদ্ধি ও বিবেকের বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে স্যার সায়্যিদের মত বুদ্ধিকেই সত্যাসত্য নিরূপণের মাপকাঠি জ্ঞান করেননি। তাঁর মতে সত্যাসত্য নিরূপণের মাপকাঠি আল্লাহর পবিত্র কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহ। বুদ্ধি ও বিবেক কুরআন ও সুন্নাহর সেবক। তাঁর দৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা আকাবির ও আস্‌লাফের গৃহীত মূলনীতির আলোকে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আকাবিরের মূলনীতি উপেক্ষা করে কুরআন ও সুন্নাহর নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গ্রহণযোগ্য নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদীর ত্রুটি নির্দেশ ও সমালোচনা করেছেন।

তিনি নিজের শিক্ষক হযরত শায়খুল হিন্দের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন। শিক্ষকের নির্দেশ পালনার্থে মসজিদে নববীতে হাদীসের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েও জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর জিহাদের প্রতিটি কদমে কদমে তাঁরই আনুগত্য ও নীতিমালা সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকেন। মাল্টা ও অন্যান্য স্থানে শায়খুল হিন্দের সেবায় তিনি নিজকে যেভাবে অর্পণ করেছিলেন ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর জীবনে ইসলামে নির্দেশিত শিক্ষাগুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদর্শ যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছিল।

হযরত শায়খুল ইসলামের মতে ইসলামের নিখুঁত শিক্ষা ও নৈতিক পরিশুদ্ধি ব্যতিরেকে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র বজায় থাকতে পারে না। হিদায়াতের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়ে ঈমানী ও আমলী শক্তিকে অগ্রসর করানোর মাধ্যমে জগতে মুসলমানদের যে আসন স্থাপিত হয় সেটিই তাদের প্রকৃত আসন। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তিনি স্বাধীনতার পর নিজেকে জাতির শিক্ষা ও নৈতিক পরিশুদ্ধির ভিত মজবুত করার জিহাদে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ পর্বের জিহাদ। এ জিহাদ তাঁর আমৃত্যু অব্যাহত ছিল।

তাঁকে জিহাদে আযাদীর নির্মোহ সিপাহসালার বলে চলে। মানবতার কল্যাণ সাধনই তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করেন। তাই স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণ বরং ত্যাগের স্বীকৃতি ও মর্যাদাস্বরূপ রাষ্ট্রীয় খেতাব গ্রহণেও তাঁকে সম্মত করা যায়নি। দেশ ও জাতির জন্য অর্পিত ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিদান হিসাবে যতটুকু প্রাপ্য ছিল তার সবই তিনি মহান আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন এবং জগতের কোন মানুষ থেকে নিতে অস্বীকার করেন।

দেশ বিভক্তির পর হিন্দু মহাসভা, আর এস এস ও অন্যান্য উগ্রপন্থীলোকেরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে মুসলমানদের উচ্ছেদে তৎপর হয়ে উঠলে তিনি তাদের পূর্ণ মোকাবেলা করেন। তিনি অভিভাবকহীন মুসলমানদের জীবন রক্ষার্থে ছুটে যান। কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের তদানীন্তন ৩ কোটি মুসলমান তাঁর সেই ভূমিকার কাছে চিরঋণী। কিন্তু কংগ্রেসের মেনিফেস্টো ও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা ও পার্সোনাল 'ল' সংরক্ষণের যে অঙ্গীকার ছিল তা পূর্ণ বাস্তবায়িত না হওয়ার শেষ জীবনে তিনি খুবই দুঃখিত হন। নিজের জেল ও রেলের দীর্ঘকালীন সহযোদ্ধাদের থেকে প্রাপ্ত এই আচরণ তাঁকে প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করেছিল ।

পরিশেষে এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রাহ্‌বার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, আমাদের দৃষ্টিতে তিনিই মহান যিনি আত্মজীবনের অন্তিম মুহূর্তেও নিজের কল্যাণধর্মী প্রতিভাগুলিকে পরিপূর্ণ কার্যকরী রাখতে পারেন, যিনি জীবনযুদ্ধের কোন পর্যায়ে হতোদ্যম, বিরক্ত কিংবা বিচ্যুত হন না বরং আরাধ্য স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন আকাঙ্ক্ষায় সর্বপ্রকারের ঝড় তুফানের মুখেও আশার পিদিম জ্বালানোর নিরন্তর সাধনায় অনড় ও অবিচল থাকেন। এই তুলাদণ্ডে আমরা যখন পরিমাপ করি তখন হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানীকে এই শতাব্দীর অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব' হিসাবে গর্বের সাথে সমর্থন করতে পারি।

اَلْحَمْدُ بِعِزَّتِهٖ وَ جَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ
خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ
وَعُلَمَاءِ اُمَّتِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ

গ্রন্থপঞ্জী

অতুল চন্দ্র, রায়, ডক্টর : **ভারতের ইতিহাস**
নতুন সং, কলিকাতা ঃ মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৫, ১ম ও ২য় খণ্ড।

অমলেশ, ত্রিপাঠী : **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)**
২য় সং, কলিকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স লি, বাংলা, ১৩৯৮।

আকবর উদ্দীন : **কায়েদ আযম**
ঢাকা ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।

আকরম খাঁ, মোহাম্মদ : **মোছলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস**
ঢাকা ঃ গ্রন্থকার, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৬৫।

আদীল, কাযী, আব্বাসী : **তাহরীক-এ-খলাফত**
দিল্লী ঃ আঞ্জুমানে তারাক্কী উর্দূ, তা. বি.।

আনযার, শাহ্, মাসউদী : **নকশে দাওয়াম**
দেওবন্দ ঃ শাহ্ একাডেমী, ১৯৮৮।

আশরাফ, আলী, শাহ্, থানবী, হাকীমুল উম্মত : **বাসায়িরে হাকীমুল উম্মত** (সংকলিত)
ডা. মুহাম্মদ আবদুল হাই, করাচী ঃ সাঈদ কোম্পানী, ১৪০৯/১৯৮৯।

: **শরীঅত ও তরীকত**
অনুঃ আবদুল মজিদ ঢাকুবী
২য় সং, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭।

: **পথহারা উম্মতের পথনির্দেশ**
অনু : মাওলানা আখতার ফারুক
মূল : ইসলাহে ইন্‌কিলাবে উম্মত
ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৪।

: **কামালাতে আশরাফিয়্যা** (সংকলিত)
মাওলানা ঈস' এলাহাবাদী
থানাবন : ইদারায়ে তালীফাতে আশরাফিয়্যা, ১৪১২।

: **ইমদাদুল ফাতাওয়া**
করাচী : মাকতাবা দারুল উলূম, তা. বি.।
১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড।

আসগর, হুসায়ন, সায়্যিদ : **হায়াতে শায়খুল হিন্দ**
লাহোর : ইদারা ইসলামিয়্যাত, ১৯৭৭।

আসীর, আদরবী, মাওলানা : **মাআছিরে শায়খুল ইসলাম**
দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন,
১৪০৭/১৯৮৭।

: **শায়খুল ইসলাম জীবন ও সংগ্রাম**
অনু : মাওলানা ইসহাক ফরীদী
২য় সং, ঢাকা : প্রভাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৮।

: **হিন্দুস্তান কী জঙ্গে আযাদী মেঁ মুসলমানূঁকা কিরদার**
দেওবন্দ : মারকাযে দাওয়াতে ইসলাম,
১৪০১/১৯৮১।

: **মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানূতবী হায়াত আওর কারনামে**
দেওবন্দ : শায়খুল হিন্দ একাডেমী,
১৪১৭/১৯৯৭।

: **তাহরীকে আযাদী আওর মুসলমান**
দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন,
১৪০/১৯৮৯।

: মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী হায়াত আওর কারনামে
দেওবন্দ : শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ১৪১৮/১৯৯৭।

: ইহ্ইয়ায়ে ইসলাম কী আযীম তাহরীক
দেওবন্দ : দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৯১।

আজিবুল হক : আওরঙ্গজেব, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম
কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩।

আনওয়ারুল হাসান, শেরকোটী, মাওলানা : হায়াতে উসমানী
করাচী : মাকতাবায়ে দারুল উলূম, ১৪০৫/১৯৮৫।

আনিসুজ্জমান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪।

আবদুর রাকিব : সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ
কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, কলেজ স্ট্রীট, ১৯৯২।

আবদুর রায্যাক, মাওলানা : মালফূযাত কারামাত ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী
ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭।

আবদুর রশীদ, আরশাদ : বীস বড়ে মুসলমান
লাহোর : মাকতাবায়ে রশীদিয়্যা লিঃ, তা. বি.।

আবদুর রহিম, মোহাম্মদ : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)
ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

আবদুর রহীম, মাওলানা : হাদীস সংকলনের ইতিহাস
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

আবদুর রহমান, মৌলভী	ঃ	তাহরীকে রেশমী রুমাল লাহোর ঃ ক্লাসিক, ১৯৬০।
আবদুল আযীয, শাহ, মুহাদ্দিস দেহলবী	ঃ	ফাতাওয়া-এ-আযীযিয়্যা দিল্লী ঃ মাতবায়ে মুজতাবায়ী, ১৩২২/১৯০৪। ১ম, ২য় খণ্ড।
	ঃ	বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন করাচী ঃ এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, ১৯৪৮।
আবদুল ওয়াহিদ, ডাঃ	ঃ	উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।
আবদুল করীম	ঃ	ঢাকাই মসলিন ঢাকা ঃ ঢাকা নগর জাদুঘর, ১৯৯০।
আবদুল করীম, ফুরূগ	ঃ	মসনবী ফুরূগ কানপুর ঃ মাতবায়ে নিযামী, ১৩০৩/১৮৮৫।
আবদুল গফুর, অধ্যাপক	ঃ	আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (সংকলিত) ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
আবদুল জলীল, এডভোকেট	ঃ	দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ ঢাকা ঃ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩।
আবদুল মওদুদ, বিচারপতি	ঃ	ওহাবী আন্দোলন ৪র্থ সং, ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ ঃ বাংলা ও বাংগালী মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা
ঢাকা ঃ সৃজন প্রকাশনী, করিম চেম্বার,
বাংলা ১৩৯৭।

আবদুল মান্নান, তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৪১৫/১৯৯৪।

আবদুল মান্নান, হাকীম ঃ মাদারে মিল্লাত
করাচী ঃ ১৯৬৫।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ডক্টর ঃ রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৫।

ঃ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীঃ জীবন ও কর্ম
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯২।

ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও
সামাজিক চিন্তাধারা
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৪০২/১৯৮২।

ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৪০৭/১৯৮৭।

ঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৬।

ঃ স্যার আবদুর রহীম ঃ জীবন ও কর্ম
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯০।

আবদুল হামীদ, আযমী : **সিলেটে হযরত মদনী (রহ:)**
অনু ঃ মাওলানা আবদুল মালিক,
মূল ঃ মাওলানা মাদানী কা কিয়ামে সিলহেট,
সিলেট ঃ রহমানিয়া কিতাব প্রকাশনী,
১৯৮৯।

আবদুল্লাহ ইবন উমর, বায়যাবী, আল্লামা : **আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত্ তাবীল**
বৈরুত ঃ মুআসসাসা-এ-শাবান, তা. বি.।
১ম খণ্ড।

আবদুল হাই, হাকীম, হাসানী, সায়্যিদ : **নুযহাতুল খাওয়াতির**
হায়দ্রাবাদ ঃ দাইরাতুল মাআরিফ উসমানিয়্যা, ১৯৭০।
৭ম, ৮ম খণ্ড।

আবদুল হক, সঙ্গপুরী, মাওলানা : **হযরত মাদানী কে হায়রত আঙ্গীয ওয়াকিআত**
দেওবন্দ ঃ মাকতাবা দীনিয়্যা, তা. বি।

আবুল আলা, মওদূদী : **খিলাফত ওয়া মুলূকিয়্যাত**
নতুন সং, লাহোর ঃ ইদারা তরজমানুল কুরআন,
১৯৯০।

: **রাসাইল ওয়া মাসাইল**
লাহোর ঃ ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ ১৯৯১।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড।

আবুল আসাদ : **একশ' বছরের রাজনীতি**
ঢাকা ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪।

আবুল কালাম, আযাদ, মাওলানা : **তাহরীকে আযাদী**
দিল্লী ঃ ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮।

: **ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম**
ঢাকাঃ স্বপ্নিল প্রকাশনী, ১৯৮৯।

: **ইসলাম কা নযরিয়্যায়ে জঙ্গ**
দল্লী ঃ ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ,
১৯৮৮।

: **মাসআলায়ে খেলাফত**
দিল্লী ঃ ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ ১৯৮৮।

আবুল হাসান, বারাবাংকুবী : **হায়াতে শায়খুল ইসলাম কে হায়রত আঙ্গীয ওয়াকিআত**
দেওবন্দ ঃ মাকতাবা দীনিয়্যা, ১৯৭৫।

: **মালফুযাতে শায়খুল ইসলাম**
দেওবন্দ ঃ মাকতাবা ইল্ম ওয়া আদব, তা. বি.।
১ম, ২য় খণ্ড।

আবুল হাসান, আলী, নদভী : **মুসলমানুঁ কে তানাযযুল ছে দুনয়া কো কিয়া নুকসান পৌহঁচা।**
লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৯৮৫।

: **হিন্দুস্তানী মুসলমান এক তারীখী জায়িযা**
লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৯৯২।

: **তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত**
লক্ষ্ণৌঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাত ইসলাম, ১৩৯৯/১৯৭৯।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, খণ্ড।

: **সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ**
লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৪১০/১৯৯০।
১ম খন্ড, ২য় খণ্ড।

: **দস্তুরে হায়াত**
লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৪০৫/১৯৮৫।

: **তাযকিয়্যা ওয়া ইহ্সান**
লক্ষ্ণৌ ঃ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৩৯৯/১৯৭৯।

আমীমুল ইহসান, সায়্যিদ, মুফ্‌তী : **কাওয়াইদুল ফিকহ**
দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৩৮১/১৯৯১

: **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**
অনু ঃ মাওলানা শরীফ মোঃ ইউসুফ
ঢাকা ঃ ইসলামী একাডেমী, হি. ১৪১১।

আযীযুর রহমান, মুফতী : **তাযকিরায়ে শায়খুল হিন্দ**
বিজনৌর ঃ দারুত তালীফ, ১৯৬৫।

আশিক ইলাহী, মীরাঠী, মাওলানা : **তাযকিরাতুর রশীদ**
সাহারানপুর ঃ মাকতাবায়ে খলীলিয়্যা, ১৯৭৭।
১ম, ২য় খণ্ড।

: **তাযকিরাতুল খলীল**
সাহারানপুর ঃ মাকতাবায়ে খলীলিয়্যা, ১৯৯২।

আসরারুল হক, কাসিমী, মাওলানা : **আযাদী কী লড়াই মেঁ উলামা কা ইমতিয়াযী রোল**
দিল্লী ঃ শুবা নশর ওয়া ইশাআত,জমইয়তে উলামা,

ইউসুফ, মুহাম্মদ, লুধিয়ানবী, মাওলানা : **ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম**
দেওবন্দঃ তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯০।
১ম, ২য় খণ্ড।

ইউসুফ, মুহাম্মদ, কান্ধলবী, মাওলানা : **হায়াতুস সাহাবা (উর্দু)**
অনু ঃ মুহাম্মদ উসমান খান ফয়যাবাদী
নয়াদিল্লী ঃ ইদারা ইশাআতে দীনিয়্যাত, হি. ১৩৮৩।
১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড।

ইকরাম, মুহাম্মদ, শায়খ : **রওদে কাওসার**
দিল্লী ঃ তাজ কোম্পানী, ১৯৯১।

: **মওজে কাওসার**
দিল্লী ঃ তাজ কোম্পানী, ১৯৯১।

ইদরীস, কান্ধলবী, মাওলানা : **সীরাতে মুস্তফা**
দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি.।
১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড।

ইদরীস, মুহাম্মদ, হুশিয়ারপুরী, মাওলানা : **খুতবাতে মাদানী** (সংকলিত)
দেওবন্দ : যম্‌যম্ বুক ডিপো,
১৯৯৭।

ইসমাঈল, মুহাম্মদ, শাহ্, শহীদ : **তাকবিয়াতুল ঈমান**
কানপুর : মুনশী নওয়াল কিশোর,
১৮৮৮।

: **মানসাবে ইমামত** (উর্দূ)
অনু : হুসায়ন আলাবী
লাহোর : আইনা-এ-আদব, আনারকলি, ১৯৬২।

ইসহাক, মুহাম্মদ, ফরীদী, মাওলানা : **আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওঃ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী**
ঢাকা : মুহাম্মদ মামূনুর রশীদ প্রকাশিত,
১৪১৩/১৯৯২।

: **বাতিল যুগে যুগে**
কুমিল্লা : আল আমীন একাডেমী
১৯৯০।

: **জিহাদের মর্মকথা**
ঢাকা : মাদানী পাবলিকেশন্স, তা. বি.।

: **কাওমী মাদ্রাসা কি ও কেন?**
ঢাকা : মাদানী পাবলিকেশন্স, তা. বি.।

: **ইসলামী আকীদা**
ঢাকা : আল আকাবা পাবলিকেশন্স,
১৯৯৮।

ইয়াহয়া, মুহাম্মদ, আবুল ফাতহ, মাওলানা : **ইসলামের দৃষ্টিতে পীর মুরীদী**
ঢাকা : জামিয়া দ্বীনিয়া মতিঝিল,
১৪০৮/১৯৮৮।

ইব্‌ন আবদিল বার	ঃ	আল ইস্তিআব ফী মারিফাতিল আসহাব মসর ঃ মাকতাবা নাহ্‌দা, তা. বি.। ২য় খণ্ড।
ইব্‌ন কাসীর, ইসমাঈল, দামেশকী	ঃ	আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া বায়রূত ঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাস আলআরবী, ১৪১৩/১৯৯৩। ১ম ও ২য় খণ্ড।
ইব্‌ন সাদ	ঃ	তাবাকাত (উর্দূ) অনু ঃ রাগিব রহমানী করাচী ঃ নফীস একাডেমী, ১৯৭২। ৭ম ও ৮ম খণ্ড।
ইব্‌ন হাজার, আলী আল আসকালানী	ঃ	আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা মিসর ঃ মাতবাউস সাআদা, হি.১৩২৮। ২য় খণ্ড।
ইব্‌নুল জাওযী, আবদুর রহমান, বাগদাদী	ঃ	তালবীসু ইবলীস (উর্দূ) অনু ঃ আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক আযমগড়ী দেওবন্দ ঃ মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৮০।
ইমদাদুল্লাহ, মুহাজিরে মক্কী ফারূকী, হাজী	ঃ	যিয়াউল কলূব অনু ঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০৮/১৯৮৮।
	ঃ	মরকূমাতে ইমদাদিয়্যা অনুঃ মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৮/১৯৮৮।
ইমাম নববী, ইয়াহয়া ইব্‌ন শারক, হাফিয	ঃ	রিয়াযুস সালিহীন নতুন সং, দিল্লী ঃ সলীম বুক ডিপো, তা. বি.।

উবায়দুল্লাহ, সিন্ধী, মাওলানা : **শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা**
অনু : নূর উদ দীন আহমদ
মূল : শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকী সিয়াসী তাহরীক
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
৩য় সং, ১৯৮২।

: **যাতী ডায়েরী**
লাহোর : সিন্ধ সাগর একাডেমী,
১৯৪৪।

এসহাক, মোহাম্মদ, ডক্টর : **ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান**
অনু : হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৪১৪/১৯৯৩।

ওয়াকিল আহমদ, ডক্টর : **উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা**
ঢাকা : বাংলা একাডেমী,
১৯৮৩।

ওবায়দুল হক, মাওলানা : **বাংলার পীর আওলিয়াগণ**
ফেনী : হামিদিয়া লাইব্রেরী,
১৯৬৯।

ওয়ালিউল্লাহ, শাহ্, দেহলবী : **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা**
দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যা, তা. বি.।
১ম ও ২য় খণ্ড।

: **ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা**
করাচী : কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি.।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড।

: **আল বালাগুল মুবীন**
অনু : কারামত আলী নিজামী
ঢাকা : শিরীন পাবলিকেসন্স, বাংলা ১৩৮৩।

কাসিম, মুহাম্মদ, নানূতবী, মাওলানা : **তাসফিয়াতুল আকায়িদ**
দেওবন্দ : কুতুবখানা ইজাযিয়্যা, তা. বি.।

: মাকতূবাতে কাসিমিয়্যা
দেওবন্দ ঃ দারুল মুআল্লিফীন, ১৯৯১।

: আবে হায়াত
দিল্লী ঃ মাতবায়ে মুজতাবায়ী, হি. ১৩২৩।

: জওয়াব তুর্কীবতুর্কী
দেওবন্দ ঃ মজলিসে মাআরিফুল কুরআন, ১৯৬৭।

: লাতায়িফে কাসিমিয়্যা
দিল্লী ঃ মাতবায়ে মুজতবায়ী, হি. ১৩২৬।

গোলাম রসূল, মেহর : হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.)
অনু ঃ আবদুল জলীল,
মূল ঃ সারগুযাশতে মুজাহিদীন
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।

জুলফিকার আহমদ, কিসমতী, মাওলানা : বাংলাদেশের সংগ্রামী উলামা পীর-মাশায়েখ
ঢাকা ঃ প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮।

জাহেদ, আল হুসাইনী, মাওলানা : চেরাগে মুহাম্মদ
অনু ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
ঢাকা ঃ জামেয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ, ১৯৯৮।

তাকী, মুহাম্মদ, উসমানী, মাওলানা : দারসে তিরমিযী
করাচী ঃ মাকতাবা দারুল উলূম, ১৪০৯/১৯৮৮। ১ম খণ্ড।

: আসরে হাযির মেঁ ইসলাম কেয়সে নাফিয হো
কুমিল্লা ঃ ইদারাতুল মাআরিফ, তা.বি.।

: হযরত থানবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা
অনু ঃ মাওলানা যাইনুল আবেদীন
ঢাকা ঃ ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ, ১৪১৬/১৯৯৬।

তোফাইল আহমদ, সায়্যিদ, মোঙ্গলরী : মুসলমানুঁ কা রওশন মুস্তাকবিল
লাহোর ঃ হাম্মাদ আলকুতবী, শীশ মহল রোড, তা. বি.।

তায়্যিব, মুহাম্মদ, কারী, মাওলানা : উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনী রোখ আওর মাসলকী মিজায।
দেওবন্দ ঃ মাকতাবা মিল্লাত, তা. বি.।

: হিকমতে কাসিমিয়্যা
দেওবন্দ ঃ মজলিসে মাআরিফুল কুরআন, ১৩৮৭/১৯৬৭।

: মাকালাতে তায়্যিবা
দেওবন্দঃ দারুল কিতাব, ১৯৮৯।

: রিওয়ায়াতুত তায়্যিব
দেওবন্দ ঃ দারুল কিতাব, ১৯৮৯।

: ইসলামী তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন
দেওবন্দ ঃ দারুল কিতাব, ১৯৮৯।

: দারুল উলূম দেওবন্দ কী পঁচাছ মিছালী শখসিয়্যত
দেওবন্দ ঃ দারুল কিতাব, ১৯৯৮।

তাহির, মোহাম্মদ, মাওলানা : মাদানী চরিত
কলিকাতা ঃ মদনী নগর মাদ্রাসা তা. বি.।

: বাংলাদেশ ও জমইয়তে উলামায়ে হিন্দ
জমইয়ত অফিস, কলিকাতা, ১৯৭২।

তারা চাঁদ, ডক্টর : ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব
অনু ঃ এস. মজিব উল্লাহ
মূলঃ Influence of Islam on Indian Culture.
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১১/১৯৯১।

: তারীখে তাহরীকে আযাদীয়ে হিন্দ
নয়াদিল্লী ঃ তারাক্কী উর্দূ বোর্ড, তা. বি.।

নূর, মোহাম্মদ, আজমী : **হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস**
৪র্থ সং, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২।

নাজমুদ্দীন, ইসলাহী, মাওলানা : **মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম** (সংকলিত)
গাওজরনাওয়ালা ঃ মাদানী কুতুবখানা, তা. বি।
১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড।

: **সীরাতে শায়খুল ইসলাম**
দেওবন্দ ঃ মাকতাবা দীনীয়্যা, ১৪১৪/১৯৯৩।
১ম ও ২য় খণ্ড।

: **মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম** (সুলূক তরীকত)
দেওবন্দঃ মাকতাবা দীনিয়্যা, তা. বি.।

নূরুর রহমান, মাওলানা : **তাযকেরাতুল আওলিয়া**
৩য় সং, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬।
৪র্থ, ৫ম খণ্ড।

নূরুল আনোয়ার, হোসেন, চৌধুরী, : **আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস**
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।
২য় খণ্ড।

: **জালালাবাদের কথা**
ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

: **আমাদের সূফীয়ায়ে কিরাম** (সংকলিত)
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

নূরুল্লাহ, মুফতী : **মাশায়িখে চিশত**
বি. বাড়ীয়া ঃ আযীয প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ফযলে হক, খায়রাবাদী, মাওলানা : **আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭**
অনু ঃ মুহিউদ্দীন খান
মূল ঃ আস্ সওরাতুল হিন্দিয়া
ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

ফুযুয়ুর রহমান, মাওলানা : মাশাহীর-এ-উলামায়ে দেওবন্দ
লাহোর : আল মাকতাবাতুল আযীযিয়্যা, ১৯৭৬।
১ম, ২য় খণ্ড।

ফরীদুল ওয়াহীদী, মাওলানা : শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী
নয়াদিল্লী : কাওমী কিতাব ঘর,
১৯৯২।

ফেরেশতা, মুহাম্মদ, কাসিম : তারীখে ফেরেশতা (উর্দূ)
অনু : আবদুল হাই খাজা
দেওবন্দ : মাকতাবা মিল্লাত, ১৯৮৩।
১ম, ২য় খণ্ড।

বদিউজ্জামান, ডক্টর : ইসমাঈল হোসেন সিরাজী জীবন ও সাহিত্য
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯/১৯৮

বদরুদ্দীন, উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক
ঢাকা : গ্রন্থনা, বাং ১৩৭৯।

বশীর, আহমদ : শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকা ফালসাফায়ে উমরানিয়্যাত
লাহোর : মাকতাবা-এ-বায়তুল হিকমা,
১৯৪৫।

ভবানী প্রসাদ, চট্টোপাধ্যায় : দেশ বিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী
কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
১৯৯৩।

মুজতবা হোছাইন, ডক্টর : হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, সমকালীন পরিবেশ ও জীবন
ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ,
১৯৯৮।

মনজুর, মুহাম্মদ নুমানী, মাওলানা : দীন ওয়া শরীঅত
লক্ষ্ণৌ : আল ফুরকান বুক ডিপো, ১৯৯০।

: তাসাউফ কাহাকে বলে
অনু : মাওলানা আবদুল খালেক
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৪০৯/১৯৮৯।

: ইসলামী জীবন
অনু ঃ ইসহাক ফরীদী ও মুস্তাক আহমদ।
ঢাকা ঃ আল আকাবা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫।

মানাযির আহসান, গীলানী : সাওয়ানিহে কাসিমী
দেওবন্দ ঃ দারুল উলূম, হি. ১৩৭৩।
১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড।

: মুসলমানুঁ কা নিযামে তালীম ওয়া তারবিয়্যত
দিল্লী ঃ নদওয়াতুল মুসান্নিফীন,
তা. বি.।

মরিস, বুকাইলী, ডক্টর : বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান
অনু ঃ আখতারুল আলম।
৬ সং, ঢাকা ঃ জ্ঞান কোষ প্রকাশনী,
১৯৯৫।

মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৪০৭/১৯৮৭।

মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা : হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী
৩য় সং, ঢাকা ঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী,
১৯৯৬।

মাহবূব, সায়্যিদ, রেযবী : তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ
নতুন সং, দেওবন্দ ঃ ইদারা ইহতিমাম দারুল উলূম, ১৯৯২।
১ম, ২য় খণ্ড।

মোহাম্মদ মূছা, মাওলানা : উপমাদেশের ওলামায়ে কেরামের অবদান
ঢাকা ঃ ফোরকানিয়া লাইব্রেরী, বাংলা ১৩৯১।
১ম খণ্ড।

মুহাম্মদ মিয়াঁ, সায়্যিদ, মাওলানা : উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী
দিল্লী ঃ কিতাববিস্তান এম ব্রাদার্স,
১৪০৫/১৯৮৫।
১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড।

: উলামায়ে হক আওর-উনকে মুজাহিদানা কারনামে
দিল্লী : আল জমইয়্যত বুক ডিপো, ১৯৪৮।
১ম, ২য় খণ্ড।

: আসীরানে মাল্টা
আল জমইয়ত বুক ডিপো, ১৯৭৬।

: তাহরীকে শায়খুল হিন্দ
দিল্লী : আল জমইয়্যত বুক ডিপো, তা. বি.।

: হায়াতে শায়খুল ইসলাম
দিল্লী : আল জমইয়্যত বুক ডিপো, তা. বি।

যাকারিয়্যা, মুহাম্মদ, শায়খ : আপবীতী
সাহারানপুর : মাকতাবায়ে শায়খ যাকারিয়্যা, তা. বি.
১ম ও ২য় খণ্ড।

: শরীঅত ওয়া তরীকত কা তালাযুম
সাহারানপুর : কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম,
হি. ১৩৯৯।

: আকাবির কা তাক্ওয়া
সাহারানপুর : কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, তা. বি.।

: আল ইতিদাল ফী মারাত্তিবির রিজাল
(ইসলামী সিয়াসত)
সাহারানপুর : কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম তা. বি.।

: আকাবির কা সুলূক আওর ইহসান
সাহারানপুর : কুতুবখানা ইশাআতুল উলূম, তা. বি.।

যফীরুদ্দীন, মুহাম্মদ, মুফতী : ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ
করাচী : দারুল ইশাআত, ১৯৮৬।
১ম-১০ম খণ্ড।

রাখাল দাস, চট্টোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাস
কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১।
১ম খণ্ড।

রতন লাল, চক্রবর্তী	:	সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।
রশীদ আহমদ, গাঙ্গূহী	:	ফাতাওয়া রশীদিয়্যা দেওবন্দ ঃ মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৮৭।
	:	ইমদাদুস সুলূক সাহারানপুর ঃ কুতুবখানা ইয়াহয়াবিয়্যা, তা. বি.।
	:	তালীফাতে রশীদিয়্যা লাহোর ঃ ইদারা ইসলামিয়্যাত, ১৪০৮/ ১৯৮৭।
রাশিদ, হাসান, উসমানী	:	তাযকিরায়ে হযরত মাদানী দেওবন্দ ঃ রাশিদ কোম্পানী লি, তা. বি।
রশীদুল ওয়াহীদী, ডক্টর	:	শায়খুল ইসলাম মাদানী হায়াত ওয়া কারনামে দিল্লী ঃ আল জমইয়্যত বুক ডিপো, তা. বি.।
রশীদুদ্দীন, সায়্যিদ, হামীদী	:	শায়খুল ইসলাম ওয়াকিআত ওয়া কারামাত কী রওশনী মেঁ মুরাদাবাদ ঃ মাকতাবা নেদায়ে শাহী, ১৪১৫/১৯৯৫।
শান্তিময়, রায়	:	ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান নতুন সং, কলিকাতা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৪।
শিবলী, নুমানী, আল্লামা	:	সীরাতুন্নবী করাচী ঃ দারুল ইশাআত, ১৯৮৫। ১ম, ও ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম-৭ম খণ্ড।
	:	ইলমুল কালাম আওর আল কালাম করাচী ঃ মাসউদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪।
শামসুর রহমান, মুহাম্মদ	:	কায়েদ-এ-আযম ঢাকা ঃ ১৯৬৪।
শৈলেশ কুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়	:	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (জাতীয়তাবাদের সন্ধানে) কলিকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বাংলা ১৪০৫।

	:	দাঙ্গার ইতিহাস কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বাং ১৩৯৯।
	:	জিন্না পাকিস্তান নতুন ভাবনা কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বাং ১৩৯৪।
স্যার সৈয়দ, আহমদ	:	আসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ লাহোর : আইনা-এ-আদব,চওক মীনার, ১৯৬৯।
সিরাজুল ইসলাম, চৌধুরী	:	দ্বি-জাতিতত্ত্বের সত্য-মিথ্যা ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৩।
সারফরায খান, মুহাম্মদ, সফদর	:	আল মিনহাজুল ওয়াযিহ (রাহে-সুন্নাত) দেওবন্দ : দারুল কিতাব, তা. বি.।
সাদুদ্দীন, তাফতাযানী	:	শারহুল আকায়িদ আন নাসাফিয়্যা চট্টগ্রাম : আল মাকতাবাতুয যমীরিয়্যা, তা. বি.।
সুনীলকান্তি দে, ডক্টর	:	আঞ্জুমান উলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২।
সুলায়মান, সায়্যিদ, নদভী	:	ইয়াদরফতেগান আযমগড় : দারুল মুসান্নিফীন, ১৯৮৬।
সালমান, মুহাম্মদ, মনসূরপুরী	:	ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম দেওবন্দ : মাকতাবা দীনিয়্যা, ১৪১৮/১৯৯৭।
হান্টার, ইউলিয়াম, উইলসন	:	হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান (উর্দু) অনু : ড. সাদিক হুসায়ন মূল : The Indian Musalmans. লাহোর : ইকবাল একাডেমী, ১৯৪৪।

হিফযুর রহমান, মাওলানা : তাহরীকে পাকিস্তান পর এক নযর
দিল্লী : আল জমইয়্যত বুক ডিপো, তা. বি.।

হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা : আমরা যাদের উত্তরসূরী
ঢাকা : আল কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮।

হেমায়েতুদ্দীন, মাওলানা : আহকামে যিন্দেগী
ঢাকা : মজলিসে দাওয়াতুল হক, ১৪১৯/১৯৯৯।

হায়দার যামান, সিদ্দীকী : ইসলাম কা নযরিয়্যায়ে জিহাদ
লাহোর : গ্রন্থকার, ১৯৪৯।

হুসায়ন আহমদ, সায়্যিদ, মাদানী : নকশে হায়াত
করাচী : দারুল ইশাআত, তা. বি.।
১ম ও ২য় খণ্ড।

: সফরনামা আসীরে মাল্টা
দেওবন্দ: গ্রন্থকার, তা.বি.।

: মিস্টার জিন্নাহ কা পুর আসরার মুআম্মা
দিল্লী : আল জমইয়্যত বুক ডিপো, তা. বি.।

: পাকিস্তান কিয়া হায়
দিল্লী : আল জমইয়্যত বুক ডিপো, তা. বি.।

: খুতবায়ে সাদারত লাহোর
দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি।

: খুতবায়ে সাদারত সাহারানপুর
দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি।

: কাশফে হাকীকত
দেওবন্দ : মাকতাবা দীনিয়্যা, তা. বি.।

: রিসালা ঈমান ওয়া আমল
দিল্লী : আল জমইয়ত বুক ডিপো, তা. বি.।

: আশ শিহাবুস সাকিব
দেওবন্দ : মাকতাবায়ে রহীমিয়্যা, তা. বি।

: মুত্তাহিদা কাওমিয়্যত আওর ইসলাম
দিল্লী : কাওমী একতা ট্রাস্ট, তা. বি.।

: তাসাব্বুরে শায়খ
দেওবন্দ : মাকতাবা রহীমিয়্যা, তা. বি.।

: আল হালাতুত তালীমিয়্যা ফিল হিন্দ
দেওবন্দ, শায়খুল হিন্দ একাডেমী।

: আল বুহূছ ফিদ দাওয়াহ্ ওয়াল ফিকরিল ইসলামী
দেওবন্দ : শায়খুল হিন্দ একাডেমী,

: মাআরিফে মাদানিয়্যা
মুরাদাবাদ : মাকতাবা মজলিসে মাআরিফ
তা. বি.।

: ইহ্সান ওয়া তাসাওউফ
দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, তা. বি.।

: সদায়ে রাফআত
দেওবন্দ : মাদানী দারুল মুতালাআ, তা. বি।

Abdul Azia : **Discovery of Pakistan**
Lahord : SH. Gholam, Ali and Sons,
1964.

Abid Husain, S. : **Destiny of Indian Muslims**
Bombay : Asia Publishing House,
1965

Azad, Abul Kalam : **India Wins Freedom**
Calcutta : Orient longmeans,
1959.

Board of Researchers : **Islam in Bangladesh Through Ages**
Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1995

Hussain Ahmed, Madani : **An Open letter to Moslem League**
Lahor : Dewan's Publications, 1946

Nehru, Jawaharlal : **Autobiography**
London : Bodley Heed, 1955

: **Discovery of India**
London : Meridian Books Ltd, 1951

Ziaul Hasan, Faruqi : **Deabond School and the Demand For Pakistan.**
Bombay : Asia Publishing House, 1963.

পত্র পত্রিকা

অগ্রপথিক (ঢাকা) : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ ; সেপ্টে- ১৯৯৫ ।

আর রশীদ (লাহোর) : দারুল উলূম দেওবন্দ-সংখ্যা, ফেব্রু-মার্চ ১৯৭৬; মাদানী ওয়া ইকবাল সংখ্যা, ১৯৭৮ ।

আর রশীদ (চট্টগ্রাম) : জামেয়া ওবায়দিয়া নানুপুর, অক্টো ১৯৯৯ ; জানু-ফেব্রু ১৯৯৮ ।

আর রায়িদ (লক্ষ্ণৌ) : নদওয়াতুল উলামা, ১৬ অক্টো, ১৯৯৭ ।

আল ইরশাদ (পেশাওয়ার)	ঃ	ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮।
আল ওয়াযুল ইসলামী (কুয়েত)	ঃ	রজব, ১৩৯৩।
আল জমইয়ত (দিল্লী)	ঃ	শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ফেব্রু ১৯৫৮; দারুল উলূম সংখ্যা, কাওমী জমহুরী কনভেশন সংখ্যা, ডিসেঃ ১৯৬৪; মুজাহিদে মিল্লাত সংখ্যা।
আল বাসুল ইসলামী (লক্ষ্ণৌ)	ঃ	নদওয়াতুল উলামা, ডিসে-জানু ১৯৯৭৭/৯৮।
আল বালাগ (করাচী)	ঃ	মুফতী শফী সংখ্যা ; মুহাররম, হি ১৪০২।
আল ফোরকান (লক্ষ্ণৌ)	ঃ	শাহ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যা, হি. ১৩৫৯।
আল বায়্যিনাত (করাচী)	ঃ	ইউসূফ বিন্নোরী সংখ্যা, জানু - ফেব্রু, ১৯৮৭।
আল হক (পেশাওয়ার)	ঃ	দারুল উলূম হাক্কানিয়্যা, মার্চ ১৯৯৩।
আল হক (চট্টগ্রাম)	ঃ	দারুল মাআরিফ, নভেম্বর ১৯৯৭।
ইনসানিয়্যত (ঢাকা)	ঃ	জামেয়া মালিবাগ-এর বার্ষিকী, ১৯৯২; ৯৩; ৯৪; ৯৫।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা	ঃ	জুলাই-সেপ্টে ১৯৯৬; অক্টো-ডিসে ১৯৯৩; অক্টো-ডিসে ১৯৯৭; জানু-মার্চ ১৯৯৯; এপ্রিল-জুন ১৯৯৬; জানু-মার্চ ১৯৯৭; এপ্রিল-জুন ১৯৮৮।
উর্দূ ডাইজেষ্ট (লাহোর)	ঃ	আগষ্ট, ১৯৮৮।
কাফেলা (ঢাকা)	ঃ	জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা-এর বার্ষিকী, ১৯৯৪; ৯৫; ৯৬ ; ৯৭।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা	ঃ	জুন ১৯৮৩ ; ফেব্রু ১৯৮৯ ; জুন ১৯৯১ ; জুন ১৯৯২ ; অক্টো ১৯৯২।

তামীরে হায়াত (লক্ষ্ণৌ) : নদওয়াতুল উলামা, ২৫ অক্টো ১৯৯৭ ;
১০ নভে ১৯৯৭; ২৫ ফেব্রু ১৯৯৮।

দিশারী (ঢাকা) : চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসার বার্ষিকী, ১৯৯২;
৯৩; ৯৪; ৯৫; ৯৬।

নূরে তাওহীদ (নেপাল) : কৃষ্ণনগর, কপিলাবস্তু, মে ১৯৯৭।

পাথেয় (ঢাকা) : নভেম্বর ১৯৯৮ ।

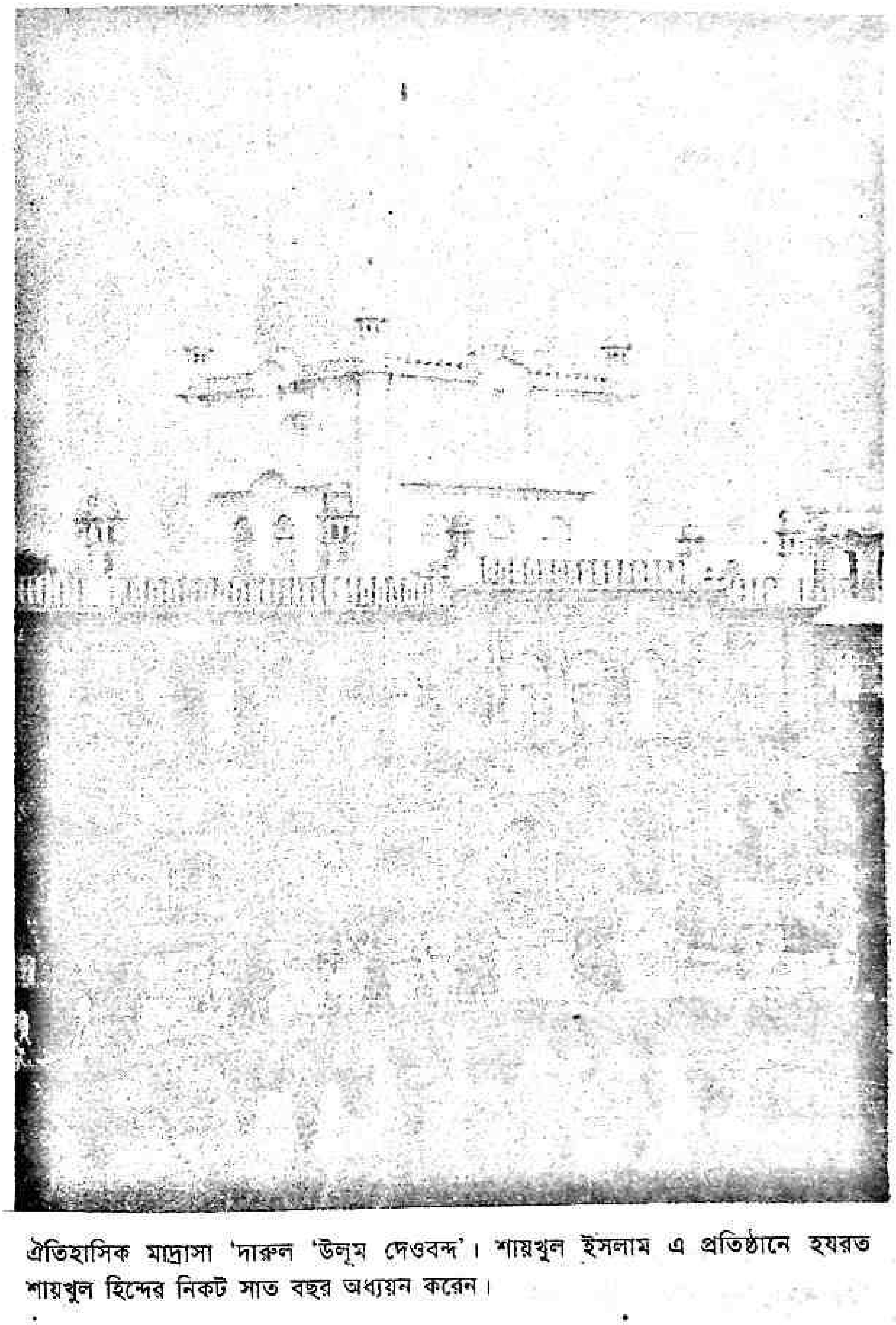
মদীনা (বিজনৌর) : ১৯৪৯; ২৫ জুলাই ১৯৩২;
২৫ ফেব্রু ১৯৩০।

চেরাগে রাহ (করাচী) : নযরিয়্যা-এ-পাকিস্তান সংখ্যা, ডিসে ১৯৬০।

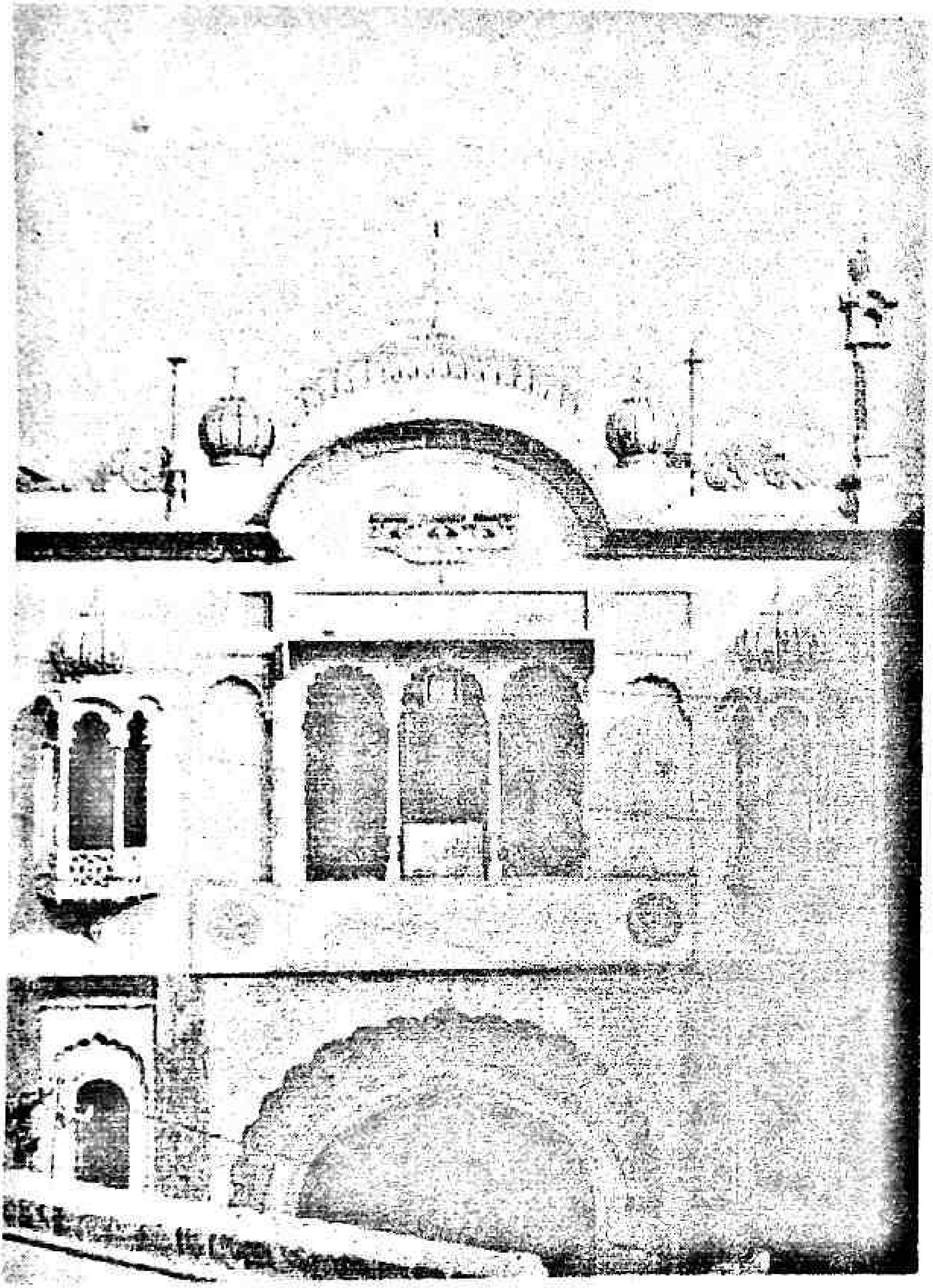
মাজাল্লাতুল আরাবী (কুয়েত) : ওয়ারাতুল আওকাফ, ১৯৬৮।

মাজাল্লাতু উলূমিদ-দীন (আলীগড়) : ফেকাল্টি অব থিউলজী-এর বার্ষিকী,
১৯৭১-৭২।

মাজাল্লাতুল মানহাল (মদীনা) : জুমাদাল উখ্‌রা, ১৩৭৭।



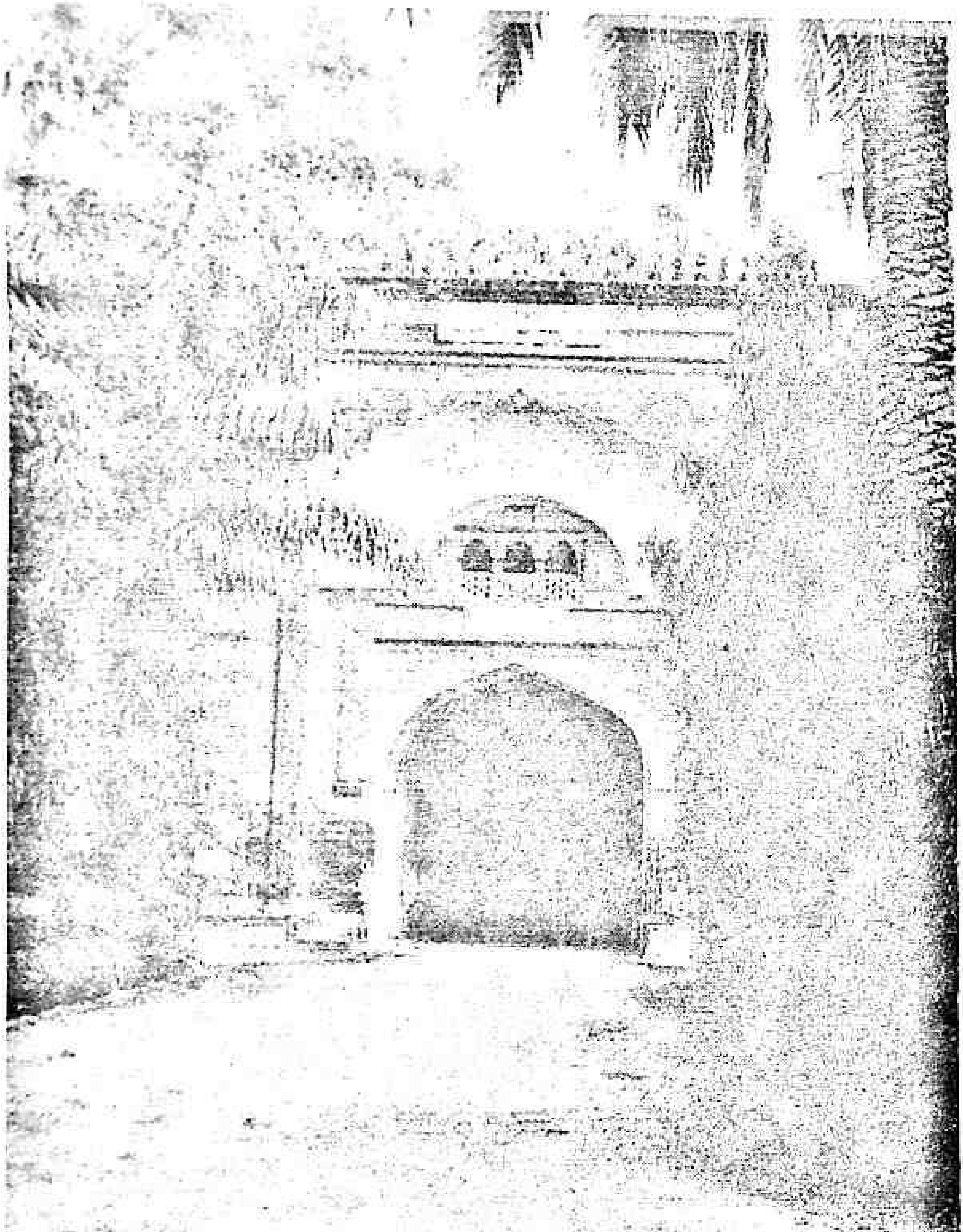
ঐতিহাসিক মাদ্রাসা 'দারুল 'উলূম দেওবন্দ'। শায়খুল ইসলাম এ প্রতিষ্ঠানে হযরত শায়খুল হিন্দের নিকট সাত বছর অধ্যয়ন করেন।



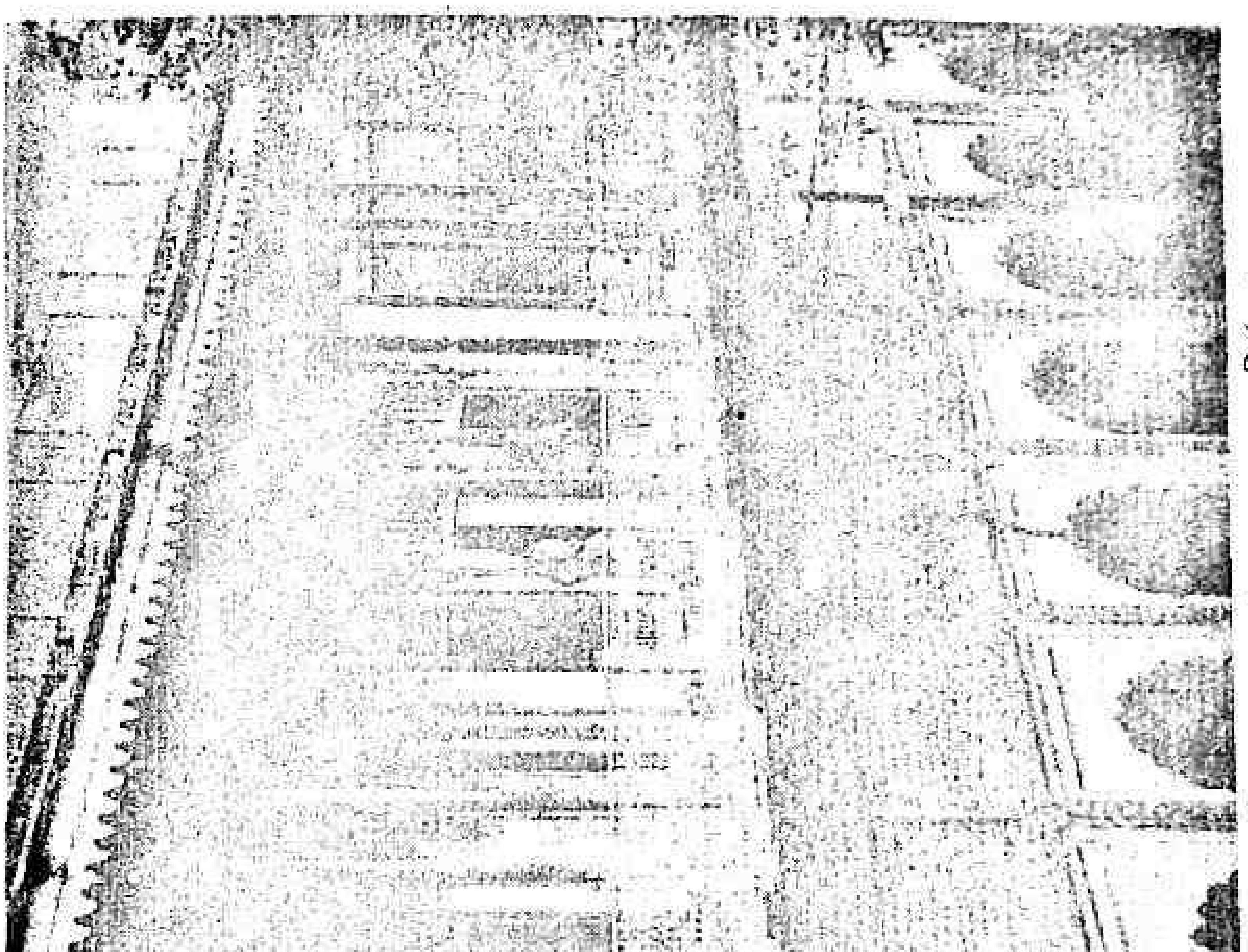
দারুল 'উলূম দেওবন্দের প্রধান ফটক। এটি প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসিম নানূতবী (রহ.)-এর নামানুসারে 'বাবে কাসিম' নামে পরিচিত।



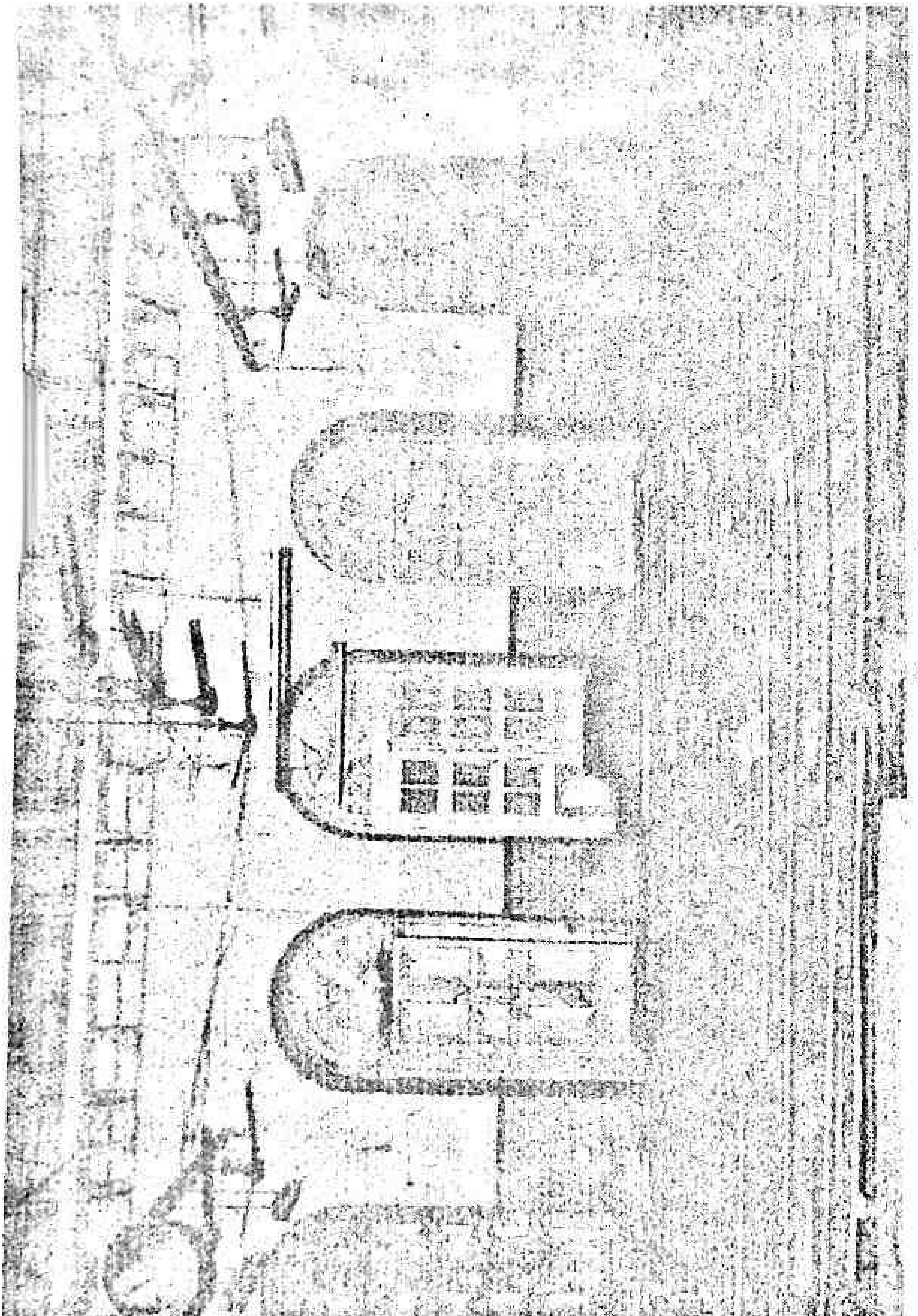
দারুল 'উলূমের 'মাদানী গেইট'। শায়খুল ইসলাম এ পথে মাদানী মনযিল থেকে দারুল 'উলূম যাতায়াত করতেন।



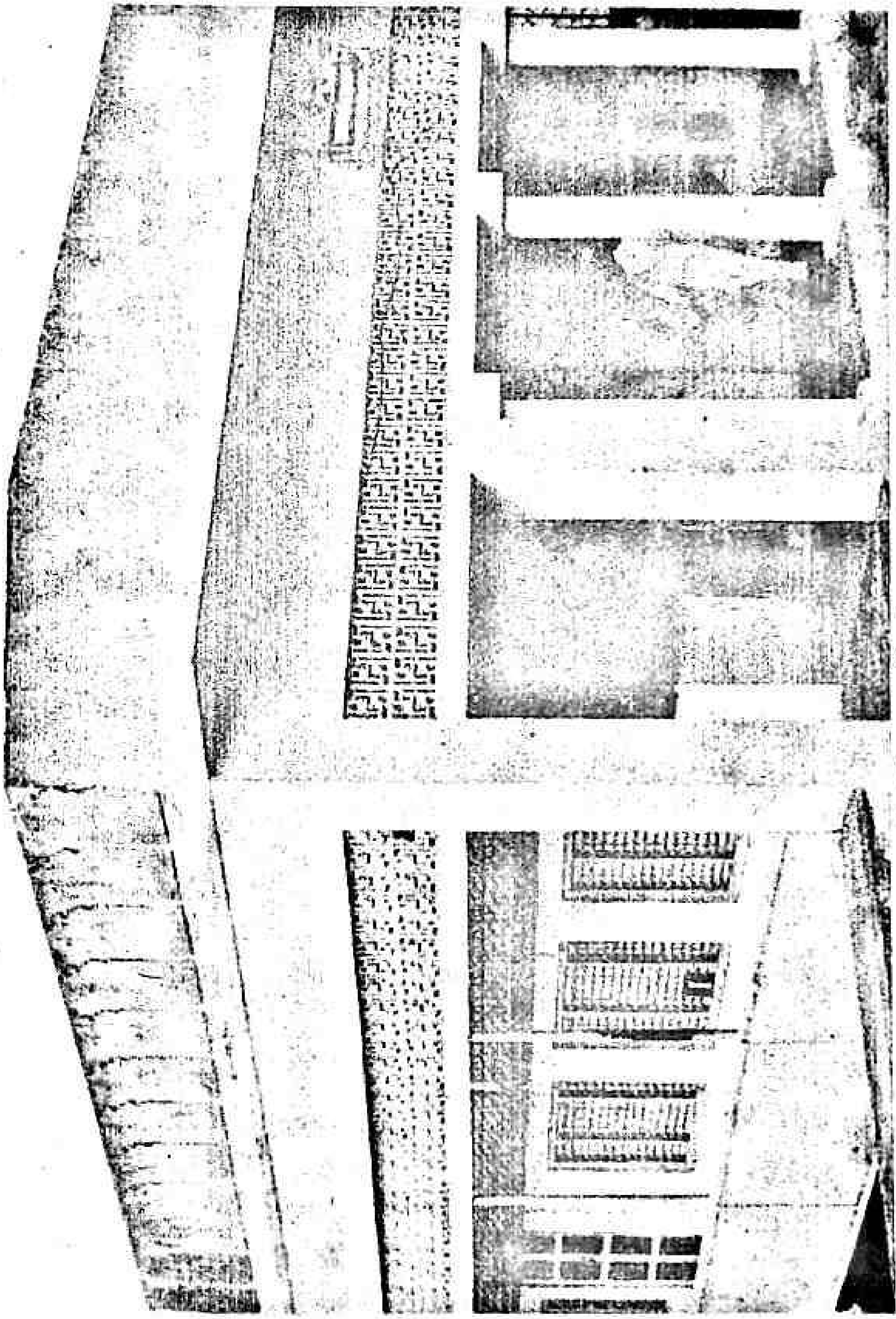
'বাবুয্ যাহির'- এটি ১৯৪০ সালে শায়খুল ইসলামের সদ্‌র মুদার্‌রিসীর আমলে আফগানিস্তানের সম্রাট যাহির শাহ্‌-এর অনুদানে নির্মিত হয়।



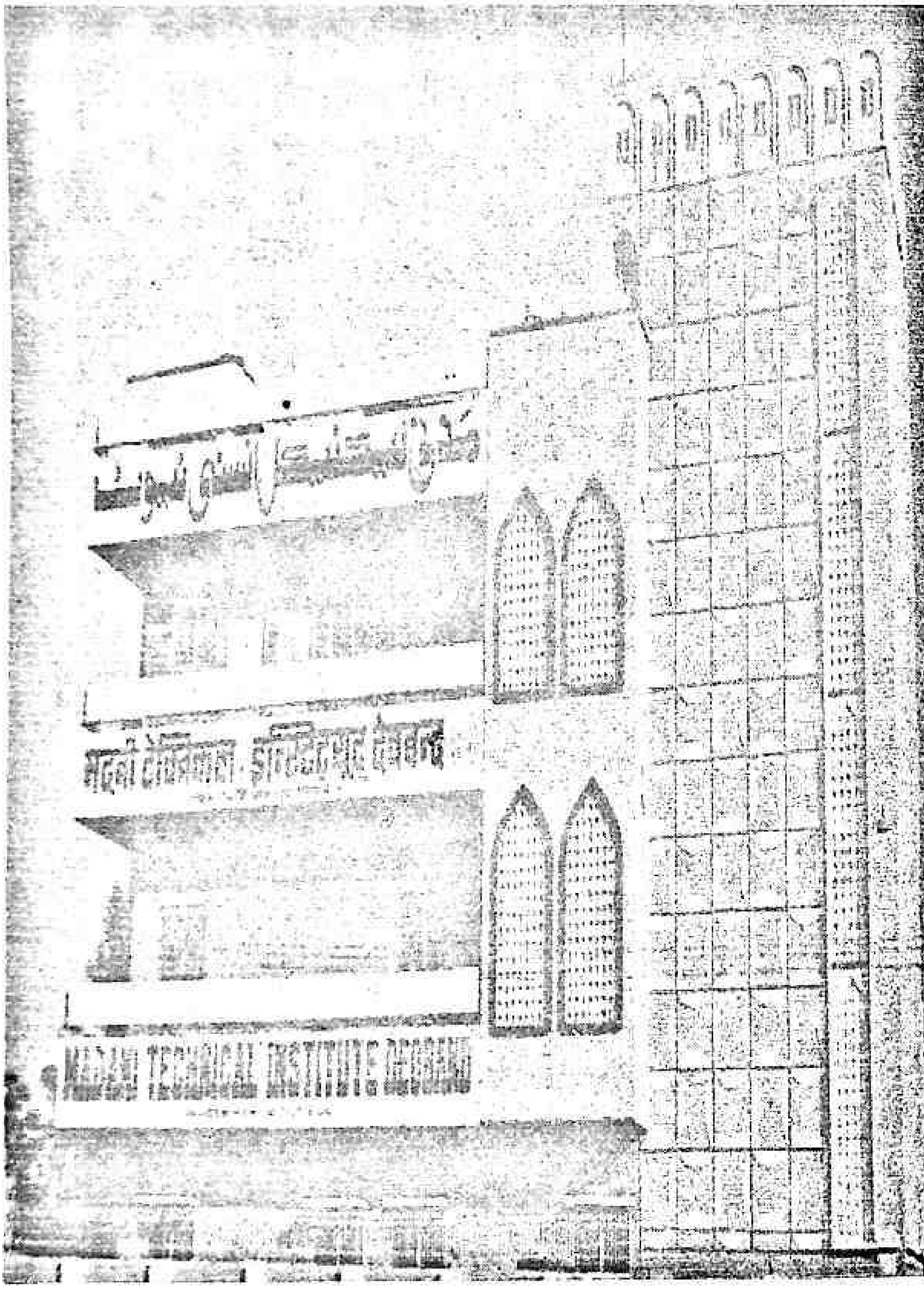
দারুল উলূম দেওবন্দের ঐতিহাসিক 'দারুল হাদীস'। শায়খুল ইসলাম এখানে দীর্ঘ ৩২ বছর সহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী গ্রন্থের অধ্যাপনা করেন।



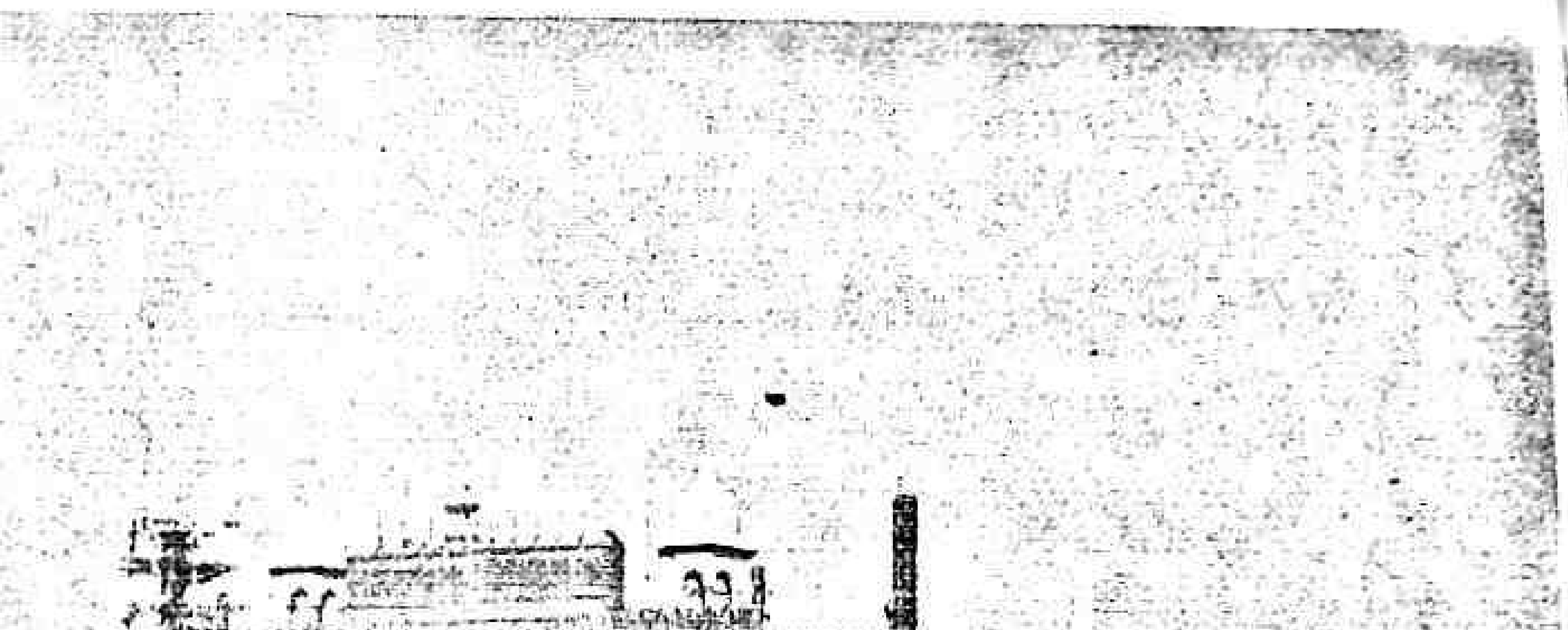
দারুল হাদীসের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য।



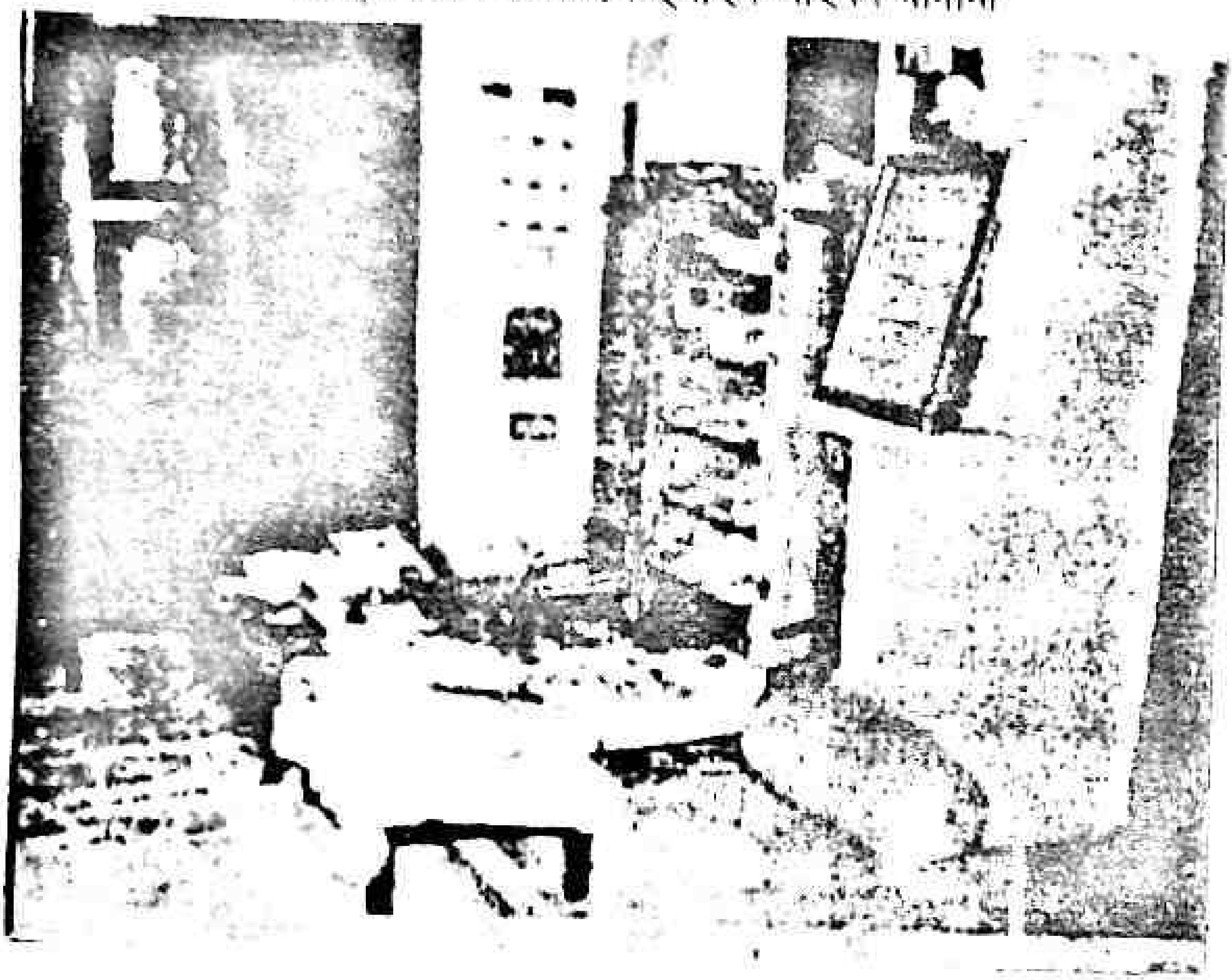
দারুল উলূম দেওবন্দের 'তা'লীমাত অফিস'। মাদ্রাসার সময়ে শায়খুল ইসলাম এ অফিসে বসতেন।

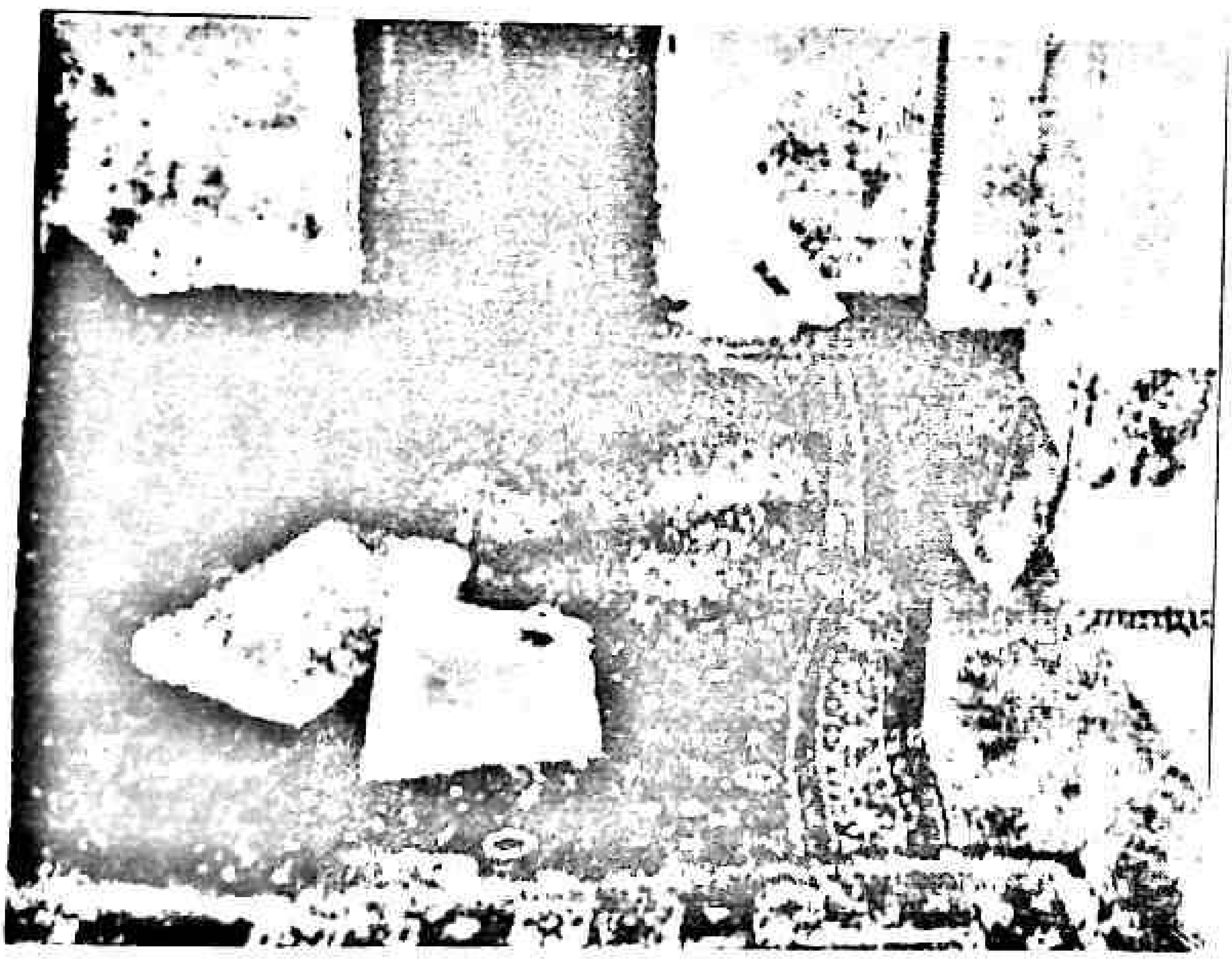


মাদানী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট দেওবন্দ।

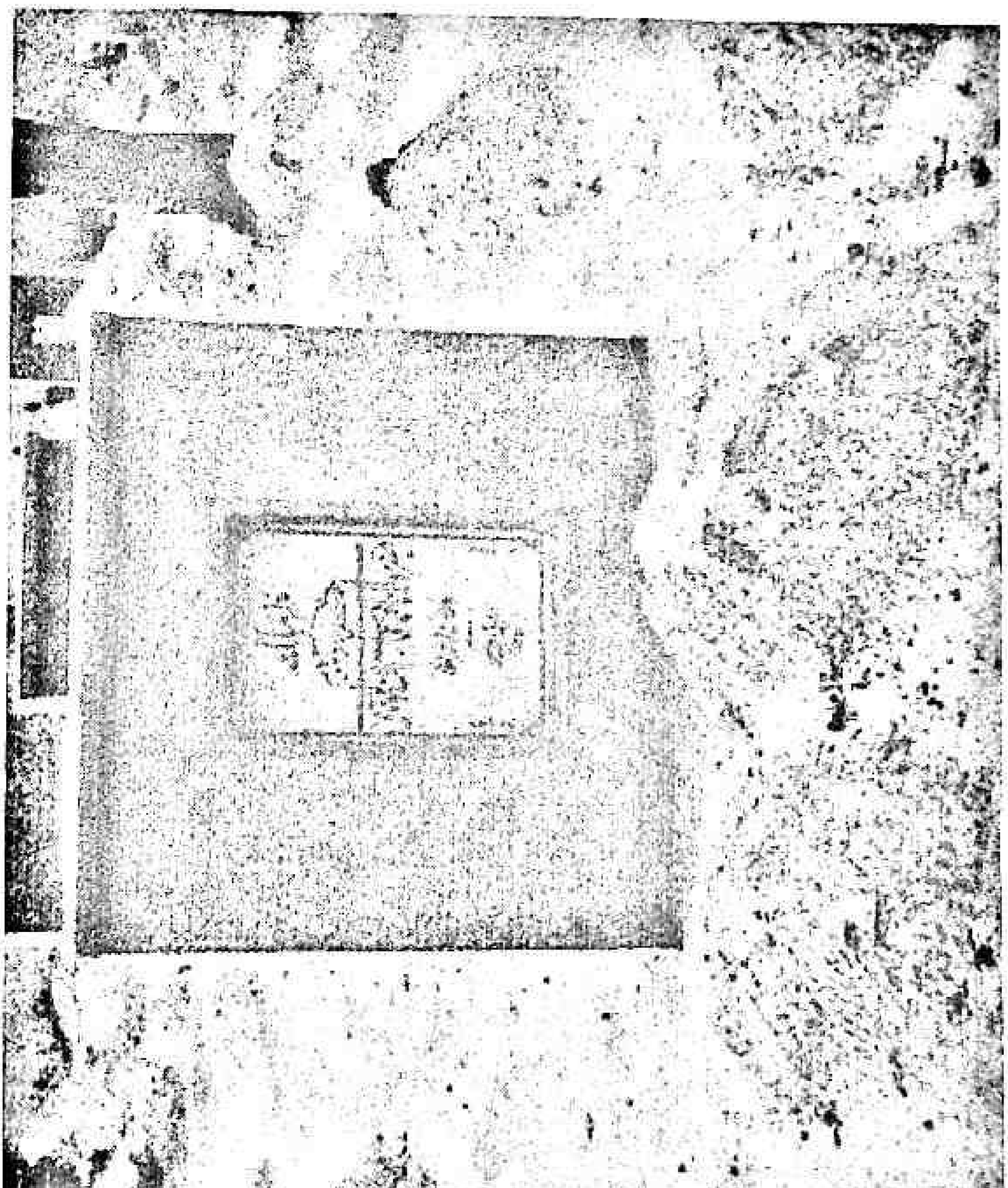


দারুল 'উলূম দেওবন্দের নতুন জামি' মসজিদ। শায়খুল ইসলামের সাহেবযাদা ফিদায়ে মিল্লাত হযরত সায়্যিদ আস'আদ মাদানীর উদ্যোগে এ মসজিদ নির্মিত হয়। এটি দারুল 'উলূমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক হযরত রশীদ আহ্মদ গাঙ্গূহী (রহ.)-এর নামানুসারে 'মসজিদে রশীদ' নামে পরিচিত।





গৃহের ভিতর শায়খুল ইসলামের অধ্যয়ন কক্ষ ও মেহ্‌মানখানা।



হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর সমাধি। শায়খুল ইসলাম অনেক সময় এখানে 'মোরাকাবা' করতেন।



দারুল উলুমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুহতামিম হযরত হাজী সায়্যিদ 'আবিদ হুসায়ন (রহ.)-এর সমাধি।



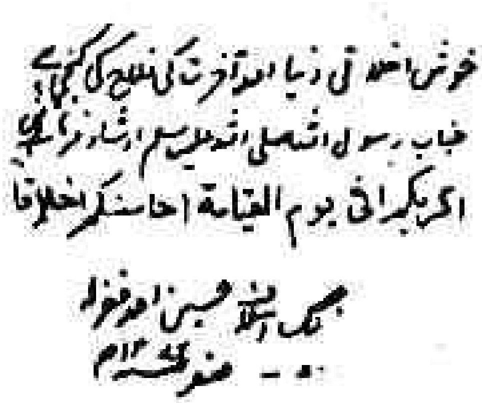
পারিবারিক গোরস্তানে অবস্থিত হযরত 'আল্লামা সায়্যিদ আন্ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহ.)-এর সমাধি। শায়খুল ইসলামের যোগদানের পূর্বে তিনিই দারুল 'উলূমের 'সদ্র মুদাররিস' ছিলেন।



মাকবারায়ে কাসিমীতে অবস্থিত শায়খুল ইসলাম (রহ.) ও তাঁর প্রাণপ্রিয় শিক্ষক হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর যুক্ত সমাধি।







মাল্টা কারাগার থেকে লিখিত শায়খুল ইসলাম-এর একটি চিঠি ও চিঠির খাম। এটি তিনি ১৯১৯ সালে মুরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত আমরূহার 'মাওলানা হাফিয যাহিদ হাসানের' নিকট লিখেছিলেন। নীচে তার একটি অটোগ্রাফ।



الجمعیۃ دہلی

خصوصی شمارہ جلد

عنوانات اور ترتیب مضامین

ضروری اعلان

ملنے کا پتہ :-

(۱) الجمعیۃ بک ڈپو - قاسم جان اسٹریٹ - دہلی ۶

(۲) مکتبۂ دینیہ - دیوبند - ضلع سہارنپور، یوپی

শায়খুল আসলামের জীবন ও কর্মের স্মরণে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত দৈনিক আল জম'ইয়ত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা "শায়খুল ইসলাম নম্বর"-এর প্রথম পৃষ্ঠা। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা, মুজাহিদ মিল্লাম মাওলানা হিফযুর রহমান, দারুল 'উলূমের মুহতামিম মাওলানা কারী তায়্যিব. তাবলীগ জামা'আতের বিশ্ব আমীর হযরতজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভীসহ প্রখ্যাত বহু উলামা এ সংখ্যায় লেখা দিয়ে শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

পরিশিষ্ট-১

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে গৃহীত জমইয়তে উলামায়ে হিন্দের রেজুলেশন

RESOLUTION EAST BENGAL
Office of Jamiat-e-Ulema, Dilhi.
April 26-27, 1971

This meeting of the Working Committee of Jamiat Ulama-e-Hind expresses its resentment and deepest sorrow and grief over the inhuman atrocities in East Bengal.

The atrocities committed in East Bengal and the oppression which continues there is a matter of concern for the whole civilised world. Islam does not permit such bloodshed and rampage. If those at the helm of affairs would have shown largeheartedness, magnanimity and statesmanship, it would have been possible to avoid this mutual strife and bloodshed and to save large number of human lives and property from destruction.

This Working Committee of Jamiat Ulama-e- Hind appeals to the intellectuals, thinkers, statesmen and conscentious men to make fullest efforts to stop inhuman atrocities and widespread bloodshed.

The Working Committee of Jamiat Ulama-e- Hind expresses its sympathy with all the sufferers of East Bengal who have been the victims of large scale killing and destruction, injustice and barbarism.

Jamiat-e-Ulema Convention
MUSLIM INSTITUTE HALL, CALCUTTA
August 18,1971

RESOLUTIONS

1. Whereas this Convention of the Jamiat-e-Ulema is of the considered view that the freedom movement of the people of East Bengal, eighty five percent of whom are Musalman, is a fight against economic exploitation and suppression of their democratic rights by the West Pakistan military regime;

And whereas this Convention is satisfied that this movement is for upholding the principles of Democracy, equality and social justice which Islam has contributed to mankind;

The Jamiat-e-Ulema extends the whole-hearted support to this freedom movement.

2. Whereas this Convention of the Jamiat-e-Ulema is convinced through conclusive evidences that the autocratic military regime of West Pakistan led by General Yahya Khan has launched an armed aggression on the

Musalman-majority territory of East Bengal and committed genocide killing about a million of people. driving out more than seven millions to India and rendering homeless inside East Bengal another thirty millions:

And Whereas this convention is satisfied that the atrocious conduct of the West Pakistan regime runs contrary to the fundamentals of Islamic teachings and is a crime against Islam itself:

The Jamiat-e-Ulema strongly condemns the fascist rulers of West Pakistan for their un-Islamic acts.

3. Whereas this convention of the Jamiat-e-Ulema is convinced that Sheikh Mohammad Mujibur Rahman. the accredited leader of the people of East Bengal. is not guilty of any crime or offence whatsoever:

And Whereas this convention is satisfied that sheikh Mohammad Mujibur Rahman has not declared any war against the state but it is General Aga Yahya Khan who has declared and waged war against East Bengal and its people. eighty five percent of whom are musalman:

This assembly of Jamiat-e-Ulema condemns the West Pakistan military government of General Yahya Khan for trying Sheikh Mohammad Mujibur Rahman in a secret military court and urges at the same time that the General Yahya and his West Pakistan military junta should be tried for wanton destruction of life and property of millions of peace-loving people of East Bengal:

4. Whereas this convention of the Jamiat-e-Ulema has noted with relief that the Government of India have rendered great humanitarian services providing shelter. food and security to the uprooted millions of people of East

Bengal, who have crossed to India to escape the Wast Pakistan military repression:

And Whereas the convention has noted with satisfaction that the Great Prime Minister of India and her colleagues have assured a political settlement envisaging independence of East Bengal (Bangladesh) and also the recognition of the Government of India to the newly-formed state of Bangladesh;

The Jamiat-e-Ulema places on record its heartfelt thanks to the Great Prime Minister and expects that the Government of India would extend the recognition to Bangiadesh Republic at the appropriate moment.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ